সুলতানী বাংলার অর্থনীতি
[Economy of Sultanat Bengal]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সুফিয়া খাতুন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ০৭/২০১১-২০১২

পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ৭৬/২০১৬-২০১৭

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি সুফিয়া খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **পিএইচ ডি** ডিগ্রির জন্য জমাদানকৃত ***সুলতানী বাংলার অর্থনীতি*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে **পিএইচ ডি** ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য জমা প্রদান করিনি। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

সুফিয়া খাতুন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ০৭/২০১১-২০১২

পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৭৬/২০১৬-২০১৭

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার **পিএইচ ডি** শিরোনাম '*সুলতানী বাংলার অর্থনীতি*'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় উপাচার্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান– এর তত্ত্বাবধানে আমি এই অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্যারের সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া তিনি আমাকে অনুপ্রেরণা ও সস্নেহ উপদেশ দিয়ে আমার কাজকে সর্বদা গতিশীল রেখেছেন। এজন্য আমি স্যারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বহু ব্যস্ততার মাঝেও অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যার আমাকে সময় দিয়েছেন এটাও আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। এজন্য আমি স্যারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর নিকট থেকে আমার যে শিক্ষালাভ সেটি ভবিষ্যতে আমার চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক ড. এস এম মফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান, ড. আব্দুল বাছির, ড. মো: নুরুল আমীন, ড. এটিএম শামছুজ্জোহা, ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ। আমার সহকর্মীগণও আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে অধ্যাপক ড. এস এম মফিজুর রহমানের পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতায় আমি খুব উপকৃত হয়েছি। তাদের সবার পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে তিনি আমাকে বিভিন্ন তথ্যের সন্ধান ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইড ডি গবেষণার নীতিমালার শর্তপূরণের জন্য আমাকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় **'সুলতানী বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য'** এবং **'সুলতানী বাংলার কতিপয় আর্থ-সামাজিক শক্তি'** শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি। উপস্থাপিত উক্ত দুটি প্রবন্ধের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি যে সকল প্রাজ্ঞ লেখক ও গবেষকের লেখালেখি ব্যবহার করেছি তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি এটি সম্পন্ন করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার, ফার্সি বিভাগের সেমিনার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, বাংলা বিভাগ ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারে কাজ করেছি। দেশের বাইরে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা থেকে আমাকে পিডিএফ বই পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন-চঞ্চল চৌধুরী, সিনিয়র যুগ্মসচিব (রাজস্ব), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা। এছাড়াও কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকেও তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা–কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই কলকাতার চঞ্চল চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক প্রকাশ বিষু, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণেন্দু দত্তকে। বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন ভারতী রানী হালদার, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। আমার গবেষণাকর্মে সহায়তার জন্য তারা অনেক তথ্য–উপাত্ত দিয়েছেন ও বই পাঠিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্বামী নিউরোলজিস্ট ডা: মো: মামনুর রশীদ-এর প্রতি। তিনি নানাভাবে আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমার পুত্র সাজিদ আল মামুন, কন্যা মালিহা মুনতাহা সাবা তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা। এছাড়াও সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভাবী সালমা জামান। তাঁর প্রতি আমার অনেক কৃতজ্ঞতা পরিশেষে আমার মা, বাবা, দুই ভাই ইউনুস, সুলাইমান, মামা, শ্বশুর আমার সকল আত্মীয় পরিজন ও অনুপ্রেরণা দানকারীদের ধন্যবাদ জানাই।

সুফিয়া খাতুন

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
সারাংশ	i-iv
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৩১-৬৯
তৃতীয় অধ্যায়	
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান	৭০-৯৫
চতুর্থ অধ্যায়	
সুলতানী বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা	৯৬-১৩৯
পঞ্চম অধ্যায়	
সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশ	১৪০-১৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	
বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা	১৯০-২১৪
সপ্তম অধ্যায়	
প্রাক-মোগল বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন	২১৫-২৬২
অষ্টম অধ্যায়	
সুলতানী বাংলার নগরায়ণ	২৬৩-২৯৭
উপসংহার	২৯৮-৩০৬
পরিশিষ্ট	৩০৭-৩২৮
গ্রন্থপঞ্জি	৩২৯-৩৪৬

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সেই দেশের ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ-নদী, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সূচককে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলার অর্থনীতিতে তৎকালীন ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসকগণ রাজত্ব করেন এবং তৎকালীন বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। যেমন বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি। এসব রাজ্যগুলোতে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। সেন শাসনের শেষদিকে প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। এ সময়ে বাংলার নানাস্থানে বেশ কয়েকজন শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যেমন, সুন্দরবনের খাড়ি মণ্ডলের শাসকের স্বাধীনতা ও মহারাধিরাজ উপাধি গ্রহণ, কুমিল্লায় স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব, মেঘনার পূর্বতীরে দেব শাসকদের শাসন পরিচালনা। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। বাংলায় আগত শাসকগোষ্ঠী ছিল শহুরে জাতি, ফলে তাদের বসবাস ও অন্যান্য প্রয়োজনে নতুন নতুন নগরকেন্দ্রে গড়ে উঠে এবং এসব নগরকেন্দ্রকে ঘিরেই পরবর্তীতে নগরের বিকাশ ঘটে। মুসলিমদের ধর্মচর্চার জন্য মসজিদ ও মাদরাসা গড়ে উঠে এবং অভিবাসী সুফি-সাধকগণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন– পরবর্তীতে এগুলোকে ভিত্তি করে নগরের বিকাশ সাধিত হয়। এছাড়া যে সকল প্রশাসনিক কেন্দ্র, থানা, ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসব কেন্দ্রও নগরায়ণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুলতানী শাসনাধীনে লখনৌতি, দেবকোট, চট্টগ্রাম ও মাহিসুন/মাহিসন্তোষ প্রভৃতি নগরের সমৃদ্ধির ফলে বহিরাগত মুসলমান জনগোষ্ঠী বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য যে, তেরো শতকে চেঙ্গিস খান সমগ্র মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র তুরস্ক, বোখারা, সমরকন্দ ধ্বংস করায় ঐসব অঞ্চলের লোকজন ভারতের মুসলিম রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাদের অনেকে বাংলায় বসতি স্থাপন করে। বাংলার সুলতানগণ এ সকল মুসলিমদেরকে সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করেন। তৎকালীন সময়ে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী বাংলার নগরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করেন, ফলে অভিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় শাসকগণ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের মুদ্রার প্রচলন এবং অভিজাতশ্রেণির চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

এ কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ ঘটে। বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় বিদেশি বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বাংলায় আসতে শুরু করে। আগত বণিকদের ভাষার সমস্যা, মুদ্রার ব্যবহার, স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ, ওজন সমস্যা প্রভৃতি কারণে তারা স্থানীয়দের শরণাপন্ন হয়। ফলে স্থানীয় বিক্রেতা ও বণিকদের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নতুন পেশাজীবীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকাশের ফলে বন্দরকেন্দ্রিক নগরগুলো দ্রুত বিকশিত হয়। বন্দরের সকল কার্যাবলি পরিচালনার জন্য বন্দরসংলগ্ন উপশহর গড়ে ওঠে। নগরের অধিবাসীদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্পকারখানা বা কুটির শিল্প গড়ে উঠায় কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সুলতানগণ বাংলায় নতুন প্রযুক্তি আমদানি করেন এবং শিল্পকারখানায় এসব প্রযুক্তির ব্যবহারে পণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়। কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষির উৎপাদনও বেড়ে যায়। কৃষির উন্নয়নের ফলে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান থাকায়, কৃষিনির্ভর কুটির শিল্পকারখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের সাথে অনেক লোক জড়িত হওয়ায় নতুন নতুন জাতি ও জাতি শাখার জন্ম হয়। পূর্বের তুলনায় বেশি পণ্য উৎপাদনের ফলে দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গতিশীলতা আসে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সময়ে সুলতানগণের উদারনীতির ফলে শিক্ষার নানান বিভাগ সবার জন্য উন্মুক্ত হয় এবং নিম্নশ্রেণির মানুষ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। প্রাক-মুসলিম যুগে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নশ্রেণির কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত না। তারা ধর্মীয় গ্রন্থ পঠন, পাঠন ও পরিচর্যার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মুসলিম শাসনাধীনে হিন্দু ধর্মের অনেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে যোগ্যতা অনুসারে সুলতানদের অধীনে উচ্চপদে চাকরিতে নিযুক্ত হয়। ফলে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পায়। উল্লেখ্য যে, বাংলায় আগত মুসলিম সুফি–সাধকগণের আধ্যাত্মিকতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করত। তাদের খানকাহ, সরাইখানাগুলোতে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি পরিচালিত হতো। তাদের এই কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে নিম্নশ্রেণির সুবিধাবঞ্চিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা সীমিত পরিসরে ব্যবসা পরিচালিত হতো। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার নিম্নশ্রেণির লোকেরা নতুন করে কুটির শিল্পে ও অন্যান্য কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায়। মুসলিম শাসনের পূর্বে তাদের এই পেশা পরিবর্তনের সুযোগ ছিল

না। সার্বিক এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন সুলতানী বাংলার সমাজজীবনকে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলিত করেছিল।

গবেষণাকর্মের পরিধি ও সময়কাল

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সুলতানী আমল বলতে ১২০৪ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া বাংলা[১] বলতে বর্তমানের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সমন্বয়ে গঠিত ভূ-ভাগকে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, মালদাহ, দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ভারতের বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়েই বাংলা গঠিত ছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর বাংলা উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দেবকোট হয়ে রংপুর (রঙ্গপুর) পর্যন্ত, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা), পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে বিহার ও এর সংলগ্ন এলাকাও ইবনে বখতিয়ার খলজির অধীনে ছিল।[২] লখনৌতি রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়ে ত্রিবেণী, সাতগাঁও, শ্রীহট্ট (আরসাহ শ্রীহট্ট-১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ), ফতেহাবাদ/ফরিদপুর (১৪১৫-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ), খুলনা, বাগেরহাট (১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ), পটুয়াখালী (মির্জাগঞ্জ শিলালিপিতে উল্লেখিত-১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ), চট্টগ্রাম (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ), কামরূপ-কামতা, আসাম ও উড়িষ্যারও কিছু অংশ বাংলার অধীন হয়। এভাবে বাংলার স্বাধীন আফগান সুলতানদের শাসনামলে সমগ্র বাংলা (আসামসহ), বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন বাংলা[৩] রাজ্য গঠিত ছিল। সঙ্গত কারণেই এসব অঞ্চলসমূহের অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজধানী শহর, নগর ও বন্দরগুলোর আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

সুলতানী বাংলার অর্থনীতি মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন নিয়ামকের বিচার বিশ্লেষণ এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভটি

---

১ গোলাম হোসেন সলীম বাংলার সীমানা নির্দেশ করে বলেন যে, বাংলা দ্বিতীয় ইকলিমে অবস্থিত এবং হিন্দুস্থানের একটি অংশ। এর পূর্বে ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম), পশ্চিম সীমানায় তেলিয়াগিড়ি (রাজমহলে) এবং পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য আনুমানিক ৪০০ শত ক্রোশ। বঙ্গের উত্তর প্রান্তে পর্বতমালা এবং দক্ষিণে সরকার মান্দারন (বীরভূমে)। বিস্তারিত দেখুন, Ghulam Husain Salim, *Riyazu-S-Salatin, (*eng.tra.) Abdus Salam, Idarah–I-Adabiyat-I- Delhi, 1975, pp.7-8

২ Jadunath Sarker (ed.), *The History of Bengal*, vol. 2, 3rd ed., D.U, 1976, pp. 12-13

৩ Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to A. D. 1538) Asiatic Society of Pakistan, (Publication No.6, Dacca, 1960), p.76; Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal*, vol. 4, Rajshahi, 1960, pp.19-20, 25, 65-66

রচনা করা হয়েছে। বাংলার সুলতানী শাসনামলের ওপর যে সকল গবেষণাকর্ম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই বেশি সংখ্যক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও কিছু গবেষণা পরিলক্ষিত হয়। তবে সুলতানী বাংলার অর্থনীতির সার্বিক বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুবই কম এবং যা হয়েছে তাও বিক্ষিপ্তভাবে। এছাড়া এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমার জানা মতে সুলতানী বাংলার অর্থনীতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এজন্য আমি মনে করি সুলতানী বাংলার অর্থনীতি বিষয়ে নতুন করে বৃহৎ আকারে গবেষণার যৌক্তিকতা ও সুযোগ রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনীতি মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তৎকালীন বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে সার্বিকভাবে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে এই গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- সুলতানী শাসনের পূর্বে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।
- বাংলায় সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের পরিধি সম্পর্কে জানা।
- মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বাংলার নগরায়ণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা।
- তৎকালীন বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ণয় ও মূল্যায়ন করা।
- সুলতানী বাংলায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে জানা এবং
- সুলতানী বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্বব্যবস্থা পর্যালোচনা ও তৎকালীন অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

সামাজিক ও মানববিদ্যা গবেষণায় বর্তমান সময়ে বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Research), ব্যাখ্যামূলক (Causes and Effect) ও গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ বেশ জনপ্রিয়। বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়, ঘটনা ও ঘটনার কারণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে এর বর্ণনাক্রম সাজানো হয়। বর্ণনামূলক গবেষণাকে কেন্দ্র করেই ব্যাখামূলক গবেষণা

পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির মাধ্যমেই কোনোকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সংক্ষিপ্ত বিষয়ের কারণ ও প্রভাব (causes & effect) সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। অন্যদিকে গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অগাণিতিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে গুণগত বা কোয়ালিটিটিভ গবেষণা বলে। আলোচ্য গবেষণাকর্ম রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি প্রাধান্য পেয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণেরও প্রয়াস রয়েছে।

গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা

সুলতানী বাংলার অর্থনীতি শীর্ষক আলোচ্য গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং (২) দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source)। প্রাথমিক উৎসসমূহকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, (ক) ফার্সি ভাষায় রচিত ইতিবৃত্ত, (খ) সুফি সাধকদের জীবনচরিত এবং চিঠিপত্র, (গ) বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ বা ভ্রমণ কাহিনি, (ঘ) মুদ্রা ও শিলালিপি সংক্রান্ত ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও (ঙ) সমকালীন বাংলা সাহিত্য। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে আধুনিক ঐতিহাসিক, গবেষক ও পণ্ডিতগণের ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি এবং বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ/নিবন্ধ।

(ক) ফার্সি ভাষায় রচিত সমসাময়িক ইতিবৃত্ত

মুসলিম শাসনামলের অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থই ফার্সি ভাষায় রচিত। সাধারণ বাঙালি সমাজের ভাষা ফার্সি না হলেও অভিজাতশ্রেণির ভাষা ছিল ফার্সি। তাই সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ফার্সি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ফার্সি ভাষায় রচিত সুলতানী বাংলার ইতিহাস বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সুলতানী বাংলার ইতিহাস অধ্যয়নের প্রাথমিক উৎস হিসেবে এসব গ্রন্থ পরবর্তী গবেষকদের নিকট সমাদৃত। আলোচ্য গবেষণায় এসব ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো– মিনহাজ-উস-সিরাজ এর *তবকাত-ই-নাসেরী*, জিয়াউদ্দিন বারানী-এর *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, খাজা আব্দুল মালিক ইসামী-এর *ফুতুহ-উস-সালাতীন* এবং আমির খসরুর গ্রন্থাবলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুলতানী আমলের সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মিনহাজ-ই সিরাজ-আল জুজযানীর (Minhaj-i-Siraj Al-Juzzani) *তবকাত-ই-নাসেরী* (*Tabaqat-i-Nasiri*) সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ। মিনহাজ গ্রন্থটি

৬৫৮ হিজরি/১২৬০ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। আরবি তবকত শব্দটি একবচন। এর অর্থ কাহিনি বা গল্প। বহুবচনে বলা হয় তাবাকাত। ফার্সি থেকে গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ করেন Major H.G.Raverty vol-1 & 2 এবং বাংলায় অনুবাদ করেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। লেখক গ্রন্থটিকে ২৩ টি তাবাকাতে রচনা করেন। তন্মধ্যে ২০ নং তাবাকাতে ইবনে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত ২০ থেকে ২২ তাবাকাত পর্যন্ত বাংলার শাসকগণের বর্ণনা করা হয়েছে। মূল্যবান এই গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক মুদ্রার প্রচলন, প্রশাসন ব্যবস্থা, ইকতার পরিচয়, মুকতিগণ কোন কোন অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রভৃতি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। মিনহাজ ভারতে আসার পর প্রথমে মুলতানের সুলতান নাসিরউদ্দিন কুবাচারের অধীনে কাজির পদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি দিল্লিতে সুলতান ইলতুৎমিস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়ে দিল্লিতে কাজির পদ গ্রহণ করেন। লেখক তাঁর গ্রন্থটি দিল্লির সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ) নামে উৎসর্গ করেন। মিনহাজ তাঁর গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। মালিক ইজ্জ-উদ-দীন তুঘরল তুগান খান যখন লখনৌতির গভর্নর ছিলেন (১২৩৩-১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ) তখন মিনহাজ লখনৌতিতে আগমন করেন এবং পরে তুঘরল তুগান খান ও মালিক তমর খান কিরানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। বাংলায় অবস্থানের সময় তিনি মুসলমানদের বাংলা বিজয় সম্পর্কিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। ইবনে বখতিয়ার খলজির সৈনিকদের মধ্যে মুতামিদ-উদ-দৌলার নিকট থেকে মুসলমানদের বাংলা বিজয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি মুসলমানদের বাংলা বিজয় এবং মামলুক শাসনের কিছু অংশ তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া তিনি দিল্লির আমিরদের সম্পর্কে আলোচনার সময় লখনৌতিতে নিযুক্ত গভর্নরদের কার্যকলাপ আলোকপাত করেছেন। মূলত তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম।

জিয়াউদ্দিন বারানীর (Ziauddin Barani) *তারিখ-ই-ফীরুজশাহী* (*Tarikh -I- Firoz Shahi*) ফার্সি ভাষায় রচিত সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন- Ishtiyaq Ahmed Zilli এবং বাংলা অনুবাদ করেন গোলাম সামদানী। বারানী তাঁর গ্রন্থে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসনে আরোহণ (১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু করে সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছর (১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। বারানী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন এবং সুলতানের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। বলবন এবং প্রথম দুই একজন খলজি সুলতানের ইতিহাস রচনার জন্য তিনি তাঁর আত্মীয়

এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি আটজন শাসকের জীবন ও কীর্তি বর্ণনা করেন। বারানী যে সময়ের ইতিহাস লিখেছেন (১২৬৬-১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ) তার অধিকাংশ সময় বাংলা স্বাধীন ছিল। স্বাধীন এ সময় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলি সন্নিবেশিত করেছেন। অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এই গ্রন্থ থেকে। যেমন- লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও এর প্রশাসন, সামরিক ব্যবস্থা, বাংলার বিখ্যাত হস্তিবাহিনী, একঢালা দুর্গ, কৃষিজাত দ্রব্য, রাজস্ব প্রশাসনের নিযুক্ত ওয়ালী, কারকুনের কার্যাবলি, কারিগর শ্রেণি, প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। এছাড়াও তিনি বহিরাগতদের লখনৌতিতে আগমনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মুলতানী মহাজনরা সুদের উপর সুদ বাড়িয়ে তঙ্কার অংক এতো বৃদ্ধি করেন যে, গৃহহীন, সহায়হীন, বহু লোক লখনৌতির দিকে রওনা হয়।[৪] যদিও মাত্র দু-একটি বিষয় ছাড়া বারানী *তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে* বাংলার ঘটনাবলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি সন, তারিখ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। মূলত দিল্লির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। একারণে তিনি বাংলার প্রতি মোটেই সহনশীল ছিলেন না। তিনি বাংলাকে 'বলগাকপুর'[৫] বা বিদ্রোহী দেশরূপে আখ্যায়িত করেছেন এবং বাংলার শাসকদের সম্পর্কেও প্রায় বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর গ্রন্থটি ঐতিহাসিক তথ্য উপাদানের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

তৎকালীন গ্রন্থের মধ্যে খাজা আব্দুল মালিক ইসামীর (Abdul Malik Isami) *ফুতুহ-উস-সালাতীন* (*Futuhus Salatin*) অন্যতম মূল্যবান একটি গ্রন্থ। এটি ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন Agha Mahdi Husain। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর প্রধান অমাত্যদেরকে দিল্লি থেকে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) যাওয়ার জন্য আদেশ দিলে ষোলো বছর বয়স্ক ইসামী তাঁর পিতামহ আজ্জ-উদ-দীনের সঙ্গে দেবগিরি যান। সেখানে ইসামী প্রথম বাহমনী সুলতান আলা-উদ-দীন হাসানের সময় তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি কবিতার ভাষায় ফেরদৌসির ছন্দের অনুকরণে রচিত। তিনি কোনো সময় বাংলায় আসেননি কিন্তু ইসামীর রচিত গ্রন্থে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায়-যা বারানীর *তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে* পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান আলাউদ্দিন বাহরাম শাহ-এর দরবারে এই গ্রন্থটি রচিত এবং সুলতানের নামে তা উৎসর্গ করা হয়। তিনি মুহাম্মদ বিন তুঘলককে

[৪] বিস্তারিত দেখুন, Ziauddin Barani, *Tarikh -I- Firoz Shahi,* eng. tra. Ishtiyaq Ahmed Zilli, Primus Book, New Delhi, 2015, p. 100
[৫] *Ibid*, pp. 49-50

অসৎ, অত্যাচারী ও অন্যায়কারী শাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইসামীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাহমনী রাজবংশের সাথে বাংলার ভালো সম্পর্ক ছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি বলেন যে, সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও এলাকা থেকে মোঙ্গল হামলার ফলে খোরাসান থেকে বহু ব্যবসায়ী, চীন থেকে বহু শিল্পী ও চিত্রকর দিল্লিতে আগমন করেন। সুফি সাধকগণ আসেন বুখারা থেকে, অন্যান্য দেশ থেকে আসেন দার্শনিক, চিকিৎসক, স্বর্ণকার, পাথর (দামি পাথর) ব্যবসায়ী দিল্লিতে আশ্রয় নিয়েছিল। পরওয়ানা (পতঙ্গ) যেমন শামার (প্রদীপের) চারপাশে ভিড় করে ঠিক তেমনই দিল্লিতে ভিড় করেছিল অসংখ্য জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তিরা। দিল্লি যেন কাবা হয়ে উঠল। তিনি তাঁর গ্রন্থে ভারতবর্ষে প্রযুক্তির আমদানি, শিল্পকারখানা ও অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। সার্বিক বিচারে দেখা যায় যে, বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলি এতে সন্নিবেশিত রয়েছে।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন Amir Khusrau (Hazrat Amir Khusrau, 1253-1325 A.D)। তাঁর প্রকৃত নাম হাকিম আবুল হাসান ইয়ামিন উদ্দিন বিন সাইফুদ্দিন মাহমুদ। তাঁর বংশীয় পদবি আমির এবং সুলতান (জালালউদ্দিন খলজি) কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি খসরু। এই দুটি মিলে পরবর্তীতে তিনি আমির খসরু নামে পরিচিত। তাঁর ৭৪ বছর জীবনকালে গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনকাল থেকে শুরু করে মোহাম্মদ শাহ্ তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত মোট ১১ জন শাসককে (বলবন, কায়কোবাদ, কিরমাউস, জালালউদ্দিন ফিরোজশাহ, রুকনউদ্দিন ইব্রাহীম শাহ, আলাউদ্দিন খলজি, শিহাবউদ্দিন, কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ, নাসিরউদ্দিন খসরু, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, মোহাম্মদ শাহ তুঘলক) সুলতান হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে প্রত্যক্ষ করেছেন। এদের মধ্যে সাতজন সুলতানের দরবারের রাজ অমাত্য এবং রাজ-কবির সম্মান লাভ করেন। তিনি বহু সাহিত্য ও কাব্য রচনা করেন। তন্মধ্যে ছয়জন শাসকের অনুরোধে ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন- (১) সুলতান কায়কোবাদের অনুরোধে '*কিরানুস সাদাইন*' গ্রন্থটি রচনা করেন, (২) সুলতান খিজির খানের অনুরোধে *দেবল রানী খিজির খান* রচনা করেন, (৩) '*নোহ সেপেহর*' রচনা করেন কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহের অনুরোধে, (৪) গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের অনুরোধে '*তুঘলক নামা*' রচনা করেন, (৫) আমির খসরু জালালউদ্দিন তুঘলকের অনুরোধে '*মিফতাহুল ফুতুহ*' রচনা করেন, (৬) আলাউদ্দিন খলজির অনুরোধে রচিত হয় '*খাজায়েনুল ফুতুহ*'। মূলত, খসরুর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সৃষ্টি '*Khazainul Futuh*'। গ্রন্থটি অত্যন্ত

উঁচু স্তরের এবং ফার্সি ভাষায় রচিত। এটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন Muhammad Habib।[৬] আমির খসরু আলাউদ্দিন খলজির সভাকবি ছিলেন, তাই সুলতানের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল বলেই শাসকের দোষ তাঁর চোখে পড়েনি। এ গ্রন্থে আলাউদ্দিন খলজির ষোলো বছরের শাসনকালের বর্ণনা এবং মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিশদ বিবরণ রয়েছে। তাঁর *Qiran-us-Sadain'* গ্রন্থটিও ফার্সি ভাষায় রচিত। সুলতান মুইজউদ্দিন কায়কোবাদের অনুরোধে ৩৬ বছর বয়সে আমির খসরু এটি রচনা করেন। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন Ishrat Husain Ansari and others. *মিফতাহুল ফুতুহ* রচনা করেন ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে যেখানে তিনি সুলতান জালালউদ্দিন খলজি এবং কারার গভর্নর মালিক সজ্জু আলাউদ্দিন কিসলু খানের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে তিনি সুলতান জালালউদ্দিন খলজি প্রদত্ত সকল ফতোয়া কাব্যে রূপান্তর করেন এবং এর নাম দেন 'তাজুল ফতোয়া'[৭]।

আমির খসরু দু'বার লক্ষ্মণাবতী পরিভ্রমণ করেন। প্রথমে তিনি ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন বলবনের অভিযানকালে নাসিরউদ্দিন বুগরা খানের অমাত্য হিসেবে আগমন করেন। এখানকার আবহাওয়া পছন্দ না হওয়ায় বলবনের সাথে তিনি দিল্লিতে ফিরে যান। তিনি দ্বিতীয় বার বাংলা পরিভ্রমণ করেন ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার সুলতান নাসির উদ-দীন মাহমুদ বুগরা খান (সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কনিষ্ঠ ছেলে) তাঁর পুত্র দিল্লির সুলতান মুইজ-উদ-দীন কায়কোবাদের সঙ্গে দেখা করতে যান। উভয়ে অযোধ্যার সরযু নদীর তীরে মিলিত হন এবং পিতা পুত্রকে রাজ্য শাসন ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। পরে কায়কোবাদ দিল্লিতে ফিরে গেলে তিনি আমির খসরুকে এই বিষয়ে লিখতে অনুরোধ করেন। ফলে আমির খসরু *কিরান-উস-সাদাইন* (দুই তারার মিলন) নাম দিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে পিতা পুত্রের মিলিত হবার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত, গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করলেও মাঝে মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উল্লেখ করেছেন। যেমন, তাঁর লেখনী থেকে আচার আচরণ (আদব-কায়দা), সংস্কৃতি, বিশেষ উপলক্ষ্যে গণজমায়েতের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। এছাড়াও তাঁর গ্রন্থে দিল্লির সমাজ-সংস্কৃতি, পালা-পার্বন, সাধারণ মানুষের অভ্যাসসহ, রাজদরবারের রীতি রেওয়াজ, সুসজ্জিত প্রাসাদ, ঋতুবৈচিত্র্য, ফুল-ফল প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দিল্লির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাংলা সম্পর্কেও

---

[৬] Hazrat Amir Khusrau, *Khazainul Futuh*, The Campaigns of Allauddin Khilji, tra.into English, Muhammad Habib, D.B.Taraporewala, Sons & Co. Hornby Road, Bombay, Madras, 1931

[৭] বিস্তারিত দেখুন, আবদুস সবুর খান, *ভারতবর্ষের অসামান্য কাব্য ও সংগীত প্রতিভা আমীর খসরু*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৮৫

অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করেন। যেমন বাংলার রাজনীতির বিভিন্ন দিক, অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৃষিজ পণ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করেছেন।

সমসাময়িক বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উৎসগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উৎস শ্রী মন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতকে বা ইবনে ইখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পরপরই এটি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন পঞ্চানন তর্করত্ন। আলোচ্য গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজের জাতি বা জাতি শাখার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক ও কংসবণিকগণের জন্ম ও উৎপত্তি[৮] সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে এই পুরাণে। তৎকালীন বাংলায় বর্ণ হিসেবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন বাংলার সবাই শাস্ত্রীয়ভাবে শুদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুদ্রবর্ণের হিন্দুরা মোট ৪১টি উপবর্ণে বিভক্ত হয়। মোটকথা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পেশাকে ব্রাহ্মণেরা শুদ্র হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নিজেরা সমাজে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখে। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণপ্রথার কঠোরতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামাজিক বাধা নিষেধ তীব্র ছিল। ফলত, হিন্দু সমাজের মধ্যে কোনো সামাজিক সংহতি ছিল না এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল ছিল। বাংলার হিন্দু সমাজের সামাজিক বৈষম্যের বাস্তবচিত্র এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য যে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সুশাসনে পরবর্তীতে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পায়।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো সমসাময়িককালে লিখিত কিন্তু সুলতানী শাসনের খুবই নিকটবর্তী সময়ে লিখিত গ্রন্থ *আকবরনামা*, *তবকাত-ই-আকবরী* এবং *মুনতাখাব-উত-তাওয়ারিখ* বাংলার ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। কোনো রাজবংশের বা শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের সাথে সাথেই ঐ সমাজের সার্বিক চিত্র পরিবর্তন হয় না। স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ একটি সমাজ পরিবর্তন হতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। পূর্বের শাসকগণের প্রবর্তিত রীতি ও নিয়মকানুন অনেক ক্ষেত্রে একই থেকে যায়। তাই বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও সাধারণভাবে সুলতানী শাসনামলের সমস্ত রীতি, প্রথা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকাংশেই একই ছিল। তাছাড়া মোগল শাসনের শুরুতেই বা সম্রাট আকবরের সময়ে সমগ্র বাংলা আকবরের অধীন ছিল না। অতএব আমরা এটা বলতে পারি যে, আকবর নামায় বর্ণিত তথ্য মূলত সুলতানী প্রশাসন ব্যবস্থার তথ্যের অংশবিশেষ।

[৮] বিস্তারিত দেখুন, শ্রী মন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪১

বাংলার ইতিহাসের ফার্সি ভাষায় রচিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আবুল ফজল আল্লামীর (Abul Fazl Allami) *আকবর নামা (Akbar Nama)* ও *আইন-ই-আকবরী (Ain-i-Akbari)*। *আইন-ই আকবরী* গ্রন্থটি অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। মূল ফার্সি থেকে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন Colonel H.S Jarret। আবুল ফজল সম্রাট আকবরের বন্ধু ও দরবারের সভাসদ ছিলেন। গ্রন্থাকার এই গ্রন্থে সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত আইনসমূহ, বাংলার ১৯টি সরকার, প্রচলিত মুদ্রা, জমি মাপার রীতি, ওজন পদ্ধতি, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সবমিলিয়ে এই গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকালের সকল বিষয়ই উঠে এসেছে। সুলতানী আমলের খুব নিকটবর্তী সময়ে রচিত এ গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। সম্রাট আকবর মূলত তাঁর পূর্বে প্রচলিত সুলতানদের শাসন পদ্ধতি ও অর্থনীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন।

গোলাম হোসেন সলীম (Ghulam Husain Salim) রচিত *রিয়াজ-উস সালাতিন (Riyazu-s-Salatin)* বাংলার ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক উৎস। গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকে রচিত হলেও মূল উৎস বা মৌলিক উৎসকে ভিত্তি করেই গ্রন্থাকার গ্রন্থটি রচনা করেছেন। লেখক ছিলেন ইংরেজদের মালদাহ কুঠির তত্ত্বাবধায়ক জর্জ উডনি (Gorge Udny) এর ডাক মুনশি। তাঁর অনুরোধে গ্রন্থটি রচনা করেন বলে গ্রন্থাকার নিজেই উল্লেখ করেছেন। এটি যে সংকলিত গ্রন্থ তা তিনি স্বীকার করেছেন। উক্ত গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে গৌড় ও পাণ্ডুয়া থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং শিলালিপির তথ্যও সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ করেন Abdus Salam। লেখক গ্রন্থটিতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম বাংলার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ইবনে বখতিয়ার খলজি ছাড়া আলী মর্দান খলজি, শিরান খলজি, গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির রাজত্বকালের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। দিল্লির অধীনে বাংলার ইতিহাস, পলাশীর যুদ্ধ, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ভূমিকা ছাড়া চারটি পরিচ্ছেদ বিদ্যমান। ভূমিকা আবার চারটি অংশে বিভক্ত। এই অংশটি আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকার প্রথম ভাগে বাংলার অধিবাসী, সীমানা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণী। দ্বিতীয় ভাগে বাংলার কিছু বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অংশে কিছু নগরের বর্ণনা দেওয়া আছে। ভূমিকার চতুর্থ অংশে হিন্দুস্তান বা ভারতের শাসকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রথম উদ্যান বা পরিচ্ছেদে দিল্লির সুলতান কর্তৃক বাংলায় নিযুক্ত মুসলমান শাসনকর্তাদের বিবরণ, দ্বিতীয় উদ্যানে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বর্ণনা, তৃতীয় উদ্যানে রাজা মানসিংহ থেকে শুরু করে নবাব জাফর আলী খাঁ পর্যন্ত দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাগণের শাসনকাল বর্ণনা করেছেন। যেখানে বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে জানার সুযোগ রয়েছে। বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপনের বিবরণ রয়েছে চতুর্থ উদ্যানে। রাজনৈতিক ইতিহাস ব্যতীত এই গ্রন্থ থেকে বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানা যায়। যেমন- উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য, ফল, খাদ্য, পশু-পাখি ও শিল্প দ্রব্যাদি, বিভিন্ন নগরীর বর্ণনা প্রভৃতি।

উপরে বর্ণিত গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার অনেক গ্রন্থ ব্যক্তিগত উদ্যোগে রচিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থের আলোচনায় রাজনৈতিক ইতিহাস প্রাধান্য পেলেও অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক, কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থসমূহ সুলতানী বাংলার ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডার। এসব গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য গবেষক ও ইতিহাসবিদদের রচনার মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান গবেষণায়ও একই দৃষ্টিকোণ থেকে এসব তথ্য উৎসের ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) সুফি–সাধকদের জীবনচরিত এবং চিঠিপত্র

সুলতানী শাসনামলে বাংলার অভিবাসী সুফি–সাধকগণের জীবনচরিত, চিঠিপত্র এবং আলাপচারিতা বাংলার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুসলিম শাসনামলে অনেক সুফি সাধক মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আগমন করেন। তারা ইসলাম প্রচারের জন্য যেসব মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন সেসব প্রতিষ্ঠান বাংলার শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বাংলার বাইরে অনেক সুফি–সাধকের জীবনচরিত পাওয়া যায় এবং এসব জীবনচরিত সমসাময়িক কালের নয় যেমন- *শেখ শুভোদয়*। এগ্রন্থে শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজির জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকে রচিত *রিসালত-উশ শুহাদা* গ্রন্থে শাহ ইসমাইল গাজীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এসব সুফিগণের জীবনী থেকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুফি–সাধকগণের খানকাহ, সরাইখানা, লঙ্গরখানাকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব সুফি–সাধকগণ বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। তারা কখনো শাসকগণকে পরামর্শ প্রদান করে আবার কখনো গোলযোগের মুহূর্তে সরাসরি নিজে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করত। যেমন রাজা গণেশের রাজত্বকালে গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে নুর-কুতুব আলম সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। এসব সুফি–সাধকগণের আলোচনা 'মালফুজ' এবং তাদের চিঠিপত্র 'মকতুবাদ' নামে পরিচিত। তাই তাদের চিঠিপত্র বাংলার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এসব চিঠিপত্র থেকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বাংলার বিখ্যাত তিনজন সুফির চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব সুফিগণ হলেন- পাণ্ডুয়ার শায়খ নুর-কুতুব আলম, জৌনপুরের সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এবং বিহারের শায়খ মুজাফফর শামস্ বলখি। নুর-কুতুব আলমের আটটি এবং আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর তিনটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। শায়খ মুজাফফর শামস্ বলখি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের নিকট কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। এ সকল চিঠি বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল।

(গ) বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ বা ভ্রমণ কাহিনি

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশ থেকে নানা সময়ে বাংলায় পর্যটকগণ আগমন করেন। এসব পর্যটকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ভেনেসীয় পর্যটক Marco Polo। তিনি সমসাময়িক কালের বাংলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। Marco Polo (১২৭১-১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর *The Travels of Marco Polo* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা প্রদেশ দক্ষিণে অবস্থিত। এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা রয়েছে এবং লোকেরা পৌত্তলিক। এখানে এক ধরনের ষাঁড় দেখতে পাওয়া যায় তা হাতির মতো উঁচু। এখানকার অধিবাসীরা মাংস, ভাত ও দুধ খেয়ে জীবনযাপন করে এবং এসব খাদ্যদ্রব্য এখানে প্রচুর জন্মে। বাংলায় প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। সুগন্ধি বৃক্ষ, আদা, চিনি এবং অসংখ্য ধরনের ঔষধি গাছ (many sorts of drugs) বাংলার মাটিতে খুব জন্মে। সেসব দ্রব্য কিনতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে বণিকেরা আসে। এছাড়াও বাংলায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। মার্কো পোলো-এর প্রদত্ত এ সকল তথ্য থেকে সমসাময়িক কালে বাংলার উন্নত বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বাংলা দাস হিসেবে খোজাদের প্রচুর পাওয়া সম্ভব। তারা (ব্যবসায়ীরা) এখান থেকে খোজা/দাস সংগ্রহ করে। এখান থেকে দাস নিয়ে বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করে।[৯]

[৯] Marco Polo, *The Travels of Marco Polo*, book.11, The Orion Press, New York, pp. 204-205

এদেশের আয়তন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দেশটি ত্রিশ দিনের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর পূর্ব সীমান্তে কাঙ্গিগু (kangigu) নামের দেশ অবস্থিত।

তৎকালীন ইউরোপীয় পর্যটক ইবনে বতুতার (১৩০৪-১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ) *The Rehla of Ibn Battuta* বাংলার ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন Mahdi Husain, বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, সবুজঘেরা বিশাল বাংলায় প্রচুর চাল পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনায় জিনিসপত্রের মূল্যের একটি তালিকা পাওয়া যায়। যেমন- বড় বড় স্বাস্থ্যবান ৮টি মুরগি ১ দিরহামে বিক্রি হতে দেখেছি, এছাড়া ১ দিরহামে ১৫টি কবুতর ও ২ দিরহামে ১টা মোটাতাজা ভেড়া বিক্রি হয়।[১০] এখানে অনেক জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়, যা তিনি অন্য কোথাও দেখেননি। মূলত তাঁর গ্রন্থে বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান দুইবার বাংলায় আসেন। তিনি প্রথম বাংলায় আসেন ১৪১৩-১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বার আসেন ১৪২১-২২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর গ্রন্থের নাম *Ying Yai Sheng Lan,* J V Mills. বইটি অনুবাদ করেছেন। বাংলা সম্পর্কে মাহুয়ানের দেওয়া তথ্য হলো- ধনীরা জাহাজ তৈরি করে যা দিয়ে তারা বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য করে। এদেশীয় লোকদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে এবং অনেকে আবার চাষাবাদ করে। অন্যান্যরা বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তিনি নারী-পুরুষদের আলাদা আলাদা পোশাক এবং মহিলাদের ব্যবহার্য অলংকারের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন এদের ভাষা বাংলা এবং মুদ্রার নাম টংকা। এই মুদ্রা দিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য হয় এবং ছোটখাটো কেনাকাটায় বাঙালিরা সামুদ্রিক পদার্থ (shell) ব্যবহার করে। বিদেশিরা একে কড়ি (কৌড়ি) বলে। মাহুয়ানের বর্ণনা থেকে এদেশের বিভিন্ন শিল্পের বর্ণনার পাশাপাশি বস্ত্রশিল্প সম্পর্কেও জানা যায়। এদের উৎপন্ন শিল্পজাত বস্ত্রের মধ্যে অন্যতম হলো ছয় রকমের সূক্ষ্ম সুতি কাপড়। এদেশ সারা বছর গ্রীষ্মকালের মতো গরম। এখানে ধান, গম, তিল, সব রকম ডাল, জওয়াব, আদা, সর্ষে, পেঁয়াজ, বেগুন ও নানা রকম তরিতরকারির ফলন হয়। তুঁতগাছ, গুটিপোকাও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলায় এক রকম গাছের ছাল থেকে মসৃণ কাগজ তৈরি হয়। এদেশে নানা রকম ফল জন্মে। এখানে

[১০] Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta,* eng.tra. Mahdi Husain, Oriental Institute, Baroda, 1953, pp. 234-235

নেশাজাতীয় দ্রব্য মদ পাওয়া যায়।[১১] নারকেল, ধান, তাড়ি এবং কাজাঙ্গ (খেজুর) থেকেও মদ তৈরি হয়। বাংলায় পশু পাখির সংখ্যা অগণিত। বিভিন্ন পেশাজীবী লোক রয়েছে- ঢাকী, বাজীকর (যারা বাঘের খেলা দেখায়), চিকিৎসক, জ্যোতিষী, শিক্ষক, কারিগর, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি। মূলত তিনি এ গ্রন্থে বাংলার সামাজিক ও অর্থনীতির বহু বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

মাহুয়ান ছাড়াও চীনা দূত ফেই সিন (Fei Sin) কর্তৃক ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত *Sing Ch'a Sheng lan* বিবরণে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ফেই সিন কর্তৃক আলোচনায় তৎকালীন সময়ের শাসক ও শাসকের দরবার সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও শাসকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যদিও তাঁর বিবরণ পূর্ণাঙ্গ নয় তবুও তাঁর প্রদত্ত তথ্য আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনায় ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান।

Nicolo de Conti ছিলেন ভেনিসীয় বণিক। তিনি পারস্য থেকে মালাবার উপকূল ধরে সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়ে ভারতের কয়েকটি অঞ্চল এবং বাংলায় আসেন। তিনি ১৪১০ থেকে ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভ্রমণ করেন। পোপ চতুর্থ ইউজেনের পরামর্শে তিনি পোপের একান্ত সচিবের নিকট তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পোপের সচিব (ব্রাচ্চিত্তলিনি) তাঁর নিজের (ইটালীয়) ভাষায় কন্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন Master Thomas Hickocke. তাঁর বিবরণে বাংলার নদ-নদীর অবস্থান, যোগাযোগব্যবস্থা, নৌকা তৈরি, ডিঙ্গি (নৌকা) তৈরির বিবরণ, ফলের বাগান, নদীর পাড়ে বড় অট্টালিকা, উৎপাদিত ফসলের বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলায় প্রচুর ঘৃতকুমারী কাঠ পাওয়া যায়। সামাজিক অবস্থার বর্ণনায় তিনি হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন।

সুলতানী বাংলার উন্নত অর্থনীতির তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক ইতালীয় পর্যটক ভারথেমার (১৫০৩-১৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ থেকে। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য বাংলায় আগমণ করেন। তাঁর বিবরণে বাংলার শহর, বন্দর, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। ভারথেমার বিবরণ *Interrario de Ludovico de Varthema etc*. নামে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। Translated from

[১১] Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan* ,The overall Survey of the Ocean's Shores, Translated from the Chinese text edited by Feng Ch'eng-Chin with introduction, notes and appendices by J. V. G. Mills, Hakluyt Society, Cambridge, 1970, pp.161-163

the Original Italians by Jone Winter Jones কর্তৃক The Hakluyt Society থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি *The Travels of Ludovico DI Varthema*, (2 vols) নামে পরিচিত। ভারথেমা উল্লেখ করেন যে, এদেশে শস্য, সব রকমের মাংস, চিনি, আদা এবং তুলা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাংলায় তিনি সবচেয়ে ধনী বণিকদের দেখা পেয়েছেন। তিনি এখানকার রপ্তানি বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, এখান থেকে প্রতি বছর পঞ্চাশটি জাহাজে তুলা ও রেশমের দ্রব্য অর্থাৎ বৈরাম, নামোন, লিজাতি, সিআনতার, দোআজার ও সিনাবাফ প্রভৃতি বস্ত্রাদি রপ্তানি করা হতো। এ সকল জিনিস সমগ্র ভারত, তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব উপদ্বীপ ও ইথিওপিয়াতে রপ্তানি হতো।[১২] মূলত এই তথ্য থেকে বাংলার আমদানি-রপ্তানি পণ্যদ্রব্য ও বণিকদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পর্যটক তোমে পিরেসের (১৫১২-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ) *The Suma Oriental of Tomo Pires* গ্রন্থটি বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল উৎস। গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন Armando Cartesao, 2 vols, (Translated from Portuguese MS in the Bibliotheque dela chambre des deputes, Paris and edited by Armando Cartesao)। অনুবাদক কোর্তেজাও বলেন যে, গ্রন্থটি ১৫১২-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ সময়ে লিখিত হয়েছে এবং এর বেশিরভাগ অংশই মালাক্কায় বসে লেখা এবং বাকি অংশ কোচিনে বসে লেখা। অনুবাদক লেখক সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেছেন। কোর্তেজাও উল্লেখ করেন তোমে পিরেস ছিলেন পর্তুগালের রাজপুত্র দোম আফন্সোর ঔষধ প্রস্তুতকারক (apothecary)। পরে তিনি পর্তুগাল হতে সরকারি কাজের দায়িত্ব নিয়ে পূর্ব এশিয়ায় আসেন। প্রথমেই তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং এরপর মালাক্কায় যান। সেখানে তিনি কিছুদিন সরকারি হিসাবরক্ষক (Government Accountant) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তারপর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। পর্তুগালের রাজদূত হিসেবে চীনে যান আরো কিছুদিন পর। পিরেস পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিবরণ দিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে ঐ রিপোর্ট পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েলকে প্রেরণ করেন। ঐ রিপোর্টটির নামই *Suma Oriental*. পিরেসের বিবরণ থেকে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যদিও পিরেস বাংলায় আসেননি তথাপিও বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে মালাক্কায় বসে বাংলা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এখানকার অধিবাসীরা বড় ব্যবসায়ী ও খুব সম্পদশালী। তারা জাঙ্কে চড়ে নদী পার হয়। বাংলাতে ব্যবসায়ের জন্য পার্সি (ইরানি),

[১২] বিস্তারিত দেখুন, *The Travels of Ludovico DI Varthema*, vol, 11, The Hakluyt Society, 1863, pp. 212-214

রুমী (ইতালীয়), তুর্কি, আরব, চৌল, দাভোল ও গোয়ার বহু লোক বাস করে। এছাড়া বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের বর্ণনায় তিনি বলেন যে, বাংলা থেকে মালাক্কায় প্রতি বছরে একটি করে জাঙ্ক যায়- কোনো কোনো বছরে দুবারও যায়। প্রতিটি জাঙ্ক আশি থেকে নব্বই হাজার ক্রুসেডো মূল্যের পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে।[১৩] বস্তুত, তোমো পিরেসের এ বিবরণ থেকে বাংলার আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি দ্রব্য, বণিক ও তাদের লাভের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি বাংলার অর্থনীতির একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

আলোচ্য সময়ের মূল্যবান তথ্য প্রদান করেন ইউরোপীয় পর্যটক বার্বোসা। তিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ এবং তাঁর পুরো নাম দুয়ার্তো বার্বোসা (১৫১৬-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি বাংলাসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা *Liuro em que da relacao do que viu eouviu no Oriente* বই থেকে। বইটি সবার কাছে *The Book of Duarte Barbosa* নামে পরিচিত। গ্রন্থটি ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা শেষ হয় এবং এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত, পর্তুগিজ ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন Mansel Longworth Dames, (The Hakluyt Society, London, 1st.pub. 1820 A.D)। তাঁর ভ্রমণ বিবরণে দিউ এর বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া কালিকটে পর্তুগিজদের ভারতীয় জাহাজ দখল করে ভারতীয়দেরকে বাণিজ্য করতে বাধা প্রদানের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। তিনি বাংলা সম্পর্কে বলেন দেশটি উর্বর ও নাতিশীতোষ্ণ। এরা সকলেই ব্যবসায়ী, তাদের জাহাজ নির্মাণ কৌশল মক্কার জাহাজের মতো এবং অন্য জাহাজগুলো চীন দেশের জাঙ্কের ন্যায় বড় ও অনেক মালামাল বহন করতে সক্ষম। এদেশের প্রচুর দ্রব্য উৎপন্ন হয় যেমন- তুলা, আখ, আদা, লম্বা মরিচ, সাদা চিনি, কমলালেবু প্রভৃতি। সে সময় দু'টি প্রধান সমুদ্রপথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এর একটি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, জাভা, শ্যাম, মালাক্কা, সুমাত্রা, সুন্দা, মসলা দ্বীপপুঞ্জ, সেলিবিস, বোর্ণিও এবং চম্পা হয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য পথটি ছিল দক্ষিণ পশ্চিমমুখী- যা উড়িষ্যা, করমণ্ডল, শ্রীলঙ্কা ও মালাবার উপকূল অতিক্রম করে পারস্য উপসাগর, আরব সাগর হয়ে আরব দেশ ও আফ্রিকার

[১৩] Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, An account of the east, from the Red sea to Japan written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Translated from the Portuguese Afs in the Bibliotheque de la chamber des Deputes, Paris and edited by Armando Cortesao, vol, 1, Hakluyt Society , London, 1944, pp. 90-92

আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।[১৪] তিনি বাঙালি নারী-পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদ ও নারীদের অলংকারের বর্ণনা দেন এবং পাশাপাশি মদপান, গান বাজনার তথ্যও তুলে ধরেন। এদেশের সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে মুর ও পৌত্তলিকরা বসবাস করে। তারা অনেক জিনিসপত্রের ব্যবসায়-বাণিজ্য করে এবং অনেক স্থানেই জাহাজ নিয়ে যায়। এসব জাহাজে তারা সুতি বস্ত্র বোঝাই করে রপ্তানির জন্য প্রেরণ করে। মূলত বার্বোসার প্রদত্ত বিবরণে বাংলার অর্থনৈতিক তথ্য ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রও ফুটে উঠেছে। বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় ভেনিসের অধিবাসী বণিক ও পর্যটক সিজার ফ্রেডারিকের (১৫৬৩-১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ থেকে। তিনি ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যের উদ্দেশে বের হয়ে সমুদ্রপথে পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের বিজয়নগর, উড়িষ্যা ও বাংলায় তিনি অনেক দিন অতিবাহিত করেন। ফ্রেডারিক ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, উড়িষ্যার কটক বন্দর থেকে সমুদ্রপথে ৫৪ মাইল অতিক্রম করে গঙ্গার মোহনায় উপস্থিত হন। ঐ স্থান থেকে ১০০ মাইল নৌকায় ভ্রমণের পর যে শহরে উপস্থিত হন সেই শহরের নাম সাতগাঁও। শহরটি সমৃদ্ধ, মুসলিম অধ্যুষিত এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার ভূমি সর্বাপেক্ষা উর্বর। বাংলায় জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা দেখে তিনি অবাক হন।

সিজার ফ্রেডারিক বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে বলেন, চট্টগ্রামের বিরাট বন্দর থেকে জাহাজযোগে পর্যাপ্ত চাল, সব রকমের বস্ত্র, চিনি ও নানা রকম ফসল পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি হতো। পেগু থেকে এদেশে রৌপ্য আমদানি হয় এবং চট্টগ্রাম বাংলার রৌপ্য আমদানির প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এখানকার বন্দর থেকে প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ টি ছোট বড় জাহাজভর্তি চাল, কাপড়, লাক্ষা, লঙ্কা, চিনি, তেল এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। ব্যবসায়ীরা ছোট নৌকায় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অস্থায়ী হাট থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে। তিনি নিজে ছোট নৌকায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র ক্রয় করেন। এছাড়া তিনি মেলায় ঘুরে বেড়ান। মেলায় অস্থায়ী অনেক দোকানপাট এবং নদীর ঘাটে দেশি-বিদেশি অসংখ্য নৌকার ভিড় তিনি লক্ষ করেন। মেলা শেষে লোকজন মেলা থেকে ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্যের বহর নিয়ে চলে যায়। এসব বিবরণ থেকে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

---

[১৪] Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, vol, 2, eng. tra. Mansel Longworth Dames, The Hakluyt Society, London, 1921, p. 149

র‍্যালফ্ ফিচ্ সুলতানী শাসনের পর ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় আগমন করেন। তাঁর গ্রন্থ্ থেকে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। বাংলার সমৃদ্ধ বন্দর, নগর, রাজধানী শহর, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি পণ্যদ্রব্য, উৎপাদিত শস্য, বস্ত্রশিল্প এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় ফিচের ভ্রমণ বিবরণীতে।

(ঘ) মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্য সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি

বাংলার সুলতানগণ কর্তৃক উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও এগুলো আরবি ও ফার্সি ভাষায় লিখিত তথাপি মুদ্রা ও শিলালিপি সংক্রান্ত অনূদিত গ্রন্থগুলো থেকে সুলতানের নাম, সময়কাল, শহর ও নগরের বিভিন্ন স্থাপত্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মূলত যেকোনো দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় প্রতীক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মুদ্রা। তৎকালীন বাংলায় আন্তর্জাতিক মানের মুদ্রার প্রচলন ছিল।

সুলতানী বাংলার মুদ্রা গবেষকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃত হলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ভট্টশালীর গ্রন্থটির নাম *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*. তিনি এ গ্রন্থে বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সুলতানগণের মুদ্রা, সময়কাল এবং শাসকগণের পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি মোট ১২ জন শাসকের নামসহ আবিষ্কৃত মুদ্রার শ্রেণীকৃত তালিকা উপস্থাপন করেছেন। তার মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মুদ্রা ১টি, ফকরউদ্দিন মুবারক শাহের মুদ্রা ১টি, ইলিয়াস শাহের মুদ্রা ৩৩টি, সিকান্দার শাহের মুদ্রা ৬০টি, আজম শাহ ৭২টি, হামজা শাহের মুদ্রা ১৪টি, বায়েজিদ শাহের মুদ্রা ৩৪টি, ফিরুজ শাহ বিন বায়েজিদ-এর মুদ্রা ৫টি, দনুজমর্দন দেবের মুদ্রা ৩টি, মহেন্দ্র দেবের ১টি, জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের ১২২টি। তিনি মুদ্রার সাল/হিজরি, ওজন, টাকশালের নাম বা প্রাপ্তি স্থান, মুদ্রায় লিপির ধরন, আকৃতি ও সংরক্ষণের স্থান (ঢাকা জাদুঘর/ কলকাতা জাদুঘর) বর্ণনা করেছেন। মুদ্রার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি শাসকগণ কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের ইতিহাস চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। এসব তথ্যের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য শাসকের সাথে বাংলার শাসকগণের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও উপঢৌকন প্রেরণের তথ্যটিও সন্নিবেশিত করেছেন। যা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল। এছাড়া গ্রন্থাকার ৪টি Appendix এর প্রথম অংশে ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ, দ্বিতীয় অংশে সুলতান ফিরোজ শাহের প্রথম লখনৌতি অভিযান, তৃতীয় অংশে বাংলা রাজ্য সম্পর্কে মাহুয়ানের বিবরণ তুলে ধরেছেন। চতুর্থ অংশে হিজরি বর্ষের শুরু থেকে (৭৩৫ হিজরি অর্থাৎ ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দ সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ- ৮৩৬ হিজরি ১৪৩২

খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট) ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক সময়ের তালিকা প্রদান করেছেন। সর্বোপরি তাঁর গ্রন্থটি অর্থনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল।

বাংলার সুলতানী আমলের মুদ্রার বর্ণনা রয়েছে Abdul Karim- এর *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to A. D. 1538) গ্রন্থে। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। গ্রন্থটির প্রথম অংশে দিল্লির সুলতানগণের মুদ্রা, বাংলায় নিযুক্ত দিল্লির অধীন গভর্নরদের মুদ্রা এবং বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রাগুলোকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থাকার মুদ্রার সাক্ষ্যে সুলতানগণের সময়কাল, টাকশাল শহর এবং মুদ্রায় সুলতানগণ যে সকল উপাধি গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অতএব এটি বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

Abdul Karim- এর মুসলিম শাসনামলের আরো একটি আকর গ্রন্থ *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি থেকে শুরু করে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্যন্ত আরবি ও ফার্সি ভাষায় যেসব শিলালিপি প্রাপ্ত হয়েছে যেসব শিলালিপিগুলো অনুবাদ করে গ্রন্থকার বারোটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। যেখানে সুলতানী আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ প্রভৃতি নির্মাণের উদ্দেশ্য, শাসকের নাম, তারিখ, প্রাপ্তস্থানসহ অন্যান্য তথ্য জানা যায়। লেখক গ্রন্থটির শেষে আরবি ও ফার্সি ভাষার শিলালিপির ৮৯টি প্লেটের চিত্র দিয়েছেন। মূলত এই গ্রন্থ থেকে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানা যায়।

স্থাপত্য প্রতিটি দেশের অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সুলতানী বাংলার স্থাপত্যের তথ্যবহুল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Ahmed Hasan Dani- এর *Muslim Architecture in Bengal.* গ্রন্থটি মোট তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মুসলমানদের বাংলা বিজয় থেকে শুরু করে সুলতানী আমলের বিভিন্ন স্থাপত্য, মসজিদ নির্মাণ কৌশল, উপাদান এবং মুসলিম শাসনাধীনে স্থাপত্য নির্মাণে যে পরিবর্তন এসেছে তার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূলত বিভিন্ন রাজবংশের সময়ে নির্মিত মসজিদ ও স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে লেখক গ্রন্থটিতে তা অত্যন্ত যত্নসহকারে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া সমসাময়িক কালের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- Ahmed Hasan Dani এর *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal*, (Down to A. D 1538), Shamsuddin Ahmed এর

Inscription of Bengal. Edward Thomas এর *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় লিখিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী রচিত, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*। লেখক গ্রন্থটিকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করে আঠারোটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। প্রথম খণ্ডে আটটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের মুসলিম খলিফাদের মুদ্রা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে এই উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদের মুদ্রার বর্ণনায়- মামলুক সুলতানগণের মুদ্রা, স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন শাসকদের মুদ্রা, সুলতানী আমলের বাংলার গভর্নরদের মুদ্রা, হাবশি শাসকদের মুদ্রা ও হোসেন শাহী সুলতানদের মুদ্রার বৈশিষ্ট্য এবং শাসকদের উপাধিসহ টাকশাল শহরের নানা তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অংশে মোগল শাসকদের মুদ্রা ও টাকশাল শহরের বর্ণনা রয়েছে। তাঁর গ্রন্থের এসব তথ্য থেকে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলার ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্বের ওপর লিখিত মূল্যবান গ্রন্থ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া প্রণীত '*বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*'। গ্রন্থকার গ্রন্থটিকে ৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। ছয়টি পরিচ্ছেদেই অঞ্চলভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন- মুসলিম আমলের হাম্মাম খানা, তোরণ, দিঘি, দুর্গনগরী, মসজিদ, মন্দির, বিহার, মঠ, কোটিলামুড়া ও বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত মুদ্রা প্রভৃতি। গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলার ভূমি বিন্যাস ও তুর্কিদের তথা ইবনে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের পরের অংশে প্রত্নতত্ত্ব ও বিভিন্ন প্রত্নকীর্তি সম্পর্কে যেমন- দুর্গ, বিহার, বিভিন্ন দুর্গনগরী, পোড়ামাটির ফলক, বৌদ্ধবিহার, ভাস্কর্য প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

(ঙ) সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়। এসব সাহিত্যে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য, বণিকদের অবস্থান, কুটির শিল্প, হাট-বাজার, উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য, রপ্তানিজাত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক উৎসের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রামাই পণ্ডিত এর *শূন্যপুরাণ*। এই গ্রন্থে বাংলার কৃষিকাজ, কৃষিজ যন্ত্রাদি, উৎপন্ন ফসল, উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ

পণ্যদ্রব্য, হাট-বাজার, ক্রয়-বিক্রয়, মুদ্রাব্যবস্থা, নৌকার বিবরণ, নগরের বর্ণনা প্রভৃতি তথ্য বিবৃত হয়েছে।[১৫]

সমসাময়িক সাহিত্যিক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- শাহ মুহাম্মদ সগীরের, *ইউসুফ জোলেখা* (১৩৯৭-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ)। উক্ত গ্রন্থ থেকে বাংলার মুদ্রার প্রচলন, হাট-বাজার, গ্রামীণ মেলা, দাস-দাসী ক্রয় বিক্রয়, বণিক, ব্যবসায়ী, নগর নির্মাণ, কারিগর, প্রকৌশলী, পোশাক পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের বিবরণ, পাটের শাড়ি, সিল্কের শাড়ির (পাটাম্বর) বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও নারীর অলংকার, শিক্ষাব্যবস্থা, নারীশিক্ষা, বিভিন্ন রকম মিষ্টান্ন দ্রব্য, কৃষিজ পণ্যদ্রব্যাদি, ধান, গম, শস্যাগার[১৬] প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম দৌলত উজির বাহরাম খাঁ এর *লায়লী মজনু* (১৫৪৩-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। বাহরাম খাঁ উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন বাংলায় মুদ্রা ও কড়ির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হতো। এছাড়াও লেখক বাংলার বিভিন্ন হাট-বাজার, সমাজে দাস-দাসীর অবস্থান, নারীশিক্ষা, নারীর পোশাক, অলংকার, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে।[১৭]

পনেরো ষোলো শতকের মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ মুহাম্মদ কবীর রচিত *মনোহর মধুমালতি*। এই গ্রন্থে রাজ-অভিষেক, অভিজাতশ্রেণির পোশাক পরিচ্ছদ, নারীর উন্নত মানের শাড়ি (হেমড়ি শাড়ি), গলার হার বিভিন্ন রকমের মঙ্গল গান, নাচ, নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের নাম, নানা রকম নৌকার গঠন[১৮] প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ষোলো শতকের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ শেখ ফয়জুল্লাহ (১৪১০-১৪১৫) এর *গোরক্ষ বিজয়*। আলোচ্য গ্রন্থে কৃষিজ পণ্যের বিবরণ, বস্ত্র বয়ন শিল্প, হাট-বাজারে নানা রকম বস্ত্র বিক্রি, কড়ির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, হিন্দু সমাজে যোগীর জীবনযাপন, যোগীর খাদ্যদ্রব্য, মদের প্রচলন এবং বাংলার সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য পাওয়া যায়। শাবারিদ খান ষোলো শতকে (১৫৩০-১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) তিনটি গ্রন্থ

---

[১৫] দেখুন, রামাই পণ্ডিত, *শূন্যপুরাণ*, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) কলকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০, ৪৮, ৬৫, ১০৮, ১১৯
[১৬] শাহ মুহাম্মদ সগীর, *ইউসুফ জোলেখা*, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫২, ৯৭, ৯৯, ১৪১, ১৪৪
[১৭] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, *লায়লী মজনু*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ৫০, ৫২
[১৮] মুহাম্মদ কবীর, *মনোহর মধুমালতি*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সূচীপত্র, ঢাকা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১

রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

জয়েনউদ্দিন–এর *রসুল বিজয়* ষোলো শতকে রচিত। এটি মাগাজী বা জাতীয় যুদ্ধ কাব্য। রসুল বিজয়ে বাংলার সমাজে মহাজনদের অবস্থা, নর্তকী, অভিজাত নারীর প্রসাধনী, মদ, ছাড়াও প্রচলিত বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা ও নাম পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকে বাংলার তৎকালীন যুগের উন্নত ধাতব শিল্প সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এ গ্রন্থে যুদ্ধের বিবরণী ছাড়াও তৎকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিপ্রদাস পিপলাই এর *চণ্ডীমঙ্গল*। এই কাব্যগ্রন্থের ৩টি অংশ রয়েছে- আখেটিক খণ্ড, দেবখণ্ড ও বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডটি *কালকেতু উপাখ্যান* নামে পরিচিত। এখানে নগর নির্মাণ, নগরে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের বর্ণনা, তৎকালীন উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বণিক খণ্ডে ব্যবসায়-বাণিজ্য, সওদাগর ও বণিকদের বাণিজ্যে যাওয়ার বর্ণনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন- সিংহলের সাথে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত *চণ্ডীমঙ্গলকাব্য* অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত বলে অনুমান করা হয়। এই গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার কৃষি, ভূমি রাজস্বব্যবস্থা, মুদ্রায় ভূমি রাজস্ব প্রদান, কৃষির সাথে জড়িত কৃষক, রাখাল, ক্রয়-বিক্রয়, গ্রাম অঞ্চলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির ব্যবহার, হাট-বাজারের বিবরণ, বিভিন্ন রকমের নৌকার ব্যবহার এবং সমাজের সার্বিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থটি সমসাময়িক কালে রচিত না হলেও হোসেনশাহী শাসনামলের ইতিহাস জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস। কৃষ্ণদাস ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা সম্পন্ন করেন। গ্রন্থাকার আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন ও রূপের সান্নিধ্যে ছিলেন দীর্ঘ সময় এবং তাদের নিকট থেকে বর্ণনা শুনে উক্ত গ্রন্থে তা তুলে ধরেছেন। তাই কৃষ্ণদাসের বিবরণ অবিসংবাদিত। শ্রীচৈতন্যের জীবনী হলেও অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে এই গ্রন্থে। এখানে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকাল, উড়িষ্যা অভিযান, তাঁর মন্ত্রী, কর্মচারী ও অমাত্যদের সম্পর্কে প্রায় সকল

তথ্যই বিবৃত হয়েছে। সমসাময়িক বাংলার ভূমি রাজস্বব্যবস্থা, মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, রাজস্ব আদায়ের কর্মচারীদের অসততা, বস্ত্রশিল্পের সাথে জড়িত তাঁতি, বিভিন্ন কারিগর, দর্জি প্রভৃতি শ্রেণির বর্ণনা ছাড়াও নবদ্বীপ এবং সপ্তগ্রাম নগরের বিবরণ পাওয়া যায়। মূলত তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্যই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মধ্যযুগের এসব কাব্যগ্রন্থে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাসের অন্যান্য মৌলিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের তথ্য-সূত্রের সঙ্গে এ সকল গ্রন্থের যে তথ্য সূত্রের সামঞ্জস্য রয়েছে, শুধু সে সকল তথ্যই যাচাই বাছাইয়ের পর এই অভিসন্দর্ভে স্থান পেয়েছে।

২. দ্বৈতীয়িক উৎস

সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণামূলক গ্রন্থ

বাংলার ইতিহাসের আধুনিক গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থটিতে ১৫টি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি তৎকালীন বাংলার কৃষি, উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য, বিভিন্ন শিল্পের বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি প্রাচীন বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও সমাজে বণিক ব্যবসায়ীদের অবস্থানের চিত্রও তুলে ধরেছেন। প্রাচীন বাংলার ওপর লিখিত হলেও তাঁর গ্রন্থে সুলতানী বাংলার অনেক মূল্যবান তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত আছে।

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে *বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ* গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি রচনা করেছেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। সরকার পাবলিশিং, কলকাতা থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থকার বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি তিনি আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সুলতানী বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাষ্ট্রের সাথে প্রজার সম্পর্ক, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মীয় সংস্কৃতির বিবর্তন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সুলতানী বাংলার অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। বাংলার বিভিন্ন শিল্প, কৃষিব্যবস্থা, কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পর্তুগিজ ও মগদের বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা এখানে স্থান পেয়েছে। এছাড়া সচিত্র স্থাপত্য শিল্প, সংস্কৃতি,

হিন্দু সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়–এই বিষয়গুলোও তিনি তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির পরিশিষ্টে মধ্যযুগের কোচবিহার ও ত্রিপুরার ইতিহাস, মানচিত্র ও মুদ্রার চিত্র বিষয়গুলোও ফুটিয়ে তুলেছেন।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অগ্রগণ্য গবেষক হলেন ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার। তিনি *Husain Shahi Bengal* (1494-1538) *A Socio-Political Study* নামে একটি কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থাকার উক্ত গ্রন্থে হোসেনশাহী রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থা ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া তৎকালীন সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় সংক্ষিপ্তভাবে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা ব্যবস্থার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করেছেন। হোসেন শাহী আমলের সাহিত্য, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় দর্শন ও রীতিনীতি, স্থাপত্য, চারুকলা, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

Kanwar Muhammad Ashraf, *Life and condition of People of Hindustan,* গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সুলতান এবং রাজদরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণির লোকের বর্ণনা। দ্বিতীয় অংশে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এই আলোচনায় হিন্দুস্তানের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলার শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে।[১৯] যদিও সেখানে বাংলার অর্থনীতির সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেনি। তৃতীয় অংশের আলোচনায় হিন্দুস্তানের সামাজিক অবস্থার চিত্র উঠে এসেছে।

ঐতিহাসিক ইরফান হাবীব এর *The Economic History of Medieval India: A Survey-* (Centre for studies in Civilization) নামক গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় '*মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*' শিরোনামে। হাবীব এই গ্রন্থে দিল্লির সুলতানী আমল, বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনীতি, মোগল ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দিল্লির

---

[১৯] Kanwar Muhammad Ashraf, *Life and condition of People of Hindustan,* Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1970, pp.124-147

সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনায় বাংলার অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করেছেন।

সুলতানী আমলের অর্থনীতি নিয়ে যে সকল আধুনিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হলো- অনিরুদ্ধ রায় রচিত *সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*। গ্রন্থটির ৭টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে কৃষিব্যবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অকৃষিকার্য উৎপাদন ও শহুরে অর্থনীতি, তৃতীয় অধ্যায়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, চতুর্থ অধ্যায়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য, পঞ্চম অধ্যায়ে মূল্য ও মজুরি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিজয় নগরের বর্ণনা এবং সপ্তম অধ্যায়ে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত গ্রন্থাকার তার আলোচনায় দিল্লি, দাক্ষিণাত্য ও সমগ্র ভারতের অর্থনীতির বর্ণনায় প্রসঙ্গক্রমে বাংলার অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন।

Muhammad Abdur Rahim এর *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. 1 & 2- এ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থাকার প্রথম খণ্ডে- বাংলার অর্থনৈতিক জীবন, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। যা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বর্ণনায় তিনি বাংলায় আরব ও মুসলিমদের বসতি স্থাপন, মুসলিম সমাজ উন্নয়নে সুফিবাদের উৎস, বাংলায় সুফিবাদের প্রচার ও প্রসার, সমাজ উন্নয়নে সুফি দরবেশদের ভূমিকা, শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি, বাংলা ভাষার উন্নতি, বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক জীবন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থ ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ে বেশকিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে-এ সকল গ্রন্থের কোনো কোনো অধ্যায় অর্থনৈতিক ইতিহাসের কিছু কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের ইতিহাস বিষয়ক গবেষক ঐতিহাসিক আবদুল করিম ১৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে *Social History of the Muslims in Bengal Down to A.D 1538,* গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। লেখক এই গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম সমাজের গঠনপ্রণালি ও সমাজের বিকাশে সুলতানদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে গ্রন্থটিতে স্বল্প পরিসরে অর্থনৈতিক ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের অন্যতম গবেষক Richard M. Eaton। তিনি তাঁর *The Rise of Islam and the Bengal Frontier* (1204-1760) গ্রন্থে সুলতানী ও মোগল আমলের বাংলার অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। লেখক গ্রন্থটিতে সুলতানী বাংলার অর্থনীতি নিয়ে খুব স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ অংশে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি দ্রব্য, মুদ্রাব্যবস্থা[২০] প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

মধ্যযুগের আধুনিক গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে Md. Akhtaruzzaman এর *Society and Urbanization in Medieval Bengal* গ্রন্থটি সুলতানী বাংলার তেরো ও চৌদ্দ শতকের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উৎস। গ্রন্থটি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে জুলাই ২০১৯। গ্রন্থকার গ্রন্থটিকে ৮টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা ও তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যযুগে বাংলার ভৌগোলিক ইতিহাসের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, আবহাওয়া, অধিবাসী, যোগাযোগব্যবস্থা প্রভৃতি। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে নগরায়ণ, নগরকেন্দ্রসমূহ, সামাজিক গতিশীলতা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নগরায়ণের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলার মুসলিম সমাজের গঠন, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা, ভাষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাংলার স্থাপত্য চিত্রকলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিথষ্ক্রিয়া এবং সপ্তম অধ্যায়ে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটির উপসংহার আলোচনা করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। মূলত গ্রন্থটি তেরো ও চৌদ্দ শতকের তথা বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি পূণাঙ্গ গ্রন্থ যা বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

S.C Ray Chaudhury এর *Social Cultural and Economic History of India (Medieval Age)* গ্রন্থে ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কেও কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে।

---

[২০] Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, University of California Press, London, 1994, pp. 97-99

উপরোল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ও বিভিন্ন উৎসসমূহ ব্যবহার করে সেগুলোর ক্রমধারায় এই অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

সুলতানী বাংলার অর্থনীতি শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। **প্রথম অধ্যায়টি ভূমিকা।** এতে আলোচ্য গবেষণার স্থান, সময়কাল নির্ধারণসহ গবেষণার যৌক্তিকতা, তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কারণে এতে গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাঠামো বিন্যাসও স্থান পেয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিন্যস্ত- **'প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা'** শিরোনামে। এখানে তৎকালীন বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলসমূহ ও শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর প্রাক-মুসলিম বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ের আলোচনায় প্রাক-মুসলিম বাংলার কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, নগর ও বন্দর, মুদ্রাব্যবস্থা, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সর্বোপরি এখানে মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম- **'বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান'**। এই অধ্যায়ের প্রথমে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। এরপর সুলতানী বাংলায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইকতা প্রথা, মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন, উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন, নগরায়ণ প্রভৃতি নিয়ামকের ওপর ভিত্তি করে সুলতানী বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। এই অংশের আলোচনায় উক্ত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

'সুলতানী বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এই অংশে বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থাপনায় নতুন পদ্ধতি ইকতা প্রথা, ভূমির শ্রেণিবিন্যাস, কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য, ভূমি রাজস্বব্যবস্থা, ভূমি পরিমাপ পদ্ধতি, রাজস্বের হার, রাজস্ব আদায় পদ্ধতি, কৃষকদের অবস্থান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন পেশাজীবী শ্রেণির উত্থান এবং বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম **'সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশ'**। এই অধ্যায়ে মুসলিম বাংলার নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রধানত সুলতানী বাংলায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রভাবে শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুদ্রায়, কৃষিক্ষেত্রে, বস্ত্র, কাগজ, চিনি, লবণসহ কুটির শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ব্যবহৃত চরকা ও পাদানী (বস্ত্র শিল্পে), ডাইস (মুদ্রা তৈরিতে), পাতন প্রক্রিয়া (পানীয় জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুতে), সাকিয়া, লিভার (কৃষিক্ষেত্রে) প্রভৃতি নতুন প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া স্থাপত্য শিল্প, চিত্রকলা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মোটকথা বাংলার বিভিন্ন শিল্পের বিকাশে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে **'বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা'** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেনামলে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জয় করে মুহাম্মদ ঘুরীর নামে স্মারক স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন। মুসলিম শাসনের সুত্রপাত হওয়ায় ধারাবহিকভাবে পরবর্তী সুলতানগণ নতুন নতুন টাকশাল স্থাপন করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত রাখেন। একদিকে মুদ্রা প্রচলন অন্যদিকে হুণ্ডি ব্যবসা বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয় এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকশিত হয়। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতি সাধিত হয়। উক্ত বিষয়গুলোই এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলার অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- **'প্রাক-মোগল বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন'** সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। এখানে প্রধানত সুলতানী বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের কারণ, স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রকৃতি, আমদানি-রপ্তানি পণ্যদ্রব্য, বিদেশি বণিকদের আগমন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে দাদনী প্রথার ভূমিকা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মহাজন ও বণিকদের অবস্থান ছাড়াও বাণিজ্যনির্ভর অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

'সুলতানী বাংলার নগরায়ণ' অভিসন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। এ অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার নগরায়ণ, নগরায়ণের প্রধান নিয়ামকসমূহ, নগরের প্রকারভেদ, রাজধানী ও প্রশাসনিক নগর, বন্দর নগর, টাকশাল নগর, দুর্গনগরী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া নগরকেন্দ্রিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধরন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নগর ও বন্দরগুলোর গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই নগরায়ণের প্রভাব, সামাজিক গতিশীলতা, বিভিন্ন দেশের অভিজাতশ্রেণির সাথে স্থানীয়দের মেলামেশার ফলে নতুন এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেই বিষয়গুলোই সংক্ষিপ্তভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এরপর বিভিন্ন অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সারাংশ উপসংহারে উপস্থাপন করেছি।

সবশেষে এ অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

গবেষণার গুরুত্ব

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি মূল্যায়ন করে বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে উন্নততর স্তরে প্রবেশের দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে আলোচ্য অভিসন্দর্ভ থেকে। এছাড়া এই গবেষণাকর্ম অধ্যয়ন করে বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকগণ 'সুলতানী বাংলার অর্থনীতি' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে সক্ষম হবেন। ভবিষ্যতে যারা সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী তারা এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হবেন। এই গবেষণাকর্ম সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করি।

সীমাবদ্ধতা

উপর্যুক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে যেয়ে আমি এদতসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক তথ্য-উপাত্তের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু ভাষাজ্ঞানের দক্ষতার অভাবে বেশ কিছু গ্রন্থের তথ্য উৎসের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারিনি। তাই আমার এই গবেষণা কর্মে সকল তথ্যসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বর্তমান অধ্যায়ে সুলতানী শাসনের পূর্বে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এরই ধারাবাহিকতায় সেনামলেও বাংলা বিভিন্ন নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। বাংলার এই ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা এদেশের রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে বিভক্ত থাকায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। বাংলার এই বিভাজনের কারণ ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা। প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় বহিঃশত্রু সহজেই আক্রমণ করতে পারত। পাল আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভালো থাকলেও সেনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্থবির হয়ে পড়ে। সমাজ সচল রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম মুদ্রা। সেনামলে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না এবং দ্রব্য বিনিময় প্রথার পাশাপাশি কড়ির প্রচলন ছিল। মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বণিকগোষ্ঠী শাসকগণের কাছ থেকে কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ায় তারা বাণিজ্যবিমুখ হয়ে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে। মুদ্রার অনুপস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকার ফলে নগরায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং নগর ও বন্দরগুলো তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় কুটির শিল্পকারখানায় বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাতদ্রব্য উৎপাদন বন্ধ-হ্রাস পায়। তৎকালীন সমাজে শ্রেণিবৈষম্য বিরাজমান থাকায় ব্রাহ্মণরা এককভাবে সব ধরনের সুবিধা ভোগ করত। নিম্নশ্রেণির জনগণ সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সুবিধা লাভ করত। মূলত বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থাই অত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। আমার অভিসন্দর্ভ 'সুলতানী বাংলার অর্থনীতি' এবং এর পটভূমিকা হিসেবে গুরুত্ব দিয়েই প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুধাবনের জন্য এই অধ্যায়ের প্রথমে ভূ-রাজনৈতিক অংশ এবং পরবর্তীতে প্রাক-মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা অংশটি আলোকপাত করা হবে।

(১) প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা

প্রাচীন কালে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন- উত্তরবঙ্গ প্রথমে পুণ্ড্র পরে বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রথমে সূক্ষ্ম পরে রাঢ়, দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল বঙ্গ এবং মেঘনা-পূর্ববর্তী এলাকা সমতট নামে পরিচিত ছিল। বাংলার পূর্ব জনপদের রাজধানী ছিল গৌড়।[১] এছাড়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে (বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী) বলা হতো বরেন্দ্র। যার অপর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে এর আয়তন বিভিন্ন সময়ে কমেছে ও বেড়েছে। সমগ্র প্রাক-মুসলিম যুগে পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করেছে। সমতট-হরিকেল গঠিত হয়েছিল কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চল নিয়ে।[২] সমতট ও শ্রীহট্টকে (সিলেটকে) একত্রে বলা হতো মণ্ডল। প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে এ অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। উপরিউক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বঙ্গ, বরেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলের ভৌগোলিক গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। যদিও এই ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক এলাকাগুলোর সীমা সুচারুরূপে নির্দেশ করা কঠিন। 'Region and Sub-Region in Pre-Muslim Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধে Barrie M. Morrison- এর তথ্য বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার দেখিয়েছেন যে, প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় মোট চারটি প্রধান ভূ-রাজনৈতিক বিভাগের অস্তিত্ব ছিল । যথা:

১. গঙ্গার উত্তর দিকের অঞ্চল এবং যমুনার পূর্বে ও মহানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ডের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বরেন্দ্র অঞ্চল।

২. ভাগীরথী-হুগলি নদীর উভয় তীরের এলাকাব্যাপী অর্থাৎ বর্তমানকালের চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর নিয়ে গড়ে উঠেছিল রাঢ় নামের আরেকটি প্রশাসনিক অঞ্চল ।

৩. সুরমা ও মেঘনার পূর্বে অবস্থিত সিলেট (শ্রীহট্ট), কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম ছিল সমতটের অন্তর্ভুক্ত।

---

[১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) প্রাচীন যুগ*, জেনারেল পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১-২; মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.৩

[২] Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol.1, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, p. 2

৪. মেঘনা ও পদ্মার সংযোগস্থলে ছিল বঙ্গ নামের অন্য একটি জনপদ। অর্থাৎ বর্তমানের ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল বঙ্গ।[৩] প্রাক-মুসলিম যুগে এ বিভাজন বিদ্যমান ছিল।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক সীমানার বর্ণনা দিতে গিয়ে কানিংহাম (Cunningham) উল্লেখ করেন যে, বাংলা চারটি জেলায় (রাজ্যে) বিভক্ত ছিল। যথা: গঙ্গার উত্তরে ছিল **বরেন্দ্র** (বারিন্দ) ও **বঙ্গ** (বঙ্) এবং দক্ষিণে ছিল **রাঢ়** (রাধা, রাল) ও **বাগ্দি**। আর প্রথম দু'টিকে ব্রহ্মপুত্র নদী এবং দ্বিতীয় দু'টিকে (রাঢ় ও বাগ্দি) গঙ্গার জালিঙ্গি শাখা পৃথক করে রেখেছিল। এছাড়া ব্লকম্যান বলেন যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পূর্বে বাংলা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো: ক. হুগলির পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে রাধা (রাঢ়, রাল), খ. গঙ্গার ব-দ্বীপ বাগ্দি, গ. বাগ্দির পূর্বে বঙ্গ (বাঙ্), ঘ. পদ্মার উত্তরে এবং মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী বরেন্দ্র (বারিন্দ) এবং ঙ. মহানন্দার পশ্চিমে মিথিলা।[৪] বাংলার এই বিভাজন ও স্থানের সীমানা কোনো কোনো সময় কম বা বেশি হয়েছে।

সমসাময়িক পারসিক উৎস ও উৎকীর্ণ লিপিতে গৌড় (গৌড়া), বঙ্গ, সমতট (সংকত), পাতিকেরা প্রভৃতি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের কথা উল্লেখ রয়েছে। মূলত তেরো শতক পর্যন্ত বাংলা কতকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল। তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থিত বঙ্গ বা বাঙালার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিক্রমপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল।[৫] বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জনপদের বর্ণনায় ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, একাদশ শতকের শেষ দিকে বঙ্গকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একটি উত্তরাঞ্চল ও আরেকটি দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্র তীরবর্তী খাল-নালা সমাকীর্ণ আর দক্ষিণাঞ্চল ছিল দক্ষিণ বঙ্গ। সেন বংশের শাসক কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের দু'টি বিভাগ ছিল। একটি বিক্রমপুর এবং অন্যটি নাব্যমণ্ডল। বর্তমান বিক্রমপুর পরগনা ও সেই সঙ্গে ইদিলপুর পরগনার কিছুটা নিয়ে ছিল

---

[৩] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৪

[৪] H. Blockmann, *Contributions to the Geography& History of Bengal*, The Asiatic Society of Culcutta, Culcutta, 1968, p. 3

[৫] R.C.Majumdar, *History of Bengal*, vol.1, pp.101-103; Lama Taranatha`s, Account of Bengal' vol. xvi, 1940, p. 238; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, ১ম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫৮-৫৯

বিক্রমপুর। আর বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্ব দিকের সমুদ্র পর্যন্ত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল নাব্যমণ্ডল।[৬] বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সমতটেরই অংশ ছিল। এক সময় সমতটের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনা (খাড়ি পরগনার) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মূলত 'গঙ্গা' 'ভাগীরথীর' পূর্ববর্তী সীমা থেকে আরম্ভ করে মেঘনা-মোহনার সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই বলা হতো সমতট।[৭]

পুণ্ড্র জনপদ ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হয়। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। মূলত রাজমহল এবং গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে আরম্ভ করে করতোয়া পর্যন্ত গোটা উত্তরবঙ্গই পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণসীমা একদিকে বর্তমানের চব্বিশ পরগনার খাড়ি অঞ্চল এবং অন্যদিকে ঢাকা, বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ছিল বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা এবং সম্ভবত পাবনা জেলার বুকজুড়ে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, রাঢ় জনপদের দু'টি বিভাগ ছিল বজ্রভূমি ও সূক্ষ্মভূমি। গঙ্গা-ভাগীরথী পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণ ভূখণ্ড অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ, যা দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত। আর উত্তরাংশ বা উত্তর রাঢ় বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে উত্তর রাঢ় গঠিত ছিল। মূলত রাঢ় দেশের দু'টি রাষ্ট্রবিভাগ ছিল। বর্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। বর্ধমানভুক্তির আবার তিনটি বিভাগ ছিল। যথা- উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ় ও পশ্চিমে খাটিকা। পাল ও সেন আমলে দণ্ডভুক্তিমণ্ডল অর্থাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমের–খাটিকা গঙ্গার পশ্চিম তীরের বর্তমান হাওড়া জেলা। বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগনারও কিছুটা কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল।[৮]

একাদশ শতকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক জনপদ ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের পরই ছিল এ বঙ্গাল দেশ এবং দুই দেশের মাঝখানে সীমানা ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী। সেই সময় বঙ্গাল দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণ

[৬] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১৪-১১৯
[৭] *ঐ*
[৮] ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ২য় ভাগ, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২-৪; নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত ভূখণ্ডকেই বোঝাত।[৯] মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদাহ ও বর্ধমান নিয়ে গৌড় জনপদ গঠিত ছিল। গৌড়ের রাষ্ট্রসীমা কখনও কখনও উৎকল দণ্ডভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড় বলতে কখনও কখনও সমগ্র বাংলাকেও বোঝানো হতো। পাল রাজারা পশ্চিমবঙ্গের শাসক হলেও নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বলে পরিচয় দিতেন।[১০] গৌড় ও নদীয়ায় সেন রাজগণের রাজধানী ছিল। বল্লালচরিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বল্লাল সেনের সময় তিনটি রাজধানী ছিল। যথা-গৌড়, বিক্রমপুর ও স্বর্ণগ্রাম।[১১]

বাংলায় আনুমানিক ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন শাসন বজায় ছিল। সেনরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে এদেশে আসে এবং পাল বংশের দুর্বলতার সুযোগে বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সামন্ত সেন এ বংশের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।[১২] তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন প্রথম রাঢ় এলাকা অধিকার করেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন পাল রাজাদের সামন্ত রাজা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুত্র বিজয় সেনই সর্বপ্রথম সামন্ত রাজ্যকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন।[১৩] বিজয় সেন পাল বংশের সর্বশেষ রাজাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করে সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হন। এছাড়াও তিনি বর্মণ বংশের শেষ রাজা ভোজবর্মকে পরাজিত করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা জয় করে তাদের রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার করেন। দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর রাজত্ব করার পর বিজয় সেন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র বল্লাল সেন ক্ষমতায় আসেন। তিনি জ্ঞানচর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি পিতামহ বিজয় সেনের ন্যায় অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সেন রাজাদের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। আর বাংলার প্রাচীন রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড় দখল করে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি নেওয়া রাজাদের জন্য সম্মান ও গৌরবের প্রতীক বলে মনে করা হতো। কিন্তু বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ঐ উপাধি

---

[৯] J. Rennel, *Memories of a Map of Hindustan*, London, 1783, p. 57

[১০] *Ibid*

[১১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস-১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)*, পৃ. ১৫৮

[১২] Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, 1204-1760, Oxford University Press, 1994, p. 14 ; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮২

[১৩] সেন শাসনাধীনের প্রায় সকল তাম্রশাসনে বিজয় সেনের বিজয় ও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। বিজয় সেনের দেওপাড়া ও ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে তাঁর বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। তিনি নান্য, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এছাড়া তিনি কামরূপ রাজকে বিতাড়িত করেন, কলিঙ্গ রাজকে পরাজিত করেন এবং গৌড় রাজকে পলায়নে বাধ্য করেন। পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুরের রাজা ভোজবর্মনকে পরাজিত করে রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার করেন। বিজয় সেনের সফলতায় দীর্ঘদিন বিক্রমপুর সেন রাজাদের রাজধানী ছিল। সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪, পৃ. ১৪২-১৪৬

নেননি। তাদের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে গৌড়েশ্বর উপাধি নেই। লক্ষ্মণ সেনই প্রথম 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন এবং গৌড়ের নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। তিনি গৌড়ে (আধুনিক কালের মুর্শিদাবাদ ও মালদাহ জেলার দক্ষিণাংশ) রাজধানী স্থাপন না করলেও গৌড়ের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[১৪] লক্ষ্মণ সেন উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। কিন্তু তাঁর শাসনের শেষ দিকে তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হন। যেমন (১) ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চলে ডুম্মন পাল নামক বৌদ্ধ রাজা একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] (২) ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন এসময়ে কেন নদীয়াতে গিয়েছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে ডুম্মন পালের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এরূপ অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করে বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তিস্থাপন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনে বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার মুসলিম শাসকগণ প্রায়ই দিল্লির প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। একদিকে বাংলা থেকে দিল্লির দূরত্ব ছিল অনেক অন্যদিকে প্রাকৃতিক বা আঞ্চলিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ বাংলাকে দুর্গম করেছিল। এছাড়া বাংলার অসংখ্য নদ-নদী অতিক্রম করাও শত্রু বাহিনীর পক্ষে সহজবোধ্য ছিল না। এই প্রদেশের দীর্ঘস্থায়ী বর্ষাকাল এবং জলপ্লাবিত সমতল ভূমি দিল্লির সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করাও সহজ ছিল না। বাংলার প্রাথমিক যুগের মুসলিম শাসকগণ নৌযুদ্ধের পরিকল্পনা মাথায় রেখেই নৌবাহিনী গঠন করেন। *তাবাকাত-ই-নাসেরীতে* উল্লেখ রয়েছে যে, গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নৌবাহিনী গঠন করেন।[১৬] এছাড়াও তারা স্থলপথ অপেক্ষা নৌপথে যুদ্ধকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। দিল্লির বাহিনী বাংলার নৌপথের যুদ্ধে অনভিজ্ঞ থাকায় বার বার বিজয় লাভে ব্যর্থ হয়। মূলত বাংলার শাসকগোষ্ঠী নৌপথের কথা চিন্তা করেই নৌবাহিনী গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেন। এছাড়াও বর্ষার সময়ে ছয় মাস শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর চলাফেরায় সুবিধা করতে পারত না

---

[১৪] শ্রী মিহির কুমার রায়, *ভারতের ইতিহাস:তুর্কো আফগান যুগ* (১২০৫-১৫২৬), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩১; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[১৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭; শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, *গৌড় রাজমালা*, প্রথম ভাগ-প্রথম খণ্ড, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রকাশিত্র, ১৩৯১, পৃ. ৬০-৬৮; নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১-৪২৩

[১৬] Minhaj–I-Siraj, *Tabakat-i-Nasiri*, eng. tra. Major H.G Raverty, vol. 1, Orient Book, Asiatic Society of Bengal, 1970, pp. 576-577

এবং বাংলায় অনেক গাছপালা ও ঝোপঝাড় থাকার কারণে আকস্মিক আক্রমণ করা সহজবোধ্য ছিল না। এটা প্রতিবন্ধকতাই ছিল বাংলার শাসকগণের পক্ষে সবচেয়ে বড় সুবিধা। তাই তারা দিল্লির সুলতানগণকে অগ্রাহ্য করার সাহস পেয়েছিল। যদিও তারা দিল্লির অধীন থাকাকালীন দিল্লিতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করত। মূলত বাংলার অফুরন্ত ধনসম্পদও অনেকক্ষেত্রেই শাসকবর্গকে বিদ্রোহ করতে সাহস সঞ্চার করেছিল।

বাংলার ভূ-প্রকৃতির গঠনই কয়েক শতক ধরে এর স্বাধীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। ফলে দিল্লির সুলতানগণের পক্ষে বাংলার হিন্দু মুসলিম শাসকগণের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা কষ্টসাধ্য ছিল। তারা (দিল্লির শাসনকর্তাগণ) অনেক সময় বাংলা দখল করলেও দীর্ঘ সময় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেননি। নামেমাত্র তারা বাংলা অধিকার করলেও সে শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং শাসকগণ দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করার পরই আবার বাংলার শাসকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করত। সাধারণত দেখা যায় যে দিল্লি থেকে কোনো শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তিনি প্রায়ই বাংলার এই কৌশলগত কারণেই বিদ্রোহ করতেন ফলে তাঁর অধীন সামন্ত ভূ-স্বামীরাও সার্বভৌম ক্ষমতালাভের আশা করতেন। সার্বভৌম ক্ষমতালাভের জন্যই খলজি শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা দেয়। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, দিল্লির বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লক্ষণাবতীকে 'বলগাকপুর' (*Balghakpur*) বা বিদ্রোহ অঞ্চল বলে আখ্যায়িত করেন।[১৭] সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম-এর দিল্লি দখল করার পর থেকে দিল্লির সুলতানরা লখনৌতিতে যাদেরকে ওয়ালী বা শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছেন তারাই কেন্দ্রীয় শাসন অমান্য করে বিদ্রোহী হয়েছেন। মূলত বাংলার বিদ্রোহীরা এদেশে নিযুক্ত প্রত্যেক শাসনকর্তাকেই দিল্লির শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করত।

ইবনে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয় থেকে শুরু করে বাংলা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনই ছিল। দিল্লির শাসকগণের মধ্যে সুলতান ইলতুৎমিস, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকই তুর্কি শাসনকর্তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে

---

[১৭] Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firuz Shahi,* eng.tra. Ishtiyaq Ahmed Zilli, Primus Book, Delhi, 2015, pp. 49-50

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁও এ স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে বাংলা দিল্লি থেকে স্বাধীন হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েকটি রাজবংশের শাসনাধীনে বাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূ-রাজনৈতিক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে গড়ে ওঠে। যেমন- ইলিয়াস শাহী রাজবংশ (১৩৪২-১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ), জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের বংশধর (১৪১৫-১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৩৬-১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ), হাবশী বংশ এবং আলাউদ্দিন হোসেনশাহের বংশ (১৪৯৩-১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। পরবর্তীতে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের সময় বাংলা দিল্লির অধীন হয়েছিল এবং ইসলাম শাহের শাসন পর্যন্ত (১৫৪৫-১৫৫২ খ্রিস্টাব্দ) এটি দিল্লির একটি অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়েছিল। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সালতানাত বহাল ছিল।

ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে (ইকলিম) অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ। এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড়-পর্বত, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্তসীমায় আছে কামরূপ ও আসাম।[১৮] মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ। সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম থেকে গর্হি পর্যন্ত ৪৫০ ক্রোশ দৈর্ঘ্য এবং উত্তরের পর্বতমালা থেকে মান্দারান পর্যন্ত ২২০ ক্রোশ প্রস্থ।[১৯] *আইন-ই-আকবরীতে* বাংলার যে ভৌগোলিক বিবরণ উল্লেখ রয়েছে, সে বিবরণের সঙ্গে বিভাগ-পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতির মিল রয়েছে। বাংলার উত্তর দিক দিয়ে চলে গেছে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণি। এর পূর্ব সীমায় গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতরাজি অবস্থিত। এসব পাহাড় ও ঘন জঙ্গল থাকায় উত্তর ও পূর্বদিক থেকে এদেশে বৈদেশিক আক্রমণ হবার সম্ভাবনা কম ছিল। দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র থাকায় দক্ষিণ দিক থেকেও ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বহিরাক্রমণের কোনো আশঙ্কা ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার পশ্চিম সীমান্তও ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল (রাজমহলের পাহাড়, ঝাড়খণ্ডের বনাঞ্চল, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, সিংহভূম, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চল)। এসব পাহাড় ও ঘন বন-জঙ্গল থাকায় পশ্চিম দিক থেকে এদেশ আক্রমণ করার সম্ভাবনা কম ছিল। হিন্দু আমলে পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম), উৎকল (উড়িষ্যা) প্রভৃতি রাজ্য জয়ের কথা জানা যায়, কিন্তু

[১৮] Abul-Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari*, eng.tra., Colonel H. S. Jarrett, The Asiatic Society Kolkata, re.print, 2010, vol. 2, pp. 130-131

[১৯] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 7

তাদের বিজয় কখনও স্থায়ী হয়নি।[২০] বাংলার উত্তরাঞ্চলের পর্বতমালা এবং পার্বত্য দেশ চীন ও তিব্বত। এসময়ে আরাকান ও বার্মার সাথে জলপথে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া পশ্চিম দিকে দীর্ঘ বনের সারি, পাহাড় ও নদীনালা বেষ্টিত থাকার কারণে এ অঞ্চল দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য ছিল। অনুরূপভাবে বিহার ও উড়িষ্যা সীমান্ত দিয়েও বাংলায় প্রবেশ ছিল দুরূহ ব্যাপার। স্থলপথে কেবল তিন দিক দিয়ে বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব ছিল।

বাংলার সাথে স্থলপথে যোগাযোগের জন্য তেলিয়াগড় পথটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজমহল শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এটি অবস্থিত। এ পথটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। এটি গঙ্গার দক্ষিণ পাড় ঘেষে পূর্বদিকে চলে এসেছে। এ পথের উত্তর দিকে খাড়া পাহাড় এবং দক্ষিণ দিকে রাজমহলের পর্বতশ্রেণি। বিহারের পাটনা থেকে শুরু করে এ পথ ভাগলপুর এবং খলগাঁও এর মধ্য দিয়ে কোলিঙ্গ হয়ে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজমহল পর্বতমালা প্রায় ৮০ মাইল, অর্থাৎ বীরভূম জেলার উত্তর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়া উত্তরে নদী এবং দক্ষিণে পর্বতমালা বেষ্টিত এ সংকীর্ণ পথটিতে বাইরের আক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য তেলিয়াগড়ে ছিল একটি সুরক্ষিত দুর্গ। কোনো বাহিনীকে বাংলায় প্রবেশ করতে হলে তেলিয়াগড় পথেই আসতে হতো এবং এজন্যই তেলিয়াগড়কে বাংলার প্রবেশদ্বার বলে উল্লেখ করা হয়।[২১] মূলত এ সীমান্তে অল্পসংখ্যক সৈন্য বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বাধা দিতে পারত। এখানেই শেরশাহ মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে বাধা দান করেন।[২২] এ কারণেই তেলিয়াগড় পথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চল।

বাংলার সাথে স্থলপথে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ ত্রিহুত। এই পথটি ছিল গঙ্গার উত্তর দিকে অযোধ্যা ও ত্রিহুতের মধ্য দিয়ে এবং কুশী, গণ্ডক ও মহানন্দা অতিক্রম করে এটি বাংলায় পৌঁছেছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ত্রিহুত জেলার নামকরণ করা হয়েছিল দ্বারবঙ্গ (দ্বার-ই-বঙ্গ) বা বাংলার প্রবেশদ্বার।[২৩] কারণ ত্রিহুতের মধ্যে দিয়েই বাংলায় প্রবেশ করতে হতো।

---

[২০] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৫, পৃ. ২১৬; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২

[২১] R.C Majumder, *History of Bengal,* vol. l, Hindu Period, The University of Dhaka, Dhaka, 1976, p, 3; বাংলার সীমান্তের এই তেলিয়াগড় দুর্গটি গভীর জঙ্গলে আবৃত থাকত সবসময়। দুর্গটি মূলত গিরিপথে অবস্থিত ছিল। উত্তর ভারত হতে তেলিয়াগড় গিরিপথ অতিক্রম করে বাংলায় প্রবেশ করা খুব কঠিন কাজ ছিল।

[২২] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

[২৩] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 9

তেলিয়াগড় ছিল আরো একটি পথ। এটি ছিল বিশাল পাহাড় ও বনের মধ্য দিয়ে একটি অনির্দিষ্ট ও চিহ্নহীন রাস্তা। ঝাড়খণ্ড অরণ্য একদিকে তেলিয়াগড়ের দক্ষিণ থেকে শুরু করে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং অন্যদিকে সাঁওতাল পরগনা, সিংহভূম প্রভৃতি জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগের সঙ্গে এর সংযোগ ছিল। সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বিহার থেকে বাংলা আক্রমণের সময় ঝাড়খণ্ড পথ ব্যবহার করেছিলেন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে মীরজুমলা এবং পরে পেশোয়ার বালাজি রাও বাংলা আক্রমণের জন্যে এ পথই বেছে নিয়েছিলেন।[২৪] বাংলার সীমান্তপথে এসব প্রাকৃতিক বাধার দরুন এদেশে প্রবেশ করা কঠিন ছিল। ফলে বাংলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এর ফলে এ অঞ্চলের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল।

উপরিউক্ত তিনটি পথ ছাড়াও বাংলার সাথে যোগাযোগের আরো কিছু পথ ছিল। পাল রাজাদের সেনাবাহিনী বঙ্গের রাজধানী হতে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেছিল। যা পরবর্তীকালে শেরশাহ কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছিল। তখন এটি 'গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক' রোড নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান এশিয়ান হাইওয়ে নামে যে সড়ক নির্মাণের প্রচেষ্টা দেখা যায় সেটিও এ সড়কেরই নতুন সংস্করণমাত্র। আঠারো শতকে অঙ্কিত মেজর রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালীন সময়ে লখনৌতি থেকে ৪টি পথ দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে সহজেই যাতায়াত করা সম্ভব ছিল। সব থেকে উত্তর দিকের রাস্তা লখনৌতি থেকে উত্তর দিকে মালদাহ ও দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে নেকমর্দন (দিনাজপুরের বিখ্যাত বাজার ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল) ও গোবিন্দ নগর হয়ে পূর্ব দিকে যায়। এ পথ রংপুর জেলার ভেতর দিয়ে কোচবিহার হয়ে আসামের রাঙ্গামাটি পর্যন্ত পৌঁছায়। রাঙ্গামাটি থেকে আবার আসামের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় পথটি লখনৌতি থেকে বের হয়ে দেবকোট, দিনাজপুর, রংপুর ও কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে রাঙামাটি গিয়ে মিশে। তৃতীয় রাস্তাটি লখনৌতি থেকে নিশানপুর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে বালুরঘাট, ঘোড়াঘাট ও উলিরপুর হয়ে কুড়িগ্রাম গিয়ে দ্বিতীয় রাস্তার সাথে মিশে। আর চতুর্থ রাস্তাটি লখনৌতির রাস্তাটি থেকে নিশানপুর থেকে বের হয়ে মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ও বর্ধনকুঠি হয়ে আবার তৃতীয় রাস্তার সাথে মিশেছে।[২৫] বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এ পথগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

---

[২৪] R.C Majumder, *op.cit.*, p. 6

[২৫] আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, *সুলতানী আমল*, পৃ. ৯৫

এছাড়া বাংলা থেকে তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। এসব পথে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাধারণ যোগাযোগ চলত। (১) প্রথম পথটি উত্তরবঙ্গ হতে পাটলীপুত্রের মধ্য দিয়ে বুদ্ধগয়া স্পর্শ করত। এ পথ বারানসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি এ পথটি সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট বন্দর পর্যন্ত সংযোজিত ছিল। বিদ্যাপতি তাঁর *পুরুষ পরীক্ষা* নামক গ্রন্থে গৌড় থেকে গুজরাট বন্দর পর্যন্ত এই বিস্তৃত রাজপথের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৬] হিউয়েন সাঙের বিবরণে এবং কথাসরিৎসাগরেও এ সকল পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। (২) এ পথটি তাম্রলিপ্তি হতে উত্তর দিক হয়ে কর্ণসুবর্ণের মধ্যদিয়ে রাজমহল ও চম্পা স্পর্শ করে পাটলীপুত্রের দিকে চলে যায়। (৩) ইৎসিঙের বিবরণ এবং দুধপানি পাহাড়ের (হাজারীবাগ) শিলালিপিতে তৃতীয় পথটির সন্ধান পাওয়া যায়। এ পথটি তাম্রলিপ্তি হতে উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে বুদ্ধগয়ার মধ্য দিয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২৭] এ পথগুলোর মাধ্যমেই বাংলার সাথে উত্তর ভারতের বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা হতো। হিউয়েন সাঙের বিবরণে আরও একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। এ পথটি বাংলার সাথে দক্ষিণ ভারতের সংযোগ রক্ষা করত। এ পথেই হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ দিক হয়ে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, চোল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য ভ্রমণ করেন।[২৮] জানা যায় যে, পাল শাসকগণও এ পথেই দক্ষিণে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

বাংলার পূর্বদিকে কামরূপ রাজ্য, উত্তরে তিব্বত ও চীন দেশ অবস্থিত ছিল। উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের মধ্য দিয়ে বাংলা এ দুটি দেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারত। এ পথের বিবরণ পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙ, চীন রাজদূতগণের বর্ণনা এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আসাম-তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত শিলালিপিতে। *তবকাত-ই-নাসেরী* গ্রন্থেও এ পথের ইঙ্গিত রয়েছে।[২৯] চৈনিক বিবরণে, দক্ষিণ চীন থেকে আরম্ভ করে উত্তরবঙ্গ ও মনিপুরের মধ্য দিয়ে কামরূপ অতিক্রম করে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ একটি পথের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ চীনের য়ুনান সিচোয়ান প্রদেশে সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র তৈরি হতো। এ সকল দ্রব্য চীন হতে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান পর্যন্ত পৌঁছাত। এ পথে বণিকগণ

---

[২৬] সুশীলা মন্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২০

[২৭] Elliot and Dowson, *The History of India as told by its own Historians,* vol. 2, Sunil Gupta Ltd, Calcutta, 1st Pub. 1871, p. 345

[২৮] সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২

[২৯] Minhaj–I-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, eng.tra., Major H.G, Raverty, vol.1, Oriental Books, New Delhi, 1970, p. 559; অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬; সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

পশুর পিঠে ও পশুবাহিত গাড়িতে করে পণ্য-সামগ্রী এক দেশ হতে অন্য দেশে নিয়ে যেতো। হিউয়েন সাঙ কামরূপবাসীদের নিকট শুনেছিলেন যে, এ পার্বত্যপথ অতিক্রম করতে বণিকগণের প্রায় দু'মাস সময় অতিবাহিত হতো।[৩০] যদিও এ পার্বত্য পথ অতিক্রম করা সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কষ্টকর ব্যাপার ছিল। তবুও বণিকগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য এই পথ ব্যবহার করত।

তিব্বত হতে কামরূপের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত পথটির সন্ধান *তাবাকাত-ই-নাসেরী* গ্রন্থে এবং গোহাটি ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী কানাই-বরশীবোয়া নামক স্থানের পাথরের ফলকে খোদিত একটি লিপি থেকে জানা যায়। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয়ের পর লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে শাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দশ সহস্র সৈন্যসহ কামরূপের পথে তিব্বত বিজয়ে অগ্রসর হন। পার্বত্য দুর্গম পথে পনেরো দিন চলার পরে ষোলোতম দিনের সকালে একটি দুর্গ-নগর মুসলমানদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ নগরের পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপত্তন বা করমবত্তন নামক স্থানটি ঘোড়া বিক্রয়ের কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ নগরে প্রতিদিন প্রভাতে প্রায় দেড় সহস্র টাট্টু ঘোড়া বিক্রি হতো।[৩১] লক্ষ্মণাবতীর সকল ঘোড়া ঐ নগর থেকে কেনা হতো এবং কামরূপের গিরিপথ দিয়ে লক্ষ্মণাবতীতে আনা হতো। ইবনে বখতিয়ার খলজি অবশ্য কামরূপের পথে একটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। গোহাটীর লিপিটি তাঁর অভিযানের সাক্ষ্য বহন করে। শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, শাকে ১১২৭ (আনুমানিক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মার্চ) শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাসে ত্রয়োদশে, কামরূপং সমাগত্য তুরস্কা ক্ষয়মায়ুয়ু।[৩২] এসব বিবরণী থেকে বোঝা যায় যে, কামরূপ থেকে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গিরিপথ ছিল। এ পথই চাঙ কিয়ান বর্ণিত পথ, যা ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে মিলিত ছিল। অনুমান করা যায়, এ পথেই বৌদ্ধ পণ্ডিত, পরিব্রাজক ও তিব্বতী দূতগণ বঙ্গদেশ হতে তিব্বতে যাতায়াত করতেন। তিব্বতের সাথে যোগাযোগের আরও একটি পথ ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ পথ উত্তরবঙ্গের সাথে জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চল এবং সিকিম-ভুটানের চুম্বী উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

---

[৩০] R C Majumder, *op.cit.*, vol.1, pp. 67-68
[৩১] Minhaj–I-Siraj, *op.cit.*, p. 559; অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬; সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
[৩২] সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

পরবর্তীতে এ পথ আরও প্রসারিত হয়ে চীনকে স্পর্শ করেছিল।[৩৩] চীন থেকে যে সকল দাস বাংলায় আনা হতো তারা ঐ দুটি পথ অতিক্রম করে আসত বলে অনুমান করা হয়।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর ভাঙা-গড়ার সাথে সাথে দেশের স্থল ভূমির পরিমাপ কম-বেশি হয় এবং নতুন ভূখণ্ডের সাথে সাথে আঞ্চলিক সত্তার জন্ম হয়। প্রাচীন বাংলায় যে আঞ্চলিক সত্তা ও ভূখণ্ড দেখা যায় তা প্রাকৃতিক কারণে গড়ে উঠলেও এর প্রধান নিয়ামক ছিল নদ-নদী বা নদী প্রবাহ। যেমন- গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী উত্তরবঙ্গের ভূ-ভাগই ছিল মূলত পুণ্ড্র-বরেন্দ্র অঞ্চল। এছাড়া ভাগীরথী নদী বঙ্গ ও রাঢ়কে ভাগ করেছিল। এদেশের নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এসব ভূ-খণ্ডের অনেক অংশ তার পূর্বের অবস্থান থেকে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে বাণিজ্যিক পথগুলোও সেই সাথে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছিল। মেঘনা প্রবাহের পূর্বতীরে সমতট হরিকেল সত্তার সৃষ্টি হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে প্রতিটি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছিল এবং এসব নদীই প্রতিটি প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করেছিল। সেন শাসনে বাংলায় চারটি প্রশাসনিক ইউনিট ছিল, যা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করেছে।

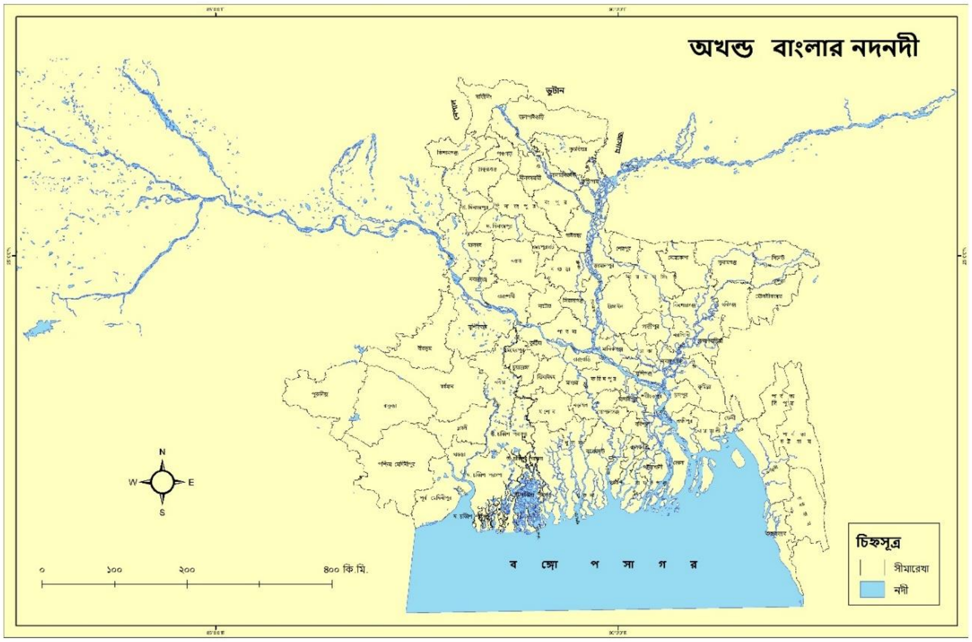

[৩৩] R C Majumder, *op.cit.*, vol. 1, p. 5

ভাগীরথী হুগলি নদীর পশ্চিম তীরের অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল পশ্চিম বাংলা এবং বরেন্দ্র ছিল উত্তর বাংলা। মধ্য বাংলা ছিল গঙ্গা ও মেঘনার সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সমতট ছিল মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী এলাকা।[৩৪] মূলত সমগ্র বাংলায় নদ-নদীগুলো জালের মতো ছড়িয়ে ছিল এবং এসব নদী পথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছে যা বাংলার অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সমগ্র বাংলার বেশিরভাগ প্রশাসনিক ইউনিটের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল নদীকে কেন্দ্র করে। পুণ্ড্রনগর বাংলার প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। এ বিভাগের বিস্তার ছিল উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে। রাজমহল, গঙ্গা, ভাগীরথী থেকে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর বাংলা পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাল রাজাদের সময়ে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার (বঙ্গ, সমতট, হরিকেল) তাম্রলিপ্তিসমূহের ভূমি দান সংক্রান্ত অংশ থেকে দেখা যায় যে, পুণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত ভূ-ভাগই ছিল বর্তমানের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেট এলাকা। সেনবংশের ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলিপিতে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়।[৩৫] সব প্রশাসনিক ইউনিটের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল নদীকে ঘিরেই।

বিজয় সেন রাঢ় অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে বঙ্গ বা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অধিকার করেন এবং পরে উত্তরবঙ্গে পাল আধিপত্যের পরিবর্তে সেন আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি সীমানা নির্দিষ্টকরণের জন্য তাম্রশাসনে বরেন্দ্রীকে বা বঙ্গের *নাব্যভাগ* বা বঙ্গের *বিক্রমপুর ভাগ* নামে দুটি শব্দ ব্যবহার করেন। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে বর্ধমানভুক্তি, দণ্ডভুক্তি এবং কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া অঞ্চল (রাঢ় অঞ্চল) বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দণ্ডভুক্তি বলতে মেদিনীপুর বালাশোর অঞ্চলকে বোঝাত। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, সুবর্ণরেখা নদীর নিম্নাঞ্চল এবং বালাশোর জেলার কিছু অংশব্যাপী এ ভুক্তি বিস্তৃত ছিল। এছাড়া লক্ষ্মণ সেনের তাম্রলিপিতে কঙ্কগ্রামভুক্তির নাম জানা যায়। যেখানে অজয় নদীই দক্ষিণ রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা ছিল।[৩৬] মূলত বাংলার প্রশাসনিক অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটিরই সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নদ-নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর এসব প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ

---

[৩৪] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৭
[৩৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯, কলকাতা, পৃ.৭০
[৩৬] *ঐ*, পৃ. ১১৯

বাণিজ্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও নদ-নদীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। নদীমাতৃক বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণের নিচু অঞ্চলগুলোতে স্থলপথ অপেক্ষা নৌপথেই বেশি যোগাযোগ হতো। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব জলপথও পরিবর্তিত হয়।

এছাড়া কয়েকটি জাতকের কাহিনী থেকে বাংলার নদী ও সমুদ্র পথের কথা জানা যায়। গুপ্ত যুগের পরবর্তীতে রচিত শঙ্খ জাতক, সমুদ্রবণিক জাতক এবং মহাজন জাতক ইত্যাদি কাহিনিতে দেখা যায় যে, মধ্যদেশীয় বণিকগণ বারাণসী এবং চম্পা হতে নৌযানে গঙ্গা-ভাগীরথী পথে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আগমন করতেন। সেখান থেকে তারা বাংলার উপকূল দিয়ে সিংহলে কিংবা সুবর্ণভূমি বা নিম্নবঙ্গেও যাতায়াত করতেন। জাতকের গল্পে তাম্রলিপ্তি হতে সিংহল ও সুবর্ণভূমিতে যাতায়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে। সিংহলী ইতিবৃত্ত *দীপবংশ*ও *মহাবংশে* রাঢ়দেশীয় রাজপুত্র বিজয় সেনের সমুদ্রপথে সিংহলে যাওয়া ও দ্বীপটি অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বাংলার সাথে ভারত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কারণ বাংলার গঙ্গা বন্দর (সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত) হতে বণিকগণ কোলণ্ডিয়া নামক জলযানে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বন্দরে যাতায়াত করত।[৩৭] প্লিনির বিবরণ হতে এসব জলপথ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। প্রাচ্যদেশ হতে সিংহলের দূরত্ব ছিল বিশ দিনের মতো এবং প্লিনির সময় দূরত্ব ছিল সাত দিনের মতো। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি হতে সিংহল যেতে চৌদ্দ দিন ও চৌদ্দ রাত অতিবাহিত করেছিলেন। ফা-হিয়েনের পর বহু চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক সমুদ্রপথে সিংহলে যাতায়াত করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেন শাসন আমলে এ বাণিজ্য পথ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুলতানী আমলে এ সমুদ্রপথ আবার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সিংহল হতে মালয়, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা এবং কম্বোজের সাথেও জলপথে যোগাযোগ ছিল। তাম্রলিপ্তি হতে চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথের বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এ পথেই আরাকানের সাথে চট্টগ্রামের নিয়মিত যোগাযোগ হতো। মধ্যযুগে চৈনিক পরিব্রাজক, আরব ও পর্তুগিজ বণিকগণ সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম হতে এ পথ ব্যবহার করে আরাকান ও নিম্নবঙ্গে যাতায়াত করতেন। ইৎসিঙ সপ্তম শতকেই বলেছেন যে, হিউয়েন সাঙ নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী 'কেডা' বন্দর হতে সমুদ্র অতিক্রম করে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আগমন

[৩৭] সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

করেন।[৩৮] মালয় উপদ্বীপে মহানাবিক বুধগুপ্তের চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতকের একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, বুধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকা হতে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সমুদ্রপথে মালয় যান। মূলত এ রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি চট্টগ্রাম জেলার রাঙামাটি বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।[৩৯]

নবম শতকের মধ্যভাগে দেবপালের নালন্দা লিপিতে বঙ্গোপসাগর থেকে এক সমুদ্রপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বন্দর তখন বিলুপ্ত। সুতরাং এ পথ কোনো স্থান থেকে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বলা কঠিন। কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন যে, উড়িষ্যার কোনো বন্দর হতে বঙ্গের উপকূলের পাশে কিংবা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে এ পথ বিস্তৃত ছিল। টলেমির বিবরণে আরও একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। এ পথে তাম্রলিপ্তি হতে যাত্রা করে জলযানগুলো উড়িষ্যার পলৌরা বন্দরে গমন করত এবং সেখান থেকে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যাতায়াত করত। উল্লেখ্য যে, সেন আমলে এসে এসব নৌ ও সমুদ্রপথগুলো যাতায়াতব্যবস্থায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন না থাকায় বন্দরসমূহে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ধস নামার ফলে বাংলা কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। আলোচ্য বাণিজ্য পথগুলো সেন শাসনামলের পূর্বে পাল শাসনামল পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সেনামলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ কমে যায় ফলে এ সকল পথ সেনামলে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়নি বলেই আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এসব পথ পুনরায় ব্যবহার করে বণিকগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে।

(২) প্রাক-মুসলিম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল থাকায় রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল ছিল। সমগ্র বাংলা খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে[৪০] বিভক্ত থাকায় শাসকগণের পক্ষে বিদ্রোহ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সেন শাসকগণ জনগণের কল্যাণ অপেক্ষা তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। সমাজের ব্রাহ্মণগণ সব ধরনের সুবিধা ভোগ করতেন, আর অন্য সব নাগরিক তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নিম্নশ্রেণির

---

[৩৮] সুশীলা মন্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
[৩৯] *ঐ*
[৪০] *ঐ*, পৃ. ১০৮

জনগণ, গ্রামীণ কৃষক এবং অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই ছিল কঠিন বিষয়। এ সময়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শাসকগণের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সীমানার প্রসারণ ও সঙ্কোচন ঘটেছিল। মূলত পৃথিবীর যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে সে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শাসকদের সুশাসনের ওপর। যা প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় অনুপস্থিত ছিল। পাল রাজাদের রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেন আমলে বাংলার মানসম্পন্ন মুদ্রার অপ্রতুলতার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে।[৪১] অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নগর কেন্দ্রগুলোর ক্ষয়িষ্ণুতার ভেতর দিয়ে এ পরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফলে বাংলার বহু অঞ্চলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে পণ্য বিনিময় প্রথা প্রাধান্য পায়।[৪২] পণ্য বিনিময় প্রথা চালু থাকায় সেন শাসনামলে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মুদ্রা। নিম্নে প্রাক-মুসলিম বাংলার কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মুদ্রা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

২.১ প্রাক মুসলিম বাংলার কৃষি

বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই বাংলার অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড। এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং কৃষিই তাদের সর্বপ্রধান অবলম্বন। প্রাচীন যুগের ন্যায় সেন আমলেও বাংলার ভূমিতে উৎপাদন কম হতো এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটত। এসময়ে যেসব ফসল উৎপাদিত হতো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় সেসব ফসল বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হতো না। ফলে ফসলের দাম কম থাকায় কৃষকগণ ফসল উৎপাদন করেও তাদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতো। বেশিরভাগ কৃষক কৃষি জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করত তা দ্বারা নিজের পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা কষ্টকর ছিল। এছাড়া ভূমিতে চাষাবাদের নিজস্ব কোনো অধিকার না থাকায় তারা চাষাবাদে খুব বেশি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে বাংলার ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়। পাল ও সেন আমলে ভূমির পরিমাণ বেশি থাকলেও চাষাবাদ হতো কম জমিতে; বরং অনাবাদি জমির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। আবাদি জমির পরিমাণ কম থাকায় উৎপাদনও স্বাভাবিকভাবে কম হতো।

[৪১] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৯
[৪২] *ঐ*

বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি। ভূমি ও কৃষি নির্ভরতার ফলে বাংলার গ্রাম্য জীবন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাধা পড়েছিল। রোজকার জীবনে যা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তা গ্রামের মধ্যেই পাওয়া যেতো। এসব জিনিসের জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার হতো না। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়নি। ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক পরিমাণে ভূমি দান করা হতো এবং ঐসব লোকজনের কাছ থেকে তারা সেবা লাভ করত। ব্রাহ্মণ প্রদত্ত ভূমি ছিল করমুক্ত যাতে করে জমির গ্রহীতা ঐ জমি থেকে যথেষ্ট আয় করতে পারে। তৎকালীন শিলালিপিগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে ‘পীড়ম’ বা বাধ্যতামূলক শ্রমের কথা উল্লেখ রয়েছে। লিপিগুলো থেকে কতকগুলো সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণি বাদ দিলেও দেখা যায় যে, সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর।[৪৩] Richard M Eaton-ও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ‘দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত লেখা তাম্রলিপিসমূহ থেকে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল এবং সমাজে শ্রেণিবিন্যাসের বিস্তৃতি ঘটেছিল। এছাড়া ভূমিদান রাজার বিশেষ অধিকারে পরিণত হয় এবং দানকৃত কৃষি জমির আর্থিক মূল্য রাজার জানা থাকত (উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের), যা সমাজকে অধিকতর কৃষিনির্ভর করার ইঙ্গিত দেয়।[৪৪] এছাড়া প্রাক-মুসলিম বাংলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণসমাজ সম্পর্কে রোমিলা থাপার উল্লেখ করেন যে, এসময়ে গ্রামে স্বনির্ভর ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি জন্ম নেওয়ায় লেনদেন হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য উৎপাদন হতো না। গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই ভোগ করা হতো। এ অবস্থা বাণিজ্যের জন্য প্রতিকূল ছিল। ফলে অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।[৪৫] লক্ষ্মণ সেনের শাসন আমলে কৃষিনির্ভর সমাজের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সভাকবি গোবর্ধন আচার্যের রচনা থেকে। তিনি উল্লেখ করেন যে, হে শত্রুধ্বজ। যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়! ইদানীংকালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধার গোঁজ) করতে চাহিতেছে।[৪৬] এ শ্লোক থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতি এবং একান্ত কৃষিনির্ভর বাংলার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এটাই স্বাভাবিক যে দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ সে দেশের সমাজ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত।

---

[৪৩] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১০

[৪৪] Richard M. Eaton, *op.cit.*, p. 15

[৪৫] রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ, আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন (প্রা) লি. কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮৪

[৪৬] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

সেন আমলে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এ সময়ে ভূমিদানের কারণে ব্রাহ্মণরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজা অথবা বিত্তবান ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মাণদেরকে ভূমি দান করতেন। দানকৃত ভূমি ব্রাহ্মণদের পরিচয়দানে সহায়ক ছিল এবং এ সকল গ্রাম তাদের নামের শেষে বা পূর্বে উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বিশেষত সেনবংশের শাসনাধীনে বাংলায় ব্রাহ্মণদেরকে জমি ও গ্রামদানের ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, দেবপালের পূর্বে নালন্দা মহাবিহারের ব্যয় নির্বাহ হতো ২০৯টি গ্রাম থেকে। দেবপালের সময় এতে আরও ৫টি গ্রাম যোগ হয়। অর্থাৎ ২১৪টি গ্রামের ওপর সে প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ভোগের অধিকার ছিল। এভাবেই বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ সমতট, হরিকেল অঞ্চলের ময়নামতি বিহারের উদ্দেশ্যে ভূমি সম্পদ দান করেন। মূলত এটাই ব্রাহ্মণদেরকে ভূমি দান করার পদ্ধতি। ভূমিদান সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তিনি বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম খাটিকায় বেতড্ড চতুরঙ্কে ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমি বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীব্যাসদেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। এ এক দ্রোণ ভূমির বাৎসরিক আয় ছিল ১৫ পুরাণ বা রজতমুদ্রা।[৪৭] এ ভূমিদান সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে হলায়ুধ শর্মা সাড়ে ৩৩৯ উয়ান পরিমাণ জমি পেয়েছিলেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বাংলা ও ভারতের বড় বড় মন্দিরগুলো ব্যাপক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং সেগুলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তবে মন্দির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও ব্রাহ্মণরাই ঐ সকল ভূমির সব সুবিধা ভোগ করতেন। এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। যথা- (ক) এসময়ে ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার প্রসার ঘটে এবং (খ) ভূস্বামী ও ভূমি অধিকারীদের (ব্রাহ্মণদের) ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে ভূস্বামীদের সম্পত্তি বেশি হওয়ায় কারণে তার পক্ষে সব জমি চাষ করা সম্ভব হতো না। ফলে এক্ষেত্রে চাষিদের নিয়োগ করা হতো। অর্থাৎ নতুন ভূস্বামীর উত্থানের ফলে মালিকানাবিহীন কৃষি শ্রমিকের উদ্ভব ঘটে। কৃষকগণ ভূমি চাষ করত। কিন্তু কোনো কৃষক ভূমির মালিক ছিল না। ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন উপাধির বর্ণনা দিতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেন, ব্রাহ্মণদের বন্ধ্যঘটীয় উপাধি হতে বর্তমানকালের বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণরা ধর্মকর্ম ছাড়া অন্যান্য কাজও করত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজন উচ্চ

---

[৪৭] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, অখণ্ড সংস্করণ, ১২ ও ২য় খণ্ড একত্রে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ.২০৪; রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, বৈশাখ ১৩৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৮৪; এরূপ ভূমিদানের প্রমাণ পাওয়া যায় কুমিল্লা জেলার পট্টিকেরা পরগনা থেকে। ময়নামতির চারপত্রমুড়ায় প্রাপ্ত লড়হচন্দ্রের তাম্রলিপি থেকে সমতট মণ্ডলে পট্টিকেরকে ভূমিদানের কথা উল্লেখ আছে। A.H Dani, "Mainamati Plates of the Chandras", *Pakistan Archaeology*, no- 111, 1966, pp. 401-48; আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৭

রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত ছিল।[৪৮] তবে তারা কোনো অবস্থাতেই শুদ্রদের সংস্পর্শে যেতো না[৪৯] ব্যতিক্রম হলে তারা পতিত হতো বা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে যেতো।

২.২ প্রাক-মুসলিম বাংলার শিল্প

শিল্পকারখানা বলতে বর্তমান সময়ে আমরা যেরূপ বড় বড় কারখানা বুঝি প্রাক-মুসলিম বাংলায় তেমন কোনো শিল্পকারখানার অস্তিত্ব ছিল না। তৎকালীন সময়ে শিল্পকারখানা বলতে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্পকে বোঝাত। রাজ পরিবারের শিল্পকারখানা ছিল বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এসব শিল্প শাসকদের বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এদেশে মোটা সূতিবস্ত্র তৈরি হতো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় চাহিদার স্বল্পতার কারণে উৎপাদন হ্রাস পায়। কেবলমাত্র দেশীয় চাহিদা পূরণের জন্য বস্ত্র উৎপাদন করা হতো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় কুটির শিল্পের উৎপাদনও হ্রাস পায়।

বাংলার বস্ত্রশিল্প প্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার কার্পাসজাত বস্ত্রাদি ভারতের সর্বত্র এবং বহির্বিশ্বেও সমাদৃত হয়েছিল। *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে* বাংলার কার্পাস বস্ত্রাদির প্রশংসা করা হয়েছে। গুটিপোকার চাষ, কার্পাসের চাষ ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল বাংলায় অর্থ আগমনের প্রধান নিয়ামক।[৫০] নবম শতাব্দীর আরব বণিক সুলায়মান উল্লেখ করেন যে, রুহমী দেশে (বাংলায়) এমন সূক্ষ্ম এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয় যা অন্য কোনো দেশ প্রস্তুত করতে পারে না। এটি দ্বারা প্রস্তুত পোশাক একটি অঙ্গুরীয়ের (আংটির) মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো যায়। তিনি স্বচক্ষেই এ পোশাক দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন।[৫১] সেন শাসনে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় বৃহৎ শিল্পকারখানায় রপ্তানি করার মতো এরূপ উন্নত বস্ত্র তৈরি হতো না। তখন এ ধরনের শিল্পকারখানায় শুধু শাসকবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বস্ত্র তৈরির

---

[৪৮] এস এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস: সেনযুগ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৫২-৫৩

[৪৯] শ্রী বিধূভূষণ ভট্টাচার্য, *হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৩৫২ সাল, পৃ. ২৭৭; সেন আমলে ক্ষত্রিয় ও বৈষ্যদের তেমন প্রভাব লক্ষ করা যায় না। তবে করণ কায়স্থরা বেশ প্রভাবশালী ছিল। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে 'করণ' শব্দ বলতে একটি জাতি ও একশ্রেণির হিসাবরক্ষক/ লেখক বা কর্মচারীকে বোঝানো হতো। কায়স্থ বলতে এই একই শ্রেণির রাজকর্মচারীকে বোঝাত। প্রাচীন লিপিতে করণ ও কায়স্থ একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। করণ জাতি হিন্দু যুগের পরে বাংলায় লোপ পায় এবং কায়স্থ জাতি হিন্দু শাসনের পূর্বে এদেশে পরিচিত ছিল না এবং পরে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই একথা বলা যায় যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায়ও করণ-কায়স্থে পরিণত হয়েছে। দশম শতকে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হয়েছে। R.C. Majumdar, *op.cit.*, pp. 585-586

[৫০] Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984, p.110

[৫১] আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৮

কাজ চালিয়ে যেতে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, ঐসব কারখানায় সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী বস্ত্র তৈরি হতো না।

এছাড়া বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির ওপর নির্ভরশীল থাকায় শিল্পের উন্নয়নে তখন কম গুরুত্ব দেওয়া হতো। শিল্পজাত পণ্য তৈরির কাঁচামালের অপ্রতুলতার কারণেও পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সর্বোপরি সেনযুগে মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ও অনভিজ্ঞ লোকবল থাকায় উৎপাদন ক্ষমতাও তেমন বাড়েনি।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে, যে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির ওপর নির্ভরশীল সে দেশে শিল্পে পারদর্শী লোকের সংখ্যা খুব কম এবং সে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী, ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞের অভাব থাকে।[৫২] সেন আমলে শিল্পকারখানা অনুন্নত থাকায় স্বল্প পরিসরে যে দ্রব্য উৎপাদিত হতো তা দ্বারা শুধু দেশের চাহিদাই পূরণ করা সম্ভব হতো। ফলে বিভিন্ন শহরের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও লেনদেন না করায় বাংলার বিভিন্ন শহর ও নগর ঝিমিয়ে পড়ে।

২.৩ ব্যবসায় বাণিজ্য

প্রাক-মুসলিম বাংলায় মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বল্প পরিসরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। দেশের অভ্যন্তরে স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু ছিল। তবে স্থলপথের তুলনায় নৌপথেই বেশি ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো।[৫৩] তৎকালীন বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারসমূহ হাটস্ নামে পরিচিত ছিল। হাটস্গুলো সাধারণত সপ্তাহান্তে বা দু'সপ্তাহে একবার গ্রামের বিস্তৃত এলাকায় বসত। শুধু স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যাদি ছোট শহর বা নগরের বাজারে বিক্রি হতো এবং এ বাজারগুলো 'চক' (Chauk) নামে পরিচিত ছিল। বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে এ ধরনের বাজারের অস্তিত্ব ছিল।

---

[৫২] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *আর্থনীতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অংশ*, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২২৪
[৫৩] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

এসব হাটস্-এ গ্রাম্য কৃষক, শ্রমিক ও পুঁজিপতিরা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করত। হাটস্গুলোকে পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ হাট বলে অভিহিত করেন। বর্তমানেও এগুলো হাট নামে পরিচিত। বাজারগুলো সাধারণত নদীর তীর কিংবা সহজ যোগাযোগব্যবস্থার অনুকূল স্থানে গড়ে ওঠে। গ্রাম্য বাজার ছাড়াও শহরকেন্দ্রিক কিছু দোকানপাট ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এসব ব্যবসায়িক কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করত। তৎকালীন বাংলার শহর, নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো কেবলমাত্র জলপথেই নয় স্থলপথের মাধ্যমেও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করত।[৫৪]

সেন শাসনামলে বাংলার বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, সেন আমলের পূর্বে বাঙালি বণিকেরা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল ধরে গুজরাট পর্যন্ত যেসব বাণিজ্যিক দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে যেতেন তার মধ্যে ছিল পান, সুপারি ও নারিকেল। সুপারির বিনিময়ে মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে তারা শঙ্খ আনতেন।[৫৫] 'গাঁঙ্গে' নামক বন্দর থেকে বণিকরা জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে দক্ষিণ ভারত ও লঙ্কাদ্বীপে যেতেন।[৫৬] কিন্তু সেন শাসনে এরূপ সফল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রমাণ নেই। উল্লেখ্য যে, চন্দ্রবংশের পতনের পর দুর্বল সেন রাজাদের অধীনে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থায় ভূমিদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা দিলে কৃষির ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়। এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর ওপর পড়েছিল। এছাড়া এসময়ে ধলেশ্বরী ও মেঘনার গতিপথ পরিবর্তন হয়। ফলে নদীপথে পণ্যদ্রব্যাদি পরিবহণে বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি হয়, যা বাংলার অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।[৫৭] তাছাড়া মেঘনা নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন তখন আর সম্ভবপর ছিল না। অতএব দেখা যায় যে, নৌবাণিজ্য এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল এবং সেটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু নৌবাণিজ্যে স্থবিরতার কারণে বণিক ও কারিগর শ্রেণি অন্যান্য পেশাদার শ্রেণিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়[৫৮] এবং কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।

---

[৫৪] Kamrunnesa Islam, *op.cit.*, p.133
[৫৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩
[৫৬] R.C.Majumdar, *op.cit.*, vol. 1, pp. 661-662
[৫৭] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[৫৮] মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় যখন ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে, তখন উত্তর-পশ্চিম বাংলার নগর কেন্দ্রগুলো তাদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তাম্রলিপ্তি ও গঙ্গা বন্দর নৌচলাচলের জন্য তখন আর উপযুক্ত ছিল না। এর ফলে এ বন্দরগুলো থেকে যে বাণিজ্য পথগুলো বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল, সে পথগুলোর বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা বিনষ্ট হয়। বিদেশি বণিকদেরকে আকর্ষণ করার মতো কোনো পণ্যদ্রব্য ঐসব বাণিজ্য কেন্দ্রে উৎপন্ন হতো না। এছাড়া আঞ্চলিক বাণিজ্যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল, ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণি কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে।[৫৯] বাংলার এরূপ বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পাল ও সেন রাজাদের তাম্রশাসনের বিবরণ থেকে দেখা যায়, ঘন লোক-বসতিসম্পন্ন কৃষি অঞ্চলে ভূমি হস্তান্তর করা হয়। ফলে শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দেয়। তাতে এদেশের সামাজিক অর্থনীতির বুনিয়াদ সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়।

প্রাক-মুসলিম যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় শিল্পের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলার শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন কমে যায়। এসময়ে আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। সেন শাসনাধীনে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া আমদানি-রপ্তানি করা পণ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট চাহিদাপূর্ণ এলাকায় প্রেরণের জন্য বহু লোক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এসব পণ্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় দৈহিক শ্রম কাজে লাগিয়ে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পায়। কিন্তু সেন শাসন আমলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এ বাণিজ্যের সাথে জড়িত বহুসংখ্যক লোক বেকার হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। মানুষ বহুবিদ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে নিজেদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করতে সক্ষম হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বণিকশ্রেণি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সাধারণত শাসকগণ বণিকশ্রেণিকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সেন শাসনামলে বাংলার বণিকগণ

---

[৫৯] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য শাসকদের নিকট থেকে কোনো রকম পৃষ্ঠপোষকতা পেতো না; বরং শাসকগণ ধনী বণিকশ্রেণির নিকট থেকে অর্থ ধার নিতেন এবং তা পরিশোধ করতেন না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার *বল্লালচরিত* গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে শাসকগণ কর্তৃক বণিকদের নিকট থেকে অর্থ ধার নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। *বল্লালচরিত* থেকে জানা যায় যে, বল্লাল সেন উদন্তপুর বিহারে অভিযান পরিচালনার পূর্বে ধনীশ্রেষ্ঠ বণিক বল্লভানন্দের নিকট থেকে এক কোটি মুদ্রা ধার করেন। কিন্তু বার বার মণিপুরের নিকট পরাজিত হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য দ্বিতীয়বার দেড় ক্রোর নিস্ক ধারের জন্য শঙ্ককোটের বল্লভানের নিকট দূত পাঠান। বল্লভান উত্তরে জানান হরিকেলের রাজস্ব যদি তাকে দেওয়া হয় তবে সে টাকা কর্জ দিতে পারে। এতে রাগান্বিত হয়ে বল্লাল সেন জোরজুলুম করে অনেক বণিকের নিকট হতে টাকা আদায় করেন।[৬০] এরই পরিপ্রেক্ষিতে বণিকগণ রাজার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এছাড়া রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হয়ে বণিকরা দেখেন যে, তারা বৈশ্য হলেও খাবারের জায়গায় সৎ শুদ্রের সঙ্গে একত্রে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বল্লাল সেনের কাছে আরও একটি খবর পৌঁছায় যে, এ বণিকদলের নেতা বল্লভানন্দ পালদের সাথে তাঁর বিপক্ষে যোগ দিয়েছে। এ খবর শুনে বল্লাল সেন রাগান্বিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, সুবর্ণ বণিকেরা এখন থেকে শুদ্র বলে গণ্য হবে। যে সকল ব্রাহ্মণ বাড়িতে তাদের পূজা বা অন্য ধর্মানুষ্ঠান করবে, তাদের বাড়িতে শিক্ষা দান করবে, তাদের দান গ্রহণ করবে তারা সবাই পতিত হবে। বল্লাল সেন আরো ঘোষণা করেন যে, বণিকরা উপবীত (পৈতে) গ্রহণ করতে পারবে না। ফলে অনেক বণিক দেশত্যাগ করে। একই সময়ে লক্ষ্মণ সেন উচ্চবর্ণের মধ্যে দুর্নীতি লক্ষ করে আচারহীন ব্রাক্ষ্মণদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেন। এছাড়া যে সকল ব্রাহ্মণ ব্যবসায়-বাণিজ্য করত, তাদেরকে জাতিচ্যুত করেন।[৬১] শাসকগণ কর্তৃক বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি এমন বিরূপ আচরণের ফলে তাদের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনীহা সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। বল্লাল সেন তাঁর রাজত্বকালে সম্পদশালী সুবর্ণ বণিকদেরও সমাজে পতিত বলে ঘোষণা করেন। আনন্দভট্ট রচিত *বল্লালচরিত* থেকে সুবর্ণ বণিকদের সামাজিক অবনমন এবং রাজ্য থেকে বহিস্কার করার কথা আমরা জানতে পারি।[৬২] অন্যদিকে সুবর্ণ বণিকদের অবস্থা সম্পর্কে হান্টার উল্লেখ করেন যে,

[৬০] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ১৪০-১৪১
[৬১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪১
[৬২] Ananda Bhatta, *Vallala Charita*, edited and trans. from Sanskait and English by Haraprasad Sastri, Hase Press, Calcutta, 1901, p. 4

এই জাতের লোকেরা বণিক জাতের একটি শাখামাত্র। এদের সামাজিক অবনমনের কাহিনী হলো এই যে এদের ঔদ্ধত্য আচরণে রুষ্ট হয়ে রাজা বল্লাল সেন এদের জব্দ করার জন্য লাল রঙের জলমিশ্রিত একটি স্বর্ণগাভী তৈরি করান এবং সুবর্ণ বণিকদের সেই সোনাকে পরীক্ষা করতে বলেন। . . . সুবর্ণবণিকেরা নিজেদেরকে বৈশ্য হিসেবে দাবি করে এবং তাদের পূর্বেকার সেইসব বণিকদের সাথে কোনো রকম সংস্পর্শ অস্বীকার করে। তৎকালীন কলকাতায় এই গোষ্ঠীর লোকেরা উপবীত ধারণ করার দাবি জানিয়ে এক আন্দোলন করেছে। এদের সম্পর্কে বলা হয় যে, এদের জন্ম হয়েছে বৈদ্য পিতা ও বৈশ্য মাতার সংস্পর্শে।[৬৩] বণিকগণ এমন চিন্তাধারাকে অপমানজনক মনে করত।

বল্লাল সেন ব্যবসায়ী বণিকদেরকে কোনো রকম সুবিধা প্রদান করেননি; বরং লক্ষ করা যায় যে বণিকদের অবনমন করার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বণিকদের অপমান করতে দ্বিধা করেননি। একইভাবে ব্যবসায়ীদের (সাহাদের) বাণিজ্য বিমুখ করার প্রমাণ পাওয়া যায় E.A. Gait এর তথ্যে-

তাঁর মতে, সাহারা বলে থাকে যে তারা সমাজে অধঃপতিত হয়েছে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য নয়। বরং মদপানের আসক্তি বেড়ে যাওয়া এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার কারণে ব্রাহ্মণেরা মদ বিক্রেতা হিসেবে সাহাদের অধঃপতিত বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে তারা বৈশ্যদের বৃত্তি অবলম্বন করে এবং এজন্য সাহারা দ্বিতীয় শ্রেণিতে তালিকাভুক্তির আবেদন জানায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাহারা একটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং অগ্রসর গোষ্ঠী এবং তাদের মধ্যে অনেক ধনী জমিদার ও বণিক দেখা যায়।[৬৪]

অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় মদ প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা হিসেবে শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি (সাহা) নামে পরিচিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী পরিচিত ছিলেন। আধুনিক গবেষকদের তথ্য থেকে আমরা লক্ষ করি যে, দেশে জনগণের মধ্যে নেশাজাতীয় (মদ) শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণেরা শুঁড়ি (সাহা)দের নীচু জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ থেকে এটা ধারণা করা অমূলক হবে না যে, শুঁড়ি (সাহা) সম্প্রদায়ের সামাজিক অবনমন বল্লাল সেনের আমলেই ঘটানো হয়েছিল। একদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুরবস্থা, অন্যদিকে শাসকগণ কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে সমাজে পতিত হওয়া, সবমিলিয়ে ব্যবসায়ী ও বণিকগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে।

---

[৬৩] W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. 1, Trubner & Co, London, 1875, P.68
[৬৪] E.A. Gait, *Census of India*, vol. 6, Part-1, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1902, p.383

২.৪ মুদ্রাব্যবস্থা

সেনামলে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না এবং দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে এদেশে মুদ্রার প্রচলন থাকলেও সপ্তম শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় মুদ্রার প্রচলন কমে এসেছিল। সেনযুগে কোনো মুদ্রার প্রচলন ছিল না এবং তেমন কোনো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। এসময়ে বাংলার কোনো শাসক কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা জারির প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি তাদের কেউ কোনো ধাতব মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন কি-না তাও স্পষ্ট নয়। তবে পাল-সেন লেখমালায় মুদ্রার বিভিন্ন নাম বিবৃত হয়েছে। যেমন-পুরাণ, দ্রম্ম প্রভৃতি। এ পরিভাষাগুলো ৩২ রতি বা কার্ষাপণ তৌলরীতির রৌপ্যমুদ্রা বুঝাতে ব্যবহৃত হতো।[৬৫] সেন রাজা ও তাদের সমসাময়িক অন্যান্য শাসকের লেখমালায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে 'কপর্দক-পুরাণ' পরিভাষাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে, কপর্দক বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক মুদ্রা যার গুণগত মান এক পুরাণ বা রৌপ্যমুদ্রার (৫৭.৬ গ্রেন) সমান, কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যা গণনা হতো সমানুপাতিক কড়ির মাধ্যমে।[৬৬] এসময়ে বাংলায় ধাতবমুদ্রা ছিল দুষ্প্রাপ্য, কড়ির প্রচলন ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধোগতির কারণে বাংলায় পাল ও সেন যুগের ধাতবমুদ্রার প্রচলন ছিল না।[৬৭] রামশরণ শর্মার মতে, বাণিজ্যনির্ভর নগর অর্থনীতির অবক্ষয়ের ফলে তখন এক স্বনির্ভর, আবদ্ধ ও গ্রামীণ অর্থনীতির সূচনা হয়। কারণ, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ি ধাতবমুদ্রার মতো ব্যবহার উপযোগী ছিল না। কড়ির মাধ্যমে বড়জোর স্থানীয় পর্যায়ে দৈনন্দিন লেনদেন চলত।[৬৮] এই সময়ে দ্রব্য বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। রণবীর চক্রবর্তী বলেন যে, প্রাক-মধ্যযুগে চালের বিনিময়ে কড়ি আমদানি হতো সুদূর মালদ্বীপ থেকে। এ বিবেচনায় কড়ি কখনই দূরপাল্লার বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক ছিল না। কড়ির উপস্থিতি দূরপাল্লার বাণিজ্যের অবক্ষয় নয়, বরং তা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যের অনিবার্যতাকেই নির্দেশ করে।[৬৯] রণবীর চক্রবর্তীর সাথে আমরা একমত নই কারণ কড়ির মাধ্যমে সব দেশের সাথে বাণিজ্য সম্ভব নয়; বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে

---

[৬৫] রণবীর চক্রবর্তী, 'মুদ্রা' সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া ৮ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ২৩১

[৬৬] মোস্তাফিজুর রহমান, 'মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা আদি-ঐতিহাসিক থেকে প্রাক-মধ্যযুগ', সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৩

[৬৭] রণবীর চক্রবর্তী, অর্থনৈতিক জীবন: কৃষিকর্ম ও কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, *বাংলাদেশের ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা*, আবদুল মমিন চৌধুরী (সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৪৯; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৪; R S Sharma, *Urban Decay in India*, (c.300-1000), Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, New Delhi, 1987, p. 123

[৬৮] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

[৬৯] রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

বাধা সৃষ্টি করেছিল, এমনকি সব দেশে কড়ির প্রচলন ছিল না। তাই বাংলায় কড়ির আমদানি হতো শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য। এখানে আরো একটি বিষয় বলা জরুরি যে, কোনো কোনো দেশে হয়ত কড়ির প্রচলন ছিল কিন্তু সেই সব দেশের সাথে যে সেনামলে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো এমন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে *তাবাকাত-ই-নাসেরী* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রাজা লক্ষ্মণ সেন সোনা ও রূপার বাসনে আহার করতেন। তিনি দানের সময় লক্ষ কড়ির কম দান করতেন না।[৭০] নীহাররঞ্জন রায় এ মত সমর্থন করেন।[৭১] তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পাল আমলে ধাতব মুদ্রা প্রচলনের একটি প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও সেন আমলে তা ছিল না। উল্লেখ্য যে, মিনহাজ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দেখতে পাননি, হাটবাজারে কড়িরই প্রচলন ছিল। অন্যদিকে মুদ্রা গবেষক রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন, সেন আমলের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ পুরাণ ও চূর্ণী শব্দ দুটি সমার্থক এবং চূর্ণী (রূপার মুদ্রা) ছিল ধাতব মুদ্রা। প্রতিটি মুদ্রা ১২৮০টি কড়ির সমতুল্য ছিল।[৭২] তাঁর মতে, প্রাক-মধ্যযুগে বাংলায় একটি জটিল ত্রিস্তরবিশিষ্ট মুদ্রাব্যবস্থা চালু ছিল। এ ত্রিস্তর মুদ্রাব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল কড়ি। সর্বোচ্চ একক ছিল রৌপ্যমুদ্রা, যা সমতট ও হরিকেল এলাকায় চালু ছিল। এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে ছিল চূর্ণী বা ধাতব চূর্ণ, যা যুগপৎ কড়ি ও রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য।[৭৩] সঙ্গত কারণেই রণবীর চক্রবর্তীর সাথে অনেক গবেষকই একমত পোষণ করতে পারেননি। কারণ, তিনি যে মুদ্রার বর্ণনা দিয়েছেন তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া তাম্রশাসনে বর্ণিত মুদ্রা বাস্তবে পাওয়া যায়নি। শুধু তাম্রশাসনের বর্ণনা থেকে ধাতবমুদ্রার অস্তিত্ব স্বীকার করা কঠিন। তবে এটা নিশ্চিত যে, দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল এবং মুদ্রা হিসেবে তখন কড়ি ব্যবহৃত হতো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষ করে, সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল।[৭৪] যার ফলে পাল ও সেন আমলে সমাজ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে পণ্য বিনিময় প্রথা অথবা কড়ির মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত। ভারতীয় উপকূলের সাথে

---

৭০ Minhaj–I-Siraj, *Tabakat-i-Nasiri*, eng. tra., Major H.G Raverty, vol. 1, Orient Book, Asiatic Society of Bengal, 1970, pp. 575-576

৭১ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪; সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

৭২ রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

৭৩ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

৭৪ মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

পশ্চিমের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত যোগসূত্রের বিলোপ সাধনের কারণে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে।[৭৫] এছাড়া শাসকগণ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব থাকায় বণিকগণ বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২.৪ নগরায়ণ

প্রাক-মুসলিম বাংলায় রাজধানী ছাড়া উন্নত নগরের অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালীন সময়ের নগরকেন্দ্রগুলো হলো- লক্ষ্মণাবতী (গৌড়), দেবীকোট (কোটিবর্ষ), সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম), চট্টগ্রাম প্রভৃতি। এসব নগর কেন্দ্রগুলোর উত্থান ঘটেছিল প্রাচীনকালেই এবং এসব নগর বিভিন্ন কারণে গড়ে উঠেছিল। কোনো কোনো নগর গড়ে উঠেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে, কোনো কোনো নগর প্রশাসনিক কারণে, আবার কোনো নগর গড়ে উঠেছিল সামরিক প্রয়োজনে। স্বাভাবিকভাবেই এসব নগর নদী, সমুদ্র পাড় বা স্থল পথের বড় বড় রাস্তার পাশে অবস্থিত ছিল। এছাড়া এসব নগর উত্থানের পেছনে রাজনৈতিক শক্তিরও ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে বড় বড় শহর বিলীন হয়ে গেছে। নদীর নতুন স্রোতধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগর। যেমন- প্রাচীন যুগের একটি বিখ্যাত বন্দর নগরী ছিল তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়েন এ বন্দর থেকেই জাহাজে শ্রীলংকায় গিয়েছিলেন।[৭৬] সপ্তম শতকে য়ুয়ান চুয়াং সমতট থেকে তাম্রলিপ্তে এসেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্রে (*বরাহ্‌মিহিরের বৃহৎসংহিতা, দণ্ডীর দশকুমার চরিতে*) তাম্রলিপ্তি নামক সমুদ্র তীরবর্তী বাণিজ্য শহরের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে ও কোনো ঐতিহাসিকসূত্রে এই বন্দরের বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সময়ের প্রবাহে বন্দর ও নগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

বাংলার প্রাচীনতম নগর তাম্রলিপ্তি বাণিজ্য সমৃদ্ধ নগর হিসেবে সুপরিচিত ছিল। *মহাভারত* এবং টলেমি রচিত গ্রন্থে এই বন্দরের কথা উল্লেখ আছে। এ নগরের অবস্থান ছিল গঙ্গার তীরে বঙ্গোপসাগর থেকে দূরে সমুদ্রের একটি খাড়ির ওপর। এই খাড়িতে স্থল ও জলপথ একসঙ্গে মিশেছে। এটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য

[৭৫] মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
[৭৬] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাতন সরস্বতী বা গঙ্গার অন্য কোনো শাখানদীর ওপর এই বন্দরটি অবস্থিত ছিল বলেই এ নদীর খাত শুকিয়ে গেলে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে নগর হিসেবে এর প্রাধান্যও কমতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছাড়াও এটি তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল।[৭৭] সেনামলে এই সমৃদ্ধ বন্দরের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রাচীন বাংলার বৃহত্তম রাজধানী শহর ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগর। বর্তমান মহাস্থানগড়ের পূর্বনাম ছিল পুণ্ড্রনগর। শহরটি ছিল প্রাচীরবেষ্টিত এবং এর চারদিকে ছিল পরিখা, বিল ও করতোয়া নদী। নগর প্রাসাদ, অট্টালিকা, মূর্তি, মন্দির, পরিখা, নগর উপকণ্ঠের বিহার, মন্দির, ঘরবাড়ি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে এর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পুণ্ড্রনগরটির দুটি অংশ; পরিখাচিহ্নিত ও প্রাকারবেষ্টিত এ অংশটি ছিল মূল নগর। দ্বিতীয় অংশ ছিল নগরের উপকণ্ঠ। নগরটি চারপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু। রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক উভয় কারণেই শহরটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। মহাস্থানগড় দুর্গটি নগরের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। এর আশপাশে ছিল নগর সহযোগীদের জন্য গুচ্ছ বসতি (nucleated settlements)। হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রনগর ভ্রমণের সময় এ শহরে ২০টি বৌদ্ধ বিহার ও ১০০টি হিন্দু মন্দির দেখতে পান। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উৎখননে মহাস্থানগড় অঞ্চলে একাধিক বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দির উন্মোচিত হয়েছে।[৭৮] শহরটি ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ নগরকে ঘিরে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল বানগড় শহর। মুসলিম বিজয়ের পর এখানে দেবকোট নামে নতুন নগরের গোড়াপত্তন হয়। পূর্বভারতের প্রধান নগরীগুলোর মধ্যে দেবকোট অন্যতম। নগরটি চারদিকে প্রাকারবেষ্টিত ছিল এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ছিল পরিখা। এছাড়া এর পশ্চিমে ছিল পুনর্ভবা নদী। এর পূর্বদিকে প্রধান নগরদ্বার এবং নগর থেকে নগরের উপকণ্ঠে যাওয়ার জন্য সেতু তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমান এ নগরটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। নগরের কেন্দ্রে সুউচ্চ স্তূপ রয়েছে যা বর্তমানে রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও নগরের ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য বড় ও ক্ষুদ্র আকারের

[৭৭] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫
[৭৮] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

স্তূপ রয়েছে। পাল আমলের তাম্রশাসনে এ নগরীর বর্ণনা ছিল। এ নগরীকে 'পঞ্চনগরী' বলা হতো। বর্তমান দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট থানা (বেলওয়া), হরিনাথপুর, নবাবগঞ্জ থানা (চরকাই), হাকিমপুর থানা (দেবীপুর) ও ফুলবাড়ি নিয়ে দেবকোট নগর গঠিত ছিল।[৭৯] কৌশলগত কারণেই নগরটির গুরুত্ব বেশি ছিল। সুলতানী শাসনের পূর্বে এ নগরটির বিকাশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ নগরের বিকাশ ঘটে।

বর্তমান কুমিল্লা শহর থেকে নয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল ময়নামতি নগরের অবস্থান। এ নগরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাঁচ শতক থেকে তেরো শতকের মধ্যে। প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানী দেবপর্বত ময়নামতিতে অবস্থিত ছিল। দেবপর্বতের উপকণ্ঠে গড়ে উঠা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষই বর্তমান সময়ে শালবন বিহার ও আনন্দ বিহার নামে পরিচিত।[৮০] এ নগরটি ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেন শাসনামলে নগরটি তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে।

প্রাক-মুসলিম বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল রামাবতী। এ নগরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল (১০৭২-১১২৬ খ্রিস্টাব্দ)। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতে* এ নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এ নগরীর পাশেই লখনৌতি নগরের পত্তন হয়। বর্তমান ভারতের রাজমহল থেকে ২৫ মাইল দূরে গঙ্গা-মহানন্দা নদীর সংগমস্থলে ১৪-১৫ মাইল জুড়ে লখনৌতি নগরী বিস্তৃত ছিল। সেন শাসনের শেষ দিকে লক্ষ্মণ সেন এ নগরীটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৮১] লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারেই এ নগরীটির নাম লখনৌতি রাখা হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

সেনামলে ঢাকার অদূরে গড়ে উঠা একমাত্র নগরী ছিল বিক্রমপুর। বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলায় এ শহরটি বিস্তৃত ছিল। দশ থেকে বারো শতক পর্যন্ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। তৎকালীন সময়ের তাম্রলিপিতে 'জয় স্কন্ধবার' শব্দ থেকে এর সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।[৮২] এ শহরে ঢিবি ছড়িয়ে

---

[৭৯] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৩৯৬

[৮০] Dilip K. Chakrobarti, *Ancient Bangladesh,* A study of the Archaeological Sources, Oxford University Press, New Delhi, 1992, p. 124; সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০; আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৮১] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

[৮২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১০

ছিটিয়ে ছিল এবং প্রতিটি ঢিবি ছিল পরিখাবেষ্টিত। সবচেয়ে বড় ঢিবিটি উত্তর কাজী কসবা এলাকায় অবস্থিত ছিল। এটি বর্তমানে চাষের জমি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও স্থানীয়দের কাছে এটি 'দেওল' নামে পরিচিত। উত্তর কাজী কসবা দেউলের উত্তর-পূর্ব কোণের একটি গর্ত থেকে চলতি শতকের প্রথমার্ধে দুটি কাঠের থাম আবিষ্কৃত হয়েছে। দুটি থামেই নারীমূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। এছাড়া সোনারঙ দেউল থেকেও বড় দীঘি ছিল। যেমন- রামপাল দীঘি, ভগবানরায়ের দীঘি, সাগরদীঘি, মামাসাব দীঘি প্রভৃতি। এসব দীঘি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছিল। এ ধরনের দীঘি প্রাক-মুসলিম শাসনামলের নিদর্শন বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া বিক্রমপুর নগরের মূর্তিগুলো দেখে মনে হয় নয় থেকে বারো শতকের ভাস্কর্যের প্রভাব রয়েছে এ মূর্তিগুলোতে। মুসলিমদের আগমনের পর তথা ইবনে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর বিক্রমপুর শহরটি প্রশাসনিক সদর দপ্তর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামরিক প্রয়োজনে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বিক্রমপুর শহরটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বড় কেন্দ্র ছিল। মূলত আজকের মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নামে প্রাচীন বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক শহরের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে নতুন রূপ নিয়ে টিকে আছে।

সেন শাসনামলের শেষ দিকে রাজা লক্ষ্মণ সেন লক্ষ্মণাবতী নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারে এ নগরটির নাম লখনৌতি রাখা হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পরবর্তীকালে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর গতিধারা পরিবর্তনের ফলে এই নগরটি পরিত্যক্ত হয়। ইবনে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর নগরটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মুসলিম শাসনামলে এটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং পরে শহরটি আবার টাকশাল শহরের মর্যাদা পায়।[৮৩] মিনহাজ-ই-সিরাজ উল্লেখ করেছেন যে, শহরটি ছিল জনমানবহীন গ্রামীণ এলাকা। তাঁর মতে, লখনৌতি শহর হিসেবে পরিচিত স্থানটিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি তাঁর সরকারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। লখনৌতির আশপাশের এলাকা জলাশয় ও কাদায় নরম ভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং বাঁধ নির্মাণ করা ব্যতীত লোকজন কোনো কাজ করতে পারত না।[৮৪] মিনহাজের এই মন্তব্য থেকে শহরটির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

---

[৮৩] Khan Sahib Abid Ali Khan, *Memories of Gour and Pandua,* edited by H.E.Stapleton, Calcutta, 1931, p. 15

[৮৪] Minhaj–I-Siraj, *op.cit.,* pp. 427, 437

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ত্রিবেণীর কিছু দূরে স্বরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল সপ্তগ্রাম। সাতটি গ্রাম নিয়ে শহরটি প্রতিষ্ঠিত বলেই শহরটির নাম সপ্তগ্রাম। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তগ্রামে পাল ও সেন আমলের অনেকগুলো মূর্তি পাওয়া গেছে। এটি ছিল মূলত প্রাচীন বাংলার একটি বিখ্যাত বন্দর ও নগর।[৮৫] সেনামলে এই নগরকেন্দ্র পতিত ক্ষয়প্রাপ্ত কিংবা পরিত্যক্ত হয়েছে। মুসলিমদের আগমনের পর শহরটির পুনর্জাগরণ ঘটে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় উল্লেখ করেন, সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে প্রধানত বিভিন্ন শ্রেণির বিদেশি বণিকগণ বহির্বাণিজ্য পরিচালনা করত।[৮৬] সুলতানী শাসন আমলে বন্দরটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রাক-মুসলিম বাংলার নগরগুলো গড়ে উঠার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠার প্রসঙ্গে বলেন যে,

> এরকম নগর গড়ে উঠার পেছনে বিবিধ কারণ ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠার পেছনে তিনটি মূখ্য কারণ ছিল বলে অনুসন্ধানে পাওয়া যায়। প্রথমত, এটি ছিল একটি তীর্থস্থান। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল একটি রাজকীয় সভাস্থল বা রাজ্যের রাজধানী। এছাড়াও এটি ছিল পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য পথের একটি সুবিধাজনক স্থান। তিনি আরো বলেন যে, কিছু নগর গড়ে উঠেছিল মূলত, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু সমসাময়িক তথ্য থেকে এটা জানা যায় যে, রাজনৈতিক কেন্দ্র ছাড়াও সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল ছিল।[৮৭]

মূলত বাংলার প্রাচীন নগরগুলোর অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসব নগরের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে নগরে স্থলপথ এবং জলপথ উভয় পথের মাধ্যমে যাতায়াত করা যেতো। পাল ও সেন শাসনামলে কেন্দ্রীয় শাসনের অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। পাল রাজাদের মতো প্রভাবশালী রাজবংশের কোনো রাজাই রাজধানী নির্মাণ করেননি। এমনকি ধর্মপালের দৃষ্টান্ত এখানে প্রাসঙ্গিক। জয়স্কন্ধাবার বা বিজিত স্থান থেকেই তারা রাজকার্য বা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

এছাড়া বারো শতকের পূর্বে এসব নগরের পতন ঘটেছিল এবং রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে আর ব্যবহৃত হয়নি। সেনামলে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবনতির ফলে

---

[৮৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

[৮৬] অনিরুদ্ধ রায়, *সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪

[৮৭] R.C Majumder, *History of Bengal*, vol. 1, The University of Dhaka, Dacca, 1976, p. 644

বন্দর নগরীর সমৃদ্ধি হ্রাস পায়। এছাড়া নদীবহুল বাংলায় বন্যার ফলে পলি জমে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে নগরকেন্দ্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বাণিজ্যিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ফলে বাংলা ভূমিনির্ভর অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক অবক্ষয় ও পতনের ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণি কাজের অভাবে ভূমির ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নগরের অবক্ষয়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণবৈষম্য। তৎকালীন সময়ে নিম্নশ্রেণির লোকদের নগরে বসবাস করা নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ কোনো নাগরিক বা কারিগর শ্রেণি নগরে বাস করার অনুমতি না পাওয়ায় তাদেরকে গ্রামে বসবাস করতে হতো। যা নগরায়ণকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

সেনামলে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রার প্রচলন না থাকা, নিরাপত্তার অভাব, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন না হওয়ায় আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হয়। নগর ও বন্দরগুলো ঝিমিয়ে পড়ায় অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে ফলে বাংলায় নগরায়ণ বিকশিত হয়নি।

২.৫. সামাজিক বর্ণবৈষম্য

সেনামলে বাংলার সমাজে বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি বজায় ছিল। সমাজের শীর্ষ অবস্থানে ছিল ব্রাহ্মণরা।[৮৮] নীচুশ্রেণির লোকেরা তাদের দেবতাতুল্য মনে করত। ব্রাহ্মণের নিচে ছিল ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধাশ্রেণি। তৃতীয় স্তরে ছিল বৈশ্য। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল শূদ্র, যারা সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত ছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমিদানের ফলে সমাজে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ব্রাহ্মণ্য শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ সময় সমাজে এক বর্ণের আধিপত্য, এক বর্ণের প্রতিপত্তি এবং এক ধর্ম প্রচলিত হয়ে যায়। মূলত এটাই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর পৌরাণিক সমাজ আদর্শ। সুতরাং এ যুগে রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করে। এ রক্ষণশীলতার কারণে সাধারণ জনগণ শিক্ষা-দীক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। নিম্নশ্রেণির জনগণ দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়ে এবং তারা মুক্তির অপেক্ষায় থাকে।

[৮৮] আব্দুল মমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা*, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯, পৃ. ৮৩৯; বল্লাল সেন, *দানসাগর*, ভবতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা (এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল), ১৯৫৩, পৃ. ২৪০

সেন শাসনামলে বাংলার ব্রাহ্মণরা ছিল ধর্ম ও সমাজের নেতা। তারা বৌদ্ধদের প্রতি উদার ছিল না। এ সময় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব হ্রাস পায়।[৮৯] রক্ষণশীল সেনগণ নিজেদের প্রভাব বিস্তারে প্রত্যয়ী হলেও পালযুগের নিজস্ব ঐতিহ্যে গড়ে উঠা সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদের দূরে রাখে। পাশাপাশি তারা পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। কট্টর ব্রাহ্মণ হিন্দুদের দ্বারাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ফলে সংখ্যার দিক দিয়ে ছোট অংশ হলেও ব্রাহ্মণদের প্রতাপ চূড়ান্তে পর্যায়ে পৌঁছে এবং সমাজে এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে।[৯০] শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সাধারণ জনগোষ্ঠীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক।

সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেন শাসনামলে সমাজ দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল। যথা: **১.** উচ্চবিত্ত এবং **২.** নিম্নবিত্ত। **ক. উচ্চবিত্ত:** রাজা ছিলেন উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যমণি ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজার পরে ছিলেন মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, রাজন্যবর্গ, রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ। এছাড়া প্রভাবশালী ভূম্যাধিকারী, বিত্তশালী বণিক অভিজাতশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৯১] এ সময়ে জ্ঞানচর্চাকারী ও ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজানুকূল্য লাভ করতেন। যাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রাহ্মণরা রাজার জন্য ধর্মীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন। রাজারা বিশ্বাস করতেন যে, এসব যজ্ঞের অর্জিত পুণ্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজার নিজের ওপর বর্তাবে। এ বিশ্বাসে একদিকে রাজা ব্রাহ্মণদের সমীহ করে চলতেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা বংশ পরিচয় ও প্রশংসাসূচক বাক্য রচনা করে দিতেন। উচ্চবিত্ত শ্রেণির লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করত না।[৯২] তারা শুধু উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ ভোগ করত। কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে ফসল উৎপন্ন করত আর উচ্চশ্রেণি বিনা শ্রমে তা ভোগ করত। ব্রাহ্মণরা তাদের জমি চাষের জন্য নিম্নবিত্ত বা কৃষকদেরকে নিয়োগ করত। চাষাবাদের দায়িত্ব ছিল প্রধানত শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত চাষিদের ওপর। ফলে নিম্নবিত্তরা উচ্চবিত্তদের অধীন থাকবে এটাই ছিল

---

[৮৯] R.C Majumder, *History of Bengal*, vol. 1, pp. 565-567

[৯০] রজনীকান্ত চক্রবর্তী, *গৌড়ের ইতিহাস*, মালদহ, ১৯০৯, পৃ. ২১১; মুসলিম শাসনের পূর্বে ব্রাহ্মণরা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন। তাদের পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা হিন্দু সমাজের আদর্শ ছিল। এরূপ জীবনযাত্রার উদাহরণ হলো ভবদেবভট্ট ও দর্ভপাণি বংশানুক্রমিক রাজমন্ত্রী ছিলেন। সাধারণ মানুষ এসব সুযোগ সুবিধার কথা কখনো ভাবতেও পারত না। R.C Majumder, *op.cit.*, pp. 583-584

[৯১] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০; ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[৯২] ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০; এস এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৭১

স্বাভাবিক নিয়ম। এভাবে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। উচ্চবিত্তদের একটি বিশেষ শক্তি ছিল ভূমির মালিকানা। মূলত ভূমি ও বর্ণই তাদেরকে সমাজের অন্যান্যদের চেয়ে পৃথক করে রেখেছিল এবং নেতৃত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিল। **খ. নিম্নবিত্তঃ** নিম্নবিত্তরা শুধু বর্ণগত দিক দিয়েই নয় অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ। যেমন- চণ্ডাল, শবর, ডোম, তাঁতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ সবসময় দাস সেবক হিসেবে পরিগণিত হতো। তারা কোনো অবস্থাতেই পেশা পরিবর্তন করতে পারত না। নীহাররঞ্জন রায় তাদেরকে আধুনিক কালের দিনমুজুর ও ভূমিহীন প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৩] এ সময়ে কৃষিভিত্তিক ও গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো সামন্ত প্রভুদের দ্বারা। রাজাই ছিলেন সমস্ত ভূমির মালিক, প্রজার কেবল রাজার জমি চাষের অধিকার ছিল। সামন্তদের দায়িত্ব ছিল কৃষকের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো কর আদায় করা।[৯৪] সব মিলিয়ে এ সময়ে কৃষকের জীবন ছিল দুর্বিষহ।

সেন আমলে বাংলার সামাজিক বৈষম্যের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো কৌলিন্য প্রথা। এ প্রথার সাথে মানুষের পেশা, মর্যাদা ও অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কৌলিন্য ব্রাহ্মণগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতেন। তাছাড়া তাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ থাকায় তারা নিজেরাই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। নিম্নে সংক্ষেপে কৌলিন্য প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বাংলায় রচিত অসংখ্য কুলজি শাস্ত্রে (kulgi) এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কুলজি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য কান্যকুব্জ হতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। কারণ বাংলার ব্রাহ্মণরা অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পাঁচ ব্রাহ্মণ পরিবারসহ বাংলায় বসবাস করেন এবং আদিশূর তাদের বসবাসের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। কালক্রমে এই পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে তারা কেউ কেউ রাঢ়, আবার কেউ কেউ বরেন্দ্রভূমিতে বাস করতে থাকে। পরে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে তারা বাসস্থানের নামানুসারে রাঢ়ী এবং বরেন্দ্রী নামে দু'টি

[৯৩] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮

[৯৪] তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে সেন শাসনামলে বাংলার জনসাধারণ বিভিন্ন রকম কর প্রদান করত। যেমন- ক্ষেত্রকর, ভাগ, রাজভোগ কর ইত্যাদি। সাধারণত উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ কর আদায় করা হতো। সুনীতি কুমার কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪, পৃ. ৯৪

ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল উনষাট। ক্ষিতিশূর তাদের বসবাসের জন্য ঊনষাটটি গ্রাম দান করেন। এছাড়া বরেন্দ্রী ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল একশত।[৯৫]

এছাড়া বিভিন্ন সময় উত্তর ভারত হতে ব্রাহ্মণগণ এসে বসতি স্থাপন করেছিল। মধ্যদেশ হতে আগত ব্রাহ্মণরা বাংলার ব্রাহ্মণদের হেয় জ্ঞান করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য কান্যকুব্জের দলে মিশে যাওয়ায় আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনার উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছিল। এ আদিশূরের ব্রাহ্মণরাই পরবর্তীকালে রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কৌলিন্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। কুলজি শাস্ত্রে/কুলজি গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কুলজি গ্রন্থ মতে, ব্যক্তিগত গুণ দেখে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন কৌলিন্য মর্যাদা দিয়েছিল।[৯৬] উল্লেখ্য যে, যদি ব্যক্তিগত গুণ দেখে কৌলিন্য মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহলে অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ ঈশান, পশুপতি, ধনঞ্জয় প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কুলীন ছিল না। এছাড়া লক্ষ্মণ সেনের সভাস্থিত জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্ধন প্রমুখ কবিগণ কেউই কুলীনের মর্যাদা পায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেন আমলের সামাজিক বৈষম্য কতটা অধিক ছিল। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, কুলজি শাস্ত্রসমূহে দেখা যায় যে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে, তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন এবং পৌত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন তাদের তাম্রশাসনসমূহে নব-প্রচলিত আভিজাত্যবিধির কোনো উল্লেখ করেননি। এছাড়া তাঁরা শাসন গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নাম উল্লেখ করলেও তাদের নতুন পদমর্যাদা উল্লেখ করেননি। এ কারণে কৌলিন্য প্রথা বল্লাল সেন কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।[৯৭] এজন্য অনেকে মনে করেন বল্লাল সেন আদৌ কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক ছিলেন না বা এ ধরনের সমাজ বিন্যাসমূলক কোনো সংস্কার তিনি করেননি। আব্দুল মমিন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এ প্রথা প্রবর্তনের কথা সে যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় উল্লেখ হওয়া খুবই সঙ্গত ছিল কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো প্রকার ইঙ্গিতও সেনযুগের সাহিত্য বা লিপিমালায় নেই। তাছাড়া সেনযুগের বিখ্যাত শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করলেও কৌলিন্য প্রথা সম্পর্কে কোনো প্রকার আকার ইঙ্গিত পর্যন্ত করেননি। সেন রাজগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান সম্পর্কিত আদেশেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।[৯৮] এ প্রসঙ্গে

---

[৯৫] এস এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৪

[৯৬] *ঐ*, পৃ. ৮৪

[৯৭] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ১ম দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৫৬

[৯৮] সেন শাসন আমলের ৯টি (ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, আনুলিয়া তাম্রশাসন, তর্পনদীঘি তাম্রশাসন, মাধাইনগর তাম্রশাসন, ভাওয়াল তাম্রশাসন, সুন্দরবন তাম্রশাসন, সাহিত্য পরিষদ তাম্রমাসন, মদনপুর তাম্রশাসন ও ইদিলপুর তাম্রশাসন) ভূমিদানের দলিল বা তাম্রশাসনের মাধ্যমে গ্রামের ভূমিদানের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন আব্দুল মমিন চৌধুরী. Abdul Momin Chowdhury, *op.cit.*, p.236

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, যে সময়ে আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের এবং বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য মর্যাদার প্রতিষ্ঠার আখ্যান পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠে ও কুলাচার্যগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। বাংলায় তখন এ উভয় ব্যাপারই জনপ্রবাদে পরিণত হয় এবং এতে ইতিহাসের অপমৃত্যু ঘটে। বংশপরম্পরাগত পারিবারিক আখ্যান, প্রচলিত জনশ্রুতি, অসম্পূর্ণ কুলজি গ্রন্থ ও তৎকালে প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস নামে সাধারণভাবে যা প্রচলিত ছিল সেগুলো যত্নসহকারে পাঠ করে সেসবের সাহায্যেই ব্রাহ্মণগণ আদিশূর ও বল্লাল সেনের কাহিনী গড়ে তোলেন।[৯৯] সুতরাং কৌলিন্য প্রথা বর্ণিত কুলশাস্ত্রসমূহের ঐতিহাসিক প্রমাণ যেহেতু নেই, সেহেতু বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের মতবাদ বিষয়টি ঐতিহাসিক নিরিখে নতুন করে বিবেচনার দাবিদার।

আলোচ্য সময়ে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ সমাজ গঠনের মূল নিয়ামক শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল নিয়ামক শিক্ষা। মুসলিম আগমনের পূর্বে টোল বা মন্দিরকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান চর্চায় ব্রাহ্মণদের একক আধিপত্য ছিল। নীচুশ্রেণির লোকেরা শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং যেকোনো প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সেন আমলে নিম্নশ্রেণির কোনো সদস্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে বিকাশমান মুসলিম সমাজের পাশাপাশি হিন্দু সমাজের যে অস্তিত্ব ছিল সেখানেও এ রক্ষণশীলতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাজ আনুকূল্যে ব্রাহ্মণরা অভিজাতশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সাধারণ শ্রেণির হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের প্রভাবের কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের (সাধারণ শ্রেণির হিন্দুদের) ধর্মাচারণের অধিকার ছিল না, সমাজেও তারা কোনো রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ব্রাহ্মণরা নানারকম শোষণ ও নির্যাতনের মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণির মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এ নির্মমতা ও নির্যাতনের মাত্রা এত অধিক ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করলে যে কারো কড়ি কেড়ে নিতো, এমনকি তাদের হত্যা করলেও ব্রাহ্মণদের কোনো দণ্ড ভোগ করতে হতো না। এর ফলে সেন রাজাদর্শ ও শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি সাধারণ জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। যেমন- লক্ষ্মণ সেনের সময় তার স্বৈরাচারী চিত্র ফুটে উঠে *শেখ*

[৯৯] এস এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

শুভদয়ার কাহিনিতে।[১০০] উক্ত কাহিনিতে অত্যাচারের যে মাত্রা বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজসভার অমার্ত্যরাও শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য যে লক্ষ্মণ সেন সব সময় ব্রাহ্মণদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। ফলে সব সুবিধা ব্রাহ্মণরাই ভোগ করত। সেন শাসনামলে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বল্লাল সেন সব সময় যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কাজে রত ছিলেন। তিনি একাধিক স্মৃতি শাস্ত্রের প্রণেতাও ছিলেন। তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলো হলো, দানসাগর, অদ্ভুদসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর ও আচারসাগর। এ সময়কালে রচিত অসংখ্য গ্রন্থে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি লক্ষ করা যায়। যেমন- পূজাপদ্ধতি, অন্যায়ের শাস্তিবিধান, তিথি নক্ষত্রের কাল বিচার, ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের নিয়মকানুন, বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। সমাজজীবনে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বজায় ছিল। বিখ্যাত কয়েকটি বংশের মধ্যে হলায়ুধের বংশ, অনিরুদ্ধভট্টের বংশ ও ভট্টভবদেবের বংশ অন্যতম। এ সময়ে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য পরিবারের সন্তানরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতো না। এমনকি তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের সুযোগ পেতো না। মুসলিম শাসনে সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলা খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এদেশকে অন্যান্য অঞ্চল থেকেও পৃথক করে রেখেছে। এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণেই বহিঃশত্রু বাংলায় আক্রমণ করেও আধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি। স্থলপথ ও জলপথে বাংলার সাথে সহজেই অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেনামলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় এসব পথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এদেশে অসংখ্য নদ-নদী চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। অধিকাংশ অঞ্চল নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা গঠিত হওয়ায় অনেক বেশি ফসল উৎপন্ন হয়। মূলত কৃষিকাজ ও যাতায়াতব্যবস্থা এ নদ-নদীর ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নদীর ভাঙা-গড়ার সাথে স্থলভাগের পরিসীমা নির্ভর করত। এর ফলে বাংলার একটি পৃথক আঞ্চলিক সত্তা গড়ে উঠেছিল। সময়ের পরিক্রমায় প্রতিটি নদীর গতিপথ

[১০০] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৮-৪২৩

পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ধ্বংস হয়েছে অনেক নগর, বন্দর ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন। আবার গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর, নগর ও বন্দর। সমগ্র বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল- যেমন বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান না থাকায় তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। সেনামলে বাংলায় কড়িই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট বণিক, অন্যান্য শ্রেণির লোকজন বেকার ও কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধঃপতনে বন্দরগুলো ঝিমিয়ে পড়লে নগরায়ণের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া শাসকগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ এবং বণিকদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়ায় অনেক বণিক দেশ ত্যাগ করে। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব বেড়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সর্বপ্রকার সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হয়। সমাজে কঠোর জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান থাকায় শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ীদের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে। রাজা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ভূমি দান করায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান ছিল। অন্যদিকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কঠোরতা প্রবল আকার ধারণ করে। নিম্নশ্রেণির মানুষ তাদের পেশা পরিবর্তন করতে পারত না, তাই তারা পর্যাপ্ত অর্থ আয় করতে সক্ষম ছিল না। এ যুগে আধিপত্যকামী ব্রাহ্মণদের প্রধান চেষ্টাই ছিল সমাজের সর্বস্তরে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ফলে একদিকে অর্থনৈতিক সুবিধাভোগ, অন্যদিকে উচ্চকুলে জন্ম হওয়ায় একদল লোকের সমাজে বেশি প্রাধান্য ছিল। এ দু'টি কারণে সমাজে মানুষে মানুষে এক বিরাট শ্রেণিবৈষম্য দেখা দেয়। মূলত সেন রাজত্বকালে উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দাপটে সাধারণ বাঙালির জীবনে নানা ধরনের নৈরাশ্য দেখা দেয়। ঐ সময়ে কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলো পর্যায়ক্রমে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। রাজনৈতিক প্রাধান্য হারিয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু জনগোষ্ঠী যখন বিপর্যস্ত, ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি মুসলিম সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (৭১২-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে। তাঁর এই বিজয় ছিল মুসলমানদের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। সুলতান মাহমুদের সতেরো বার ভারত অভিযান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব অভিযান থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ অর্জিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তেরো শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয় ছিল মুসলমানদের অর্থনৈতিক কাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত করার তৃতীয় পদক্ষেপ। তিনি নদীয়া ও লখনৌতি বিজয়ের পর সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে স্বনামে মুদ্রা জারি করেন। যা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছিল। ইতঃপূর্বে বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত থাকায় রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল ছিল। ইবনে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান ঘটে। যেমন- ইকতা প্রথার প্রচলন, মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নগর প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন, নগরায়ণের বিকাশ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি শুরু হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাক-মুসলিম যুগে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, নিম্নশ্রেণির মানুষ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও নিজের যোগ্যতায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। অভিজাতশ্রেণি ও আঞ্চলিক অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় কতিপয় সমন্বিত রীতিনীতির উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমাংশে বাংলায় মুসলিমদের আগমন ও স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়াংশে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার নতুন আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। নদীয়া বিজয়ের পূর্বে তিনি ওদন্তপুর বিহার জয় করেন[১] এবং বিভিন্ন স্থানে থানা স্থাপন করে শক্তি বৃদ্ধি হলে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী নদীয়া জয় করেন।[২] নদীয়ায় ৩ দিন অবস্থান করে অনেক ধন-সম্পদ, হাতি-ঘোড়া হস্তগত করে পরবর্তীতে গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) অধিকার করেন। গৌড় বিজয়ের পর তিনি কার্যত এক স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে নিরাপদ স্থান হিসেবে দেবকোটে (দিনাজপুর জেলায়) তাঁর কার্যালয় স্থাপন করেন।[৩] এছাড়া বিজিত অঞ্চলসমূহে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রার প্রচলন করেন।[৪] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেনামলে বাংলায় পণ্য বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। ইবনে বখতিয়ার খলজির মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং পরবর্তী খলজি শাসকগণের সময়ে মুদ্রার ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পায়। তেরো শতকের শেষ দিকে ত্রিবেনী, সাতগাঁও মুসলিম সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫] মূলত ১২৯০ থেকে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতি সালতানাতের বিস্তার ঘটে। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনামলে শ্রীহট্ট বিজিত হয়।[৬] এভাবেই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চল লখনৌতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলত ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সালতানাত অর্ধ-স্বাধীন ছিল।

ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই সময় থেকেই বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দুশো বছর বাংলা স্বাধীন সালতানাত হিসেবে টিকে ছিল। সুলতান ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের শাসনামলে (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ) চট্টগ্রাম মুসলমানদের অধিকারে আসে। মূলত, পনেরো শতকের মধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য হিন্দু রাজ্যগুলোও লখনৌতি তথা মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সোনারগাঁও বিজয়ের ফলে ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের শাসনের অবসান ঘটে।[৭] ইলিয়াস শাহ

---

১ Minhaj-ud-din Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, (eng.tr.) Major H. G. Raverty, vol. 1, p. 550, F.note-5

২ Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin (A History of Bengal)* Translated by Abdus Salam, Idarah-I-Adabiyat-I Delhi, Delhi, 2009, pp. 62-65

৩ অতুলচন্দ্র রায়, মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক গতিধারা, *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি* (প্রবন্ধ সংকলন), অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ০১

৪ Minhaj-ud-din Siraj, *op.cit.*, pp. 556-557

৫ সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউসের শাসনামলে (১২৯১-১৩০১ খ্রিস্টাব্দ) উৎকীর্ণ ত্রিবেনী শিলালিপিতে দেখা যায় কাজী নাসিরউদ্দিন কর্তৃক জাফর খান মসজিদ নির্মিত হয়। Shamasuddin Ahmad, *Inscription of Bengal*, vol. 4, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960, pp. 19-20

৬ *Ibid*, p. 25

৭ Ibn Battuta, *Rehla of Ibn Battuta*, eng.tra. Aga Mahdi Husain, Baroda, 1953 , p. 237

সমগ্র বাংলার সুলতান হন। তার পূর্বে বাংলার কোনো শাসককেই সমগ্র বাংলার সুলতান বলা হতো না। তাদেরকে বলা হতো লখনৌতির না হয় সোনারগাঁও-এর সুলতান। প্রথমবারের মতো ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান হিসেবে পরিচিতি পান। এ জন্যই শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বা 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৮] এভাবে লখনৌতি রাজ্য 'বাংলা সালতানাতে' পরিণত হয়। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নেপালে একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন।[৯] ১৩৫৮-১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে ফিরুজ শাহ তুঘলকের অভিযানের পরপরই সিকান্দার শাহ পূর্ব বিহারের কিছু অঞ্চল দখল করে নেন। চৌদ্দ শতক থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত কিনওয়ার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং ত্রিহুত রাজনীতিতে দিল্লি ও জৈনপুরের বার বার হস্তক্ষেপের উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত বাংলার শাসকগোষ্ঠীর ভয়েই কিনওয়ার শাসকরা বার বার দিল্লি ও জৈনপুরের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করে তাদের আশ্রয় প্রার্থী হতেন।[১০] এরপর সিকান্দার শাহ ও তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের (১৩৯২-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকাল ইলিয়াসশাহী বংশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পরবর্তীতে ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা কংস শক্তিশালী হলে উজির সৈয়দ হোসেনের নেতৃত্বে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাবশি রাজত্বের অবসান হয়। সৈয়দ হোসেন 'আলাউদ্দিন হোসেন শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন এবং এ সময়ে বাংলা সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। এই বংশের সর্বশেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের আফগান শাসনকর্তা শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত হন এবং কিছুদিনের মধ্যে হুমায়ুন বাংলা অধিকার করেন। চৌসার যুদ্ধের মাধ্যমে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ (১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) পুনরায় বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেন।[১১] এ সময় বাংলা দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা মুহাম্মদ খান সুর (১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাহাদুর শাহ সুর (১৫৫৫-১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ) ও জালাল শাহ সুর (১৫৬০-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং এরপর গিয়াসউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বাংলা শাসন করেন। তাজ খান কাররানী ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ভাই সুলাইমান কাররানী (১৫৬৫-১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর রাজ্য সীমা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং উড়িষ্যার হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে উড়িষ্যা

[৮] Shams-i-Siraj Afif, *Tarikh-i-Firuz Shahi*, Eliot and Dowson (ed.) History of India. vol, 111, Allahabad, p. 296

[৯] Jadunath Sarkar (ed.), *The History of Bengal*, Muslim Period, 1200-1757 A.D, vol. 2, 3rd.ed, University of Dhaka, 1976, pp.151-152

[১০] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

[১১] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, আনুমানিক ১২০০-১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ.১৩৮-১৩৯

জয় করেন। সুলাইমানের পুত্র বায়েজিদ (১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ) ও দাউদ কররানী (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) পিতার ন্যায় বিচক্ষণ না থাকায় মোগল বাহিনীর নিকট দাউদ কররানী পরাজিত হন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাউদ কররানী পলায়ন করেন[১২] এবং মুনিম খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। মোগলদের বিজয় অর্জন করা পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে ছিল।

২. বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহ

প্রতিটি সমাজেই সামাজিক নিয়ামকসমূহ উৎপাদনে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে এবং উৎপাদনের উপকরণের সাথে এদের সম্পর্ক ভিন্ন মহলেও বিযুক্ত নয়। বাংলায় সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় এর প্রভাব আর্থ-সামাজিক জীবনকেও স্পর্শ করে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফল হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে যে সকল আর্থ-সামাজিক নিয়ামকগুলো সমাজবিকাশে সহায়তা করেছিল তা হলো- কেন্দ্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও ইকতা প্রথার প্রচলন, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন, মুদ্রার প্রচলন ও

---

[১২] দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, মডেল পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১০ বাংলা, পৃ. ৯৪-৯৫

টাকশাল শহর প্রতিষ্ঠা, নগরায়ণের বিকাশ প্রভৃতি। আলোচ্য অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ামকগুলোর কতিপয় নির্বাচিত বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে।

২.১. আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা

আমলাতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যাতে স্থায়ী সরকারি কর্মকর্তারা দায়িত্ব বিভাজনের মাধ্যমে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এটি মূলত ফরাসি শব্দ। এর আভিধানিক সংজ্ঞার্থ হলো- আমলা হচ্ছেন সরকারের অংশ যারা অনির্বাচিত। তাদেরকে নীতিনির্ধারক হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যায়। যেখানে ছোট, বড় সব ধরনের কর্মচারী জড়িত। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে* বলা হয়েছে আমলাতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায়- ছোট, বড় সব ধরনের কর্মচারী জড়িত থাকে। তৎকালীন প্রশাসন ব্যবস্থায় এরূপ ছোট, বড় সব ধরনের কর্মচারী নিয়ে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিকভাবে এ প্রদেশে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়। ইবনে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয়ের পর লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পরবর্তী সুযোগ্য উত্তরাধিকারী খলজি শাসকগণও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। মূলত বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ প্রচলিত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে নতুনভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

দিল্লি সুলতানদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই বাংলার সুলতানগণ মন্ত্রী বা উজির নিয়োগ করেন এবং তাদের ওপর প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সুলতানগণ শাসনকার্য পরিচালনায় উজিরদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে আফিফ উল্লেখ করেন যে, সিকান্দার শাহের মন্ত্রীগণ সুলতানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেনো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে শান্তি স্থাপন করেন। মন্ত্রীগণের পরামর্শে দুই সুলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং উপহার উপঢৌকন বিনিময় হয়েছিল।[১৩] উজির রাজস্ব বিভাগ বা রাজকোষ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। ইলিয়াস শাহী শাসনের শেষ

---

[১৩] Shams-i-Siraj Afif, *op.cit.*, p.158

সময়ে 'মালিক আনদিল' হাবশি উজির ছিলেন এবং সৈয়দ হোসেন (হোসেন শাহ) হাবশি সুলতানদের উজির ছিলেন। এছাড়া রাজা কংস ও গোপিনাথ বসু যথাক্রমে প্রথম যুগের ইলিয়াস শাহী সুলতানদের ও হোসেন শাহের উজির ছিলেন। দাউদ কররানীর উজির ছিলেন শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য।[১৪] *দবীর-ই-খাস* সুলতানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি সুলতানের ফরমান, আইন, আদেশ প্রভৃতি খসড়া তৈরি করতেন এবং রাজকার্যের পত্রালাপের সকল দায়িত্ব পালন করতেন। *দবীর-ই-খাস* পদে এমন লোককে নিয়োগ দেওয়া হতো যিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। ঐতিহাসিক বারানী উল্লেখ করেছেন যে পাণ্ডিত্য ও রচনার ক্ষেত্রে দবীর শামসউদ্দিনের সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন বলবনের সচিব এবং তাঁর পুত্র বাংলার মুকতা নাসিরউদ্দিন মাহমুদের *দবীর-ই-খাস*।[১৫] সুলতান বলবন তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন বুগরা খানকে যে উপদেশ দেন দবীর তা লিপিবদ্ধ করেন। লখনৌতির বিদ্রোহী শাসক তুগরিলের পরাজয়ের বার্তা *দবীর-ই-খাস* কেওয়ামউদ্দিন লিখে দিল্লির সুলতানের দরবারে প্রেরণ করেন।[১৬] তৎকালীন সময়ের কয়েকজন সহকারী *দবীর দবীর-ই-খাসকে* বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতেন। দবীরের দরবারে কয়েকজর *কাতিব* ও কার ফরমান ছিলেন। দবীর লিখতেন কাতিব নকল করতেন এবং কার ফরমারগণ সম্ভবত ফরমান প্রেরণ করার দায়িত্ব পালন করতেন।

তুর্কি সুলতানগণ ইকতা ব্যবস্থা প্রচলনের মধ্য দিয়ে সমকালীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসকের প্রত্যক্ষ অধীনে ইকতা প্রাপ্ত মুকতা নিয়োগ করে দিল্লির সুলতানগণ এক সুসংহত সুদৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত (centralized) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতবর্ষের অসংহত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলোকে নিজেদের আয়ত্তে এনে এক সুসমন্বিত রূপ প্রদান করেন। যদিও কাগজে কলমে মুকতা ছিলেন কেন্দ্রীয় শাসকের অধীন একজন প্রশাসনিক আমলা তা সত্ত্বেও তাকে উল্লেখযোগ্য সামরিক ক্ষমতা প্রদান করা হতো। বাস্তবিকপক্ষে ইকতা প্রাপ্ত মুকতা ছিলেন তার অধীন এলাকায় সুলতানের ক্ষুদ্র প্রশাসক। বাংলায় মুকতা তার প্রশাসনিক কাজকর্মে সহযোগিতার জন্য সহকারী (deputy) মুকতা নিয়োগ করতে পারত এবং তাকে গ্রামের ভূমি বন্দোবস্ত দিতে পারত। মুকতা তার ইকতার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য ছিল। বারানীর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে

---

[১৪] R. C. Majumder, *History of Bengal*, vol. 2, p. 15, footnote, 1
[১৫] Barani, *op.cit.*, pp. 57-59
[১৬] *Ibid*, p. 55

লখনৌতির মুকতা তুঘ্রিল খান যখন বিদ্রোহী হন তিনি তখন জাজনগর (উড়িষ্যা) বিজয়ে প্রাপ্ত ধনসম্পদ ও হাতি দিল্লিতে প্রেরণ করেননি।[১৭] মুকতাগণ অনেক ক্ষেত্রে অর্থ আত্মসাত করারও চেষ্টা করত।

আলোচ্য সময়ের মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে বাংলার প্রশাসনিক বিভাগের নাম জানা যায়। শিলালিপি থেকে ইকলিম, আরসাহ, শহর, থানা ও মহল নামে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটের নাম জানা যায়। মুদ্রা থেকে আরও বেশ কিছু প্রশাসনিক ইউনিটের নাম জানা যায়। যেমন- শহর ফিরোজাবাদ, ফতেহাবাদ, সোনারগাঁও, খলিফাতাবাদ, মাহমুদাবাদ, বারবকাবাদ, মুজাফফরাবাদ, লখনৌতি এবং কসবা ও খিত্তা লখনৌতি প্রভৃতি। এগুলো প্রশাসনিক ইউনিট ছাড়াও টাকশাল শহর ছিল।[১৮] ঐতিহাসিক এম আর তরফদার মনে করেন এগুলো হোসেন শাহি রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী শহর।[১৯] এসব স্থানগুলোতে বিভিন্ন পদবিধারী কর্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং এসব কর্মচারীকে বলা হতো *সর-ই-লস্কর* ও উজির কখনো আবার তারা কেবল *লস্কর* উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উজির দেশের সমগ্র প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। সুলতানী আমলে গৌড়, দেবকোট, ঘোড়াঘাট, সাতগাঁও, ত্রিবেণী, চট্টগ্রাম, মুঙ্গের, হাজীপুর, বিহার প্রভৃতি স্থান উচ্চ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।[২০] বাংলার মুদ্রা ও শিলালিপিতে প্রধানত দুটি ইকলিমের নাম জানা যায়। যথা- ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ ও ইকলিম মোবারকাবাদ।[২১] তৎকালীন পূর্ব বাংলার বিভাগগুলোকে ইকলিম এবং পশ্চিম দক্ষিণ বাংলার বিভাগগুলোকে আরসাহ বলা হতো। সাধারণত বড় এলাকাকে বলা হতো ইকলিম এবং ছোট এলাকাকে বলা হতো আরসাহ। যদিও শহর, কসবা এবং খিত্তা প্রায় একই অর্থবোধক শব্দ।[২২] কসবাহ গঠিত হয়েছিল কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে। কসবাহ এর নতুন নাম অনেক ক্ষেত্রে পরগনা হিসেবেও দেখা যায়। সুলতানী বাংলার সর্বোচ্চ ইউনিটের নাম ছিল শিক বা সরকার। অর্থাৎ এ সময়ে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ইউনিট ছিল গ্রাম। কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে পরগনা ও কয়েকটি পরগনার সমন্বয়ে শিক গঠিত ছিল। সাধারণত অশ্বের মাধ্যমে এই

---

[১৭] Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal,* First Reprint, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2019, pp.107-108

[১৮] ইকলিম-মুয়াজ্জমাবাদ, মোবারকাবাদ, আরসাহ- সাজলা মানখাবাদ, মহরবাদ, হাদিগড়, শ্রীহট্ট, শহর- লাউবেলা, শিসলাবাদ, থানা- লাউড়, লাউবেলা ও মহল- মুয়াজ্জমপুর, হাদিগড়, জোড়-বারোর প্রভৃতি নামে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটের নাম জানা যায়। এছাড়া মুদ্রা থেকে আরও বেশকিছু প্রশাসনিক ইউনিটের নাম জানা যায় যেমন: শহর- ফিরোজাবাদ, ফতেহাবাদ, সোনারগাঁও, খলিফাতাবাদ, মাহমুদাবাদ, বারবকাবাদ, মুজাফফরাবাদ, লখনৌতি। এছাড়া কসবা- লখনৌতি এবং খিত্তা- লক্ষনৌতি ইত্যাদি। Abdul Karim, *Corpus*, p.186

[১৯] M R Tarafder, *op.cit.*, pp. 114-115

[২০] Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol. 1, p.47

[২১] Abdul Karim, *Inscription*, p.186

[২২] পশ্চিম বঙ্গের আঞ্চলিক বিভাগকে আরসাহ এবং পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক বিভাগকে ইকলিমকে অভিহিত করা হতো। A.H Dani, *Bibliography of Muslim Inscription of Bengal*, (Appendix to the Journal of the Asiatic Society of Pakistan), vol.11, 1957, p. 115

শিক বা সরকার হতে রাজধানীতে সব ধরনের সংবাদ প্রেরণ করা হতো। অন্যদিকে সুলতানী বাংলার ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ইউনিট ছিল গ্রাম। গ্রাম্য প্রধানকে বলা হতো মুকাদ্দাম। মুকাদ্দামের হিন্দু উপাধি ছিল মুখিয়া।[২৩] মুকাদ্দাম ছিলেন গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। গ্রামের সব ভূমি রাজস্বের হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল পাটোয়ারীর ওপর। খুত উপাধিধারী একজন হিন্দু সুলতানের অধীন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।[২৪] মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই মুকাদ্দাম ও খুত উভয় উপাধির[২৫] ব্যক্তিই সুলতানের কাছ থেকে নানারকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। মূলত উপরোক্ত পদবীধারী লোক ছাড়াও প্রশাসনের সাথে বিভিন্ন উপাধির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল যেমন, কোতোয়াল, সরাবদার প্রভৃতি।

২.২. ইকতা প্রথা

ইকতা প্রথা ছিল মুসলিম শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। কৃষি ব্যবস্থাপনায় ইকতা প্রথার প্রচলনে অনেক ভূমি চাষের আওতায় আসে। আলোচ্য যুগে বাংলার অর্থনীতির প্রধান খাত ছিল-কৃষি। ভৌগোলিক অবস্থান বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান। নদীবহুল বাংলায় উর্বর সমতল ভূমি, প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রাকৃতিক সেচ সুবিধা ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের জন্য অনুকূল ছিল। আবুল ফজলের মতে বাংলার মাটি এত বেশি উর্বর ছিল যে, একই মাটিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হতো।[২৬] এ সময় বাংলার কৃষক সমাজ বহুমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিলেন। তবে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান ছিল প্রধান। ঐতিহাসিক আবুল ফজল-এর তথ্য মতে, বাংলায় এ সময় এত বিচিত্র রকমের ধান উৎপন্ন হতো যে, এসব ধান থেকে প্রাপ্ত চালের প্রত্যেকটির একটি করে জমা করলে একটি বৃহৎ পাত্র ভরে যাবে।[২৭] আলোচ্য যুগে কৃষি বাংলা অর্থনীতির প্রধান খাত হলেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থানও ছিল উল্লেখ করার মতো। কৃষিজাত পণ্যকে ঘিরে সমকালে বাংলায় শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। উল্লেখ্য যে, এ সময় বাংলায় বৃহৎ শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। শিল্প বলতে বুঝাতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে। তবে অর্থনীতিতে এ শিল্পের গুরুত্ব ছিল উল্লেখ করার মতো। তুর্কি-পাঠান জাতি-গোষ্ঠীর শাসকশ্রেণি বা সমরনায়কদের দ্বারা নয়, বহির্বিশ্বে বাংলার পরিচয় ঘটেছিল এর শিল্পপণ্য দ্বারা। সাধারণ কারিগরদের উৎপাদিত শিল্পপণ্যই ছিল বহির্বিশ্বে

[২৩] জিয়াউদ্দিন বারানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮

[২৪] Moreland, *op.cit.*, p. 27

[২৫] I H Qureshi, *op.cit.*, pp. 207-208

[২৬] Ibn Battuta, *The Rehla of Battuta*, eng.tra. Agha Mahdi Hussain, Oriental Institution, Borada, 1953, p. 241; Abul Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari*, eng.tra. Colonel H.S Jarret, The Asiatic Society, Kolkata, vol. 2, 2010, p. 134

[২৭] Abul Fazl Allami, *op.cit.*, p.134; রামাই পণ্ডিত, *শূণ্যপুরান*, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ, ১১০-১১৪

বাংলার দূত।[২৮] ওপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সুলতানী বাংলায় অর্থনীতির মূল খাত ছিল কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প। অর্থনীতির এ তিনটি প্রধান খাতকে ঘিরেই সুলতানী বাংলায় কতিপয় অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল।

কৃষি প্রধান বাংলার জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসত কৃষি থেকে। প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা এবং তুলনামূলকভাবে কৃষিকাজ ও কৃষি উৎপাদন সহজসাধ্য হওয়ায় বাংলার জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন।[২৯] তবে লক্ষ করার বিষয় হলো কৃষকদের মধ্যেও প্রভূত মাত্রায় স্তর বিভাজন ছিল। *শূন্যপুরাণ*- এর একটি তথ্য নির্দেশ করে মমতাজুর রহমান তরফদার বলেছেন, কৃষি কেবল সাধারণ মানুষের পেশা ছিল তা নয়, সম্ভবত সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণও পেশা হিসেবে কৃষিকে অপছন্দ করতেন না।[৩০] পশ্চিম বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে কবি বিপ্রদাসের বর্ণনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১]

ধনী কৃষকদের রায়ত বা *খুদ-কাশত* বলা হতো। এ শ্রেণির কৃষকগণ নিজে জমি ও গবাদি পশুর মালিক ছিলেন। এ শ্রেণির কৃষকদের সম্পর্কে *মৈমনসিংহ গীতিকায় (১৬৫০)* উল্লেখ রয়েছে।[৩২] ধনী কৃষকদের পরই ছিল মধ্যস্তরের কৃষক। এদের *পাই-কাশত* কৃষক বলা হতো। এদের সঙ্গে *খুদ-কাশত* এর পার্থক্য হলো এরা নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্য গ্রামের জমিদারদের আওতায় কৃষিকাজে নিয়োজিত হতে পারতেন। *পাই-কাশত* এর দুটি ভাগ ছিল এক দলের জমি চাষের কোনো উপকরণ ছিল না। প্রথম শ্রেণির *খুদ-কাশতরা* এদের উপকরণগুলো ধার দিতো। এ বাবদ তাদের কাছ তা উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ আদায় করে নিতেন। তৃতীয় শ্রেণির কৃষকদের বলা হতো *মুজারিয়ান*। *মুজারিয়ানরা* নিম্নস্তরের ভাড়াটে ধরনের কৃষক ছিলেন। তাদের নিজের কোনো জমি ছিল না, সম্পন্ন গৃহস্থ বা জমিদারদের কাছ থেকে চাষের জন্য তারা জমি নিতেন। এসব জমিতে তাদের কোনো স্বত্ব বা অধিকার ছিল না। *মুজারিয়ান* কৃষকগণ নিজেদের কর্ষিত জমি অন্য কাউকে চাষের জন্য হস্তান্তর করতে পারতেন না। চতুর্থ

[২৮] Sirajul Islam, "Economic History in Perspective," *History of Bengal, Economic History*, vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2017, p.1

[২৯] এম মোফাখ্খারুল ইসলাম মনে করেন আলোচ্য সময়ে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল সম্ভবত শতকরা ৮০ ভাগ। বাংলার ‘অর্থনৈতিক জীবন’ আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৬৬। তাঁর বর্ণিত এ সংখ্যাটি অনুমানভিত্তিক। সন্দেহ নেই বাংলার জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ অংশ কৃষিজীবী ছিলেন। তবে তা শতকরা ৮০ ভাগ ছিল কি-না তা নিঃশয়ে বলা সম্ভব নয়।

[৩০] রামাই পণ্ডিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১- ১৯৪

[৩১] Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal, 1494-1538 A.D, A Socio- Political Study*, Dhaka University, 1999, pp. 144-145

[৩২] শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *মৈমনসিংহ গীতিকা*, স্টুডেণ্ড ওয়েজ, ঢাকা, ২০১২. পৃ. ১১০

শ্রেণির কৃষকরা ছিলেন ভূমিহীন কৃষিক।[৩৩] সুলতানী বাংলায় এ কৃষকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। অনেকে এদের কৃষক না বলে কৃষি শ্রমিক বলাই বেশি সঙ্গত বলে মনে করেন। এ শ্রেণির কৃষিজীবীদের নিজের কোনো চাষযোগ্য জমি ছিল না। কৃষি মৌসুমে তারা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে সম্পন্ন ও মাঝারি কৃষকদের জমিতে কাজ করতেন। কৃষি মৌসুম শেষে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদেরকে অন্য কোনো অকৃষিজাত কাজে যুক্ত হতে হতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুলতানী যুগে কৃষি বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি এবং উৎপাদন কৌশল ছিল সেকেলে। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চালের উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সেচকাজ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়ে কিছু কিছু প্রযুক্তির প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেচব্যবস্থায় জলচক্রের (water wheel) ব্যবহার এর প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে চাপযন্ত্র বা লিভারের কথাও বলা যেতে পারে। জলচক্র এবং লিভার যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বাংলায় কৃষিজ পণ্যের, বিশেষ করে ধান-চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৪] ফলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সামন্ততান্ত্রিক সুলতানী বাংলায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, নীতিগতভাবে ভূমির মালিকানা স্বত্ব (মিলকিয়াত) ছিল সুলতানের। তবে জমিতে কৃষকের জমিচাষ ও ভোগ দখলের মালিকানা অধিকার ছিল। যতদিন কৃষক ভূমি রাজস্ব ঠিকমতো আদায় করে কৃষিকাজ অব্যাহত রাখতো ততদিন সরকার তাকে জমি থেকে উচ্ছেদের অধিকার প্রয়োগ করত না। রাজস্ব সংগ্রহকে কার্যকরী করা এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে সুসংগঠিত করতে সুলতানগণ বাংলাকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করেন। বাংলার প্রাদেশিক ও স্থানীয় ইউনিটগুলো রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করত।[৩৫] গ্রাম থেকে কয়েকটি ধাপ পার হয়ে ভূমি রাজস্ব কেন্দ্রে পৌঁছাত। গ্রামের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন মুকাদ্দাম ও চৌধুরী। পরগনায় শিকদার, সরকারে শিকদারের প্রধান, প্রদেশে আমিল

---

[৩৩] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, (১২০০-১৭৫০), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫-৬; গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, সুবর্ণ রেখা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৮, পৃ, ৩৯-৪৩; আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ৩

[৩৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১

[৩৫] Ahmed Hasan Dani, Bibliography of Muslim Inscription of Bengal, Appendix to the Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol. 11, 1957, pp 53-59, 63-67; প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগকে বলা হয় ইকলিম বা আরসাহ। পূর্ব বাংলার বিভাগগুলোর নাম ইকলিম এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার বিভাগগুলোর নাম আরসাহ। বিভাগীয় প্রধান কর্মচারীকে বলা হতো *সর-ই-লস্কর* বা উজির।

এবং কেন্দ্রে উজির ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। প্রত্যেক প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির লোক ছিল। তারা রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রে প্রেরণ করত। সুলতানী শাসনে জমিদার, ইজারাদার, মজুমদার, জায়গিরদার, আমিল ও শিকদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করতেন। উপরিউক্ত রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণি ছাড়াও কখনও কখনও গ্রাম্য প্রধান গ্রামের কৃষকদের পক্ষ থেকে শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর রাষ্ট্রকে প্রদান করতেন।[৩৬] জমিদারের রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করার বিনিময়ে গ্রামের এসব ব্যক্তি এক নির্ধারিত কমিশন লাভ করত। বাংলার ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন যে, নীলনদের তীরের গ্রামবাসীদের তাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক কর দিতে হতো। এছাড়া আরও কিছু কর দিতে হতো।[৩৭] শেরশাহ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা নির্ধারণ করেন।[৩৮] প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যসূত্র পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে ভূমি রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশের মধ্যে ছিল।

সরকারি কর্মচারীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের রীতিকে বলা হতো ইকতা (Iqta)। বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই ভূমিব্যবস্থায় ইকতা পদ্ধতি চালু ছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ছিলেন ভিউলি ও ভাগতের ইকতাদার। তিনি নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পর বিজিত অঞ্চলে তাঁর বিশ্বস্ত ও উচ্চ সামরিক পদের অধিকারী সৈনিককে ইকতার মুকতা নিযুক্ত করেন। আলী মর্দান খলজি ছিলেন বরসৌলের ইকতা আর হুসাম উদ্দীন ইওজ খলজি ছিলেন গঙ্গাতীরের মুকতা।[৩৯] ইকতার প্রধানকে বলা হতো মুকতি (Muqti)।[৪০] মুকতি বা ইকতাদার ছোট বা বড় ভূখণ্ড থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাঁকে রাষ্ট্রের সামরিক এবং কিছু পরিমাণে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। স্বাধীন সালতানাত যুগেও এ ব্যবস্থা বহাল ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ সময় ইকতা ছিল দু'প্রকারের। ছোট ও বড় ইকতা। ছোট ইকতার

---

[৩৬] Ishtiaq Husain Qureshi, *The Administration if the Sultanate of Delhi,* Pakistan Historical Society, Karachi, 1954, pp. 120-121

[৩৭] Ibn Battuta, *op.cit.,* p. 241

[৩৮] W H Moreland, *The Agrarian System of Moslem India,* Atlantic Publishers, New Delhi, 1994 p.76

[৩৯] Maulana, Minhaj–Ud-Din, Abu-Umar-I-Usman, *Tabakat-I-Nasiri,* eng.tr. Major H. G. Raverty, vol.1, Oriental Books, New Delhi, 1970, pp. 575-576

[৪০] সুলতান ছিলেন ইকতার মালিক। তিনি খুশিমতো ইকতা দিতেন এবং ইকতার অধিকারী ততোদিন ইকতা ভোগ করতে পারতেন যতদিন সুলতান ইচ্ছা পোষণ করতেন। মুকতি ইকতার কর আদায় ও ভোগের অধিকারী তবে এ কর সুলতানের প্রাপ্য। ইকতার রাজস্ব ভোগ করতে মুকতিকে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হতো যেমন-১. তিনি ইকতার আয় থেকে সেনাবাহিনী পোষণ করবেন এবং সুলতানের জরুরি প্রয়োজন হলে তিনি সেই রাজস্বের অর্থ সরবরাহ করবেন। ২. ইকতার রাজস্ব মুকতিকে দেওয়া হতো অনেক সময় সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য। মুকতির গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দুটি-(ক) কর সংগ্রহ করা ও (খ) সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান করা। Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (Edited by), *The Cambridge Economic History of India* 1200-1750, vol. 1, Orient BlackSwan, Cambridge University Press, India, 1982, p. 68; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

অধিপতিকে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হতো না। মুখ্যত রাজস্ব আদায় এবং সেই সাথে কিছু সামরিক দায়িত্ব পালন করাই ছিল তাঁর দায়িত্বের অধিক্ষেত্র। অন্যদিকে বৃহৎ ইকতার অধিপতি মুকতিদের রাজস্ব আদায় এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো।

মুকতিগণ ইকতার আয় থেকে একটা নির্দিষ্ট অর্থ সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ করতেন। এছাড়াও আদায়কৃত রাজস্ব থেকে ইকতা পরিচালনার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ (surplus money) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব দপ্তরে পাঠাতেন। কেন্দ্র প্রেরিত অর্থের হিসাব নিরীক্ষা করত।[৮১] উল্লেখ্য যে, রাজস্ব ব্যাপারে মুকতিগণ সবসময় সততার পরিচয় দিতেন না। তাঁদের অসাধুতা ও রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য সরকারকে 'খোওয়াজা' নামে এক শ্রেণির গুপ্তচর নিয়োগ করতে হতো। শাসকগোষ্ঠী যেকোনো সময় মুকতিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বদলি করত। এক ফলে মুকতিরা নির্দিষ্ট কোনো গ্রাম অঞ্চলভিত্তিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারত না। শাসকগণের নির্দেশে অনেক মুকতিকেই কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হতো। তাই মুকতির উদ্দেশ্য থাকত সংগৃহীত পণ্যশস্যকে জমিতেই নির্দিষ্ট দামে ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা। এভাবে ভূমিতেই পণ্যশস্য বিক্রি করে রাজস্বের অর্থ আদায়ের জন্য এক বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এক কথায় বলা যায় ইকতা ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ দ্রুত করেছিল।

২.৩. নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ এই প্রদেশে নতুন প্রযুক্তির আমদানি করেন। যা ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এ সময় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলায় শিল্পখাতের বিকাশ ঘটেছিল। বস্ত্রশিল্পে নতুন প্রযুক্তি চরকার ব্যবহার শুরু হলে বস্ত্র উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ছয় থেকে সাতগুণ বেড়ে যায়। ইসামীর *ফুতুহ-উস সালাতিন* থেকে জানা যায় যে, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতে সুতা কাটার যন্ত্র 'চরকা' (spinning wheel) ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল।[৮২] একই সময়ে বাংলার বস্ত্রশিল্পেও চরকার ব্যবহার শুরু হয়। ইরফান হাবীব উল্লেখ করেন যে, শুধু চরকা নয়, পা দিয়ে

---

[৮১] Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (Edited by), *The Cambridge Economic History of India* 1200-1750, vol. 1, p.69

[৮২] Irfan Habib, Economic History of the Delhi Sultanate, *The Indian Historical Review,* vol. iv, Number-1, p. 289; Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009, p, 283

তাঁত চালানোর প্রথাও চতুর্দশ শতকে চালু হয়েছিল। চরকা ও তাঁতের পাশাপাশি বস্ত্রশিল্পে 'টাকু' (বাঁশের তৈরি সুচের মতো একটি যন্ত্র) বা তকলি এবং তুলা পেঁজার ধুনন-যন্ত্র (cotton-carder's bow) সংযুক্ত হয়।[৪৩] এতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। বিদেশি পর্যটকগণ তাঁদের বর্ণনায় বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন মানের, রঙের ও আকারের সুতি বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৪] বাংলার সুতিবস্ত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এমনকি, তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব উপদ্বীপ ও ইথিওপিয়াতে রপ্তানি করা হতো। সুতীবস্ত্র ছাড়া এ সময়ে বাংলায় প্রথম রেশম চাষ শুরু হয়। রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য তুঁতগাছ (mulberry) ও রেশমগুটি উৎপাদন করা হতো। ভার্থেমার বর্ণনায় রেশমিবস্ত্র বাংলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে।[৪৫] বাংলায় উৎপাদিত রেশমিবস্ত্র তৈরির কাঁচামাল অপরিমার্জিত রেশম দিয়ে ক্যাম্বে, আহমদনগর ও সুরাটে রেশমিবস্ত্র তৈরি হতো।[৪৬] এ সময় বাংলায় মসলিন নামে উন্নত মানের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো এবং তার সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। মসলিন খুব দামি বস্ত্র ছিল। মির্জা নাথান মালদাহ থেকে চার হাজার টাকায় একখণ্ড মসলিন ক্রয় করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৭] বাংলায় সাধারণত নীল, লাল, বাসন্তী, হলুদ, সবুজ, কালো প্রভৃতি রঙের মসলিন তৈরি হতো। নানা রঙের এসব মসলিন বস্ত্রের চাহিদা থাকায় বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি হতো।[৪৮] একদিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় অসাধারণ উন্নতি অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব বাংলার অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, চীন-জাপানে, পশ্চিম এশিয়ায় ও ইউরোপে, গুজরাট, করমণ্ডল প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলার সুতিবস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। পাটের সুতা থেকেও এক ধরনের বস্ত্র তৈরি হতো। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* পাটশাড়ির বিবরণ রয়েছে।[৪৯] কবি মুকুন্দরামের কাব্যে পাটের শাড়ির প্রশংসা রয়েছে। এ

---

৪৩ Irfan Habib, *Technology in Medieval India,* c.650-1750, Aligarh Historians Society, New Delhi, 2017, p. 39

৪৪ চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী এসব সুতিবস্ত্রের মধ্যে 'পি-পো', 'মান-চে-তি', 'শাহ-না-কিয়ে' (শাহ-না-পা-কু), 'হিন-পেই-টাঙ্গ-টা-লি' (পি-পাই-লাও-টা-লি), 'শা-তাইউল', এবং 'মা-হেই-মালি' এই ছয় প্রকারের বস্ত্র ছিল উল্লেখযোগ্য। Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan,* The overall Survey of the Ocean's Shores, Translated from the Chinese text edited by Feng Ch'eng-Chin with introduction, notes and appendices by J. V. G. Mills, Hakluyt Society, Cambridge, 1970, pp.162-163; বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্র এদের পরিমাপ ও রঞ্জন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, James Wise, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,* Harrison and Sons St. Martins Lane, London, 1883, pp.103, 113-114; Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol. 1, Imam Muhammad Ibn S'aud Islamic University, Riyadh, 1985, pp. 937-939

৪৫ Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal,* p.157

৪৬ মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ.৩৪

৪৭ Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi,* tra. M.I Borah, Guahati, Assam, 1936, p. 32

৪৮ ঢাকার মসলিন ইংল্যান্ডে পরিচিত লাভ করে এবং ঐ সময় থেকে ইংরেজরা ও এর কয়েক বছর আগে থেকে ডাচ এবং পরবর্তীতে ফরাসিরা মসলিনের ব্যবসা ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে। James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* vol. 1, Calcutta, 1840, pp. 172-175

৪৯ দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

সময় উৎপাদিত পাটবস্ত্র কেবল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নয়, বীরের মন কাড়তেও সক্ষম হয়েছিল বলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন।[৫০]

পনেরো শতকের প্রথমদিকে পর্যটক মাহুয়ান বাংলায় তিন রকমের উৎপাদিত চিনি দেখেছিলেন।[৫১] চিনি উৎপাদন শিল্পের সাথেও প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবী লোক জড়িত ছিল। লবণশিল্প ছিল সুলতানী বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাকেরগঞ্জ এলাকার বেপারি, গোলদার, জমাদার ইত্যাদি উপাধিতে পরিচিত ব্যক্তিবর্গও লবণ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল বলে এইচ বেভারিজ উল্লেখ করেছেন।[৫২] চামড়া শিল্প ছিল সুলতানী বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। মুসলমানগণ তাদের পোশাকে আভিজাত্য বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের পশুর চামড়া ব্যবহার করতেন।[৫৩] এছাড়া চামড়া দিয়ে জুতা, বেগ, কার্পেট, পানির পাত্র, তরবারির কোষ ও ঘোড়ার জিন প্রভৃতি তৈরি করা হতো। মাহুয়ান ও বার্বোসার উদ্ধৃতি থেকেও চামড়ার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়।[৫৪] বহিরাগত অভিজাতশ্রেণি চামড়ার গোড়ালী সংযুক্ত পা-নি-হি (upanah) নামক জুতা ব্যবহার করতেন।[৫৫] চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত কারিগরদের বলা হতো 'চর্মকার'। সাধারণত হিন্দু সমাজের অন্তজ শ্রেণির লোকেরা বংশপরম্পরায় এ চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন।

সুলতানী আমলে তীব্র সুগন্ধযুক্ত 'মৈদু' ও 'চুবাই' আতর[৫৬] এবং আখের রস, অপরিশুদ্ধ চিনি, মহুয়া ও ভাত থেকে তরল মাদক প্রস্তুত করা হতো।[৫৭] এছাড়া খেজুরের রস ও তালের রস থেকেও এক শ্রেণির পানীয় মাদক তৈরি হতো। এখানে খোলাবাজারে মাদক কেনা-বেচা হতো বলে মাহুয়ানের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি বাংলায় তৈরি চার রকম মদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এসব মদের মধ্যে বেশির

---

[৫০] মুকুন্দরাম উল্লেখ করেন যে,

সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাঞি কাটে
সর্বকাল করে নিরামিস।
পাইআ ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিস। সুকুমার সেন (সম্পাদিত) *চণ্ডীমঙ্গল (কবিকঙ্কণ)*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৮২; আহমেদ শরিফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২২৭

[৫১] Ma Huan, *op.cit.*, p.162; M.R Tarafder, *op.cit.*, pp. 81-82 ; তিন রকম চিনি হলো- কণা সমষ্টির আকারে তৈরি চিনি (গুড়- Granulated suger), সাদা চিনি (White suger) এবং দানাদার চিনি (মিসরি- Crystallized suger)

[৫২] H Beveridge B.C.S, *The District of Bakargonj*, Trubner & co. Ludgate Hill, London, 1876, p. 297

[৫৩] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 335

[৫৪] Ma Huan, *op.cit.*, p. 160

[৫৫] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 335

[৫৬] K M. Ashraf, *Life and Condition of the People of Hindustan*, Munshiram Monoharlal, New Delhi, 1970, p. 122

[৫৭] K.M Ashraf, *op.cit.*, p. 122

ভাগ ছিল চোলাই করা মদ।[৫৮] মাদক ছাড়াও গোলাপ জল ও নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য মিশিয়ে সরবত দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ ছিল। উপরে বর্ণিত পানীয় মাদক ও সুগন্ধি তৈরির সাথে বহু মানুষের আর্থিক জীবন যুক্ত ছিল।

পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় ধাতব শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল এবং এ শিল্পের সাথে যুক্ত কর্মকার ও স্বর্ণকাররা একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসেবে সামাজিক জীবনে স্বীকৃতি লাভ করেছিল বলে জানা যায়।[৫৯] ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমান নৌযুদ্ধের প্রয়োজনেই সুলতানী আমলে বাংলায় নৌ শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল।[৬০] নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্পকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ফলে বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

২.৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন

বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলে নতুন আর্থ-সামাজিক শক্তির/নিয়ামকের উত্থান ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন। তুর্কি শাসনগণ বাংলায় মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন করেন ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃত্তি এবং সমুদ্রযাত্রায় মুসলমানদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং সর্বোপরি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের ফলে আলোচ্য সময়ে বাংলার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। মুসলিম শাসনামলে সামাজিক স্তর বিন্যাসে বণিক-ব্যবসায়ীদের উচ্চমর্যাদা নিশ্চিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সমকালীন তথ্যসূত্রে বণিক, মহাজন এবং হাট-বাজারের বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামীণ হাট-বাজারে সাধারণ মানুষ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যও পাওয়া যায়।[৬১] প্রাক্-মুসলিম যুগে সেনরা বাংলায় পুরোপুরি কৃষি অর্থনীতির উপর ব্রাহ্মাণ্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানী আমলে বাংলা

---

[৫৮] Ma Huan, *op.cit.*, p. 161

[৫৯] কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি তৈরির জন্য কামারদের যে বেশ চাহিদা ছিল তা অনুমেয়। উন্মুক্ত ধাতব গোলাকার জলপাত্র, ইস্পাতের বন্দুক, বাটি, চুরি এবং কাঁচির মতো জিনিস বাংলার খোলাবাজারে বিক্রি হতে মা হুয়ান দেখেছেন। Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal* 1494-1538 A.D A Socio-Political Study, Dhaka University,1999, p. 157

[৬০] এ সময় বাংলায় তিন প্রকারের জাহাজ নির্মিত হতো- (ক) অগভীর পানিতে চলাচল উপযোগী চ্যাপ্টা তলাবিশিষ্ট জাহাজ, (খ) সামনে ও পেছনে প্রসারিত গলুই বিশিষ্ট জাহাজ এবং (গ) প্রায় একহাজার পিপার পরিমাণ মাল পরিবহণে সক্ষম 'গিউঞ্চী' নামক এক ধরনের বৃহৎ জাহাজ। বারবোসা 'জুঙ্গোস' (জাংক) নামে বিস্তর মাল পরিবহণে সক্ষম বৃহৎ জাহাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, vol. 1, p. 394

[৬১] Momtazur Rahman Tarafder, *op.cit.*, p. 147

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে পূর্বে উল্লেখিত বাণিজ্য অনুকূল উপাদানগুলো যুক্ত হওয়ায় ফলে বাংলার বহির্বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়।[৬২] বাংলা সাহিত্যের *মনসা মঙ্গল* ও *চণ্ডীকাব্য* থেকে চাঁদ সওদাগর, লক্ষ্মীন্দর সওদাগর, ধনপতি সওদাগর প্রমুখ সুলতানী বাংলার বণিকের নাম ও তাঁদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বাংলার উপকূলীয় সমুদ্রবন্দরসমূহ সোনারগাঁও ও হুগলিতে বসবাসকারী একটি প্রতিপত্তিশালী বণিক সম্প্রদায়ের অবস্থানের কথাও সমকালীন নানা তথ্য সূত্র থেকে জানা যায়। তবে এ বণিকরা বাঙালি ছিল না, বরং এদের অধিকাংশই ছিল আরবীয়।[৬৩] তোমে পিরেসের বর্ণনা থেকে এসব বণিকদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[৬৪] চৈনিক পর্যটকদের বর্ণনাতেও সমকালে বাংলায় বিপুল মূলধনের অধিকারী বৃহৎ বণিকদের কথা উঠে এসেছে।

আলোচ্য সময়ে বাংলায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটেছিল। বাংলায় আগত ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরা ছিল পুরোধা। সাতগাঁও, হুগলি এবং চট্টগ্রাম ছাড়াও তারা বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য জলপথে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তারা বার্মা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বাংলা থেকে পণ্যসামগ্রী রপ্তানি এবং এসব দেশ থেকে বাংলায় পণ্য আমদানি করতেন। পর্তুগিজ ও পূর্বে উল্লেখিত আরব ও পারসিক বৃহৎ বণিক ব্যবসায়ীদের এবং স্থানীয় উৎপাদক ও ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের মধ্যে একশ্রেণির বাঙালি বণিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন। এজন্য তাঁর তারা ক্রেতা বণিক ও বিক্রেতা উৎপাদক উভয়ের কাছ থেকে দালালি বাবদ 'দস্তুরি' নামক অর্থ আদায় করতেন। দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী হলেও এই শ্রেণি বণিকরাও অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পদশালী ছিল। বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় তাদেরও এক রকমের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

৬২ সে সময় দু'টি প্রধান সমুদ্রপথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এর একটি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, আভা, শ্যাম, মালাক্কা, সুমাত্রা, সুন্দা, মসলা দ্বীপপুঞ্জ, সেলিবিস, বোর্ণিও এবং চম্পা হয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্য পথটি ছিল দক্ষিণ পশ্চিমমুখী-যা উড়িষ্যা, করমণ্ডল, শ্রীলঙ্কা ও মালাবার উপকূল অতিক্রম করে পারস্যোপসাগর, আরব সাগর হয়ে আরব দেশ ও আফ্রিকার আবিসিনিয়া। Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, vol. 2, eng.tra. Mansel Longworth Dames, The Hakluyt Society, London, 1921, p. 149

৬৩ Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol.1, pp. 399-400

৬৪ Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires,* An account of the east, from the Red sea to Japan written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Translated from the Portuguese Afs in the Bibliotheque de la chamber des Deputes, Paris and edited by Armando Cortesao, vol. 1, Hakluyt Society , London, 1944, pp. 90-92

২.৫. মুদ্রার প্রচলন

সুলতানী আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় একটি বড় নিয়ামক ছিল মুদ্রার প্রচলন। মুসলিম শাসনের শুরুতে মুদ্রাকে কেবল সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও কালক্রমে তা আর্থিক লেন-দেন ও বিনিময় উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৬৫] মুদ্রা তৈরির জন্য সুলতানী শাসনামলে গিয়াসপুর, শহর-ই-নও, মুয়াজ্জেমাবাদ, জান্নাতাবাদ, ফতেহাবাদ, রোটাসপুর, মাহমুদাবাদ, বারবাকাবাদ, মুহুম্মদাবাদ, হুসাইনাবাদ, চন্দ্রাবাদ, নুসরাতাবাদ, খলিফাতাবাদ ও খলিফাতাবাদ বদরপুর প্রভৃতি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব টাকশাল থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হতো।[৬৬] মুদ্রা তৈরি করে তৎকালীন বাংলায় একটি দক্ষ শিল্পী বা কারিগর শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। সুলতানী বাংলার মুদ্রাগুলোর নির্মাণ কৌশল থেকে শিল্পীদের কারিগরি দক্ষতা ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎকর্ষতার কথা অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য যে, মুদ্রা তৈরির প্রত্যেকটি ধাপেই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মুদ্রা তৈরিতে নতুন প্রযুক্তি ডাইসের (dices) ব্যবহার ছিল সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

তৎকালীন বাংলার মুদ্রা 'তংকা/ টংকা/তনকাহ' নামে পরিচিত ছিল। এ সময়ে বাংলায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সুলতানগণ প্রথম দিকে ১৭০ থেকে ১৭৫ গ্রেন ওজনের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে তা ১৬৬ গ্রেনের মাপে দাঁড়ায়। মুদ্রা তৈরির সাথে জড়িত ছিল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক। বাংলার মুদ্রাগুলোর নির্মাণ কৌশল দেখে মুদ্রা অঙ্কিত শিল্পীদের কারিগরি দক্ষতা ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ে মুদ্রার ওজন, ধাতুর বিশুদ্ধতা ও নির্মাণশৈলী দেখে তৎকালীন সময়ের নতুন প্রযুক্তি ও কারিগরদের ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে পারদর্শিতারও প্রমাণ মেলে। আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, একটি টাকশালে মুদ্রা তৈরির সাথে জড়িত ছিল একুশ শ্রেণির কর্মচারী। এদের কেউ কেউ ছাঁচ তৈরি করত, কেউ মুদ্রা তৈরির জন্য ধাতুকে রাসায়নিক দ্রবণে রেখে প্রক্রিয়া করত, কেউ ধাতুর বিশুদ্ধতা নিরূপণ করত, কেউ ধাতুর খণ্ডকে ছাঁচে ফেলে মুদ্রার আকার দিতো। অন্য কেউ মুদ্রার গায়ে লিপি অঙ্কন করত।[৬৭] বানওয়ারী, শ্রফ প্রভৃতি পদবিধারী লোকেরা মুদ্রা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

---

[৬৫] Minhaj–I-Siraj, *op.cit.*, pp. 575-576

[৬৬] Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to A. D. 1538), Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1960, pp. 157-165; এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, বুক চয়েজ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৩৬-২৪২; এ সময়ে চার প্রক্রিয়ায় মুদ্রা জারি করা হতো। যথা- ক. ওয়ালী বা ইকতাদার দ্বারা জারি করা দিল্লির সুলতানদের নামে মুদ্রা, খ.দিল্লির নিয়োগপ্রাপ্ত ইকতাদারদের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইকতাদারদের নিজ নামে মুদ্রা, গ. দিল্লির সুলতান ও ইকতাদারদের যৌথ নামের মুদ্রা এবং ঘ.বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা।

[৬৭] Abul Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari*, eng. tra. Colonel H.S Jarret, The Asiatic Society, Kolkata, vol. 2, 2010, p. 134

তাদের দেখাশোনার জন্য ‘দারোগা’ পদধারী কর্মকর্তা (Mint Master) নিযুক্ত থাকতো। মুদ্রার তৈরির সাথে জড়িত এসব পেশাজীবী শ্রেণি বাংলার অর্থনৈতিক শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

২.৬. নগরায়ণ

আলোচ্য সময়ে আর্থ-সামাজিক নিয়ামকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নগরায়ণ। সুলতানী শাসনামলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলায় নগরায়ণের বিকাশ ঘটে। একে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অগ্রবর্তী ধাপ বলা যায়। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় কেবল নতুন নতুন নগরের পত্তন ঘটেনি, বরং পুরাতন নগরগুলোরও পুনরুজ্জীবন ঘটে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি সামরিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলায় আগত মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর নগরে বাস করার প্রবণতা পর্যালোচনাধীন সময়ে বাংলায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত করেছিল। নতুন নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও নতুন নতুন শহর প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করেছিল।[৬৮] এভাবে চৌদ্দ শতক থেকেই বাংলার নগর বিন্যাস বাড়তে থাকে। সুলতানী আমলে বাংলার প্রধান নগরগুলোর অন্যতম ছিল লখনৌতি, দেবকোট, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম ও পাণ্ডুয়া ইত্যাদি।[৬৯] পদমর্যাদা অনুযায়ী সুলতান, অভিজাত অথবা স্থানীয় প্রশাসকগণ বিভিন্ন ধরনের নগরে বসবাস করতেন। অভিবাসিত মুসলমানদের সাথে অনেক শিক্ষিত উলেমা, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সুফি সাধক এদেশে আসেন। সুফিগণ বিভিন্ন উপশহর কিংবা ধর্মীয় সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত স্থানগুলোর কাছাকাছি তাদের খানকাহ স্থাপন করতেন। এভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসীর বসতি গড়ে উঠে, যা সময়ের বিবর্তনে ছোট্ট শহরে উপনীত হয়। নগর জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বহুতর অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও নানা শ্রেণিপেশার মানুষের সমাগম ঘটে।

২.খ. সামাজিক নিয়ামকসমূহ

ত্রয়োদশ শতকের উষাকালে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কিদের বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলা সেন বংশের শাসনের অধীনে ছিল। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন সেন শাসন ছিল একান্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য আদর্শের শাসন, রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ।[৭০] সেন যুগে বাংলায় স্বল্প সংখ্যক

---

[৬৮] K M Ashraf, *op.cit.*, pp.198-199; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 127

[৬৯] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 136

[৭০] নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২০

বৌদ্ধদের অস্তিত্ব থাকলেও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে তাদের কেনো প্রভাব ছিলনা। হিন্দু সমাজ গঠনের ভিত্তি ছিল বর্ণ প্রথা। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এ চার বর্ণে বিভক্ত ছিল। বর্ণ প্রথায় আন্তবর্ণের মধ্যে কঠোর সামাজিক বাধাবন্ধন অনুসরণ করার কারণে হিন্দু সমাজে নানা সামাজিক স্তর বিন্যাস ঘটে এবং সামজিক বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল হয়।

সামাজিক জীবনের উপর্যুক্ত পটভূমিকায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলায় তুর্কিদের আগমন। তুর্কি বিজয়ের ফলে বাংলায় সামাজিকভাবে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়।[৭১] সমাজ বিকশিত হয় এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে বহিরাগত অভিবাসী ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত হিন্দু-বৌদ্ধ জনতাকে নিয়ে। স্মর্তব্য যে, সুলতানী আমলে বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর সাথে তুর্কি, আরব, ইরানি, আফগান, পাঞ্জাবি, সিজিস্তানি ও হাবশি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নানা শ্রেণিপেশার মানুষের বাংলায় আগমন ঘটেছিল।[৭২] তত্ত্বগতভাবে ইসলাম বর্ণ প্রথা বা কৌলিন্য নীতিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজ গড়নে একরকমের বর্ণবাদী সামাজিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বহিরাগত অভিবাসী মুসলমানগণ মুসলিম সমাজের '*আশরাফ*' এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ '*আতরফ*', '*আজলফ*', '*আরজল*' হিসেবে পরিচিতি পায়।[৭৩] আশরাফ শ্রেণির অবস্থান ছিল সমাজের পুরোভাগে এবং তাঁরা ছিলেন সমাজের সর্বোচ্চ সম্মান ও সুবিধাভোগী। এই *আশরাফ* শ্রেণিতে ছিল আরব বা আজম (ইরান-তুরান হতে আগত) উদ্ভূত মুসলমানগণ। এমনকি অনেক সময় উত্তর ভারত থেকে আগত মুসলমানগণও বাংলায় উচ্চ সামাজিক

[৭১] Abdul Karim, *op.cit.*, p. 50

[৭২] বহিরাগতদের মধ্যে হাজী ইলিয়াস ছিলেন সিজিস্তান থেকে আগত একজন অভিবাসী। আরবীয়দের মধ্যে প্রথম আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। সৈয়দ আলাউল হক ও নুর কুতুব-উল-আলমের পরিবারের সদস্যরা সবাই আরবীয় ছিলেন। সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার লখনৌতি, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহিরাগত অভিবাসীরা স্থায়িভাবে বসবাস করত। চট্টগ্রামের অনেক বণিক ব্যবসায়ী বসবাস করত। তাদের ভাষা থেকে আমরা এটা নিশ্চিত হতে পারি। সপ্তগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে অনেক মুসলমান বাস করত। সুলতানী শাসনের শেষের দিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় যখন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা অনেক আফগানকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। অনেক আফগানরা শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। সুলতানী শাসনামলে বাংলায় বহু আলেম, সুফি-মাশায়েখ ধর্ম প্রচার করে। শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি, শাহজালাল ও অন্যান্য সুফিদের ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিসম্পন্ন সাধক কম লক্ষ করা যায়। আরবরা বাংলায় বসতি স্থাপন করে সওদাগর ও ধর্মপ্রচারকরূপে বহু আরব সূফী দরবেশ বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত হন। মুসলিম ব্যবসায়ীদের বোহরা বলা হতো। বোহরা অর্থ ব্যবসায়ী। বাংলায় মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে ইরানিরা আগমন করে। তারা বাংলায় সুফি দরবেশ ও ধর্মীয় শিক্ষকরূপে আগমন করে। তারা মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বহিরাগত ইরানিরা অভিজাত শাসকদেরকে পরামর্শ দান করত এবং তারাই মুসলিম সমাজের উচ্চ স্তর গঠন করেছে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে বিরচিত বিপ্রদাস এর মনসা বিজয় থেকে সাতগাঁও অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের সম্পর্কে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন যে,

নিবসে যবন যত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান তছলিম।
সৈয়দ মোল্লা কাজী কেতাব কুরআন রাজি
দুই ওক্ত করে তছলিম। বিপ্রদাস (সুকুমার সেন সম্পাদিত), *মনসা বিজয়*, কোলকাতা, ১৯৫৩, পৃ.১১৪

[৭৩] আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড* , পৃ.৪২

মর্যাদা ও সম্মানের দাবি করেছেন। এভাবে ইসলামের সাম্যবাণী প্রচার সত্ত্বেও[৭৪] বাংলায় পরোক্ষ সামাজিক সম্মানের নতুন উপাদান সৃষ্টি হয়। জাতি ও জন্মলব্ধ সামাজিক সম্মানের অঙ্কুর শতাব্দীর পর শতাব্দী সযত্ন লালনে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।

সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাধারণ নিয়ামক প্রশাসনিক পদ, আর্থিক সঙ্গতি ও মর্যাদার নিরিখে সুলতানী বাংলার সমাজকাঠামো ছিল অনেকটাই পিরামিড আকৃতির। এ সমাজের সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিলেন স্বয়ং সুলতান ও তাঁর পরিবার। সামাজিক কাঠামোতে অন্য সামাজিক শক্তিগুলো ছিল ক. অভিজাতশ্রেণি, খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং গ. সাধারণ শ্রেণি। মূলত বাংলার সুলতানগণ পদমর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে এক অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু। শাসকগণ চিন্তা ও কর্মে মুসলমানদের সামাজিক জীবনেরও নেতা ছিলেন। মুসলমানদের ঐক্য বজায় রাখা এবং তাদের ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল।[৭৫] সংখ্যায় কম হলেও রাজপরিবারের সদস্যদের উচ্চ রাজকাজে অংশগ্রহণ এবং রাজ্যশাসনে প্রভাবশালী ভূমিকা পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁরাও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন।

সুলতানী আমলের প্রশাসন ব্যবস্থায় সুলতানের পরই ছিল উজিরের স্থান। বাংলার উজির সাধারণত '*খান-ই-জাহান*' বা '*খান জাহান*' উপাধি লাভ করতেন। উজির প্রশাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বেসর্বা ছিলেন।[৭৬] চৈতন্য সাহিত্যে বাংলার সুলতানদের উজির পদবির সমমর্যাদার দুটি পদবির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- *দবির-ই-খাস* ও *সাকর মল্লিক*। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে 'রূপ' ও 'সনাতন' দুই ভাই *দবির খাস* ও *সাকর মল্লিক* পদ পেয়েছিলেন।[৭৭] সুলতানদের অনেকেই রাজকার্যে উলামাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

---

[৭৪] ইসলামের অপরিবর্তনীয় নিয়মানুসারে একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। আল কোরআনে বলা হয়েছে, " হে মানব জাতি --- তোমাদের জাতি ও গোত্ররূপে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পার।" *আল কোরআন, ৪৯:১৩*

[৭৫] Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, pp. 244-245

[৭৬] সুলতান নিম্নোক্ত উক্তি করেন,

আমার যে কিছু কার্য সব তোমা লঞা।

কার্য্য ছাড়ি রাহিলা তুমি ঘরতে বসিয়া। কষ্ণদাস কবিরাজ (সুবোধচন্দ্র মজুমদার), *চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা,* পরিচ্ছেদ-১৯, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ.২০৮

[৭৭] *মনসামঙ্গল* কাব্যে অভিজাতদের জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

কর্পুরা তাম্বুল খায়   কস্তুরি চন্দন গায়

গোলাম জোগায় ঘনঘন।

সুলতানদের জমকালো দরবার ছিল। দরবারে মন্ত্রী অমাত্য ছাড়াও *হাজিব, সিলাহদার, শরাবদার, জমাদার* ও *দ্বারবান* ইত্যাদি বহুতর কর্মচারী নিয়োজিত থাকতেন।[৭৮] এদের মধ্যে হাজিব পদবিধারী কর্মকর্তাকে অনেকাংশে সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব বলা যায়। বাংলার সুলতানদের অধিকাংশই বিদ্যানুরাগী সংস্কৃতিবান এবং শিল্প-সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। এ কারণেই তাঁদের দরবার ছিল বিদ্বান, পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি ও রসজ্ঞ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আবাসস্থল। এক কথায় বলতে গেলে সুলতানদের দরবার কেবল বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতার প্রদর্শন ছিল না, তা একই সাথে উচ্চ পর্যায়ের সুরুচি ও সংস্কৃতির বিকাশস্থলও ছিল।

সুলতানগণ অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ, বিলাসী ও জমকালো জীবনযাপন করতেন। তাঁরা নানা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুরম্য প্রাসাদে বাস করতেন। প্রত্যেক প্রাসাদেই 'হারেম' নামক একটি জেনানা মহল থাকতো। হারেম রক্ষণাবেক্ষণ ছিল আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ। হারেমে রাজপরিবারের সদস্যগণ ছাড়া গায়িকা ও বিনোদন কর্মীরা থাকতেন। হারেম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারী-পরিদর্শিকাসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী নিয়োজিত থাকতেন।[৭৯]

২.খ.১. অভিজাতশ্রেণি

সুলতানের পরেই ছিল অভিজাতশ্রেণির অবস্থান। অভিজাতশ্রেণির মধ্যেও নানা শ্রেণিবিভাগ ছিল। আমির ওমরাহগণ ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান শ্রেণিভুক্ত। সুলতানের সিংহাসন ও মর্যাদা এদের সমর্থন ও আনুগত্য ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে তাঁর মত।[৮০] তবে অন্য সূত্র মতে, সুলতান ও রাজপরিবারের সদস্যদের পরেই সামাজিক সোপানে '*আহল-ই-কলম*' (Ahl-i-Qalm) বা '*আহল- ই-সাদাত*' (Ahal-i-Saadat) হিসেবে পরিচিত সৈয়দ, উলমা ও মাশায়েখদের স্থান ছিল। চর্তুদশ শতকের

কেহ মলে অঙ্গপদ কেহ করে খোসামোদ
কেহ শ্বেত চামর ঢুলায়।
কেহ প্রাণের ভয়ে করজোড় করি রয়
কেহ বলে রসুলে খোদায়। অর্থাৎ হাসান সুগন্ধিযুক্ত পান খায়। চন্দন ও কস্তর সুগন্ধী ব্যবহার করেন। ক্রীতদাসরা এসব সুগন্ধী পান ঘনঘন এনে দেয়। কেউ হাতপা পেষণ করে, কেউ তার খোশামোদ করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর মাথায় সাদা পাখা দোলায়। কেউ প্রাণের ভয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, কেউবা আল্লাহ রাসুলের নাম জপ করে। বিপ্রদাস, *মনসামঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬৬-৬৭

[৭৮] I.H.Qureshi. *op.cit.*, pp. 86-87

[৭৯] Abul-Fazl, *op.cit.*, vol.1, pp. 46-47

[৮০] Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal,* Jatiya Grantha Prakashan, 3rd ed. 2001, pp. 174-175

মধ্যভাগে সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮খ্রি.) এর একটি রাজকীয় ঘোষণা[৮১] থেকে জানা যায় যে, সামাজিক পদমর্যাদায় *আহল-ই-কলম*-এর পরই ছিল *'আহল-ই-তেগ'* (Ahl-i-tegh) বা *'আহল-ই দৌলত'* (Ahl-i-daulat) নামে পরিচিত খান, আমির, মালিক, খান, সদর, আকাবের এবং মারিফ ও তাদের অনুচরবর্গ প্রমুখ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক আমলা শ্রেণি। উচ্চশ্রেণির তৃতীয় পর্যায়ে জমিদার, মুকাদ্দম, মাফরুজমান এবং সদকান প্রমুখ ভূ-অভিজাতদের স্থান ছিল। এর পরেই ছিল সন্ন্যাসী, সিদ্ধপুরুষ এবং গাবরদের স্থান। এদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু যোগী, পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরু।

উল্লেখ্য যে, অভিজাতশ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তি বিশেষ করে অমাত্য আভিজাত্যের বিষয়টি বংশগত ছিল না। প্রতিভা ও যোগ্যতা বলেই আমির ওমরাহগণ এ মর্যাদায় উন্নীত হতো। এমনকি হাবশি দাসগণ আমিরের মর্যাদা লাভ করেছিল। মূলত সামরিক নৈপুণ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল অভিজাতশ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার প্রধান গুণাবলি। শেখ ও উলেমা ব্যতীত উচ্চশ্রেণির বেশিরভাগ লোক প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন এবং জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। আমির ওমরাহদের প্রত্যেকেই জমকালো পোশাক পরিধান করতেন। তাদের আবাসস্থলে অনেক কর্মচারী থাকতো। উদাহরণ হিসেবে হাসান জমিদারের কথা উল্লেখ করা যায়। বিপ্রদাস তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাসানের গৃহে বহু খোঁজা ও দাস-দাসী দেখেছেন।[৮২] শুধু বিলাসী জীবনযাপন নয় সুলতানী বাংলার অভিজাতশ্রেণি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও নানাভাবে ভূমিকা রাখতেন। সার্বিক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে সুলতানী বাংলার অভিজাতশ্রেণিকে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল মননের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

---

[৮১] 'ইনশা-ই- মাহরু' তে এ রাজকীয় ঘোষণাপত্রটি লিপিবদ্ধ আছে। *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Calcutta, 1923, p. 280 তে উদ্ধৃতি। এ ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছিল বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

[৮২] *মনসামঙ্গল* কাব্যে অভিজাতদের জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

কর্পুরা তাম্বুল খায়   কস্তরি চন্দন গায়
গোলাম জোগায় ঘনঘন।
কেহ মলে অঙ্গপদ   কেহ করে খোসামোদ
কেহ শ্বেত চামর ঢুলায়।
কেহ প্রাণের ভয়ে   করজোড় করি রয়
কেহ বলে রসুলে খোদায়। অর্থাৎ- হাসান সুগন্ধিযুক্ত পান খায়। চন্দন ও কস্তর সুগন্ধী ব্যবহার করেন। ক্রীতদাসরা এসব সুগন্ধি পান ঘনঘন এনে দেয়। কেউ হাত পা পেষণ করে, কেউ তার খোশামোদ করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর মাথায় সাদা পাখা দোলায়। কেউ প্রাণের ভয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, কেউবা আল্লাহ রাসুলের নাম জপ করে। বিপ্রদাস, *মনসামঙ্গল,* কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬৬-৬৭

২.খ.২. মধ্যবিত্ত শ্রেণি

সাধারণভাবে প্রতিটি সমাজ কাঠামোতেই অভিজাতশ্রেণি ও নিম্ন বা সাধারণশ্রেণির মাঝখানে একটি সামাজিক শ্রেণির অবস্থান থাকে। সালতানাত যুগের স্তরবিন্যাসেও এরূপ একটি সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। অনেকেই একে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। উল্লেখ্য যে সেনামলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। ডব্লিউ এইচ মুরল্যান্ড (William Harrison Moreland) এর মতে, ভারতীয় সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ব্রিটিশ যুগেই হয়েছে; তবে তাঁর মতে বাংলার কথা স্বতন্ত্র, এখানে ব্রিটিশ যুগের পূর্বেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল।[৮৩] আধুনিক যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে- ১. বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা ২. রাজনৈতিক চেতনা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত এবং বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁদের জীবিকা উপার্জন করে। শিক্ষা ও বুদ্ধি দ্বারা তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আধুনিক যুগের সংজ্ঞায় সুলতানী আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিচার করার সুযোগ নেই। কিন্তু সমাজে এরকম বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির লোক ছিল। তাঁরা নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এইসব ব্যক্তিগণ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং লেখার কাজে অথবা শিল্পকলায় তাঁদের জ্ঞান ব্যবহার করতেন। তারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পেশার বিচারে দৈহিক শ্রম দ্বারা উপার্জনকারী সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। নিম্নশ্রেণির সরকারি কর্মচারী, চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি, গায়ক, শিল্পী ইত্যাদি পেশাজীবীদের নিয়ে সে সময়কার মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গশক্তি ছিল বণিক সমাজ। বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতির ফলে বণিকদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ধনী বণিকগণ প্রাচুর্যময় বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। সম্পদ ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের ভিত্তিতে বড় বড় ব্যবসায়ী ও বণিকগণ সমাজের উচ্চশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। তবে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব না থাকায় এরা রাজকীয় ও সামাজিক অভিজাতচক্রে স্থান করে নিতে পারেননি। মুসলিম সমাজের হাওলাদার বা ক্ষুদ্র জমিদার, জোতদারারা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রভাবশালী সম্প্রদায়। বিজয়গুপ্ত *মনসা মঙ্গলে* হাওলাদার দুলার প্রভাব বর্ণনা করেন।[৮৪] উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলায় কায়স্ত শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। তারা কোনো বর্ণগত শ্রেণি নয়

---

[৮৩] W H Moreland, *India at the Death of Akbar*, Macmillan and Co., Limited, London,1920, 1962, p. 25

[৮৪] এদের প্রভাব সম্পর্কে বিজয়গুপ্ত বলেন যে,
এক বেটা হালদার নাম তার দুলা।
বড় অহংকার করে হোসেনের শালা।।
সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আগে।
তাহার ভয়ে হিন্দু সব পালায় তরাসে।। বিজয়গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বানী নিকেতন, পৃ. ৫৮ অর্থাৎ- দুলা নামে হুসেনের শ্যালক একজন হালদার। লোকটি ভারী অহংকারী। সে সদাসর্বদা হুসেনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং সমস্ত হিন্দুরা ভয়ে তার নিকট থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

বরং তারা ছিল পেশাগত শ্রেণি। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন, চিকিৎসার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ এবং ঔষধ তৈরি করা ছিল বৈদ্যদের কাজ। লেখাপড়ার কাজ তাদের মধ্যে চালু ছিল বলেই সমাজে গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। পেশাগত কারণেই বৈদ্যদেরকে লেখাপড়া করতে হতো। তাছাড়া মুসলিম শাসকগণ শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করেন ফলে নিম্নশ্রেণির মানুষ শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চপদে চাকরির সুযোগ পায়। তৎকালীন সময়ে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য যে, সেন শাসনামলে শিক্ষার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণদের ছিল এবং নীচু শ্রেণির কারো শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটেনি। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়ে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কায়স্থদের নৈপুণ্য ছিল সুপরিচিত।[৮৫] মূলত সুলতানী শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় আর্থ-সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটে।

২.খ.৩. সাধারণ শ্রণি

উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ছাড়া সকল নাগরিক সাধারণ শ্রেণির অন্তর্গত। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ 'আতরফ', 'আজলফ', 'আরজল' হিসেবে পরিচিত।[৮৬] এরা মুসলিম সমাজের নীচুশ্রেণির লোক হিসেবেই পরিগণিত হতেন। ওপরের উল্লেখিত সুলতান ফিরুজশাহ তুঘলকের ঘোষণাপত্র বা কবি বিপ্রদাস পিপলাই এর কবিতায় এই শ্রেণিটি স্থান পায়নি। তবে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে এদের সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণির মুসলমানগণ যেসব পেশায় নিয়োজিত ছিল বলে কবি মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেগুলো হলো- 'জোলা' (বয়ন শিল্পী বা তাঁতি), 'গোয়ালা' (দুধ ওয়ালা), 'মুকেরী' (গরু ব্যবসায়ী বা রাখাল), 'পিঠারী' (পিঠা বা রুটি প্রস্তুতকারক), 'কবরী' (মাছ ব্যবসায়ী), 'সানকার' (তাঁত প্রস্তুতকারক), 'তীরকার' (তীর ধনুক প্রস্তুতকারী), 'কাগচা' (কাগজ প্রস্তুতকারক), 'হাজ্জম' (খৎনাকারী), 'দর্জি' (কাপড় সেলাইকারী), 'রংরেজ' (কাপড় রঞ্জনকারী) 'পটকার' (চিত্রকর) এবং 'কসাই' (মাংস বিক্রেতা) ইত্যাদি। তিনি 'কালান্দর' বা ভবঘুরে দরবেশ নামেও এক শ্রেণির মুসলমানের কথা বলেছেন।[৮৭] তবে তারা নিম্নশ্রেণিভূক্ত ছিল কী-না এ ব্যাপারে মতান্তর রয়েছে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় বাংলার ধর্মান্তরিত

---

৮৫ সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি*, কলকাতা, ১৩৫২, পৃ. ৯-১৫

৮৬ Richard M.Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1750,* University of California Press, London,1994, p. 97

৮৭ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণচণ্ডী*, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৩২ সাল, পৃ. ৮৬; Abdul Karim, *Social History of the Muslim in Bengal (Down to A.D. 1538),* Jatiya Grantha Prakashan, Dhaka, 1959, p.184

মুসলমানদের 'গোরসাল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৮] অবশ্য তিনি এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। জেমস ওয়াইজের তথ্যসূত্রে আবদুল করিম এর অর্থ করেছেন বাজি প্রস্তুতকারক।[৮৯]

বাংলার ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের যে পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সরাসরি কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু হিন্দুদের বেশিরভাগ লোকই ছিল কৃষিজীবী। শাসকশ্রেণির অনেকেই সেনাবাহিনী বা সরকারের অধীনে ছোটখাট চাকরি করত। পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের পাইক পেয়াদা বা সমুদ্রগামী বাণিজ্য বহরের নাবিক হিসেবেও তারা কাজ করত।[৯০] তাঁর এ বক্তব্য মেনে নিলে প্রশ্ন দাঁড়ায় পূর্ব বাংলার যে বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা কি রাতারাতি কৃষিকাজ ত্যাগ করেছিলেন? তা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই কবি মুকুন্দরামের তথ্যে উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা অমূলক হবে না যে, ধর্মান্তরিত মুসলমানদের একটা অংশ কৃষিজীবী ছিলেন। কৃষিজীবী ছাড়াও বিভিন্ন পেশার লোক ছিল। যারা পরিশ্রম ও নৈপুণ্য দ্বারা শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় রাজনৈতিকভাবে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে ওঠে। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ামকের বিকাশ ঘটে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষিব্যবস্থাপনায় নতুন নিয়ামক ইকতা প্রথা চালু হলে ভূমি ও রাজস্ব ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। কৃষিকাজে নতুন প্রযুক্তি চাপযন্ত্র ও জলচক্র (সাকিয়া) ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। কৃষিক্ষেত্রে রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে ইকতা ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে নতুন পেশাদারশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইজারাদার, শিকদার, আমিল। কৃষিজাত পণ্যকে ঘিরে শিল্পকারাখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার পূর্বের তুলনায় কুটির শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন নামে নতুন নতুন পেশাজীবীর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য যে, কৃষিজ পণ্য উৎপাদন

---

[৮৮] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীকাব্য*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ.৩৪৫

[৮৯] জেমস ওয়াইজ বলেন, বাজী প্রস্তুতকারকগণ সবসময় মুসলমান হতো এবং মাঝেমাঝে তার "গোলাপসাজ" নামে অভিহিত হতো, James Wise, *Notes on the Races Castes and Trades of Eastern Bengal*, Harrison and Sons ST. Martins Lane, London, 1883, p. 216

[৯০] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 265-266

বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পের কাঁচামালের মূল্য পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায়। ফলে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে যায়। কৃষি ও শিল্পের বিকাশের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে তৎকালীন বাংলায় নতুন গতির সঞ্চার হয়। বাংলার বস্ত্রশিল্পের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। এ সময়ে বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদিত হতো। নতুন অভিজাত শাসকশ্রেণির চাহিদানুযায়ী কিছু বস্ত্র উৎপাদিত হতো। বাংলা থেকে শিল্পজাত পণ্য বস্ত্র ছাড়াও কৃষিজপণ্য রপ্তানি করা হতো। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে টাকশাল হতে মুদ্রার প্রচলন করেন, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। মুদ্রা প্রচলনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় এবং এই মুদ্রা তৈরির সাথে অনেক কর্মচারী যুক্ত ছিল। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর আগমনে বাংলায় নগরায়ণের বিকাশ ঘটে। এ সময়ে পূর্বের নগরগুলো চাঙ্গা হয় এবং নতুন নতুন নগরের গোড়াপত্তন হয়। মুসলিম শাসনামলের পূর্বে বাংলায় যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও সামাজিক বৈষম্য বিরাজমান ছিল সুলতানী শাসনামলে উল্লিখিত অগ্রগতির ফলে সেই স্থবিরতা ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পায়। মুসলিম সুলতানদের অধীনে নিজের যোগ্যতা বলে অনেক হিন্দু রাজকীয় উচ্চপদে চাকুরির সুযোগ পায়। ব্যবসায়ী, কারিগর, শিল্পী ও অন্যান্য পেশাজীবীর হাতে অর্থ থাকায় তারা পূর্বের তুলনায় ভালো জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করে। সুলতানী বাংলার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে এটি একটি দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা। বাংলার মুসলিম শাসন কাঠামোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা দৈতন্যের সৃষ্টি করে। বাংলার এই আর্থ-সামাজিক নিয়ামকগুলোই পরবর্তীকালে বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার ভিত্তি রচনা করেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতানী বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতানী বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও নতুন আর্থ-সামাজিক শক্তির উত্থান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের কৃষিজপণ্য উৎপাদনের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অত্র অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বাংলার কৃষিব্যবস্থাকে এই স্বাতন্ত্র্যতা দান করেছে। কৃষির সেই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের অসংখ্য নদনদী, পরিবাহিত পলিমাটি, পরিমিত বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচব্যবস্থার ফলে বাংলার সমতল ভূমি উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার সমগ্র অঞ্চলে চাষযোগ্য জমি ছিল অনেক কিন্তু কম জমিতে চাষাবাদ হতো। সেনামলে বাংলার ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষিজীবী থেকে শুরু করে সম্পদস্রষ্টা মানুষের সম্মানজনক অবস্থান থেকে বঞ্চিত করা। ফলে এ সময় কৃষক ও কারিগরগণ সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারে বাড়তি আগ্রহ দেখাত না। এ কারণে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন কম হতো। সুলতানী শাসনামলে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে কৃষিজপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ফলে বাংলা পৃথিবীর একটি সম্পদশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুলতানী শাসনামলে বাংলার কৃষি ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাংলার কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং কৃষক পরিবারগুলো নিজ উদ্যোগেই ভূমি চাষ করত। আলোচ্য সময়ে বাংলার কৃষকদের বংশপরম্পরায় ভূমি স্বত্বের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় কৃষি কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ ও উদ্যোম পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এ সময়ে অনেক জমি চাষের আওতায় আসে এবং আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। উৎপাদক শ্রেণি ও রাষ্ট্রের মধ্যে মোটামুটি একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও কৃষকের আগ্রহে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত কৃষিজপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ভূমি রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হয়। কৃষকগণ মুদ্রা ও ফসল দ্বারা উভয় পদ্ধতিতে ভূমি রাজস্ব প্রদান করত। এ সময়ে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে ভূমি রাজস্বের সাথে সংশ্লিষ্ট জমিদার, মজুমদার ও মধ্যস্থতাকারী শ্রেণির লোকেরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এছাড়াও বাংলায়

পর্যাপ্ত পণ্যশস্যের উৎপাদন ও সরবরাহ থাকায় বাংলা শস্যপণ্যের ভাণ্ডারসমৃদ্ধ দেশ বা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলায় উর্বর ভূমি, জমির সহজলভ্যতা, অনুকূল পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে বিভিন্ন উপজাতি ও যাযাবররা[১] এদেশে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু প্রাক্ মুসলিম যুগে বহিরাগতদের অভিবাসন বন্ধ ছিল। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অভিবাসন শুরু হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় অভিবাসীদের বসতি স্থাপন বাড়তে থাকে। তাদের বসতি স্থাপনের ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই ভূমিতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বাংলার কৃষকগণের ভূমি চাষ পদ্ধতি, কৃষিজ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, কৃষিজ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করলে বাংলার ভূমি রাজস্ব, কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হবে। আলোচ্য অধ্যায়ে তৎকালীন বাংলার ভূমির বৈশিষ্ট্য, ভূমির শ্রেণিবিন্যাস, ভূমির চাষ পদ্ধতি, কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. বাংলার ভূমির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

কৃষিপ্রধান বাংলার ঋতুভেদে বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদিত হতো। এই কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে বড় উপকরণ ভূমি। তাই প্রথমেই আমাদের ভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। ভূমির ইংরেজি প্রতিশব্দ Land। অর্থনীতিতে শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় জল, স্থল, আলো-বাতাস, নদ-নদী, সমুদ্র, সূর্য কিরণ, খনিজ পদার্থসহ সবকিছুই ভূমির অন্তর্গত। ভূমি এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা থেকে খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও সমগ্র মানবসমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটে। কেবলমাত্র বসতভিটা ও কৃষিজপণ্য উৎপাদনের জন্য নয়, শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের মাধ্যম ভূমি। মূলত, কৃষিপ্রধান বাংলায় অর্থনৈতিক প্রগতির সর্বপ্রধান অবলম্বন ভূমি। গ্রাম ও শহরের বসতবাড়ি ছাড়াও রাস্তা, পায়ে চলা পথ, পুকুর যা সাধারণ জনগণের জন্য পানি সরবরাহ করত এবং জঙ্গল পশুচারণ ভূমিসহ সবকিছু ভূমির ওপরেই নির্মিত।[২] সুলতানী আমলে বাংলায় আবাদি ও অনাবাদি উভয় প্রকার ভূমি ছিল। কালক্রমে গ্রামীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনাবাদি, পতিত জমিগুলো পর্যায়ক্রমে চাষের আওতায় চলে আসে। কোনো কোনো গ্রামের প্রান্তেই স্থানীয় হাট ও বাজার গড়ে উঠেছিল।[৩]

---

১ Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, vol. 1, eng.tra. Major. H.G.Raverty, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1881, reprint: Oriental Book Reprint Corporation, New Delhi, 1970, pp. 152-156

২ শেখ ফয়জুল্লাহ, *গোরখ বিজয়*, পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪

৩ *ঐ*, পৃ. ৪০

গ্রামবাসী তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য এসব হাটে যেতো। শ্রী নাথ *আচার্যচুড়ামণির বিবাহ তত্ত্বর্ণভ* এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক এম আর তরফদার বলেন যে, গ্রাম এলাকার উর্বর ভূমি (উর্বরা-ভূমি), চারণভূমি (গোচারণ ভূমি) ধর্মীয় বলিদানের জন্য স্থান (বেদি ভূমি), বাজার (বিক্রয় স্থান)হ্রদ, অনুর্বর জমি (ঊষর ভূমি), চৌমাথা (চারটি পথ) এবং শবদাহের স্থান (শ্মশান) ছিল।[৪] কৃষিপ্রধান বাংলায় এভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ভূমির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ- (১) ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ এই ভূমি সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল ভূমির রূপ পরিবর্তন করতে পারে। (২) ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ; কেউ তা বাড়াতে বা কমাতে পারে না। (৩) ভূমিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায় না, সকল ভূমিই স্থাবর সম্পদ। (৪) উর্বরতার দিক থেকে কোনো ভূমি কম উর্বর এবং কোনো ভূমি বেশি উর্বর।[৫] তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে ভূমির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয়।

ক.১. ভূমির শ্রেণিবিন্যাস

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনার পূর্বে স্বাভাবিকভাবেই ভূমির শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। সুলতানী বাংলার ভূমির শ্রেণিবিন্যাস করা কঠিন। প্রাচীন বাংলার শিলালিপি থেকে চার প্রকার ভূমির কথা জানা যায়। যথাঃ বাস্তুভূমি, ক্ষেত্রভূমি, খিলক্ষেত্রভূমি ও খিলভূমি। যে ভূমিতে মানুষ ঘর-বাড়ি তৈরি করে অথবা যে ভূমি বাসযোগ্য, তা বাস্তুভূমি। যে ভূমি চাষের যোগ্য ও চাষের অধীন, সেই ভূমি ক্ষেত্রভূমি। যে ভূমি চাষের যোগ্য কিন্তু চাষ করা হয়নি, সেই ভূমি খিলক্ষেত্র ভূমি। সিলেটের কোনো কোনো এলাকার চাষের অযোগ্য এবং জলাভূমিকে খিলভূমি বলা হয়।[৬] এ সকল ভূমি সুলতানী শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল। বাংলায় আরো ছয় প্রকার ভূমি ছিল। যথা- (১) বাংলার গ্রামাঞ্চলে মানুষ ও যানবাহন চলাচলের জন্য পথ বা রাস্তা নামে ভূমি ছিল এবং আজও তা বিদ্যমান। নর্দমা বা পানি নিঃসরণের পথ তল ভূমি নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া দুই ব্যক্তির ভূমির সীমা নির্দেশ করার জন্য 'আইল' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। (২) গ্রামে পানি নিঃসরণের জন্য নিচু ভূমি ছিল যা জোলা নামে পরিচিত। উত্তর ও পূর্ব বাংলায় জোলা শব্দটি ব্যবহার করা হতো। (৩) গ্রামীণ হাট-বাজারের জন্য ব্যবহৃত ভূমি এবং খেয়া পারাপারের ঘাট।[৭] (৪) বন্ধ ডোবা, উচ্চভূমি বা ঢিবি জাতীয় ভূমিও বাংলায় ছিল। (৫) গ্রামের বাইরের সীমানায় গো-চারণ ভূমি ছিল যা প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ সম্পত্তি। (৬) এছাড়াও বাংলায় বন ও

---

৪ M. R.Tarafdar, *Husain Shahi Bengal, A Socio –Political Study,* Dhaka University, Dhaka, 1999. p.132

৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, পৃ. ১৭৩

৬ M. R.Tarafdar, *Husain Shahi Bengal,* p. 132

৭ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, পৃ. ১৮৪-১৮৫

বনভূমি নামে ভূমি ছিল এবং যা বর্তমানেও বিদ্যমান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বন ও বনভূমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] আজও এসব ভূমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত। বাংলায় সুলতানী শাসনের শুরু থেকেই অধিকাংশ আবাদি জমি সুলতানের নিযুক্ত কর্মচারী অথবা জায়গিরদারের অধীনে ছিল, তবে খালিসা জমি সরাসরি সরকারের আয়ত্তে ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল- এর *আইন-ই আকবরী* থেকে উর্বরতা অনুযায়ী চার প্রকার ভূমির কথা জানা যায়। যথা- (১) যে ভূমি কর্ষণাধীন, তা ছিল 'পোলাজ' (Polaj) ভূমি। এই ভূমিই ছিল প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রভূমি। (২) যে ভূমি কর্ষণযোগ্য কিন্তু এক বা দু'বছরের মধ্যে তা কর্ষণ করা হয় না, উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফেলে রাখা হচ্ছে, সেই ভূমি 'পরাউতি' (Parauti) ভূমি। (৩) যে ভূমি তিন বা চার বছর ফেলে রাখা হয়েছে, তা 'চাচর' (Chachar) ভূমি। (৪) এছাড়া যে ভূমি পাঁচ বা ততোধিক বছর অনাবাদি রয়েছে, তা 'বানজার' (Banjar) ভূমি।[৯] এই বিভাজন প্রাক-মোগল যুগেও বিদ্যমান ছিল বলেই অনুমিত হয়। বাংলার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরিলক্ষিত হয় যে, নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলেও নতুনভাবে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হতো না। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তাই মোগল আমলেও ব্যতিক্রম ছিল না বলেই ধারণা করা যায়।

ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও অধিকারের ভিত্তিতে সুলতানী বাংলার ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (ক) জায়গির অথবা কর প্রদায়ী জমি, (খ) ইজারাদার বা রাজস্ব দালালদের যেমন- ডিহিদার এবং মুস্তাজিরদের আওতাধীন জমি, (গ) শিকদার বা আমিলদের অধীন জমি। (ঘ) জায়গির বা আয়মার জমি।[১০] সুলতানী বাংলার সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত ভূমি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলোঃ (i) আলোচ্য সময়ে বাংলার জায়গির ভূমির পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ বেশিরভাগ সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারীদের জায়গির দানের মাধ্যমে বেতন দেওয়া হতো। মোগল সম্রাট বাবর তাঁর আত্মচরিত *বাবরনামা* গ্রন্থে বাংলায় জায়গির প্রথা প্রচলন থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট বাবর উল্লেখ করেন যে, জায়গির জমিতে জায়গিরদারগণ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতেন।[১১] (ii) বাংলায় সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাগণ মুসলিম

---

[৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, পৃ. ১৮৪-১৮৫

[৯] Abul Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari*, eng.tra. Colonel H.S Jarret, vol. 2, The Asiatic Society, Kolkata, p. 68

[১০] Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol. 2, Pakistan Publication House, Karachi, 1967, p. 112

[১১] Zahirud-din Muhammad Babur Padshah Ghazi, *The Babur Nama, Memoirs in Babur*, trans from Turki Text., Annette Susannah Beveridge, vol. 2, Low Prince Publication, Delhi, 1921, pp. 482, 676

শাসকদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং নিয়মিত কর প্রদান করেন। তারাই সম্মানসূচক 'জমিদার' উপাধিতে ভূষিত হন। এসব জমিদারগণ রাজস্ব সংগ্রহ করে নিয়মিত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। (iii) সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় খাস বা খালিসা (crown land) নামের কিছু কিছু জমি সরাসরি সরকারের আয়ত্তে ছিল। ঐ সমস্ত জমির আয় সরকারি রাজকোষে জমা হতো। খালিসা জমির ক্ষেত্রে ইজারাদারগণ করদাতা হিসেবে অথবা ইজারাদার হিসেবে রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন।[১২] (iv) তারা আমিলদের অধীন জমিতে রাজস্ব আদায় করাতেন। রায়তারি ব্যবস্থায় শিকদার বা আমিলগণের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে রায়তদের সাথে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। মূলত শিকদার বা আমিলদের অধীন এলাকা সীমিত ছিল। জমিদার, ইজারাদার, জায়গিরদারদের অধীন এলাকাগুলো থেকেও রাজস্ব আদায় করা হতো। এসমস্ত মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিগণ প্রজাদের কাছ থেকে অনেক সময় জোরপূর্বক বেশি রাজস্ব আদায় করতেন।[১৩] মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগ্রন্থে মধ্যস্থতাকারীদের জোরপূর্বক রাজস্ব আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতানী শাসনে বাংলায় সুফি মাশায়েখ ও ধর্মীয় নেতাদের ভরণপোষণের নিমিত্তে নিষ্কর ভূমি বরাদ্দ দেওয়া হতো। অন্যদিকে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত মসজিদ ও মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর ভূমি বা ওয়াকফ ভূমি ছিল। এ সময়ে চাষযোগ্য ভূমি নাগরিকদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থাকত। সাধারণ প্রজাগণ এসব জমি চাষ করত এবং রাষ্ট্রকে নির্ধারিত কর প্রদান করত। তবে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেও ভূমি থাকত (খাস বা খালসা), যা প্রয়োজনের সময় দেশের ভূমিহীন লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। বাংলায় মুসলিম শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো-ভূমিতে প্রজার অধিকার স্বীকৃত ছিল। প্রজা সেই ভূমি বিক্রি, হস্তান্তর বা দান করতে পারত। যা প্রাক্-মুসলিম যুগে প্রযোজ্য ছিল না।

ক.২. বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা

ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কিত আইন-কানুন ও রীতিনীতিকে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলা হয়। অর্থনীতির পরিভাষায় ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে জমি ও জমির ওপর দালানকোঠা, গাছপালা ইত্যাদির ওপর যাবতীয় অধিকারকে বোঝায়। অধ্যাপক মার্শাল-এর মতে, যে পদ্ধতিতে এবং যে সময়ের জন্য কৃষি জমির ভোগদখলের অধিকার নিরূপিত হয়, তাকেই ভূমিব্যবস্থা বলে। উল্লেখ্য জমির ওপর কৃষকের

---

[১২] W H Moreland, *The Agrarain system of Moslem India*, Atlantic Publishers, New Delhi, 1994, pp. 205-206 ; Muhammad Abdur Rahim, *op.cit,*. p. 116

[১৩] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit,*. p. 116

ভোগস্বত্ব, ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন অধিকার, মালিকানা এবং ভূমির সঙ্গে কৃষক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করাই হলো ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়।

বাংলার সুলতানী শাসনের ভূমিব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাক-মুসলিম বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। হিন্দু শাসনামলে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কে ছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বিভিন্ন সময়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, ভূমির স্থায়ী মালিকানা বলতে কিছু ছিল না।[১৪] রাজতন্ত্রের উদ্ভবের পর থেকে রাজা তাঁর রাজ্য সীমায় অবস্থিত সকল ভূমির মালিক এবং তিনি তাঁর অধিকারের অন্তর্গত জমি অধীনস্তদের মধ্যে বণ্টন করতেন। যেসব প্রজা এই ভূমি চাষ করত তারা নির্দিষ্টহারে সরকারকে কর দিতো। হিন্দু শাসনের প্রত্যেকটি শিলালিপি ও তাম্রশাসনে দেখা যায় ভূমির একমাত্র বিক্রেতা রাজা এবং বিক্রীত ভূমি ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হতো বলে রাজা দান ও পুণ্যের এক-ষষ্ঠভাগের অধিকারী হতেন।[১৫] পুণ্যলাভের আশায় রাজা বেশি বেশি ভূমি দান করতেন। রাজার ধারণা ছিল ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করলে ব্রাহ্মণ যে পূজা-অর্চনা করবেন সেই পুণ্যের এক-ষষ্ঠাংশের মালিক হবেন রাজা নিজে। ভূমি বিক্রয়ের ফলে রাজা ভূমির মালিকানা হারালেও কর গ্রহণের মাধ্যমে জমির স্বত্বাধিকারের দাবি বজায় রাখতেন।[১৬]

বাংলায় সুলতানী শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের ভূমিব্যবস্থার সঠিক রূপ তুলে ধরা কঠিন। যে সকল জমির কোনো ওয়ারিশ নেই অথবা মুসলিম শাসনের পূর্বেও সরকারের আওতাধীন ছিল, সেসব ভূমি রাষ্ট্রীয় ভূমির আওতায় আসে। এছাড়া অন্য সব ইসলামি রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলায়ও বিজিত অঞ্চলের বাসিন্দাগণ তাদের নিজ নিজ ভূমির মালিক হিসেবে বহাল থাকে।[১৭] অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনবশত সরকার কোনো কোনো ভূমি রাষ্ট্রীয় ভূমির আওতায় নিতেন। এককথায় বলা যায় এ সময় ভূমিতে কৃষকগণের মালিকানা বা অধিকার স্বীকৃত থাকার কারণে তারা ইচ্ছে করলে জমি বন্ধক, দান, বিক্রি ও বর্গা দিতে পারত, যেখানে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকত না।

---

[১৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০; দামোদরপুরের ১নং লিপিতে রয়েছে যে, শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকভোজ্যে তয়া নীবীধর্মেণ দাতুমিতি; ২নং লিপিতে আছে অপ্রদাক্ষয়নী- মর্যাদয়া দাতুমিতি। ৩ নং লিপিতে আছে হিরণ্যমুপসংগৃহ্য সমুদয় বাহ্যাপ্রদখিলক্ষেত্রানাং প্রসাদং কর্তুমিতি এবং ৫ নং লিপিতে আছে অপ্রদাধরর্মণ শাশ্বতকালভোগ্যা। এছাড়া পাহাড়পুর লিপিতে আছে শাশ্বতকালেলাপভোগ্যক্ষয়নীবী সমুদয়বাহ্যাপ্রতিকর। এসব লিপিতে যা বর্ণিত আছে তার অর্থ হচ্ছে রাজা ভূমির মালিক এবং ভূমি দান করা হচ্ছে সকল প্রকার ভূমি রাজস্ব প্রদান ব্যতীত বা দানকৃত ভূমির কোনো রূপ রাজস্ব প্রদান করতে হবে না। ভূমিগ্রহীতা চিরকাল চন্দ্র-সূর্য-তারার স্থিতিকাল পর্যন্ত কোনো রাজস্ব না দিয়ে ভূমি ভোগ করতে পারবে।

[১৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৫

[১৬] *ঐ*, পৃ. ২৫৭

[১৭] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *প্রাচীন যুগ*, পৃ. ২০৯

আলোচ্য সময়ে পূর্বের তুলনায় অনেক অনাবাদি জমি চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় অনেক জঙ্গল কেটে ভূমি চাষের আওতায় আনা হয়েছিল। মুকুন্দরাম (১৫৪৪-১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেন যে, দেবী চণ্ডী কালকেতুকে আংটি দিয়ে নগদ অর্থে বিক্রি করতে বলেন এবং তাঁর সম্মানে মন্দির নির্মাণ করার নির্দেশ দেন।[১৮] কালকেতু ঐ আংটি বিক্রি করে সাত কোটি টংকা হস্তগত করে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কালকেতু দেবীর সম্মানে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির নির্মাণ করেন এবং অনেক ভূমি কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত করেন। এসব ভূম্যাধিকারীদের অগ্রিম অর্থ প্রদান করেন এবং এখানে অনেক প্রজার বসতি স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

খান জাহান আলী ছিলেন সুলতানী আমলের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা।[১৯] তিনি বর্তমান যশোর শহরের ১০ মাইল উত্তরে বড় বাজার এলাকায় প্রায় ১২৬টি জলাধার এবং বাগেরহাট অঞ্চলে অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন।[২০] কৃষির উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করেন। আবাদি জমিতে লবণাক্ত পানি এসে যাতে অনাবাদি করতে না পারে একারণে তিনি বাঁধ নির্মাণ করেন এবং পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য খাল খনন করেন। এভাবে অনেক জমি ধান উৎপাদনের উপযোগী আবাদি জমিতে রূপান্তরিত হয়। এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্য শ্রমিকদের আবাসস্থলের প্রয়োজন ছিল। ফলে আশেপাশের এলাকায় লোকবসতি গড়ে ওঠে। যদিও প্রত্যেকটি কাজ ছিল দুরূহ আর এসব কাজ কঠিন করে তুলেছিল ভয়াল বাঘ ও মারাত্মক জ্বরের নিত্য উপস্থিতি।[২১] প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও অত্র অঞ্চলের অনেক জমি চাষের জমির অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে উত্তর পশ্চিম বাংলায় হিন্দু অধ্যুষিত পাণ্ডুয়া অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি চাষের জমির অন্তর্ভুক্ত হয়। বিখ্যাত সুফি ও সাধক শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি পাণ্ডুয়ায় মসজিদ নির্মাণ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য তাব্রিজিকে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি দান করেন। তাব্রিজি সারাদেশ থেকে জনগণকে আমন্ত্রণ জানান এবং এখানে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[২২] তিনি লক্ষ্মণ সেনের নিকট

---

[১৮] মুকুন্দরাম বলেন যে,

লহ বর কালকেতু তাজ ধনুঃশর।।
মানিক অঙ্গুরী লই সাত রাজার ধন।।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ রাজ্য গুজরাট বন।।
বসাইবে দিয়া কড়ি গরু আর ধান।।
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান।।
পুজিহ মঙ্গলবারে দিয়া দ্রব্যজাত।। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত, *কবিকঙ্কণ চণ্ডী*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৩১ সন, পৃ. ৭১; *কালকেতু উপাখ্যান*, মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, ২০১৭, পৃ. ৬২

[১৯] Shamsuddin Ahmed (ed.) , *Inscription of Bengal*, vol. 4, Rajshahi, 1960, p.66

[২০] J. Westland, *A Report on the District of Jessore: its Antiquities, its History and its Commerce*, Calcutta, 1871, 2nd ed. pp. 100-101

[২১] J Westland, *op.cit.*, pp. 11-15

[২২] Halayudha Misra, *Sekasubhodaya*, edited by Sukumar Sen, Calcutta, 1963, pp. 217-220

থেকে একাধিক গ্রাম অধিগ্রহণের পাশাপাশি তা চাষযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত করেন এবং সেসব ভূমি জরিপের নির্দেশ দেন। এসব জমির সমন্বিত রাজস্ব বাইশ হাজার মুদ্রা নির্ধারণ করে দলিল তৈরি করেন। আদায়কৃত রাজস্ব তিনি পরিব্রাজক, নিম্নশ্রেণির মানুষ ও দরিদ্রদের মধ্যে প্রত্যহ বিতরণের ব্যবস্থা করেন।[২৩] মূলত পাণ্ডুয়া নগরীতে মুসলিম শাসন সম্প্রসারণে তাঁর (তাব্রিজির) ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাব্রিজির তত্ত্বাবধানে অনেক জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবাদযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে রচিত চীনা বিবরণে বাংলার কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভূমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।[২৪]

ক.৩. বাংলার ভূমির পরিমাপ পদ্ধতি

সুলতানী শাসনাধীনে ভূমি পরিমাপের পদ্ধতি আলোচনা করা দুরূহ। বিভিন্ন উৎস থেকে অনুমান করা যায় কাঠা ও বিঘায় ভূমি মাপা হতো এবং এক বিঘাতে পনেরো কাঠার চেয়ে বেশি জমি হতো। আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, এক বিঘাকে বিশ অংশে ভাগ করা হতো যার প্রত্যেকটি 'বিশওয়াহ্‌শাহ'রূপে পরিচিত ছিল এবং পরিমাপের সময় আর কোনো ভাগ করা হয় না।[২৫] অতএব সুলতানী শাসনাধীনে মাপের একক হিসেবে কাঠা ও বিঘা পাওয়া যায়, কাঠা ছিল বিঘার বিশ ভাগের এক ভাগ। সতেরো শতকের ত্রিপুরার রাজা কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য এবং ধর্ম মাণিক্যের জারিকৃত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, সুলতানী শাসনে কানি ও দ্রোণ ছিল জমি মাপার পরিমাপক।[২৬] জমি মাপার এই একক দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। হোসেনশাহী আমলে সুলতানদের বিজিত চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে সম্ভবত এর ধারাবাহিক ব্যবহার হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে প্রিন্সেপ এর উদ্ধৃতি থেকে ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার জমির পরিমাপে যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ:

৮ হাতি নল = ১২ ফুট
৪ কড়ির গণ্ডা = ২ x ৩ নল : ৯৬ বর্গগজ
কানি = ২০ গণ্ডা = ১২ x ১০ নল = ১৯২০ বর্গগজ
দ্রোণ = ১৬ কানি = ৮০৭২০ বর্গগজ বা ৬.৩৫ একর।[২৭]

---

[২৩] Halayudha Misra, *Sekasubhodaya*, edited by Sukumar Sen, Calcutta, 1963, pp. 217-220

[২৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, " চৈনিক পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬, পৃ.৪১

[২৫] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, pp. 67-68 ; আবুল ফজল আরও উল্লেখ করেন যে, কেউ আবার বিশওয়ানশাহকে বিশ ভাগে ভাগ করে প্রতিভাগকে বলে তপওয়ানশাহ। এটি আবার তারা বিশ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগকে বলে অনমওয়ানশাহ। . . . এত একশ বিঘার মাপে দশ বিঘা কম হয়। এত মাপের ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি হয়।

[২৬] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, pp. 67- 68

[২৭] M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, pp. 139-140

এ পরিমাপে দেখা যায় যে, এক কানি জমি ৩৯.৮৬৭৫ বা প্রায় ৪০ শতাংশের সমান। মধ্যযুগে জমি মাপার কাজে নল বা বাঁশ ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের অনেক জেলায় বিশেষ করে নোয়াখালিতে জমি মাপা হয় শাহি কানি হিসেবে।[২৮] আবার শ্রীহট্টে সর্বোচ্চ মান ছিল হাল এবং সর্বনিম্ন মান ছিল ক্রান্তি। শ্রীহট্টের ভূমি পরিমাপের হিসেব ছিল নিম্নরূপ-

৩ ক্রান্তি = ১ কড়া
৪ কড়া = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ পণ
৪ পণ = ১ রেখা
৪ রেখা = ১ ষষ্ঠী
৭ ষষ্ঠী = ১ পোয়া
৪ পোয়া= ১ কেদার বা কেয়ার
১২ কেয়ার = ১ হাল (সাড়ে ১০ বিঘা = সাড়ে ৩ একর)।[২৯]

উল্লেখ্য যে, জমি মাপার বিভিন্ন একক থাকলেও বড় একক ছিল কানি এবং বাংলার সুলতানগণ এ মাপের প্রচলন করেছিলেন বলেই অনুমিত হয়। জমির মাপের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ জমি মাপের মাধ্যমেই ব্যক্তিগতভাবে অধিকারে কে, কী পরিমাণ জমির মালিক তা জানা যেতো। তৎকালীন সময়ে বীজ বা ধান বুননের মাধ্যমে জমি মাপা হতো বা রাজস্ব আদায় হতো। যেমন- এক আঢ়া বা আঢ়ক অর্থাৎ ১৫-২০ কিলো ধান বোনার মতো জমি ছিল এক দ্রোণ। শব্দকল্পদ্রুমে মাপের এই পদ্ধতি পরিমাণ দেখা যায়। পূর্ব বাংলার কিছু অঞ্চলে হালের প্রচলন ছিল।[৩০] একজন কৃষক তার একটি হালের সাহায্যে কী পরিমাণ জমি চাষ করত সে সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করতে পারি। বাংলার সিলেট অঞ্চলের একটি হাল দিয়ে ১০.৫ বিঘা বা প্রায় ৩.৫ একর জমি চাষ করা যেতো।[৩১] উত্তর বাংলার দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে বুকানন হ্যামিল্টন বলেছেন যে, 'এক হাল দিয়ে সাধারণত যে পরিমাণ জমি চাষ করা যেতো তা হচ্ছে বাংলার দশ বিঘা বা পনেরো বিঘা এবং কলকাতার বিঘা বা পাঁচ একর'।[৩২] তবে হালের বা লাঙলের প্রকৃতি অনুসারে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম কর নির্ধারণ করা হতো। মুকুন্দরাম তৎকালীন বাংলায় প্রচলিত মাপের একক হিসেবে 'কাঠা' ও 'কুড়ার' কথা উল্লেখ করেছেন। কবির এ বর্ণনা থেকে স্বল্প পরিসরে হলেও জমি জরিপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। প্রজাদের যন্ত্রণাকাতর প্রার্থনায় কান না দিয়ে 'শিকদার' ১৫ কাঠায় 'এক কড়া' হিসেবে

---

[২৮] M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, pp. 139-140
[২৯] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮
[৩০] R. C. Majumder, *History of Bengal*, vol. 1, p. 654
[৩১] *Ibid*
[৩২] *Ibid*

মেপেছিলেন।[৩৩] বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে জমি জরিপ অনুসরণ করা হতো এবং বাংলার অন্য অঞ্চলে ফসলের মূল্য বিচার করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

নিচের তথ্য থেকে তৎকালীন বাংলার জমি পরিমাপের ধরন সম্পর্কে জানা যায়।

৮ মুষ্টি = ১ কুঞ্চি
৮ কুঞ্চি = ১ পুস্কল
৪ পুস্কল = ১ আঢ়ক (আঢ়)
৪ আঢ়কে = ১ দ্রোণ।
৮ দ্রোণে = ১ কুল্যবাপ।[৩৪] পরে এই মাপগুলো রৈখিক মাপে রূপান্তরিত হয়ে হাতের মাপে পরিণত হয়। এই মাপ সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। এই বিঘা এবং কাঠা পদ্ধতি বাংলায় প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলাসহ বাংলার কিছু অংশে প্রচলিত জমির মাপ ছিল নিম্নরূপ:

৪ কাকিনি (কানি) = ১ উয়ান
৫০ উয়ান = ১ আড়ি
৪ আড়ি = ১ দ্রোণ । লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন লিপিতে উয়ান এককটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঐ লিপি অনুযায়ী- ১২ অঙ্গুলি (১২ আঙ্গুল প্রসারিত) = ১ হাত

৩২ হাত = ১ উম্মান (উয়ান)।কৃষিপ্রধান বাংলায় যেভাবে ফসল মাপা হতো সে অনুযায়ী ১৬ আউন্সে ১ পাউন্ড হয়। ঐ মাপ অনুযায়ী দিল্লি রতল বা মণের ওজন ২৮.৮ পাউন্ড বা আজকের ওজন মানের প্রায় ১৪ সের।[৩৫] তবে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে ষোলো শতকের প্রথম দিকে বাংলার কিছু অংশে সের বা আধা এর প্রচলন ছিল। সময়ের সাথে ফসল মাপের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। টোডরমলের জরিপ ব্যবস্থায় ভূমির পরিমাপের ২০ কাঠাতে এক বিঘা ধরা হতো এবং লোহার আংটাযুক্ত বাঁশের দণ্ড ভূমি পরিমাপে ব্যবহৃত হতো। এ পরিমাপ যন্ত্র ৬০ গজের সমতুল্য ছিল, যাতে ৩৬০০ (৬০×৬০) বর্গগজের এক খণ্ড জমি এক বিঘার হিসেব ধরা হতো।[৩৬] এ সময়ে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রজাদের উৎসাহ প্রদান করা হতো।

---

[৩৩] M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 115; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কনচণ্ডী*, ১ম খণ্ড, ডি সি সেন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২

[৩৪] Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, 1494-1538 A.D, A Socio- Political Study, Dhaka University, 1999, p.140

[৩৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৮৮; N K Bhattashali, *Coin and Chonology*. p. 144

[৩৬] Abul Fazl, *op. cit.*, vol. 2, p. 68

বাংলার কৃষি ও চাষ পদ্ধতি

সুলতানী শাসনে বাংলায় পুরাতন ও নতুন উভয় পদ্ধতিতে জমি চাষ করা হতো এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা হতো। বছরে দু'বার এবং কোনো কোনো স্থানে তিনবার ফসল উৎপন্ন হতো।[৩৭] বাংলায় একই ভূমিতে পর্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন ছিল প্রকৃতির অসীম দান। আর কোনো বিশেষ ধরনের মাটিতে কোনো ধরনের ফসল উৎপাদন সবচেয়ে উপযোগী হবে সেটা ছিল কৃষকের অভিজ্ঞতার ব্যাপার। কারণ বাংলার কৃষকগণ ছিল স্বজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট সচেতন। বাংলার কৃষি সেচব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মৌসুমি বৃষ্টিকে কৃত্রিম সেচব্যবস্থা দিয়ে পরিপূরণ করা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কুয়া, খাল, বিল প্রভৃতি ছিল সেচের প্রধান উৎস। কুয়া থেকে জল তোলার যত রকমের পদ্ধতি এখন চালু আছে, তার প্রায় সবই এ সময়ে প্রচলিত ছিল। এছাড়া সেচের সুবিধার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি সড়ক নির্মাণ করেন। ঐ সড়ক কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বাঁধ নির্মাণের কাজ করেছিল। কানিংহাম সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির নির্মিত সড়ক সম্পর্কে বলেন যে,

> আমি গৌড় থেকে দেবকোট পর্যন্ত গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নির্মিত সড়কের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করেছি। এই সড়কের অনেক জায়গায় পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু সড়কের বেশির ভাগ উঁচু অংশ এখনও অটুট অবস্থায় রয়েছে যা আশি থেকে একশ ফুট প্রশস্ত এবং চার থেকে পাঁচ ফুট উঁচু। কৌশলগত এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছাড়াও এই রাজপথ সুলতানের রাজ্যের অধিবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের কাছে ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। এটি আন্তঃদেশীয় বাঁধের ভূমিকা পালন করত এবং দেশের মানুষের বাসস্থান ও ফসলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করত।[৩৮]

কানিংহামের এই বিবরণ থেকে দেখা যায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই কৃষিকাজের সুবিধার্থে বাঁধ নির্মিত হয়। শুধু সময়ের সাথে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে এই সেচ পদ্ধতির অগ্রগতি হয়েছে। আবুল ফজল বর্ণনা করেন যে, জমি চাষ সাধারণত বৃষ্টি আর কিছু অংশ কুয়া থেকে পানি উত্তোলন করে আবাদ করা হতো, এ জন্যই ঐ জমি কুয়ার সেচের ওপর নির্ভর করত।[৩৯] ভারতের লাহোর প্রদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে চাষাবাদ হতো কুয়া সেচের সাহায্যে। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পর্যটক ট্যাভারনিয়ার গোলকুণ্ডাকে 'পুকুরে' ভর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন সেগুলো তৈরি হতো কখনও কখনও আধ লীগ লম্বা করে। আর এভাবে প্রাকৃতিক নিম্নভূমিতে বর্ষার জল ধরে রেখে পরে জমিতে

---

৩৭ Abul Fazl, *op.cit.,* vol. 1, p. 389

৩৮ Alexander Cunningham, *Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-1880, From Patna to Sunargaon,* XV, Delhi, 1969, p. 44

৩৯ Abul Fazl, *op.cit.,* vol. 1, p. 513

সেচের কাজে লাগানো হতো।[৪০] বাংলার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করে সেচের ব্যবস্থা করা হতো বলেই ধারণা করা হয়।

নদীবহুল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার পানিতে নদী ভরে জমি ভাসিয়ে দিতো। মিনহাজ উল্লেখ করেন যে, . . . the during rainy season the entire area is flooded.[৪১] নদীর পানিবাহিত জমিতে উর্বরা পলিমাটি জমার ফলে সেখানে সেচ এবং সারের প্রয়োগ দুটোই হতো পুরোপুরি প্রাকৃতিক উপায়ে। নরম পলি পড়া মাটিতে নদীর গতিপথের প্রতিবন্ধকতার ফলে গোটা সমভূমি জুড়ে গড়ে উঠতো অসংখ্য পরিত্যক্ত খাত। বন্যার সময়ে যখন নদী থেকে পানি ঢুকতো তখন খাতগুলো আবার পানিতে ভরে যেতো। বাঁধ দিয়ে পর্যায়ক্রমে পুরনো খাতগুলোর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হতো।[৪২] অন্যদিকে বন্যা বা পানি আটকানোর জন্য বাঁধ দেওয়ার ফলে উর্বর জমির পরিমাণ কমে যেতো। পরবর্তীকালে খাল কেটে সেচব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ফিরোজশাহ তুঘলকের ন্যায় খানজাহান আলীও কৃষির সেচের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো পুকুর ও খাল খনন করেন।[৪৩] সমকালীন বাংলায় বড় বড় দীঘি খনন করার প্রমাণ রয়েছে এবং ঐসব দীঘি থেকে সেচব্যবস্থা পরিচালনা করা হতো। যেমন-খান জাহান আলীর দীঘি। অর্থাৎ বাংলায় পানি সেচব্যবস্থার প্রসারে এরকম ছোট বড় দীঘি খনন করার নজির রয়েছে।

সুলতানী বাংলায় কৃষিকাজে নতুন প্রযুক্তি সাকিয়া বা জলচক্র এবং চাপযন্ত্র ব্যবহার করায় কৃষিজপণ্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়।[৪৪] প্রাক-মুসলিম যুগে অরঘট বা ঘটিযন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কানায় কানায় কলসি বেঁধে দড়ির সাহায্যে পানি তোলা হতো। এর দ্বারা কেবল নদী বা ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী জলাশয় থেকে পানি তোলা হতো।[৪৫] সাকিয়ার সাহায্যে নদী বা জলাশয় ছাড়াও গভীর কূপ থেকে পানি তোলা হতো। গিয়ার ব্যবস্থাযুক্ত করে যন্ত্রটি পরিচালনা করায়

---

[৪০] Tavernier, *op.cit.*, vol.1, pp. 121-122

[৪১] Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, vol. 1, p. 161

[৪২] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), Asia Publishing House, New York, 1963, pp. 30-31

[৪৩] ফিরোজ শাহ তুঘলক ৫টি খাল খনন করেন। এর মধ্যে ২টি বিখ্যাত খাল ছিল যমুনা নদী ও শতদ্রু নদী থেকে কেটে আনা হয় এবং কর্নোল এর নিকট দিয়ে প্রায় ১২ মাইল ঘুরে হিসার সিরাজের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ৩য় খালটি সরস্বতী নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি সরবরাহ করত। ৪র্থ খালটি ১৫০ মাইল এলাকায় পানি সরবরাহ করত এবং এটা হিসার ফিরোজায় এসে শেষ হয়। একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি সরবরাহ করত। ৫ম খালটি সরস্বতী এবং মরকনদ নদীকে সংযুক্ত করে; উভয় নদীর মধ্যবর্তী উচ্চ ভূমিতে এই নদী পানি সরবরাহ করত। সুলতান ফীরুজশাহ তুঘলক, *ফুতুহাত-ই-ফীরূজশাহী*, অনুবাদক, আব্দুল করিম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ.৩০ মূলত সুলতান এই খাল খনন করে খুব প্রশংসিত হন এবং এ সময়ে কৃষির সেচব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়।

[৪৪] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, ICBS, DU, 1995, pp. 91-92

[৪৫] ইরফান হাবীব, “ইতিহাস গবেষণায় প্রযুক্তি চর্চার গুরুত্ব”, ইরফান হাবীব সম্পাদিত, *মধ্যকালীন ভারত*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কো. কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৩

অনেকটা দূরে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে সেচের পানি পৌঁছানো সম্ভব হতো। এছাড়া পশু শক্তিকে গিয়ার বা চাকা ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করে কূপ থেকে সবসময় পানি উঠানো সম্ভব হতো। ঐতিহাসিক ইরফান হাবীব বলেন- একাদশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বে চাকার প্রচলন শুরু হয়। মুসলিম শাসনের পূর্বে ভারতের অন্য কোথাও অরঘট ছাড়া পানি তোলার জন্য চাকাযুক্ত এ যন্ত্রের কথা উচ্চারিত হয়নি। মোগল বাদশাহ বাবর তাঁর আত্মচরিত *বাবরনামায়* প্রথম এর বর্ণনা দেন। তিনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করেন।[৪৬] তিনি উল্লেখ করেন যে, জমিতে বালতি ভরে পানি দিয়ে সেচ দেওয়া হয় নতুবা চরকি দিয়ে পানি তুলে সেচ দেওয়া হয়। এছাড়াও চাকা ঘুরিয়ে পানি তুলে জমিতে সেচ দিয়ে থাকে। অনেক স্থানে মেয়ে, পুরুষ কলসি বা বালতি ভরে পানি এনে ক্ষেতে দেয়।[৪৭] সম্রাটের এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে চাকা ঘুরিয়ে পানি সেচের পদ্ধতি বাংলায়ও প্রচলিত ছিল। চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা বাংলায় মেঘনা নদীতে জলচক্রের ব্যবহার লক্ষ করেন।[৪৮] সুতরাং মুসলমানদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় বাংলায়ও এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়ে কৃষির উন্নতির জন্য সরকারের পাশাপাশি কৃষকদেরও ব্যক্তিগত অবদান ছিল। চীনা পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সুলতানী আমলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য কারণ সেচব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার ভারতের পাশাপাশি বাংলায় প্রচলিত ছিল।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রথম শাসক যিনি কৃষির সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ঋণদান করেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় নির্দেশনামা তৈরি করেন। এছাড়া কৃষির সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য এবং কৃষি বিভাগের জন্য 'দিওয়ান-ই-আমির-ই-কোহি' পদ প্রতিষ্ঠা করেন। দিওয়ানের অধীন অফিসাররা কৃষির সম্প্রসারণের দায়িত্ব নেন এবং সুলতান তাদেরকে নতুন নতুন শস্য চাষের নির্দেশ দেন।[৪৯] সুতরাং সুলতানগণ কৃষির সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে বাংলায় এমন ঋণ প্রদান করা হতো কিনা তা বলা দুরূহ।

[৪৬] ইরফান হাবীব, "ইতিহাস গবেষণায় প্রযুক্তি চর্চার গুরুত্ব", ইরফান হাবীব সম্পাদিত, *মধ্যকালীন ভারত*, পৃ. ১১

[৪৭] Zahiruddin Muhammad Babur, *The Babur Nama, Memories in Babur*, pp. 487- 488

[৪৮] Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta*, p. 241

[৪৯] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন* (১২২-১৭৫০), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৯

বাংলার উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য

বাংলার মাটির অসাধারণ উর্বরাশক্তির কারণে বিভিন্ন রকম ফসল উৎপন্ন হতো। ধান রোপণ করা হতো কয়েকটি পদ্ধতিতে। যথা-১. সরাসরি ধান ছিটিয়ে, ২. রোপণ করে বা সারিবদ্ধভাবে ধান রোপণ করে এবং ৩. মূল বীজতলা থেকে নতুন স্থানে চারা রোপণ করে। এ পদ্ধতির মধ্যে ধানের চারা রোপণ করা হতো এবং অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা সম্ভব হতো।[৫০] বাংলায় প্রচুর ধান উৎপাদন করা হতো।[৫১] মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থ থেকে আমন ধান চাষের কথা জানা যায়। আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, ক্রমান্বয়ে একই জমিতে বছরে তিনবার ধান রোপণ করা ও কাটা হতো। তিনি এক বিশেষ ধরনের ধানের কথা (long steamed rice) উল্লেখ করেছেন পানির উচ্চতার ক্রমান্বয়িক বৃদ্ধির সঙ্গে যার বোঁটা বৃদ্ধি পেতো এবং এর ফলে পানি ফসলের কোনো ক্ষতি করতে পারত না।[৫২] তিনি আরো বলেন যে, a large vase would be filled up, if a single grain of each kind were collected.[৫৩] তাঁর এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। সুলতানী বাংলায় বিভিন্ন নামের ধান উৎপন্ন হতো এবিষয়ে গবেষণা করেছেন আধুনিক যুগের গবেষক মিজানুর রহমান। তিনি *Agricultural extension in Medieval Northern Bangladesh: Archaeobotanical Evidence from Sotisher Danga-* শীর্ষক গবেষণাকর্মে মধ্যযুগের ধান উৎপাদনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি নানা রকম ধানের নাম দিয়েছেন। তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দুটি সারণীতে সুলতানী আমলে উৎপন্ন কৃষিজপণ্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন নবাবি আমলের তুলনায় সুলতানী আমলে ধান, বার্লি ও বিভিন্ন রকম ফল বেশি উৎপন্ন হতো।[৫৪] এদেশে প্রচুর গম উৎপন্ন হতো এবং ভারতে তা রপ্তানিও হতো।[৫৫] বাংলার উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ছিল আদা, মরিচ, হলুদ, সুপারি ও বিভিন্ন ধরনের ডাল।[৫৬] মসলা জাতীয় জিনিসের মধ্যে অন্যতম ছিল পিপলু। যা বাংলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো।[৫৭] চৌদ্দ শতক থেকে বাংলায় প্রচুর পাট উৎপাদনের কথা জানা যায়। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে

---

৫০ রামাইপণ্ডিত, *শূন্যপুরাণ*, পৃ. ১৮৬

৫১ Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), Asia Publishing House, New York, 1963, p. 36

৫২ Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 134

৫৩ *Ibid*

৫৪ Mizanur Rahman, Medieval Agriculture: An Archaeobotanical Study, *History of Bangladesh*, ed. Abdul Momin Chowdhury, Society Economy Culture, vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, 2020, pp. 90-100

৫৫ Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India, p. 37

৫৬ Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 134

৫৭ Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 390; পিপলু ফল শুকিয়ে মসলা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ভারতে এটি ব্যবহার করা হতো এছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় রান্নার মসলার মিশ্রণে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India, p. 46

উৎপন্ন হতো। নারকেলের এত বেশি প্রাচুর্য ছিল যে, এগুলো অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলায় প্রচুর ফল খাওয়ার প্রচলন ছিল।[৫৮] কলা, আম, কাঁঠাল, ডালিম, কমলালেবু, খেজুর ইত্যাদি ছিল বাংলার সুপরিচিত মৌসুমি ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য সময়ে বছরে দুবার (রবিশস্য বা বসন্তকালীন ফসল এবং খরিফ শস্য বা হৈমন্তি ফসল) ফসল উৎপাদিত হতো।[৫৯] ইবনে বতুতার বিবরণেও একই জমিতে বছরে দুবার ফসল উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সব জমিতেই দুবার ফসল উৎপন্ন হতো না বরং এরূপ উর্বর জমি নিশ্চয়ই ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।[৬০] তবে কৃষকরা একই জমিতে প্রতি বছর মোটের ওপর দুবার ফসল ফলাত। বর্তমানকালে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য এবং সুলতানী ভারতে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না বলেই অনুমান করা যায়। তেরো শতকের শেষের দিকে দিল্লিতে প্রায় পঁচিশ ধরনের ফসল উৎপাদন হতো।[৬১] সুলতানী বাংলায় কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চাল, ডাল, যব, ভুট্টা, শিম, তিল ও তৈলবীজ, ইক্ষু এবং তুলা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬২] ইবনে বতুতার বিবরণে বাংলার প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। রামাইপণ্ডিত বিরচিত *শূন্যপুরাণ* কাব্যগ্রন্থে বাংলায় উৎপাদিত প্রায় এক হাজার রকমের ধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৩] এসব ধান থেকে প্রচুর চাল হতো যা দেশীয় চাহিদা পূরণের পর রপ্তানি হতো। বার্নিয়ার বলেন যে, বাংলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতো চাল উৎপন্ন করে যে, তা কেবল প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে নয় দূরবর্তী রাজ্যসমূহকে সরবরাহ করে। এসব চাল গঙ্গা থেকে পাটনা পর্যন্ত বহন করে আনা হয় এবং সাগর দিয়ে মসলিপট্টম ও ভারতীয় উপকূলের বহু বন্দরে রপ্তানি করা হতো। এছাড়া বিদেশি রাজ্য বিশেষ করে সিংহল ও মালদ্বীপে পাঠানো হয়।[৬৪] পর্যটক মার্কো পোলো বাংলার প্রচুর পরিমাণ আদা ও মসলাপাতি উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। ভেষজ লতাপাতা, মসলা ও সুগন্ধি কাঠ, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, গম, যব, জোয়ার, মটরশুঁটি, চাল, তিল, তৈলবীজ, ইক্ষু এবং তুলা ছিল প্রধান ফসল।[৬৫] বাংলার পাট ইউরোপীয় বণিকদের দৃষ্টি

---

[৫৮] Ralph Fitch, *op.cit.*, p.119

[৫৯] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, pp. 136-138

[৬০] Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (edited), *The Cambridge Economic History of India*, vol. 1, Orient Black Swan, Cambridge University Press, 1982, Reprint. 2014, New Delhi, p. 50

[৬১] অনিরুদ্ধ রায়, *অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, পৃ. ৮

[৬২] *ঐ*

[৬৩] K M Ashraf, Economic Life under the Sultanate, H.S Bhatia Edited, *Political, Legal and Military History of India*, vol. 4, Deep & Deep Publication, New Delhi, 1992, p. 256

[৬৪] Bernier, *op.cit.*, pp. 437-438

[৬৫] Marco polo, *The Travels of Marco polo,* J M Dent & Sons Ltd, London, 1954, p.261

আকর্ষণ করেছিল। সেই যুগে পাট থেকে পণ্যদ্রব্য বাঁধার জন্য রশি ও মোটা পাটের থলে তৈরি হতো।[৬৬] আমির খসরু অবশ্য ভারতে আম, কলা ও পান উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া জিয়াউদ্দিন বারানী ও আবুল ফজল বাংলায় পান চাষের কথা বলেছেন।[৬৭] বাংলায় উৎপাদিত সিরসুতী নামের উন্নত মানের চালের ব্যাপক চাহিদা ছিল দিল্লির বাজারে। উৎপাদিত সব শস্য সাধারণত শস্য গোলায় (grain-pits or khattees) মজুত করা হতো[৬৮] এবং এসব গোলায় শস্য বহুদিন ধরে মজুত থাকত। শস্য ছাড়াও বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে নারিকেলের ফলন ছিল প্রচুর।[৬৯] বার্নিয়ারের মতে, বাংলা থেকে বেশ কিছু পরিমাণ মিষ্টান্ন ফলমূল যেমন- আম, আনারস, হরতকি, লেবু এবং আদা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হতো।[৭০] এছাড়া বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় ফুলের চাষ হতো। যার মধ্যে অন্যতম ছিল হলুদ ও সাদা রঙের ফুল।[৭১] সৌন্দর্য, সৌরভ ও বৈচিত্র্যে বাংলার ফুল অতুলনীয়। তুলসী পাতা ও গাঁদা ফুলের সাথে হিন্দু ধর্মের পবিত্রতার আভা জড়ানো আছে। কারণ হিন্দুদের পূজায় এসব ফুলের গুরুত্ব বেশি। প্রধান প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান ও পারিবারিক উৎসবে ফুল ও ফুলের মালার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রীহট্ট সরকারে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতকুমারী ও চন্দন কাঠ জন্মাত।[৭২] বুগরা খান তাঁর পুত্র সুলতান মুইজুদ্দীন কায়কোবাদকে যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে সুগন্ধি কাঠও ছিল। বাংলায় উপরোক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি ছাড়াও শিল্পকারখানার জন্য অনেক কাঁচামাল উৎপন্ন হতো। এসব কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল তুলা[৭৩], রেশম[৭৪] এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত লাক্ষা[৭৫] প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে মোগল সম্রাট আকবর ও তাঁর পরবর্তী শাসনামলের রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে উৎপাদিত কৃষিজাত ফসলের বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। এসব নথিতে *জিনস-এ-কামিল (jins-i-kamil) বা জিনস-এ-আলা (jins-i-a'la)* শব্দ দুটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যা ফসলের বিভাজন করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

৬৬ J N Das Gupto, *Bengal in the Sixteenth Century A.D*, p.105

৬৭ Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, eng.tra., Ishtiyaq Ahmed Zilli, New Delhi, 2015, p.71; Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 390

৬৮ K.M Ashraf, *op.cit.*, p.118; এই গর্ত বা পরিখাগুলো খোঁড়ার জন্য উঁচু শুকনো জমি বেছে নেওয়া হতো এবং নির্বাচিত স্থানের ভূ-প্রকৃত অনুসারে গর্তের আয়তন ছিল ছোট বড়। এই গর্তে কিছু শুকনো সবজি/খড় পোড়ানো হতো। গর্তের চারপাশে ও গোড়ায় গম বা যবের মূল সারিবদ্ধভাবে ল্যাগানো হতো। তারপর গর্তের মধ্যে শস্য জমা করা হতো। শস্যের ওপর খড় চাপা দেওয়া হতো। মাটির চত্বরটি ১৮ ইঞ্চি হতো এবং গর্তের মুখের ওপর দিয়ে সামনের দিকে প্রসারিত থাকত। এর ওপর গোবর মাটির প্রলেপ দিয়ে আরো মজবুত অভেদ্য করা হতো। ফলে ইদুর এবং পোকা মাকড়ের আক্রমণের হাত থেকে বছরের পর বছর অবিকৃত অবস্থায় থাকত।

৬৯ K.M Ashraf, *op.cit.*, p. 118

৭০ Bernier, *op.cit.*, pp. 30-38

৭১ Ziauddin Barani, *op.cit.*, p.281

৭২ K.M Ashraf, *op.cit.*, p. 118

৭৩ Marco Polo *The Travels of Marco Polo*, p. 204

৭৪ Barnier, *op.cit.*, pp. 439-440; Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 390

৭৫ Tavernier, *op.cit.*,vol. 2, p.18; বাংলায় প্রচুর লাক্ষা উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই লাক্ষা ছিল সবচেয়ে ভালো ও সস্তা।

খাফী খান (khafi khan) তৎকালীন সময়ের শস্যের দুই রকমের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যথা- (ক) *জিনস-এ-গল্লা (jins-i-ghalla)* এবং (খ) *জিনস-এ-কামিল (jins-i-kamil)*। প্রথমটি খাদ্যশস্য আর দ্বিতীয়টি আখ। রাজস্ব সংক্রান্ত শব্দকোষে বলা হয়েছে *জিনস-এ-কামিল* এর মধ্যে রয়েছে আখ, পান ও তুলা ইত্যাদি। কিছু শস্যকে *জিনস-এ-অদনা (jins-i-adna)* বলা হতো ঐসব শস্যকে যা কমদামে বিক্রি হতো। যেমন- জোয়াব, বজরা, জাতীয় দানাশস্য। ইরফান হাবীব উল্লেখ করেন যে, মোগল শাসনের পূর্বেও এই তুলা ও আখ ছিল বাংলার প্রধান অর্থকারী ফসল।[৭৬] মুসলমানরা বাংলায় আগমনের পর জাফরানের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। অভিজাতশ্রেণির কাছে বিক্রির জন্য জাফরান ফলানো হতো।[৭৭] মূলত সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়।

গ. সুলতানী বাংলার কৃষি ও ইকতা ব্যবস্থা

ইকতা (Iqta) ফার্সি শব্দ। ইন্দো-ফার্সি সাহিত্যে ইকতা বলতে সেবার বিনিময়ে ভূমি রাজস্ব ভোগের অধিকারকে বোঝানো হয়েছে।[৭৮] ম্যোরল্যান্ড উল্লেখ করেন যে, সুলতানী যুগে ছোট বা বড় ভূ-খণ্ড থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের অধিকার হলো ইকতা। এর বিনিময়ে ইকতার অধিকারী মুকতিকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো।[৭৯] তেরো শতকে ইকতা শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। মোগল আমলে ইকতা শব্দের পরিবর্তে জায়গির শব্দটি ব্যবহার করা হতো।[৮০] ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, দুই হাজার ঘোড়সওয়ারের অধিকারী মুকতি ইকতার রাজস্ব ভোগ করত কিন্তু এজন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করত না। বারানী ইকতা শব্দটিকে খুব সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৮১] তৎকালীন সময়ে ইকতাকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হতো। ইকতাদার ছিলেন সেবার বিনিময়ে রাজস্ব ভোগের

---

[৭৬] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 39; বাংলার ঢাকা ও মৈমনসিংহ এর এক বিরাট ভূ-খণ্ডে তুলা চাষ হতো। এখানকার তুলা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জাতের তুলা এবং সেই তুলা থেকেই বিখ্যাত বস্ত্রসমূহ তৈরি হতো। যেমন-মসলিন।

[৭৭] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 98

[৭৮] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, pp. 135-137; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৮৩

[৭৯] সুলতান ছিলেন ইকতার মালিক। তিনি খুশিমতো ইকতা দিতেন এবং ইকতার অধিকারী ততোদিন ইকতা ভোগ করতে পারতেন যতদিন সুলতান ইচ্ছা পোষণ করতেন। মুকতি ইকতার কর আদায় ও ভোগের অধিকারী তবে এ কর সুলতানের প্রাপ্য। ইকতার রাজস্ব ভোগ করতে মুকতিকে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হতো যেমন-১. তিনি ইকতার আয় থেকে সেনাবাহিনী পোষণ করবেন এবং সুলতানের জরুরি প্রয়োজন হলে তিনি সেই রাজস্বের অর্থ সরবরাহ করবেন। ২. ইকতার রাজস্ব মুকতিকে দেওয়া হতো অনেক সময় সেনাবাহিনী ব্যয় নির্বাহের জন্য। মূলত, মুকতির গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দুটি-(ক) কর সংগ্রহ করা ও (খ) সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান করা। Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (edited by), *The Cambridge Economic History of India* 1200-1750, vol.1, Orient Black Swan, Cambridge University Press, India, 1982, p. 68

[৮০] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 258

[৮১] Moreland, *op.cit.*, p. 27

অধিকারী। অন্যদিকে মুকতি একাধারে রাজস্বের অধিকারী এবং প্রশাসক।[৮২] সরকারি কর্মচারীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের রীতিকে বলা হতো ইকতা (Iqta)। এক কথায় বলা যায় ভূমি রাজস্ব আদায়ের অধিকার হলো ইকতা (territorial assignment)।

বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই ভূমিব্যবস্থায় ইকতা পদ্ধতি চালু ছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ছিলেন ভিউলি ও ভাগতের মুকতা। তিনি নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পর বিজিত অঞ্চলে তাঁর বিশ্বস্ত ও উচ্চ সামরিক পদের অধিকারী সৈনিককে মুকতা নিযুক্ত করেন। আলী মর্দান খলজি ছিলেন বরসৌলের মুকতা আর হুসাম উদ্দীন ইওজ খলজি ছিলেন গঙ্গাতীরের মুকতা।[৮৩] স্বাধীন সালতানাত যুগেও এ ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। ইকতার প্রধানকে বলা হতো মুকতি (Muqti)।[৮৪] মুকতি ছোট বা বড় ভূ-খণ্ড থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাঁকে রাষ্ট্রের সামরিক এবং কিছু পরিমাণে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ সময় ইকতা ছিল দু'প্রকারের। ছোট ও বড় ইকতা। ছোট ইকতার অধিকারীকে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হতো না। মুখ্যত রাজস্ব আদায় এবং সেই সাথে কিছু সামরিক দায়িত্ব পালন করাই ছিল তাঁর দায়িত্বের অধিক্ষেত্র। অন্যদিকে বৃহৎ ইকতার অধিপতি মুকতিদের রাজস্ব আদায় এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো।

মুকতিগণ ইকতার আয় থেকে একটা নির্দিষ্ট অর্থ সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ করতেন। এছাড়াও আদায়কৃত রাজস্ব থেকে ইকতা পরিচালনার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ (excess money) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব দপ্তরে পাঠাতেন। কেন্দ্রের হিসাবরক্ষক প্রেরিত অর্থের হিসাব নিরীক্ষা করত।[৮৫] উল্লেখ্য যে, রাজস্ব ব্যাপারে মুকতিগণ সবসময় সততার পরিচয় দিতেন না। সুলতান চাইতেন মুকতিরা যাতে অর্থ আত্মসাৎ করতে না পারে। মুকতিরা চাইত অর্থ আত্মসাৎ করতে। মুকতিরা তাদের অধীন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে রেখে অর্থ আত্মসাৎ করত।[৮৬] তাঁদের অসাধুতা ও রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য সরকারকে 'খোওয়াজা' নামে এক শ্রেণির গুপ্তচর নিয়োগ করতে হতো। শাসকগোষ্ঠী

---

[৮২] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp.106-107

[৮৩] Maulana, Minhaj–Ud-Din, Abu-Umar-I-Usman, *Tabakat-I-Nasiri*, eng.tra. Major H. G. Raverty, vol.1, Oriental Books, New Delhi, 1970, pp. 575-576

[৮৪] Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India* 1200-1750, vol. 1, p. 68

[৮৫] *Ibid*, p. 69

[৮৬] *Ibid*, p. 68

যেকোনো সময় মুকতিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বদলি করত। এক ফলে মুকতিরা নির্দিষ্ট কোনো গ্রাম অঞ্চলভিত্তিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারত না। শাসকগণের নির্দেশে অনেক মুকতিকেই কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হতো। তাই মুকতির উদ্দেশ্য থাকত সংগৃহীত পণ্যশস্যকে জমিতেই নির্দিষ্ট দামে ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা। এভাবে ভূমিতেই পণ্যশস্য বিক্রি করে রাজস্বের অর্থ আদায়ের জন্য এক বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হয়। ইকতাব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ দ্রুত করেছিল।

ইবনে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক ইকতা প্রথার প্রচলিত হলে পরবর্তীতে ইকতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলা পুনঃদখল করে এ প্রদেশকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং লখনৌতি-এ তিন ইকতায় বিভক্ত করেন।[৮৭] সুলতানী বাংলায় পর্যায়ক্রমে অনেক ভূমি ইকতার অধীনে আসে এবং ইকতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কেননা বেশিরভাগ সামরিক-বেসামরিক রাজকর্মচারীদেরকে ইকতা প্রদানের মাধ্যমেই বেতন বা ভাতা দেওয়া হতো। *বাবরনামায়* উল্লেখ রয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে রাজকোষ, অশ্বশালা এবং সকল রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিভাগের ব্যয়ভার নির্বাহের নিমিত্তে পরগনা নির্ধারিত করে দেওয়া হতো এবং অন্য কোনোভাবে আর কোনো অর্থ প্রদান করা হতো না।[৮৮] উল্লেখ্য যে আলোচ্য সময়ের জায়গির প্রথা ইকতা প্রথারই এক বিশেষ রূপ। জায়গির জমিতে জায়গিরদারগণ রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। সমগ্র মুসলিম শাসনামলে বাংলায় জায়গিরদারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[৮৯] যার প্রভাব মোগল শাসনেও পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে নবাব মুর্শিদকুলি খান ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলাকে ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে সামরিক ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রকার জায়গিরের সংখ্যা ছিল ৪১০টি এবং এর আয় ছিল ৩৩,২৭৪৭৭ টাকা।[৯০]

আলোচ্য সময়ে একজন মুকতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন- (ক) সুলতান নিজে ইকতা প্রদান করতেন। মুকতির নিজস্ব কোনো আঞ্চলিক বা সার্বভৌম অধিকার ছিল না। সুলতান তাকে কোনো অঞ্চল শাসনের জন্য নিযুক্ত করতেন আবার ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় তিনি তাকে স্থানান্তরিত করতে পারতেন। মূলত সুলতানের ইচ্ছার ওপর মুকতির নিয়োগ নির্ভর করত। (খ) মুকতি ছিলেন সুলতানের অধীন ইকতার শাসক। বারানীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বলবন তাঁর পুত্র বুগরা খানকে (আরামপ্রিয়

---

৮৭ Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, eng. tra. Ishtiyaq Ahmed Zilli, Delhi, 2015, p. 277
৮৮ Zahirud-din Muhammad Babur Padshah Ghazi, *The Babur Nama, Memoirs in Babur*, pp. 482, 676
৮৯ Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*,p. 321
৯০ Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol. 2, 1st ed. 1967, p. 131

ও অলস লোক ছিলেন) বাংলার শাসক হিসেবে প্রেরণের সময় তাকে সতর্ক ও সজাগ হতে পরামর্শ দিয়ে বলেন যে, যদি পিতার পরামর্শ অমান্য করেন তবে তাকে সিংহাসন হারাতে হবে। বলবন পুত্রকে সুলতান (ইকলিমদারি) ও গভর্নরের (বিলায়েতদারির)[৯১] মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। সুলতান ভুল করলে তা সংশোধনের অবকাশ থাকে না এবং তিনি ধ্বংস হয়ে যান। অন্যদিকে মুকতি যদি কাজে অদক্ষ হন বা অবহেলা করেন, তাহলে তিনি পদচ্যুত হন। সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব বিভাগের অন্য কর্মচারীগণ বিরোধ করলে সুলতান তাদের যেকোনো সময় পদচ্যুত করতেন। (গ) মুকতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সুলতানের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। (ঘ) মুকতিকে তার অধীন অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করতে হতো এবং সেই আদায়কৃত রাজস্ব থেকে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর বাকি অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রেরণ করতে হতো। (ঙ) মুকতি ইকতার যে রাজস্ব ব্যয় করতেন তা পরীক্ষা করার জন্য একজন হিসাব নিরীক্ষক থাকত। হিসাব নিরীক্ষক যদি দেখতেন মুকতির কাছে সরকারের পাওনা আছে তাহলে তা কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে কঠোরভাবে আদায় করে নেওয়া হতো।[৯২] মূলত মুকতিদের অবস্থান ছিল আমলাদের মতো। সুলতান তাদের নিয়োগ দিতেন এবং বদলিও করতে পারতেন। এছাড়া সুলতানের নির্দেশ মতো কার্যাবলি পরিচালনা না করলে সুলতান তাকে পদচ্যুত করতেন। মুকতিকে মনে রাখতে হতো যে, দেশ ও প্রজা (রায়ত) সুলতানের এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। মুকতি তাদের দেখাশোনার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন মাত্র। এ সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। যেখানে শাসক ও মধ্যবর্তীস্থানের কর্মসম্পাদনকারী ও অধিকারীদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। মূলত প্রশাসনিক কাজে তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

ঘ. সুলতানী বাংলার ভূমি রাজস্ব নীতি

তেরো শতকের শুরুতে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি রাজস্বব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাংলার সুলতানগণ এদেশে সেন শাসনামলের প্রচলিত ভূমি রাজস্ব প্রথার সাথে নতুন প্রথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটি নতুন রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ সময় রাজস্বের উৎস ছিল প্রধানত ৪ প্রকার- যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাহ), ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক। মিনহাজের মতে, ইবনে বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের পর প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করেন এবং সেই সম্পদ থেকে

[৯১] Ziauddi Barani, *Tarikh-I-Firoz Shahi*, pp. 43-50; রাজধানীর কাছাকাছি অঞ্চলকে বলা হতো ইকতা এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলোকে বলা হতো বেলায়েত। তেরো ও চৌদ্দ শতকে ওয়ালীর অধীনে যে প্রদেশ ছিল ঐ প্রদেশকেই বলা হতো বিলায়েত।

[৯২] W. H. Moreland, *op.cit.*,Appedix-B, pp. 218-222

তিনি কিছু দ্রব্যসামগ্রী উপঢৌকন হিসেবে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিনের নিকট প্রেরণ করেন।[৯৩] বাংলার পরবর্তী সুলতানগণও বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। সুতরাং সুলতানী শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রাজ্যের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসরূপে গণ্য হতো। মুসলিম আইন অনুযায়ী এই সম্পদ একত্রিত করে চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা এবং এক-পঞ্চমাংশ রাজকীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল।[৯৪] তবে বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এ নিয়ম পরিপূর্ণভাবে পালন করতেন বলেই ধারণা করা যায়।

সাধারণত ভূমি রাজস্ব এর অর্থ হলো প্রজা কর্তৃক ভূমিতে উৎপাদিত সকল সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের অংশীদারিত্বের অধিকার। ন্যায় ও কার্যকর নীতির ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা মুসলমান শাসকদের প্রধান লক্ষ ছিল। যাতে অধিক ভূমি চাষাবাদ হয় এবং বেশি অর্থ রাজকোষে জমা পরে। ঐতিহাসিক ম্যোরল্যান্ড বিখ্যাত ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ আবু ইউসুফ-এর '*কিতাবুল খারাজ*' গ্রন্থের কতকগুলো প্রধান প্রধান রীতির কথা বলেছেন যার মাধ্যমে সুলতানগণ ভূমি রাজস্ব নীতি নির্ধারণ করেন। (১) রাষ্ট্রের চাহিদা হবে ন্যায়সঙ্গত, অতিরিক্ত কিছু নয়। কোনোক্রমেই তা প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেকের বেশি হবে না। (২) খাজনা ধার্যের ব্যাপারটা হয় সরকার এবং চাষির মধ্যে উৎপন্ন শস্য ভাগাভাগির দ্বারা অথবা জমি পরিমাপের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। (৩) রাষ্ট্র ও প্রজাসাধারণের পক্ষে অসুবিধাজনক না হলে এবং মুসলিম আইনের পরিপন্থি না থাকলে রাজস্বব্যবস্থায় সাধারণত স্থানীয় প্রথা অনুসরণ করা হবে।[৯৫] সুলতানী শাসনামলের বাংলার জমিদারগণ খালিসা জমির ক্ষেত্রে করদাতারূপে অথবা ইজারাদার হিসেবে রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। আমিলগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং জমিদাররা ছিলেন মধ্যস্থ ব্যক্তি। মূলত সুলতানী বাংলায় এসব মধ্যস্থ ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল। সুলতানগণ এ পদ্ধতি পছন্দ করার বিশেষ কয়েকটি কারণ ছিল বলে ধারণা করা যায়- (১) যে সমস্ত হিন্দু ভূ-স্বামী মুসলমান শাসকদের বশ্যতা স্বীকার করে কর দিয়েছেন তাদেরকে তাদের অধীন এলাকা থেকে অপসারণ করা হয়নি। অর্থাৎ তারা পূর্বের পদেই বহাল ছিল। (২) সুলতানগণ তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য হিন্দু রাজাদের সহযোগিতা অনুভব করেন। (৩) এছাড়া সুলতানগণ ব্যক্তিগত সুবিধার্থে প্রচলিত প্রথার ব্যাঘাত ঘটাননি এবং বাংলার রাজস্বব্যবস্থায় খুব বেশি পরিবর্তন ঘটাননি। জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রথা তাদের নিকট সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। এছাড়া

[৯৩] Maulana, Minhaj-Ud-Din, Abu-Umar-I-Usman, *Tabakat-I-Nasiri*, eng.tra. Major H. G. Raverty, vol. 1, Oriental Books, New Delhi, 1970, p.560

[৯৪] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*, পৃ. ৭৬

[৯৫] W H Moreland, *Agrarian System of Moslem India*, p. 14

আর্থিক দিক থেকেও এটা কম ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। সেজন্যই জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো এবং আমিল ও শিকদারদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের এলাকা সীমিত ছিল।

সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার শাসকগণ শুরু থেকেই হিন্দু শাসনে প্রবর্তিত ভূমি রাজস্বব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারা প্রজাদের স্থানীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আলোচ্য সময়ে সুলতানগণ প্রজার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। শাসকগণ বিজিতদের ওপর তাদের নিজস্ব (মুসলিম) রাজস্ব পদ্ধতি চাপিয়ে দেননি। মূলত কৃষকগণ কর্তৃক উৎপাদিত ফসলই ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। তাই শাসকগণের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য ন্যূনতম কর ধার্য করা, যাতে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক মিনহাজের মতে, আলী মর্দান খলজি সিংহাসনে আরোহণ করলে পার্শ্ববর্তী (হিন্দু) রায়গণ তাকে রাজস্ব পাঠাতে শুরু করে।[৯৬] সুলতান মুগিস-উদ্দিন ইউজবেক মন্দারন ও নদীয়ার ভূমির রাজস্ব দিয়ে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন (১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে)।[৯৭] সুলতান রুকন-উদ্দিন কাইকাউস বঙ্গের (পূর্বাঞ্চলের) ভূমি রাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থ দিয়ে নতুন করে স্বনামে মুদ্রা জারি করেন।[৯৮] দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন তিনি এক ঘোষণাপত্রে (বাংলার) জমিদারদের ভূমি রাজস্ব মওকুফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[৯৯] এ সময়ে বাংলার প্রজাসাধারণ ধার্যকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সময়মতো পরিশোধ করত।

সুলতানী বাংলার রাজস্বব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, (১) রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। (২) বার্ষিক খাজনা আটটি মাসিক কিস্তিতে দেওয়া হতো, (৩) পণ্যশস্যের মূল্য বিচার অনুসরণ করা হতো, (৪) সরকারকে নগদ অর্থে খাজনা প্রদান, (৫) সরকার ও প্রজার মধ্যে ফসলের ভাগাভাগির রীতি বাধ্যতামূলক ছিল না, (৬) রাজস্ব ধার্য হতো কয়েক বছরের উৎপন্ন ফসলের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে।[১০০] আবুল ফজল বলেন রাজস্ব ধার্য হতো উৎপন্ন ফসলের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে। মোগল শাসনব্যবস্থা আকবরের সময়কালে কেবল বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু দরবারি ঐতিহাসিকের পক্ষে কেবল ঐ এলাকার রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে খবর রাখা সম্ভব ছিল। তাই আবুল ফজলের প্রদত্ত তথ্য সমগ্র বাংলার জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এ সময়ে

[৯৬] Minhaj-Ud-Din, Abu-Umar-I-Usman, *Tabakat-I-Nasiri*, vol. 1, pp. 577-578
[৯৭] *Ibid*
[৯৮] Abdul Karim, *Corpus*, p. 22
[৯৯] Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, pp. 360-361
[১০০] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p.134 ; M A Rahim, *op.cit.*, vol. 2, pp. 111-112

আমিল, শিকদার এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও সরকার, জমিদার, ইজারাদার এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীদের মাধ্যমে খাজনা সংগ্রহ করা হতো।

ইতোপূর্বে ভূমির প্রকারভেদের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলতানী শাসনে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। যেমন- (১) জমিদারি এবং কর প্রদায়ী জমি, (২) ইজারাদার, ডিহিদার এবং মুস্তাজিরদের আওতাধীনে জমি, (৩) শিকদার ও আমিলদের অধীনের জমি এবং (৪) জায়গির এবং আয়মার জমি। ইজারাদারদের অধীন জমি খালসা জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এ জমির খাজনা আদায় করা হতো ঠিকাদারদের মাধ্যমে।[১০১] মূলত বাংলায় নিযুক্ত আমির, ওমরাহ ও কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গিরের জমির খাজনা বরাদ্দ দেওয়া হতো এবং এসব কর্মচারীরা জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। জায়গিরদারগণ তাঁর অধীন এলাকার জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। এক্ষেত্রে সরাসরি খাজনা আদায়কারী সরকারি কর্মচারী ছিলেন আমিল বা শিকদারগণ। রায়তওয়ারির ব্যবস্থায় আমিল বা শিকদারদের মাধ্যমে খাজনা আদায় করা হতো এবং এতে জমি ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে রায়তদের সাথে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। সাধারণত জমিদার ও ইজারাদারদের মতো মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের পদ্ধতি ‘জমিদারি’ বা ‘ইজারাদারি’ পদ্ধতি[১০২] বলে অভিহিত করা হতো।

বাংলার সুলতানী শাসনের শেষের দিকে পর্তুগিজরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছিল। বাংলার সুলতান তৃতীয় মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদেরকে সাতগাঁও ও সোনারগাঁওসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে রাজস্ব আদায় ও কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[১০৩] এসব পর্তুগিজ উপনিবেশগুলো মজুমদারদের অধিকারভুক্তির মতোই ছিল। বাংলার সুলতানদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল চুক্তিভিত্তিক। চুক্তি অনুসারে তারা সুলতানকে বার্ষিক কর দিতো এবং নিজেদের এলাকার রাজস্ব বিষয়গুলো পরিচালনা করত। পর্তুগিজরা খুব সামান্য রাজস্বের বিনিময়ে সাতগাঁও-এর অধিকার লাভ করে।[১০৪] উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে, পর্তুগিজ ইজারাদারগণ বাংলায় অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তারা ইচ্ছেমতো রাজস্ব আদায় করত এবং সুলতানকে নামেমাত্র কর দিতো। চট্টগ্রামের শুল্ক ভবনের পর্তুগিজ প্রধান, হিন্দু ও মুসলমান উভয় অধিবাসীদের

---

[১০১] M A Rahim, *op.cit.*, vol. 2, pp. 111-112
[১০২] *Ibid*, p.112
[১০৩] J J A Campos, *op.cit.*, pp. 31-32; M.R.Tarafder, *Husain Shahi Bengal,* p. 116
[১০৪] J.J. A Campos, *op. cit.*, pp. 39-46

কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করত।[১০৫] চট্টগ্রামের পর্তুগিজরা কিভাবে ভূমি রাজস্বব্যবস্থা কায়েম করেছিল সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে আরো ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

তৎকালীন সময়ে বাংলায় জায়গিরদারি প্রথা নিয়মিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়েছিল। নিজামউদ্দিন আহমেদ তাঁর রচিত *তবকাত-ই-আকবরী* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে উল্লেখ করেছেন যে, সেই সময়ে জরুরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে নসিব শাহ অনেক জায়গিরদারকে জায়গির প্রদান করেছিলেন।[১০৬] এ জায়গিরগুলো মূলত ইজারাদারি ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। নিজামউদ্দিন আহমেদ জায়গিরদারি ও জমিদারির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সিকান্দার লোদী বিহারে জমিদারদের কাছ থেকে কিছু পরগনা নিয়ে জায়গির হিসেবে তাঁর নিজের লোকদের দিয়েছিলেন।[১০৭] এ পদ্ধতি ইব্রাহিম লোদীর আমলেও প্রচলিত ছিল। তৎকালীন জমিদারি ব্যবস্থা আধুনিককালের জমিদারির মতো ছিল না। ফতেহাবাদ সরকারেই তিন শ্রেণির জমিদার ছিল এবং সরকার সুলাইমানবাদের স্বাধীন তালুকদারদের কাছ থেকে ২১৩,০৬৭ দাম রাজস্ব পাওয়া যেতো।[১০৮] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৫৪৪-১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর *কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে* উল্লেখ করেন যে, তিনি (নিজে) গোপীনাথ নিয়োগীর সীমানায় বসবাস করতেন।[১০৯] গোপীনাথ ঐ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলার জমির উর্বরতা ও বিভিন্ন ঋতুতে উৎপাদিত ফসলের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্বের হার ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে এদেশে 'ভাগচাষ' পদ্ধতি প্রচলন ছিল। তখন কৃষকগণ উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করত।[১১০] এ ব্যবস্থাকে 'হিরানিয়া' পদ্ধতি বলা হতো।[১১১] মুসলিম শাসনামলে রাজস্বের হার পরিবর্তন হয়। ইবনে বতুতা বলেন যে, নীল নদের (মেঘনা) তীরবর্তী অধিবাসীরা তাদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভূমি রাজস্ব হিসেবে প্রদান করত।[১১২] চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী 'বাংলায় খাজনার হার উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ ছিল।[১১৩] সুলতানী

---

[১০৫] Nizam-ud-din Ahmed, *Tabqat-i-Akbari*, eng.tra. B.De, published in Bib.Indica, vol. 3, 1939, revised by Baini Prasad, p. 444; M.R.Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 116
[১০৬] Nizam-ud-din Ahmed, *op.cit.*, vol. 1, pp. 320-335
[১০৭] *Visva Bharati Annals*, 1945, vol.1, p.117
[১০৮] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণচণ্ডী* ১ম খণ্ড, পৃ. ২২
[১০৯] Ishtiaq Husain Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Delhi*, 4th ed. Pakistan Historical Society, Karachi, 1958, p. 118
[১১০] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ. ১৭০, এস এ কিউ হুসাইন এর মতে এক-চতুর্থাংশ খাজনা আদায় করা হতো। S A Q Hussain, *Arab Administration*, *op.cit.*, p. 29
[১১১] আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩
[১১২] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 27
[১১৩] Chines Accounts, *Vishva Varati Annals,* vol. 1, 1945, p. 99

শাসনের শেষের দিকে অর্থাৎ শেরশাহের শাসনামল ছিল ভূমি রাজস্ব সংস্কারের (১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর ভূমি প্রশাসনের সুফল বাংলাও ভোগ করেছিল। জানা যায়, শেরশাহ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেন। তবে মুলতানের ক্ষেত্রে তিনি এক-চর্তুথাংশ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সেখানকার গভর্নর হায়বত খানকে (Haibat Khan) নির্দেশ দেন।[১১৪] সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে, মুলতানের পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতি সদয় হয়ে শেরশাহ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেরশাহ ঘোষণা করেছিলেন যে, রাজস্ব নির্ধারণের সময়ে ছাড় দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আদায়ের সময়ে কখনই ছাড় দেওয়া হবে না।[১১৫] অর্থাৎ রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছাড় দিলেও রাজস্ব আদায় করা হতো কঠোরতার সাথে। তাঁর শাসনামলে বাংলাসহ তাঁর অধীন সাম্রাজ্যে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চর্তুথাংশ ভূমি রাজস্ব করা হয়। মোগল শাসন আমলেও এই রাজস্বব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়নি।[১১৬] এ সকল তথ্য থেকে বলা যায় যে, সুলতানী শাসনে বাংলায় ভূমি রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চর্তুথাংশের মধ্যেই ছিল। কোনো কোনো এলাকায় রায়তকে জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত লাঙলের সংখ্যার ভিত্তিতে খাজনা দিতে হতো।[১১৭] সুলতানী শাসনের শেষে দিকে বাংলার ভূমি রাজস্বের হার কোনো কোনো অঞ্চলে অর্ধেক থেকে এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[১১৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্রাট আকবরের শাসনাধীনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি রাজস্ব হারের ভিন্নতা ছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে সম্রাটের নির্দিষ্টকৃত রাজস্ব হার ছিল এক-তৃতীয়াংশ।[১১৯] তাই একথা বলা যায় যে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি রাজস্বের হার বিভিন্ন রকম ছিল। তবে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে দুশো বছরে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) সাধারণভাবে ভূমি রাজস্বের হার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ মধ্যেই ছিল। পনেরো শতকের প্রথম দিকে চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান বাংলার সৈন্য ও সামরিক কর্মকর্তাদের নগদে বেতন নিতে দেখেছিলেন। তিনি বাংলায় তঙ্কা ও কড়ির ব্যাপক প্রচলনও লক্ষ করেছিলেন।[১২০] অতএব একথা বলা যায় যে, বাংলায় নগদ অর্থে বেতন প্রদান করা হতো এবং জায়গিরদারি প্রথারও প্রচলন ছিল।

---

[১১৪] Abbas Khan Sarwani, *Tarikh-i-Ser Sahi*, tra. by Brahmadeva Prasad Ambashthya, Patna, 1974, p.758

[১১৫] Abbas Khan Sarwani, *Tarikh-i-Ser Sahi*, footnote 12. A; Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 249

[১১৬] W H Moreland, *op.cit.*, p. 76

[১১৭] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণচণ্ডী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪

[১১৮] I H Qureshi, *op.cit.*, p.113

[১১৯] Moreland, *op.cit.*, p.79

[১২০] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, pp. 144-154

মুসলিম শাসনাধীনে বাংলায় ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য দুই শ্রেণির জমিদার ছিল- (১) পেশকার বা কর প্রদানকারী জমিদার এবং (২) রাজস্বের ইজারাদার। সময়ের পরিক্রমায় এরা এ পদে স্থায়ী হয় এবং ইজারাদার পদটি বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকে কর প্রদানকারী জমিদারদের অস্তিত্ব লক্ষ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল জমিদাররা স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মুসলিম শাসকদের কাছে তারা আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বিদ্রোহ না করার শর্তে নিয়মিত কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ঐতিহাসিকগণ তাদেরকে জমিদার বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে জমিদার বলতে রাজস্ব ইজারাদারদেরও বোঝাত। তারা নিয়মিত রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে এ পদে স্থায়ী হয় এবং তাদের পদ বংশানুক্রমিক হয়।[১২১] তুঘলক বংশের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা অভিযানকালে সেখানকার বিদ্রোহী শাসনকর্তাগণ হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের পক্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য জমিদার, মুকাদ্দাম, খান, মালিক ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। এ ঘোষণাপত্র থেকে জানা যায় যে, জমিদারগণ ছিলেন বাংলায় শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস।[১২২] বাংলার হিন্দু জমিদারদের সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, বহু হিন্দু জমিদার হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াসের পক্ষে যুদ্ধ করেন।[১২৩] ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গনেশ তাঁর রাজ্যে এত বেশি ক্ষমতাবান হয়ে উঠেন যে, তিনি ইলিয়াস শাহি বংশ অপসারিত করে স্বয়ং বাংলার শাসনদণ্ড হস্তগত করেন। এ সময়ে পুরাতন জমিদারের অনেকেই তাদের জমিদারি হারায় এবং তাদের জায়গায় নতুন জমিদারদের আবির্ভাব ঘটে। যে সময়েই তাদের আবির্ভাব হোক না কেন, জমিদারের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এসব জমিদারি বাংলার অনেকটা অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার ডিহিদার ও মুস্তাজিরগণ প্রথম দিকেই সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদেরকে নির্দিষ্ট এলাকার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। *চৈতন্যচরিতামৃতে* (১৪৭৮-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ইজারাদারদের জমিদারে পরিণত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। *চৈতন্যচরিতামৃতে* হিরণ্য দাসকে সপ্তগ্রামের (সাতগাঁও) জমিদাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, হিরণ্য দাস ছিলেন একজন চৌধুরী। সরকারকে বারো লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে তাঁকে সাতগাঁও অঞ্চলের খাজনা আদায়ের সনদ দেওয়া হয়। তিনি

---

[১২১] Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol. 2, Pakistan Publishing House, Karachi, 1967, pp. 111-112

[১২২] Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi,* pp. 361-362

[১২৩] মুকুন্দরাম, *চণ্ডীকাব্য*, পৃ. ২০-৩৪

প্রজাসাধারণের নিকট থেকে বিশ লক্ষ টাকা আদায় করে বারো লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দেন আর বাকি আট লক্ষ টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন।[১২৪]

সুলতানী যুগের শাসকগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য সাধারণত হিন্দু কর্মচারী যেমন-কানুনগো ও চৌধুরীদের সঙ্গে চুক্তি করতেন। এসব কর্মচারীরা যদি নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদান করত, তাহলে তাদেরকে স্থায়িভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। বাংলার এই রাজস্ব ইজারাদারগণ সম্মানসূচক জমিদার উপাধিতে ভূষিত হতেন। সুলতানী বাংলায় ইজারাদারদের অস্তিত্বের আরো প্রমাণ রয়েছে।[১২৫] সুলতানী শাসনের শেষদিকে পর্তুগিজগণ নামমাত্র রাজস্ব প্রদানের শর্তে শেষ হোসেনশাহী সুলতান তৃতীয় মাহমুদের কাছ থেকে হুগলির ইজারা লাভ করেন। এসব রাজস্ব আদায়কারীগণকে পতিত জমির জন্য বার্ষিক কিছু পরিমাণ নির্ধারিত অর্থ প্রদান করতে হতো। এজন্যই তারা রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত পতিত জমি চাষের আওতায় আনত।[১২৬] *চৈতন্যচরিতামৃতে* গোপীনাথ নামে একজন রাজস্ব ইজারাদারের নাম পাওয়া যায়। গোপীনাথ দু'লক্ষ কাহন (কড়ি) সরকারি রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাকে বাঁশের চাঙ্গের ওপরে শুইয়ে দিয়ে, একটি তরবারি তার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং অন্য একটি তরবারি তার নিচে পাতা হয়।[১২৭] অনুরূপভাবে শাস্তি প্রদান করে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী শ্রেণি খাজনা দিতে ব্যর্থ ঠিকাদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত।[১২৮]

প্রাক-মোগল বাংলায় কি পরিমাণ ভূমি রাজস্ব আদায় হতো তার ধারণা পাওয়া যায় মোগল শাসনের শুরুতে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের আদায়কৃত ভূমি রাজস্ব পরিমাণ থেকে। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী*[১২৯] অনুসারে বাংলার ১৯টি সরকার ও ৬৮৮টি মহালের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ নিম্নরূপ-

---

[১২৪] কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, হিরণ্য দাস মুলুক নিয়া মুক্ত করিয়া,
বারো লক্ষ দেন- রাজাই সাধেন বিশ লক্ষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ.২৯৩

[১২৫] Moreland, *op.cit.*, p. 73

[১২৬] J.J. A Campos, *op.cit.*, pp. 39-46

[১২৭] S N Das Gupto, *Bengal in the Sixteenth Century A.D*, p. 71

[১২৮] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 141

[১২৯] *Ibid*

সরকার	পরগনা	রাজস্ব: দাম
বাংলা (২৪) উড়িষ্যাসহ	৭৮৭	৫৯,৮৪,৫৯,৩১৯ দাম/(টাকা ১,৪৯,৬১,৪৮২-১৫-৭)
উড়িষ্যা ৫	৯৯	১,২৫,৭৩২,৫৩৮ দাম
শুধুমাত্র বাংলা ১৯	৬৮৮	৪৭,২৭,২৭,৬৮১ দাম (১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা)
সরকার	মহাল	দাম
উদম্বপুর/তাণ্ডা নামে পরিচিত	৫২	২৪,০৭৯,৩৩৯১/৩ দাম
জান্নাতাবাদ (লক্ষ্মণাবতী)	৬৬	১৮,৮৪৬,৯৬৭ দাম
মাহমুদাবাদ	৮২	১১,৬০২,২৫৬
ফতেহাবাদ	৩১	৭,৯৬৯,৫৬৮
খলিফাতাবাদ	৩৫	৫,৪০২,১৪০
বাকলাহ	৪	৭,১৫০,৬০৫
সাতগাঁও	৫৩	১৬,৭২৪,৭২৪
মান্দারণ	১৬	৯,৪০৩,৪০০
পূর্ণিয়া	৯	৬,৪০৮,৭৭৫
তাজপুর	২৯	৬,৪৮৩,৮৫৭
ঘোড়াঘাট	৮৪	৮,০৮৩,০৭২-১/২
বারবকাবাদ	৩৮	১৪,৪৫১,৫৩২
সোনারগাঁও	৫২	১০,৩৩১,৩৩৩
সিলেট	৮	৬,৬৮১,৩০৮
চট্টগ্রাম	৭	১১,৪২৪,৩১০
সুরাইমানাবাদ	৩১	১৭,৬২৯,৯৬৪
শরিফাতাবাদ	২৬	২,৪৮৮,৭৫০

উপরিউক্ত চিত্র থেকে প্রত্যেকটি পরগনার রাজস্বের পরিমাণ লক্ষ করা যায়।[১৩০] মূলত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম বাংলার অংশত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সমগ্র পূর্ববাংলা বারো ভূঁইয়াদের অধীনে ছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আবুল ফজল বর্ণিত পরগনাসমূহের রাজস্ব তালিকাই ছিল সুলতানী বাংলার শাসকদের পরগনাভিত্তিক রাজস্ব তালিকা।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বের আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন গবেষক শিরিন মুসবী। তিনি তাঁর অভিনন্দর্ভে দেখিয়েছেন যে ১৫৯৫-১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে সাম্রাজ্যের রাজস্ব জমা হয়েছিল ৩৯৬,০৩২৭,১০৬ দাম। এই আয়ের ৬০ শতাংশেরও বেশির ভাগ আসত ভূমি রাজস্ব থেকে। মোট জমার ২৪ থেকে ৩৩ শতাংশ আসত খালসা ভূমি থেকে আর ৬৭ থেকে ৭৬ শতাংশ আসত জায়গির

[১৩০] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 134

ভূমি থেকে।[১৩১] এই ভূমি রাজস্বের একটি বড় অংশের যোগান আসত বাংলা থেকে। যা ওপরের ছক থেকে লক্ষ করা যায়। *আইন-ই-আকবরীর*[১৩২] তথ্য থেকে দেখা যায় যে বাংলার সাতটি সরকার থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় হতো-৯, ৫১, ১৩, ৪৯২ দাম। পরগনা সাতটির রাজস্ব আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ-

সরকার	জমা	রাজস্বের পরিমাণ/দাম
বাকলাহ	”	৭১,৩১,৪৪০ দাম
সাতগাঁও	”	১,১৪,২৩,৫১০ ”
সোনারগাঁও	”	১.৩৪,১৬,৫১৩ ”
ফতেহাবাদ	”	৭৯,৭৬,৮৩৭ ”
সিলেট	”	৭০,৫৬,৬০৮ ”
ঘোড়াঘাট	”	৮৬,৪১,৯৪১ ”
বাজুহা		৩,৯৪,৬৬,৬৪৩ ”

মোট= ৯,৫১,১৩,৪৯২ দাম।

বাংলার ১৯টি সরকারের মধ্যে ৭টি সরকারের ভূমি রাজস্ব ছিল ৯,৫১,১৩,৪৯২ দাম এবং বাকি ১২টি সরকারসহ রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬,৩০,৫১,৭০০,৫৭ দাম। অর্থাৎ বাংলার মোট ১৯টি সরকারের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৫,৮১,৬৫,১৯২,৭৫ দাম। অতএব পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার ১৯টি সরকারের (উড়িষ্যাবাদে) রাজস্বের পরিমাণ ছিল আনুমানিক প্রায় ২৯ কোটি দাম। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে সমগ্র বাংলা তাঁর অধীন না হওয়ায় অবিজিত ও অনধিকৃত অঞ্চলগুলোর পরগনা ও সরকারে বিভক্ত করা সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই সরকার ও পরগনাসমূহ ছিল প্রাক-মোগল যুগের রাজস্ব বিভাগ। সম্রাট আকবরের সময়ের প্রত্যেকটি পরগনার রাজস্বের দামে নিরূপণ করা হয়েছে মোগল পূর্ব বাংলার শাসকগণের পরগনা ও সরকার ভিত্তিক রাজস্ব তালিকা বা রাজস্বের বিবরণীর ভিত্তিতে।

বাংলার সকল জমিদার ও রাজস্ব ইজারাদারগণ এ সময় সরকারকে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান করতেন। জমিদারগণ সবসময় প্রজাদের কাছ থেকে নগদ অর্থে রাজস্ব সংগ্রহ করতে বেশি জোর দিতেন। প্রজারা

[১৩১] Shireen Moosvi, The Economy of Mughal India-A Statistical Study, *Ph D Thesis,* Aligarh Muslim University, 1981, p. 270

[১৩২] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p.141; Shireen Moosvi, The Economy of Mughal India-A Statistical Study, p. 297

ইচ্ছে করলে ফসলেও খাজনা দিতে পারত। কৃষকের জমির ফসল কাটার সময়ে উৎপন্ন শস্য ভাগাভাগি করা হতো এবং এ পদ্ধতি ‘গাল্লাবখশ’ নামে পরিচিত ছিল।[১৩৩] ফসলের শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের এ পদ্ধতি সরকারের নিকট ব্যয়বহুল ও অসুবিধাজনক বলে পরিগণিত হয়। কারণ এসব ফসল সংগ্রহের জন্য বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ, অসংখ্য গুদাম এবং পরিবহণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতো। এ সকল অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার অনুমানভিত্তিক রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি অনুসরণ করত। যে সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তির অত্র এলাকার ভূমি ও ফসলাদি সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল, শাসকগণ তাদেরকে ঐ নির্দিষ্ট এলাকার রাজস্ব কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করতেন। এসব কর্মচারী মাঠে শস্য নিরীক্ষণ করে জমির আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারত। তাদের আনুমানিক হিসাবের ওপর ভিত্তি করে শস্যেও খাজনা নির্ধারিত করা হতো। এ ব্যবস্থাকে অনুমান নির্ধারণ ব্যবস্থা (Appraisement System) বলা হতো। শেরশাহ সুলতানী যুগের রাজস্বব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেননি। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের রাজস্বের হার হয়ত কিছু পরিবর্তন করেন।[১৩৪]

ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজারা তাদের রাজস্ব আট কিস্তিতে স্বয়ং কাচারিতে উপস্থিত হয়ে পরিশোধ করত। প্রত্যেক ফসলের মূল্য পাটওয়ারী, মহুরী ও কারকুনের নিকট রক্ষিত আমিলের সিলযুক্ত কাগজ অনুসারে পরিশোধ করা হতো।[১৩৫] রাজা টোডরমল সুলতানী যুগের রাজস্ব তালিকা অনুসরণ করেই মোগল শাসনামলের রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের ন্যায় মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও উৎপাদিত ফসলের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত রাজস্বের পরিমাণকে নগদ অর্থে ধার্য করেছিলেন। তাছাড়া আবুল ফজল সুলতানী যুগে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদানের উদাহরণ দিয়েছেন। জমিদার ও রাজস্ব ইজারাদারগণ নগদ অর্থে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতেন। জমিদার ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ের সাথে যুক্ত ছিল খোদ, মুকাদ্দাম ও চৌধুরী উপাধির ব্যক্তিগণ।[১৩৬]

উপরিউক্ত তথ্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, সুলতানী আমলে যে ভূমি রাজস্বব্যবস্থা প্রচলিত ছিল শেরশাহ তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বকালে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করেন মাত্র। শস্যে রাজস্ব নির্ধারণ করার পর এ শস্যের মূল্য বাজার দর অনুযায়ী নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা হতো। নগদ অর্থ ছাড়া ফসলের মাধ্যমেও

---

[১৩৩] ফার্সিতে বলা হয় গাল্লা বা গল্লাবখশ এবং হিন্দিতে বলে বটাঈ (batai) এবং ভাওলী (bhaoli)
[১৩৪] Ashirbadi Lal Sree Vastava, *The Mughal Empire*, Agra, 1975, pp. 105-106
[১৩৫] Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin*, p. 21
[১৩৬] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 322

রাজস্ব আদায় করা হতো। তৎকালীন সময়ে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে ৪টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যথা- (ক) কানকুত (Kankut) হিন্দি ভাষায় কান অর্থ ফসল আর কুত অর্থ আন্দাজ। সমস্ত ভূমি মাপের মাধ্যমে বা আন্দাজে ফসল নির্ধারণ করে দেওয়া হতো। অনেক ক্ষেত্রে পাঁয়ে হেটে ফসলের জমি মাপা হতো। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ কাজ করতেন এবং পরবর্তী সময়ে তা মাপলেও সঠিক হতো। উৎপন্ন ফসল পরিদর্শকের অভিজ্ঞতায় তা নির্ধারণ করে ফসল আদায় করা হতো। (খ) বাটাই (batai) দুই পক্ষের (রাজস্ব আদায়কারী ও ভূমির মালিক) লোকের উপস্থিতিতে চুক্তি অনুযায়ী শস্য ভাগাভাগি করা হতো। (গ) খেত বাটাই (khet batai) ভূমিতে উৎপন্ন ফসল কাটার পূর্বেই ফসল ভাগাভাগি করা হতো। (ঘ) লাং বাটাই (lang batai) জমির শস্য কাটার পর তা স্তূপাকারে রাখা হতো, তারপর উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হতো।[১৩৭] যেহেতু এই পদ্ধতি সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল, বাংলায়ও একই পদ্ধতিতে কর ধার্য করা হতো বলে ধারণা করা যায়। বাংলার জমি জরিপ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইরফান হাবীব উল্লেখ করেছেন যে, মোগল শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিন ধরনের জমি জরিপের আওতায় ছিল- ১. চষা (ধান বোনা) জমি, ২. পতিত জমি এবং ৩. আবাদযোগ্য ভূমি।[১৩৮] ইরফান হাবীবের এ তথ্য থেকে আমরা বোঝা যায় যে, সুলতানী শাসনে কৃষি ক্ষেত্রে একই ধরনের ভূমি জরিপ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। কারণ শেরশাহের সময়ে জমি জরিপ ও অন্যান্য সংস্কার করা হয় এই পদ্ধতি মোগল শাসনেও বহাল ছিল।

উৎপাদক ও ভোক্তাশ্রেণি

বাংলার জনগণকে উৎপাদক ও ভোক্তাশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। উৎপাদকশ্রেণি পরিশ্রম দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করে বা তারাই সম্পদ স্রষ্টা শ্রেণি। যারা ভোক্তাশ্রেণি তারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে না বরং পরোক্ষভাবে সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বাংলায় মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ও অভিজাতগণ ছিল ভোক্তাশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সকল উচ্চপদের কর্মকতাগণও ছিল ভোক্তাশ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। যেমন, রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক, স্থানীয় ভূ-স্বামী, নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সামরিক বাহিনীর সদস্য প্রভৃতি পেশার লোক পরিসেবা প্রদান করত, তারাও ভোক্তাশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উৎপাদকশ্রেণি থেকে তাদের অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও সম্পদ সৃষ্টিতে তাদের পরোক্ষ অবদান ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সরাসরি রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, সেতু

---

[১৩৭] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 47; *আইন- ই-আকবরীতে* তৃতীয় পদ্ধতি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, চাষিরা সমান সমান স্তূপ করে ফসল গাদা করে রাখত আর রাজস্ব সংগ্রাহক রাষ্ট্রের ভাগের অনুপাত অনুযায়ী তার মধ্য থেকে কয়েকটি বেছে নিতো। গল্লাবখস থেকে একটি রীতিকে আলাদা করা হয় যাকে পোলাবন্দি বলা হতো। ধারণা করা হয় এটি ছিল ভাগে চাষেরই আরো একটি রূপ। রাজস্ব আদায়কারীগণই ফসল কাটার ও ঝাড়াই এর ব্যবস্থা করত এবং ঝাড়াই হওয়া শস্য থেকে পরিমাণমতো রাষ্ট্রের ভাগ নিয়ে নিতো। Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p.198

[১৩৮] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556 -1707), p.6

ইত্যাদি নির্মাণের জন্য অনেক স্থপতি ও রাজমিস্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এসব পেশাজীবীগণ সরাসরি সম্পদ সৃষ্টি করেন না তবে অবকাঠামোগত উন্নয়নে শ্রম দিয়ে থাকে। বাংলার সুলতান ও গভর্নরগণ সম্পদ বিতরণে সাহায্য করতেন। এক্ষেত্রে সুলতান ও অভিজাতগণ শুধু ভোক্তা শ্রেণি ছিল না কারণ তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় সম্পদের একটি বড় অংশ ব্যয় হতো।[১৩৯] অভিজাতদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সেই অর্থ দিয়েই জীবনযাপন করতেন। মূলত এ সকল কর্মকর্তাগণ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দক্ষতার সাথে প্রশাসন পরিচালনা করে সম্পদ সৃষ্টির উপযোগী উন্নত পরিবেশ তৈরি করে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

উৎপাদক-শ্রেণি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

সেন শাসনামলে ভূমিতে সাধারণ প্রজার বংশপরম্পরায় চাষের অধিকার না থাকায় কৃষকগণ চাষাবাদে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু সুলতানী শাসনামলে ভূমিতে কৃষকের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় কৃষকগণ চাষাবাদে আগ্রহী হয়। অর্থাৎ কৃষকগণ ভূমি চাষ করলে এবং নিয়মিত ভূমি রাজস্ব প্রদান করলে তাকে ঐ ভূমি থেকে উৎখাত করা হতো না। ফলে কৃষকের সাথে শাসকের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। শেরশাহের সময়ে শাসক ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্রাট আকবর যে রাজস্বব্যবস্থা প্রচলন করেন তার মূলসূত্র ছিল শেরশাহ প্রবর্তিত ভূমি রাজস্বব্যবস্থা। শেরশাহের পূর্বেও বাংলায় জমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল, তবে সমগ্র বাংলায় ছিল না তা বলা কঠিন। তিনিই প্রথম সমগ্র দেশকে প্রদেশ ও পরগনায় ভাগ করেন। শেরশাহ জমিকে উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন (অনুর্বর) এই তিন ভাগে ভাগ করেন এবং এদের উৎপাদনের ওপর গড় হিসেব করে রাজস্ব ধার্য করেন।[১৪০] আবুল ফজল বলেন যে শেরশাহ তিন রকমের শস্য হার বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রতি ফসলের জন্য প্রাপ্য রাজস্ব হিসেবে এই হারগুলোর গড়ের একের তিন ভাগ রাজস্ব স্থির করা হয়।[১৪১] কোরায়শি বলেন যে, আকবর রাজস্বের দাবি বাড়িয়ে উৎপন্ন ফসলের একের চার থেকে একের তিন ভাগ করেছিলেন।[১৪২] মূলত সুলতান উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য করেন এবং নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

---

[১৩৯] M.R.Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 116

[১৪০] ম্যোরল্যান্ড বলেন যে, এক বিঘা উত্তম শ্রেণির জমির জন্য উৎপাদিত গমের পরিমাণ ধরা হতে ১৮ মণ, মধ্যম শ্রেণির জন্য ১২ মণ, নিম্নতম শ্রেণির জন্য ৮ থেকে ৫ সের। এভাবেই গড় করে উৎপাদিত ফসলের দর নির্ধারণ করা হতো। নগদ অর্থে অথবা কৃষক ফসল দ্বারা রাজস্ব প্রদান করতে পারত। W H Moreland, *op.cit.*, p.76

[১৪১] Abul Fazl, *op.cit.*, p. vol.1, pp. 293-300

[১৪২] I H Quraishi, *op.cit.*, 2nd edition, pp. 118-119

শেরশাহের ভূমি রাজস্ব সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রচলন। তিনি ভূমিব্যবস্থায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির জন্য কবুলিয়ত ও পাট্টা নামে দুটি দলিল সম্পাদন করেন।[১৪৩] কবুলিয়ত ও পাট্টা শব্দ দুটি ফার্সি শব্দ। কবুলিয়ত হলো স্বীকৃতিনামা আর পাট্টা শব্দের অর্থ হলো মালিকানা দলিল (জমির অধিকার বা মালিকানা বিষয়ক দলিল)। কৃষকগণ তাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করে সরকারকে যে দলিল সম্পাদন করে দিতো তাকে কবুলিয়ত বলা হয়। আবার সরকার জমির ওপর কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করে কৃষককে যে দলিল সম্পাদন করে দিতো তাকে পাট্টা বলা হয়। মোগল ও প্রাক-মোগল বাংলায় সাধারণত চাষিদের পাট্টা দেওয়ার রীতি অনুসরণ করা হতো। মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থে চাষিদের পাট্টা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪৪] শেরশাহ ভূমিব্যবস্থায় সর্বপ্রথম জমি জরিপ করে পরগনাভিত্তিক ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ- তিনি প্রত্যেক পরগনা থেকে রাজকোষে দেয় রাজস্ব নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর শাসনামল স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় ভূমি জরিপ শুধু খালিসা ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনেকেই মনে করেন।[১৪৫] শেরশাহের মৃত্যুর পর এই রাজস্ব সংস্কার ব্যাহত হয়। পরবর্তী মোগল সম্রাট আকবর ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে শেরশাহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পুনঃপ্রবর্তন করেন। হাবীব মন্তব্য করেন যে সম্রাটের পূর্বপুরুষ তৈমুর তাঁর রাজত্বের কিছু অংশে উৎপন্ন ফসলের একের তিন ভাগ আদায় করাতেন।[১৪৬] এ থেকে বলা যায় যে, ভূমি রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ ছিল।

আলোচ্য সময়ে ভূমি রাজস্ব আদায় হতো এমন কিছু ভূমি ছিল। সাধারণত জমিদারদের কাছে যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হতো এবং তারা আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দিতো। এ সকল ইজারাদারদের কেউ কেউ প্রাদেশিক গভর্নরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল।[১৪৭] অন্যদিকে সুলতানের আত্মীয়বর্গের জমি নিষ্কর ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন কর্মকর্তাকে অনেক সময় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদত্ত জমিও নিষ্কর জমির আওতাধীন ছিল। এ সকল ভূমি থেকে রাজস্ব পাওয়া যেতো না। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের একজন কর্মকর্তা ওয়াজির হামিদ খানকে চট্টগ্রামে দুই শিক জমির ভোগ-দখলের অধিকার দেওয়া হয়।[১৪৮] হোসেন শাহ তাঁর জামাতা 'কুতুব-উল-আশেগীনকে'

---

[১৪৩] W H Moreland, *op.cit.*, p. 71

[১৪৪] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪; *শিবায়ন*, পৃ.৭০-৭১; Momtazur Rahman Tarafder, *op.cit.*, p. 152 ; ইন্দ্র ও কালকেতুর কাছ থেকে চাষিরা পাট্টা গ্রহণ করত। হোসেন শাহী আমলে এই পদ্ধতি বিরাজমান ছিল

[১৪৫] আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

[১৪৬] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 191

[১৪৭] আবদুল্লাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

[১৪৮] দৌলত কাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

সোনারগাঁও এর ভূ-সম্পত্তি দেন এবং তাঁর অন্য বংশধরদের সোনারগাঁও সরকারে ১৩৩ বিঘা আবাদি জমি দেন। এই সম্পত্তির কর, সরকারি ব্যয়, জমি ও বাগান থেকে বার বার ফসল উৎপাদন, চৌধুরীর জন্য শতকরা দুই ভাগ, এর জন্য সালামি, অট্টালিকা, কানুনগো, সামরিক গভর্নর এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের শতকরা হার ইত্যাদির অজুহাতে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ছিল।[১৪৯] এ ধরনের জমি ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমিগুলোর মধ্যে পার্থক্য ছিল। সাধারণত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করা জমিগুলো নিষ্কর জমি ছিল। এই সব জমি সুলতানগণ মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করতেন। উদাহরণ হিসেবে নূর-কুতুব-ই-আলমের মাজারের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রামগুলোর কথা বলা যায়। হোসেন শাহ এসব জমি দান করেছিলেন সরাইখানার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য। জমিদার ও মোল্লারা এসব ইচ্ছাপত্র করে সম্পত্তি জালিয়াতি করতে পারত। এ ধরনের নিরোধকে গভর্নর ও কাজিদের আন্তরিক দায়িত্বরূপে গণ্য করা হতো।[১৫০] উপরিউক্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, সুলতানী শাসনাধীনে কিছু ভূমি সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ছিল যা থেকে রাষ্ট্র রাজস্ব আদায় করত না।

সুলতানী বাংলায় রাজস্ব প্রদানের মাধ্যম

বাংলার সুলতানদের জারিকৃত মুদ্রার প্রচলন থেকে বলা যায় যে, এই সময়ে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান করা হতো। সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার ভূমি রাজস্ব মুদ্রার মাধ্যম ছাড়াও উৎপন্ন শস্যের মাধ্যমেও সংগ্রহ করা হতো। তৎকালীন দিল্লিতেও ঐ একই প্রথা চালু ছিল।[১৫১] সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে জানা যায় যে, প্রজারা তখন নগদ অর্থে (মুদ্রায়) ভূমি রাজস্ব পরিশোধ করত। সরকার ও প্রজার মধ্যে শস্য ভাগাভাগির রীতিরও প্রচলন ছিল।[১৫২] প্রজাসাধারণ নিজেরা খাজনা পরিশোধের জন্য মোহর এবং টাকা নিয়ে (রশিদ গ্রহণের জন্য) একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকত। ফসলাদি প্রচুর হয়, জমি জরিপের 'পাইমাইশ' (পরিমাপের) বিশেষ প্রয়োজন হয় না।[১৫৩] ফসলের উৎপাদনের মোটামুটি একটি হিসেব ধরে সরকারি রাজস্ব ধার্য করা হতো।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলায় নগদ অর্থে ভূমি রাজস্ব আদায়ের প্রথা (টোডরমলের বন্দোবস্ত) প্রচলিত হয়েছিল। সুলতানী আমল থেকেই বাংলায় এ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সম্রাট আকবর তা

---

[১৪৯] Momtazur Rahman Tarafder, *op.cit.*, p. 152
[১৫০] A. H Dani, *op.cit.*, p. 72
[১৫১] I H Quraishi, *op.cit.*, p. 113
[১৫২] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 141
[১৫৩] Abul Fazl, *op. cit.*, vol. 1, p. 134

অনুমোদন করেন মাত্র।[১৫৪] হাবীব উল্লেখ করেন যে, সম্রাট আকবরের সময়ে রাজস্ব জমার পরিমাণ ঠিক করা হয়েছিল সরাসরি আগের সরকারের কানুনগোর কাগজপত্র থেকে এবং বাংলা বাদে বাকি সব প্রদেশের রাজস্বের হার বার বার পরিবর্তন করা হতো।[১৫৫] বখতিয়ার খলজি থেকে শুরু করে হোসেনশাহি বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ পর্যন্ত অনেক সুলতানেরই তাম্র, রৌপ্য এবং কিছু স্বর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব মুদ্রা প্রচলনের ফলে বাংলার প্রজাসাধারণের রাজস্ব প্রদানের কাজ সহজ হয়েছিল। মুদ্রার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রথা চালু ছিল, বৈষ্ণব সাহিত্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫৬] হিরণ্য ও গোবর্ধন দুই ভাই তাদের বসবাস ছিল সপ্তগ্রাম অঞ্চলে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হিরণ্য দাসকে সপ্তগ্রাম অঞ্চল ইজারা দিয়েছিলেন। হোসেন শাহের শাসনামলে রাজস্ব ইজারাদার গোপীনাথ দু'লক্ষ কাহন কড়ি রাজস্ব দিতে অসমর্থ হন।[১৫৭] এখানে টাকার পরিবর্তে কড়ি শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে অনেক ক্ষেত্রে কড়ির মাধ্যমেও লেনদেন হতো। তাই কড়ি এবং মুদ্রার হিসেব আলোচনা করা অত্যাশ্যক। বাংলায় স্থানীয়ভাবে লেনদেনের জন্য অনেক কড়ি আমদানি করা হতো। তোমে পিরেস (১৫১২-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ) বলেন যে, 'বাংলা রাজ্যে কড়ি মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল। বাংলার কড়িগুলো বড়, তাদের মাঝখানে হলদে ডোরা আছে। উন্নতমানের কড়িগুলো মালদ্বীপ থেকে আমদানি করা হতো।[১৫৮] তবে তোমে পিরেসের আগেও বাংলায় যে কড়ির প্রচলন ছিল তা চীনা লেখক ওয়াং তা ইউয়ানের বিবরণে (১৩৪৯-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন কেনাবেচার সময় বাংলার অধিবাসীরা কড়ির ব্যবহার করে। একটা রৌপ্য মুদ্রার (টংকা) সঙ্গে ১০,৫০২ সংখ্যক কড়ির বিনিময় হয়। জনসাধারণের কাছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ির ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল।[১৫৯] ওয়াং

---

[১৫৪] Moreland, *op.cit.*, p. 79

[১৫৫] Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 263; টোডরমলের সুপারিশে দেখা যায় বিশ্বস্ত গ্রামের চাষিরা তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে রাজস্ব জমা দিয়ে রশিদ নিতে পারত। কোনো সংগ্রাহককে/তহশীলদারকে ঐ ধরনের গ্রামে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। রাজস্ব আদায়কারী যে রাজস্ব সংগ্রহ করত তা কোষাগারে জমা দিতো এবং খাজাঞ্চি এর জন্য চাষিদের রশিদ দিতো। হিসাবরক্ষক বা কারকুন যদি কোনো কারণে রশিদ না দিতো তবে ভুল যারই হোক না কেন সেই কাজের দায়িত্ব বর্তাবে আমিল-এর ওপর। আর চাষিরা যদি অভিযোগ করে তবে আমিলদের কথা শোনা হবে। *Ibid*, p. 242

[১৫৬] বৈষ্ণব সাহিত্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হেনকালে মুলুকের এক শ্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী।।
হিরণ্য দাস মুলুক নিল মকড়া (মোক্তা) করিয়া।
বারো লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্তশীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ.৩১০

[১৫৭] M A Rahim. *op.cit.*, vol. 2, pp. 113-114

[১৫৮] Tome Pires. *The Suma Oriental of Tome Pires*, pp. 144-145

[১৫৯] *Ibid*

তা ইউয়ানের সমসাময়িক মাহুয়ানের বিবরণেও বাংলায় কড়ি প্রচলনের কথা জানা যায়।[১৬০] চৈতন্যভাগবতেও কড়ি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬১]

এদেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কড়ির ব্যবহার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এক টাকার বিনিময় মূল্য ৬৫০০টি কড়ি ছিল বলে রেভার্টি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া শুভঙ্করীর আর্যা থেকেও মুদ্রার মাধ্যম হিসেবে কড়ির ব্যাপক প্রচলনের কথা জানা যায়। আর্যাটি নিম্নরূপ-

৪ কড়ি = ১ গণ্ডা
৫ গণ্ডা = ১ কুড়ি (২০)
৪ কুড়ি (২০ গণ্ডা) = ১ পণ (৮০ কড়ি)
৪ পণে = ১ চৌক (চার আনা ৩২০ কড়ি)
৪ চৌকে = ১ কাহন (এক টাকা বা ১,২৮০ কড়ি) এখানে দেখা যায় যে, ১,২৮০ কড়ি (৪×৫×৪×৪×৪) = ১ টাকা।[১৬২] তবে ওয়াং তা ইউয়ানের বিবরণে আমরা পেয়েছি যে ১০,৫২০ কড়ি = ১ টাকা। এছাড়াও এম আর তরফদার মি. প্রিন্সেপ নামক একজন ব্রিটিশ পণ্ডিতের সূত্র ধরে কড়ির একটি হিসেব দিয়েছেন, যেমন-

৪ কড়ি = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডায় =১ পণ (৮০ কড়ি)
৫ পণ= ১ আনা (৪০০ কড়ি)। এ হিসেবে ৪০০ কড়ি (৪×২০×৫) = ১ আনা হলে, ১ টাকা (১৬ আনায় ১ টাকা)= (৪০০×১৬) ৬,৪০০ কড়ি।[১৬৩] উপরোল্লিখিত তথ্য থেকে একথা বলা যায় যে, এ সময়ে স্বল্প মূল্যমানের মুদ্রার অপ্রতুলতা এবং দ্রব্যমূল্য অতিশয় কম থাকার কারণে কেনাবেচার ক্ষেত্রে কড়ির প্রচলন ছিল।[১৬৪]

বাংলার রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা

সুলতানী বাংলার রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাদের নানা পদবি ছিল। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের দলিলপত্র থেকে জানা যায়, *মুতাসাররিফ*, *আমিল*, *মুশরিফ*, *কারকুন*, *চৌধুরী*, *কানুনগো* প্রভৃতি

---

১৬০ Mahuan, *op.cit.*, p. 161
১৬১ কড়ি প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় *চৈতন্যভাগবত*-এ দুর্ভিক্ষ হইল সব গেলে চিরন্তন।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়। *চৈতন্যভাগবত*, মধ্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ.৪০৮
১৬২ Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 159
১৬৩ *Ibid*, p. 159
১৬৪ *Ibid*, p. 152

কর্মচারীরা স্থানীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত ছিল। ইবনে বতুতা একশত বা বহু সংখ্যক গ্রামের সমষ্টি এক সাদি এর রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে *মুতাসাররিফ* এর কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬৫] মূলত পরগনা ও সাদি একই রাজস্ব বিভাগকে নির্দেশ করে এবং এই বিভাগের রাজস্ব আদায়কারীকে *মুতাসাররিফ* বলা হতো। বারানী স্থানীয় রাজস্ব আদায়কারীকে *মুতাসাররিফ* (*mutasarrif*) বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৬] *আমিল* ও *মুতাসাররিফ* একই ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন পরগনার রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী। সুলতানী বাংলার রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদবি ছিল '*সর-ই-গোমস্তা*' বা *সর-ই-গুমাশতাহ্। সর-ই-গোমস্তারা* ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[১৬৭] তবে *চৈতন্যচরিতামৃতে* '*আরিন্দা*' পদবিধারী একশ্রেণির রাজস্ব কর্মচারীর বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৬৮] সুলতানের প্রাপ্য অর্থ রাজধানীতে পৌঁছানোর জন্য পরগনায় আসত এই *আরিন্দা* নামের কর্মচারীরা। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে এই *আরিন্দা* উপাধির গোলাপ চক্রবর্তী সপ্তগ্রামের ইজারাদার হিরণ্য দাসের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে রাজকোষে জমা দিতেন। সুলতানী শাসনে *আরিন্দা* পদবিধারী কর্মচারী সুলতান ও ইজারাদারদের মধ্যে রাজস্ব বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। গ্রাম থেকে আদায়কৃত রাজস্বের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখত *পাটওয়ারী*।[১৬৯] ধারণা করা হয় প্রত্যেক চাষির ওপর ধার্য রাজস্ব পরিমাণের পাট্টা বা দলিলপত্র নিয়ে কাজ করতেন বলেই তার নাম হয়েছিল *পাটওয়ারী*। তাঁর কাজ ছিল গ্রামের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা। প্রত্যেক চাষির কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়, হিসাবপত্র রাখা ও কর্তৃপক্ষের কাছে তা দাখিল করার জন্যই তার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া *মুকাদ্দম* নামের কর্মচারী ছিল।[১৭০] *মুকাদ্দম* প্রত্যেক চাষির কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। পারিশ্রমিক হিসেবে *মুকাদ্দম* গ্রামের রাজস্ব নির্ধারিত জমির আড়াই শতাংশ পেতো অথবা এজন্য *মুকাদ্দম*কে নিজের দখলের জমির রাজস্ব প্রদান করতে হতো না।[১৭১] এছাড়াও রাজস্বের ওপর শতকরা পাঁচ ভাগ ধার্য ছিল যা *মুকাদ্দম* ও

---

[১৬৫] Ishtiaq Husain Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Delhi*, p. 208

[১৬৬] Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi*. pp. 288-290

[১৬৭] Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol. 3, 1958, p. 92; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*, পৃ.৭৬

[১৬৮] ভূমির সাথে জড়িত কর্মচারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে- গোলাপ চক্রবর্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাণ।।
গৌড়ে রহে পাদ শাহা আগে আরিন্দগিরী করে।
বারো লক্ষ মুদ্রা সেই পদশ হেরে ভরে। *চৈতন্যভাগবত*, অন্তলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ.২৯৭

[১৬৯] Abul Fazl, *op. cit.*, vol. 1, p. 300; পাটওয়ারী অনেক সময় নিজে তার ভাতাকে গ্রামের তহবিল থেকে গ্রামের খরচ খাতে দেখাত। কিন্তু তার কাজের জন্য প্রশাসনও তাকে পারিশ্রমিক দিতো। সম্রাট আকবরের সময়ে গ্রামের রাজস্বের এক শতাংশ কমিশন তার জন্য বরাদ্দ ছিল। কানুনগোর ছিল দুই ভাগ কমিশন। মূলত কানুনগোর কাজের বড় অংশই ছিল রাজস্ব নির্ধারণের পরিমাণ ঠিক করা, চৌধুরীর মূল কাজ ছিল রাজস্ব আদায়।

[১৭০] মুকাদ্দম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো যাকে প্রথমে বসানো হয়। মধ্যযুগের শুরু থেকে এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো। গ্রামের মোড়ল এর অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হতো।

[১৭১] Abul Fazl, *op.cit.*, vol.1, p. 285

চৌধুরীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হতো। একইভাবে দুই শতাংশ ধার্য ছিল যা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হতো *পাটোয়ারী* ও কানুনগোর মধ্যে।[১৭২] *চৈতন্যচরিতামৃতে 'অধিকারী'* ও *'চৌধুরী'* পদবিরও উল্লেখ রয়েছে।[১৭৩] শেরশাহ ও আকবরের সময়ে প্রত্যেক পরগনায় একজন মাত্র *কানুনগো* থাকত। শেরশাহ প্রতি পরগনায় একজন *আমিন*, একজন *খাজাঞ্চি*, একজন *কারকুন* হিন্দিনবীশ, একজন *কারকুন* ফার্সিনবীশ নিযুক্ত করেন। কানুনগোর মতে *আমিন বা আমিল* তিনি রাজস্ব নির্ধারণ বা আদায় করতেন।[১৭৪] কোরাইশি ও ত্রিপাটির মতে আমিল ও শিকদার একই কর্মচারী ছিলেন। রাজস্ব আদায় তার প্রধান দায়িত্ব ছিল। অর্থাৎ *আমিন* রাজস্ব জমি জরিপ করতেন, রাজস্ব নির্ধারণ এবং জমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করতেন।[১৭৫] *কানুনগো* ছিলেন পরগনার রাজস্ব আদায়, এলাকার পরিসংখ্যান, স্থানীয় রাজস্বের হার এবং রীতি ও প্রথা সংক্রান্ত তথ্যের ভাণ্ডারী। তাদের কাজের বড় অংশই ছিল রাজস্ব নির্ধারণের পরিমাণ ঠিক করা আর চৌধুরীর মূল কাজ ছিল রাজস্ব আদায়। সে প্রশাসনকে রাজস্ব এবং এলাকার সমস্ত হিসাবের (অঙ্ক) যোগান দিতো।[১৭৬] তার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল *আমিনের* কাছে নিজের নথিপত্র ও নিজের যা আছে তা পেশ করা।[১৭৭] *আমিন* রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ তৈরি করলে *কানুনগো* তার ওপর সই করত আর *চৌধুরী* ও *মুকাদ্দম* এর সঙ্গে একটি কবুলিয়ত ও গ্রহণপত্রে স্বাক্ষর করত। অন্যদিকে *কানুনগোর* কাছে আমিল বা রাজস্ব সংগ্রাহককে তার আদায়, বকেয়া এবং খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবের একটা কপি (নকল) দিতে হতো। আমিল এর কাছে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে সেসব সঠিকভাবে হিসেব লিখেছে কিনা তা দেখার জন্য কানুনগোকে জমিনদার এবং অন্যান্যদের হিসেবের সাথে মিলিয়ে দেখতে হতো।[১৭৮] জমিদারগণ স্থানীয় কর্মচারীদের দিয়ে খাজনা আদায় করাতেন। এছাড়া আরো কিছু পদবির কর্মকর্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলায় ওয়ালি, আমলা ও কারকুন উপাধির লোক নিযুক্ত করেন।[১৭৯] সুলতানী বাংলায় জায়গিরদারি[১৮০] প্রথাও বিদ্যমান ছিল। জায়গিরদাররা তাদের ভূমি ইজারাদারদের কাছে ইজারা দিতেন। এসব ভূমি ইজারা নিতো

---

১৭২ Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 300
১৭৩ *চৈতন্যভাগবত*, অন্তলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩১০
১৭৪ Kalikaranjan Qanungo, *Sher Shah*, Kar. Majumder & Co. Calcatta, 1921, pp. 359-360
১৭৫ Ishtiaq Husain Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Delhi*, p. 208
১৭৬ Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 289
১৭৭ Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 288
১৭৮ Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), pp. 289-290
১৭৯ Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, p. 365
১৮০ জায়গির শব্দটি ফার্সি শব্দ। সঠিক বানান হলো জাইগীর। এর আক্ষরিক অর্থ কোনো জায়গার অধিকারী বা দখলদার। *বাহার-ই-আজম* এ (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.) বড় ফার্সি শব্দ কোষ এর পারিভাষিক অর্থের একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে জাইগির, জাগির। একটি ভূ-খণ্ড শাসক লোকদের মঞ্জুর করেন, যাতে তারা সেই জমির আবাদ থেকে যে রাজস্ব হয় তা দিতে পারেন, সেই রাজস্ব যাই হোক ? বারানী জায়গিরের পরিবর্তে ইকতা শব্দটি ব্যভহার করেছেন। Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal* India (1556-1707), p. 257

স্থানীয় লোকেরা। এ প্রথায় সরকারের পক্ষ থেকে আমির, ওমরাহ ও সরকারি সৈন্য এবং কর্মচারীকে নিয়মিত বেতনের পরিবর্তে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হতো। বাংলার আঞ্চলিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমি থেকে এবং স্থানীয় জমিদার ও ইজারাদারদের কাছ থেকে সুলতানগণ রাজস্ব লাভ করতেন। মজুমদার (Majmu'adars) উপাধিধারী একশ্রেণির লোক ছিল[১৮১] যারা ছিল ঠিকাদারশ্রেণির মতো। তারা কৃষকদের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় করত তা সম্পূর্ণ রাজকীয় কোষাগারে জমা দিতো না বরং নিজেরা একটা অংশ কর্তন করে রাখত। এইসব শ্রেণির ঠিকাদার বা ইজারাদাররা তাদের খুশিমতো রাজস্বব্যবস্থা চালাত এবং মাঝে মাঝে তারা চাষিদের ওপর স্বেচ্ছাচারমূলক রাজস্ব দাবি করত। নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ পেয়ে সরকার সন্তুষ্ট থাকায় এসব জমিদারদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু মজুমদার উপাধিধারী এসব জমিদাররা তাদের জমিদারির ওপর বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার দাবি করতে পারত না। মাঝে মাঝে এসব জমিদারি হাত বদল হতো।[১৮২] *চৈতন্যচরিতামৃতে* উল্লেখ রয়েছে যে, হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাসের অধীন জমিদারিতে তারা কর হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা আদায় করে কেবল মাত্র ১২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতো।[১৮৩] মজুমদাররা আঞ্চলিক কর্মকর্তার অধীনে যারা থাকতেন তাদের কার্যাবলির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রামচন্দ্র খানের বকেয়া খাজনার জন্য ওয়াজির তাঁর ওপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার করেছিলেন।

সুলতানী বাংলার ভূমি রাজস্বের একক বা এলাকা কয়েকটি ধাপে বিভক্ত ছিল। যথা-

ক. কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য, **খ.** ইকলিম বা প্রদেশ, **গ.** শিক বা সরকার, **ঘ.** কসবা/সিত্তা/পরগনা, **ঙ.** গ্রাম

রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী - **১.** কেন্দ্রীয়– ওয়াজির

২. প্রদেশ– আমিল

৩. সরকার– **ক.** আমিল (প্রধান শিকদার) **খ.** প্রধান মুনসেফ

৪. কসবা/পরগনা– ক.শিকদার, খ.মুশরিক, গ. মুহাসসিল, ঘ. গোমস্তা, ঙ.মুনাফিক

৫. গ্রাম– ক. মুকাদ্দাস খ. চৌধুরী/ খুত। এ সকল কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করে জমিদার ও ইজারাদারদের সাহায্য করতেন।

---

[১৮১] কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন, *চৈতন্যচরিতামৃত*, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, রাধারমন প্রেস, মুর্শিদাবাদ, ১৪৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯৩-২৯৪

[১৮২] কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন, *চৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ২৯৩

[১৮৩] *ঐ*, পৃ. ২৭৮

বাংলার কৃষকের অবস্থান

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় এদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ ছিল কৃষক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা এবং কৃষি উৎপাদন সহজসাধ্য হওয়ায় জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল।[১৮৪] *শূন্যপুরাণ*-এর বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, কৃষি কেবল সাধারণ মানুষের পেশা ছিল তা নয়, সম্ভবত সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণও পেশা হিসেবে কৃষিকে অপছন্দ করতেন না।[১৮৫] *শূন্যপুরাণে* একজন হিন্দু দেবতাকে কৃষি পেশা গ্রহণকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।[১৮৬] সুলতানী বাংলায় চার শ্রেণির কৃষক ছিল। (ক) অবস্থাসম্পন্ন বা ধনী কৃষক, (খ) মধ্যস্তরের কৃষক, (৩) নিম্নস্তরের কৃষক ও (৪) ভূমিহীন খুদে কৃষক। ধনী কৃষকদের *রায়ত* বা *খুদ-কাশত* বলা হতো। এ শ্রেণির কৃষকগণ নিজে জমি ও গবাদি পশুর মালিক ছিলেন। ধনী কৃষকদের সম্পর্কে *মৈমনসিংহ গীতিকায়* উল্লেখ রয়েছে।[১৮৭] ধনী কৃষকদের পরই ছিল মধ্যস্তরের কৃষক। এদের *পাই-কাশত* কৃষক বলা হতো। এদের সঙ্গে *খুদ-কাশতে*র পার্থক্য হলো এরা নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্য গ্রামের জমিদারদের আওতায় কৃষিকাজে নিয়োজিত হতে পারতেন। *পাই-কাশতে*র দুটি ভাগ ছিল, এক দলের জমি চাষের কোনো উপকরণ ছিল না। প্রথম শ্রেণির *খুদ-কাশত*রা এদের উপকরণগুলো ধার দিতেন। এ বাবদ তাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ আদায় করে নিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণির *পাই-কাশতে*র চাষের উপযোগী উপকরণ ছিল। যা দ্বারা এই কৃষকগণ ভূমি চাষ করত। তৃতীয় শ্রেণির কৃষকদের বলা হতো *মুজারিয়ান*। *মুজারিয়ান*রা নিম্নস্তরের ভাড়াটে ধরনের কৃষক ছিলেন। তাদের নিজের কোনো জমি ছিল না, অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ বা জমিদারদের কাছ থেকে চাষের জন্য তারা জমি নিতেন। এসব জমিতে তাদের কোনো স্বত্ব বা অধিকার ছিল না। *মুজারিয়ান* কৃষকগণ নিজেদের কর্ষিত জমি অন্য কাউকে চাষের জন্য হস্তান্তর করতে পারতেন না। চতুর্থ শ্রেণির কৃষকরা ছিলেন ভূমিহীন কৃষক।[১৮৮] সুলতানি বাংলায় এ কৃষকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। অনেকে এদের কৃষক না বলে কৃষি শ্রমিক বলাই বেশি সঙ্গত বলে মনে করেন। এ শ্রেণির কৃষিজীবীদের

---

[১৮৪]এম মোফাখ্খারুল ইসলাম মনে করেন আলোচ্য সময়ে কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল সম্ভবত শতকরা ৮০ ভাগ। বাংলার 'অর্থনৈতিক জীবন' আনিসুজ্জমান (সম্পাদিত), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ২০১৯, পৃ. ৬৬। তাঁর বর্ণিত এ সংখ্যাটি অনুমানভিত্তিক। সন্দেহ নেই বাংলার জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ অংশ কৃষিজীবী ছিলেন। তবে তা শতকরা ৮০ ভাগ ছিল কি-না তা নিঃশয়ে বলা সম্ভব নয়।

[১৮৫] রামাই পণ্ডিত, *শূন্যপুরাণ*, পৃ. ১৮১- ১৯৪

[১৮৬] *ঐ*, পৃ. ১৮২-১৯৪

[১৮৭] *মৈমনসিংহ গীতিকায়* এদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে-

ধনুয়া নদীর পারে কাজলকান্দা বাড়ি।
তাইতে না বসতি করে ইরাধর বেপারী।
গিরস্থি করিয়া বেচে একশ পুড়া ধান।
এমন গিরস্থি নাই তাহার সমান।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), *মৈমনসিংহ গীতিকা*, স্টুডেণ্ড ওয়েজ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১০

[১৮৮] আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ. ৩; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন*, (১২০০-১৭৫০), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫-৬; গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, সুবর্ণ রেখা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৮, পৃ, ৩৯-৪৩

নিজের কোনো চাষযোগ্য জমি ছিল না। কৃষি মৌসুমে তারা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে অবস্থাসম্পন্ন ও মাঝারি কৃষকদের জমিতে কাজ করতেন। কৃষি মৌসুম শেষে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদেরকে কৃষিকাজ ভিন্ন অন্য কোনো কাজে যুক্ত হতে হতো। কৃষকের কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ছিল- কাঠের লাঙ্গল, দাঁতালো মই, জমি সমান করার পাটা, রোপণ-যন্ত্র, গাইতি, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি।[১৮৯] কৃষকের উৎপাদিত পণ্যশস্যের একটি বড় অংশই স্থানীয় বাজারে পৌঁছাত। বাংলার সমাজ কৃষিনির্ভর হওয়ায় শাসক ও কৃষকের মাঝে সুবিধাগ্রহণকারী একশ্রেণির দালালের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক ছিল। ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিরা শাসক এবং কৃষক উভয়পক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা নিতো। বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর *মনসামঙ্গল* কাব্যগ্রন্থে পশ্চিম বাংলার মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক শ্রমিক হলেও শত শত শ্রমিক নিয়োগকারী, বিরাট ভূ সম্পত্তির মালিক ও হিন্দু জোতদার শ্রেণিও ছিল। তৎকালীন হিন্দু জোতদারদের জীবনযাত্রাপ্রণালি পরবর্তীকালের জমিদারদের জীবনধারণের মানের সমতুল্য। ধনী জোতদার ও ভূমিহীন মজুরদের মাঝখানে আরও একশ্রেণির কৃষিজীবী ছিল। তারা মজুরদের তদারকি করত। এরা ছিল প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান এবং প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক।

ইকতাদার কৃষকের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব বাবদ যে ফসল আদায় করাতেন তা এই আঞ্চলিক বাজারে বিক্রি করত।[১৯০] সাধারণত জায়গিরদারগণ এসব ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করত। স্থলপথে কৃষিজ দ্রব্যাদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হতো গরুর গাড়িতে কিংবা বলদের পিঠে। গরু বা ঘোড়ার গাড়িতে চাকার ব্যবহারে কৃষিজ পণ্যশস্য খুব দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হতো। যোগাযোগের পথগুলো খুব বেশি চওড়া ছিল না। এসব পথের পাশে রাত কাটানোর জন্য সরাই বা পাঁচিল ঘেরা আস্তানা এবং গুদামের ব্যবস্থা ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকরা প্রায়ই সরাইখানার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৯১] অনেক কৃষক ও ভাগ চাষি ছিল যারা ফসল নিয়ে বাজারে পৌঁছাতে পারত না। কারণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তারা দাদনদারদের কাছে ফসল বেঁচতে বাধ্য হতো। দাদনদার ব্যবসায়ী বা গ্রামের মহাজন যাই হোক না কেন গ্রামের কৃষকরা সব সময় তাদের উৎপাদিত পণ্যশস্যের কমদাম পেতো। যে সব কৃষক চুক্তিতে

---

[১৮৯] K.M Ashraf, *Life and Condition of the People of Hindustan*, Munshriam Manoharam, New Delhi, 1970. pp. 114-116

[১৯০] গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে করে শহরে মাল আসত। তাদের খাবারের জন্য এক তঙ্কা করে ফি দিতে হতো। যে গাড়িগুলো ঘাস ও খড় আনত তার ওপর ধার্য ছিল একটা করে তামার পয়সা। যে গাড়িতে জ্বালানী কাঠ আসত পাঁচ সের কাঠ ধার্য ছিল। যে গাড়িতে বাদাম আসত বলদ পিছু চারটে করে বাদাম আদায় করা হতো। শহরে আসার পথে অনেক জায়গাতেই এসব গাড়িতে এভাবেই ফি পরিশোধ করতে হতো। গরিব লোক ও চাষিরা শহরে ও শহরতলী অঞ্চলে বিক্রির জন্য সব ধরনের গবাদি পশু নিয়ে আসত।

[১৯১] Jean Baptist Tavernier, *Travels of India*, vol.1, p. 45

আবদ্ধ ছিল না তারা হয়তো নায্য মূল্যের কিছুটা কাছাকাছি দাম পেতো। বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য, চিনি, লবণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে শস্য ও পণ্যদ্রব্যাদি শহরে সংগ্রহ করা হতো এবং তা বিভিন্ন বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এসব পণ্য অদ্ভুদ কায়দায় পরিবহণের ব্যবস্থা করত বিখ্যাত বানজার শ্রেণির লোকেরা। এই ব্যবসা তাদের একচেটিয়া ছিল। ভারী বড় বড় বলদের পাল নিয়ে তারা পথ চলত। বানজার ছিল মূলত যাযাবর। তারা পরিবারসহ তাঁবুতে বসবাস করত এবং সশস্ত্র থাকত।[১৯২] তাদের একটি তাঁবুতে পঞ্চাশ থেকে একশটি বলদের দেখাশোনা করতে পারত। বানজাররা বছরে কয়েকশ হাজার টনের অঙ্কের পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করত।[১৯৩] তারা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে তাদের জাত ব্যবসা পরিচালনা করত। উল্লেখ্য যে তাদের ব্যবসা ছিল কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ওপর নির্ভরশীল। ভালো ফসল হলে তাদের ব্যবসাও খুব ভালো হতো।

সাধারণত দেখা যায় যে, দেশে দুর্ভিক্ষ না হলে এবং পরিমাণমতো বৃষ্টি হলেই জমিতে ভালো ফসল জন্মাত। কিন্তু আর্থিকভাবে অনেক কৃষকই স্বাবলম্বী ছিল না। বাংলা সম্পদে পরিপূর্ণ দেশ হওয়ায় কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের সস্তামূল্য থাকায় কৃষকগণ খুব ভালো অবস্থান ভোগ করত বলে মনে হয় না। এদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণি জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করত। কিন্তু কৃষকগণের ক্ষেত্রে অনেকটা বিপরীত চিত্র ছিল। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাঝে বৈষম্য বিরাজমান ছিল। সব কৃষকের প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল না এবং অনেক কৃষকের তা সংগ্রহ করার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না।[১৯৪] এ সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, সাধারণ মানুষের জীবন মানেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সম্পদস্রষ্টা কৃষকের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাদের জীবন ছিল গতানুগতিক ও অনগ্রসর। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে কৃষকগণ কখনও কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত না। শাসকের পরিবর্তন হোক বা না হোক এ বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। সামাজিক স্তরভেদেও তারা ছিল সর্বনিম্ন স্তরে। কৃষকের একমাত্র দায়িত্ব ছিল দেশের প্রতিটি লোকের জন্য ফসল উৎপাদন করা। তাই খাদ্য সরবরাহ করার জন্য ফসল ফলায়, উৎপন্ন ফসল কেটে গোলায় সংরক্ষণ করে। কৃষক রমণী কৃষকের সকল কাজে সহায়তার পাশাপাশি গৃহপালিত পশুর দেখাশোনা করে। কৃষকের ফসলের একটি বড় অংশ খাজনা পরিশোধ করতে শেষ হতো। বাকী কিছু অংশ গৃহস্থালীর কাজে লাগত। এছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পুরোহিত উৎপন্ন ফসলের একটি অংশের ভাগ পেতো। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার তুলনায় কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যদের

---

[১৯২] Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia (travels in Asia 1628-1634)*, edited by Lt. Col. Sir Richard Carnac Temple. vol. 2, The Hakluyt Society, London, 1914, pp. 167-168
[১৯৩] *Ibid*, pp. 95-96
[১৯৪] Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 169

বেশি খাটতে হতো। সকলের সম্মিলিত কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে দুবেলা পেট ভরে খেতে পেলেই তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করত। বছরের অধিকাংশ সময়ই তাদের দিন কাটত অনাহারে অর্ধাহারে।[১৯৫] তারা প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকত। কৃষকের পোশাক সম্পর্কে মোগল সম্রাট বাবর মন্তব্য করেন যে, চাষি ও দিনমুজুর সবাই ন্যাংটা অবস্থায় বাইরে ঘোরে। অবশ্য তারা একটা সরু বস্ত্রাংশ কোমরের সামনে থেকে নিয়ে কোমরে প্যাঁচানো একটা দড়ির সাথে পেছনে বাঁধে।[১৯৬] সম্রাটের এই মন্তব্য থেকে কৃষকের পোশাক সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট যে তারা খুব ছোট আকৃতির পোশাক পড়ত। অর্থাৎ তারা হয়ত লুঙ্গিটাকে কাছা দিয়ে পরত সম্রাট সেই অবস্থা দেখে এই মন্তব্য করেছেন। কৃষকের সংসারের নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কয়েকটি পোড়ামাটির বাসন ছিল যথেষ্ট। অবস্থাসম্পন্ন কৃষক পিতল ও মিশ্রধাতুর বাসন ব্যবহার করত। জোয়াবের রুটি, ভাত, ডাল, পিঁয়াজ, মরিচ ও সামর্থ্য থাকলে একটু ঘি ছিল তাদের অতি পরিচিত খাদ্যবস্তু।[১৯৭] ঘুমানোর জন্য ভূমি শয্যা এবং পরিধেয় লেংটি ও একটি মোটা খসখসে চাদর। এই চাদর দিয়ে তাদের সবরকম পোশাকের কাজ তো হতোই বরং অনেক ক্ষেত্রে ঐ চাদর বিছানার সমস্যাও মেটাত।

বাংলার কৃষকের সার্বিক জীবন সম্পর্কে জানা যায় সম্রাট বাবরের মন্তব্য থেকে। তিনি ভারতবর্ষের কিষাণ পল্লী সম্পর্কে বলেন যে,

> গ্রামের মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের বসবাসের সব চিহ্ন মাত্র দেড় দিনের মধ্যে লুপ্ত করে দিয়ে অন্যস্থানে চলে যেতে পারে এবং তাদের পরিত্যক্ত জায়গায় মানুষের বসবাসের কোনো নিদর্শন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা নতুন করে যেখানে বসতি স্থাপন করে সেখানে একটা পাতকুয়া, কিংবা ডোবা অথবা পুকুর থাকলেই হলো ব্যস আর কিছু তারা চায় না। খাল বা সেতুর এলাহী কাণ্ড তাদের প্রয়োজনের গণ্ডিতে পরে না। তাদের ঘর তোলার জন্য দরকার কয়েকটি গাছের গুঁড়ি এবং ঘরের চাল ছাইবার জন্য কিছু খড়। এগুলো পেলেই তারা তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই তৈরি করে নিতে পারে। . . . অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ের মধ্যে তারা নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলত। এভাবেই খানিকটা খোলা জমির ওপর সামান্য উপকরণ দিয়ে নতুন পল্লী পত্তনের সূত্রপাত ঘটে, তারপর খানিকটা ঘুরে ফিরে এসে দেখবেন সহজ শান্ত চেহারা নিয়ে হিন্দুস্তানের পল্লী অঞ্চলের পরিচিত চেহারা আপনার চোখের সামনে।[১৯৮] বাংলার কৃষকের জীবনের এটাই বাস্তব চিত্র।

---

[১৯৫] K.M Ashraf, *Life and Condition of the People of Hindustan*, p. 124
[১৯৬] Zahirud-din Muhammad Babur Padshah Ghazi, *The Babur Nama, Memoirs in Babur*, p. 519
[১৯৭] K.M Ashraf, *Life and Condition of the People of Hindustan*, p. 197
[১৯৮] Zahirud-din Muhammad Babur Padshah Ghazi, *The Babur Nama, Memoirs in Babur*, pp. 487-488

বিশ্ব মানচিত্রের অন্যতম প্রাচীন ভূ-খণ্ড বাংলা আবহমান কাল থেকেই কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সুলতানী বাংলার অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কৃষকগণ ফসল উৎপাদন করে দেশের প্রজাসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করত। কৃষিজ উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমেই শিল্পের কাঁচামালও সংগ্রহ করা হতো। প্রাক-মুসলিম বাংলায় চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল তুলনামূলক কম। মুসলিম শাসনামলে অভিজাত মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর আগমন, মুদ্রার প্রচলন, নগরায়ণ প্রভৃতি কারণে লোকবসতি বৃদ্ধি পায় ফলে আবাদি জমির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুলতানী শাসনামলে ইকতা ব্যবস্থার প্রচলন হলেও অনেক জমি চাষের আওতায় আসে। ইকতা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এ সময় থেকে এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। ইতোপূর্বে ভূমিতে প্রজার কোনো অধিকার ছিল না। রাজা এক-ষষ্ঠাংশ পুণ্যলাভের আশায় মন্দির ও ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। সুলতানী শাসনামলে ভূমিতে প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রজা ইচ্ছা করলে ভূমি বিক্রি ও দান করতে পারত। এ সময়ে কৃষি জমির উর্বরাশক্তির ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় এবং প্রজারা নির্দিষ্ট দিনে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চর্তুথাংশ ভূমি রাজস্ব প্রদান করত। নগদ অর্থ ও ফসল উভয় মাধ্যমেই রাজস্ব আদায় করা হতো। শাসকের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তার পরিবর্তন হলেও ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্বনীতি অনেকক্ষেত্রে এক থাকত। সুলতানী শাসনাধীনে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের সাথে জমিদার, ইজারাদার ও হিসাব নিরীক্ষক প্রভৃতি লোক জড়িত ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে তারা সমৃদ্ধশালী ছিল। কৃষিকাজে নতুন প্রযুক্তি সাকিয়া/জলচক্র, চাপযন্ত্রের ব্যবহার এবং আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য গুদামজাত করে তা রপ্তানি করা হতো। কৃষিজাত পণ্যকে ভিত্তি করে এভাবেই বাংলায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকশিত হওয়ায় মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে এবং বাংলা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশ

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাংলার কৃষি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে বর্তমান অধ্যায়ে। প্রযুক্তির পরিবর্তন ও নতুন ধরনের প্রযুক্তি সাধারণত উন্নত সভ্যতা থেকে গ্রহণ করা হয়। অভিজাত শাসকগোষ্ঠী বাংলায় বেশকিছু নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসেন। তারা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করেন। সুলতানী শাসনে অভিবাসীদের আগমন ও নগরায়ণের বিকাশ ঘটায় জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, ফলে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে পূর্বের তুলনায় বেশি পণ্য উৎপাদন করা হয়। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক মুদ্রার প্রচলনে বাংলায় কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে এক ধরনের মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন শুরু হয়। কৃষি, বিভিন্ন শিল্প, স্থাপত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে সেচ প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বেড়ে যায় এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বস্ত্রশিল্পে নতুন প্রযুক্তি চরকার ব্যবহার করায় বস্ত্রের উৎপাদন ছয় থেকে সাতগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায়। বাংলায় কাগজ তৈরি প্রশাসনিক কার্যাবলিকে দ্রুত করেছিল। অন্যদিকে কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও হুন্ডির ব্যবহারকে সহজ করেছিল। রেশম উৎপাদনের কৌশল, পানীয়জাত দ্রব্য তৈরিতে পাতন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য সময়ে বাংলায় যেসব শহর গড়ে উঠেছিল সেখানেও নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নতুন ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য স্থাপত্যে চুন, পাথর, ইট ও টালির ব্যবহার নতুন প্রযুক্তির সাক্ষ্য বহন করে। এসময়ে বড় বড় জাহাজ নির্মাণের কারণে নদী ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে যোগাযোগব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে। মূলত দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে সুলতানী আমলে বাংলার বিভিন্ন শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এসব শিল্পের সাথে নতুন করে অনেক লোক যুক্ত হওয়ার নতুন নতুন পেশাজীবী শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই বিষয়গুলোও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

সুলতানী শাসনামলে বিভিন্ন শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রযুক্তি কি সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

প্রযুক্তি হলো একটি হাতিয়ার, যন্ত্র বা কৌশল। এই যন্ত্র বা কৌশলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করাই হলো প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে উন্নত, সহজ ও আরামদায়ক করে থাকে। সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা কৌশলের প্রয়োগকেই প্রযুক্তি বলা হয়। মূলত মানুষের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি কৌশল বা জিনিসই প্রযুক্তির অংশ। প্রযুক্তি শব্দটি গ্রিক শব্দ Tecno থেকে এসেছে, যার অর্থ শিল্প ও নৈপুণ্য। প্রযুক্তির কারণে মানুষ অল্প পরিশ্রমে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। প্রযুক্তি আমাদের চারপাশে পরিবেশের প্রতিটি অংশকে প্রভাবিত করে সেগুলোর এমন রূপান্তর ঘটিয়েছে যে পরিবর্তিত নতুন জ্ঞানের আলোকে বর্ণনা করতে গিয়েও প্রযুক্তির উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞান ব্যবহার করতে হয়। এই নতুন জ্ঞান মানুষকে নিত্য-নতুন কারিগরি কৌশল উদ্ভাবনে এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে সহায়তা করেছে। প্রযুক্তির সংজ্ঞায় *Business Policy* তে বলা হয়েছে যে, Technology consists of equipments, machines, tools, plant layout, product flow system and arrangement of activities.[১] প্রযুক্তি সম্পর্কে *Shorter Oxford English Dictionary* তে বলা হয়েছে যে- The branch of knowledge that deals with the mechanical arts applied sciences; a discourse or treatise on these subjects.[২] প্রযুক্তি যেহেতু সম্পদ ব্যবহার করে তাই প্রযুক্তিগত ইতিহাস অর্থনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত। দৈনন্দিক জীবনে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিসপত্র উৎপাদন করা হয়। তাই প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সবচেয়ে বড় শক্তি সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি। এছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বিকশিত হয় প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য চাই প্রযুক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ ও যথার্থ ব্যবহার। সুলতানী বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

---

১ L.M. Prasad, *Business Policy: Strategic Management,* Sultan Chand and Sons, New Delhi, 2004 Reprint, p. 404

২ *Shorter Oxford English Dictionary,* 5th ed. 2002, p. 3198

সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি

সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারিত হয় এবং কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কুটির শিল্প তথা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প কারখানার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, সুলতানগণ বাংলায় নতুন প্রযুক্তির আমদানি করেন। প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। এসব প্রযুক্তির মধ্যে ছিল মুদ্রা তৈরির প্রযুক্তি, কাগজ তৈরির প্রযুক্তি, রেশমশিল্পে, কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রা তৈরিতে ছাপ (minting) দেওয়া ও ডাইচের ব্যবহার (dices), বস্ত্র বুননে চরকার ব্যবহার (spinning wheel), পাদানি (treadles), রেশমশিল্প (sericulture), চিনিশিল্প, লবণশিল্প, কাগজশিল্পে (art of paper making), সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য তৈরিতে চোলাই/পাতন প্রক্রিয়া (technique of distillation), কৃষিক্ষেত্রে গিয়ার/সাকিয়া (saqiya) ও চাপযন্ত্র বা লিভার (lever) প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুলতানী আমলে প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নিচে বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পক্ষেত্রে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

মুদ্রা ও প্রযুক্তি

প্রতিটি দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় নিয়ামক হলো মুদ্রা। প্রাচীনকালে বাংলায় দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল এবং পণ্যদ্রব্যের বদলে পণ্যদ্রব্য দিয়ে লেনদেন সম্পাদিত হতো। এটি ছিল পিছিয়ে পড়া সমাজের লক্ষণ। বাংলায় মুদ্রার প্রচলন দেখা দেয় খ্রিস্টজন্মের আগে থেকেই। গুপ্ত আমলে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল, কিন্তু সাত শতকের পর থেকে বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা একেবারে উধাও হয়ে যায়। সেন শাসনামলের রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া যায় না। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনে বাংলা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়ে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতির ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকারখানাগুলোর অবক্ষয় শুরু হয়। ফলে কৃষির ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে পাল আমলের শেষের দিক থেকে বিশেষ করে সেন আমলে বাংলা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর অচল-অনড় গ্রাম্য সমাজে পরিণত হয়।[৩] বাংলার সমাজব্যবস্থা ও গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি জনজীবনের বৈশিষ্ট্য হয়েছিল বা সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল।[৪] বাংলার নগরায়ণকে দ্রুততর করা এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু

৩ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩১২-৩৪৭; সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪২

৪ Momtazur Rahman Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, pp. 29-30

রাখার ক্ষেত্রে মুদ্রাব্যবস্থা ছিল একটি অত্যন্ত সক্রিয় প্রযুক্তি। তৎকালীন সময়ে ৯৬ রতি বা ১৭২.৮ গ্রেন মানের ওজনের ভিত্তিতে সোনা ও রূপার দ্বি-ধাতু মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[৫] বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার নতুন প্রযুক্তি ছিল মুদ্রার জন্য ধাতব পদার্থ গলানোর কৌশল, ডাইসের ব্যবহার এবং মাপের পরিবর্তন। এ সময়ে শাসকের পরিবর্তনের সাথে সময়ের পরিক্রমায় মুদ্রার ওজন ও আকৃতিতে পরিবর্তন আসে। ইবনে বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া ও গৌড় বিজয়ের পর গৌড় থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরির নামে স্মারক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। এ মুদ্রাই ছিল বাংলা থেকে জারি করা প্রথম মুসলিম স্বর্ণমুদ্রা।[৬] বাংলা থেকে মূলত, চার শ্রেণির মুদ্রা প্রণয়ন করা হতো। যথা- ক. ওয়ালি বা ইক্তাদার দ্বারা জারি করা দিল্লির সুলতানদের নামে মুদ্রা, খ. দিল্লির নিয়োগপ্রাপ্ত ইক্তাদারদের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইক্তাদারদের নিজ নামের মুদ্রা, গ. দিল্লির সুলতান ও ইক্তাদারদের যৌথ নামের মুদ্রা এবং ঘ. বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা।[৭] সুলতানগণ কর্তৃক জারিকৃত মুদ্রাগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বাংলায় তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। মানসম্মত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন তৎকালীন বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি সাধারণ প্রজারা এ সময় মুদ্রায় খাজনা দিতো।[৮] তাছাড়া বাংলার সুলতানগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করে শুধু অন্যান্য মুসলিম শাসকদেরকেই উৎসাহিত করেনি বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[৯]

---

[৫] M.R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 84

[৬] মোঃ রেজাউল করিম, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা (মধ্যযুগ), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমীক্ষামালা-১*, সম্পাদক-সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১৫

[৭] (ক) সুলতান মুইযউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম (১১৯৩-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান শামস্উদ্দিন ইলতুতমিশ (১২১০-১২৩৫ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান রুকনুদ্দিন ফিরুজ শাহ (১২৩৫-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ), সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান বাহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২-১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান নাসরুদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি শাসকের মুদ্রায় দিল্লির সুলতানের নাম যুক্ত ছিল। মুহাম্মদ বিন সাম, ইলতুৎমিস, সুলতান রাজিয়া, আলাউদ্দিন মাসুদ, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নামে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে এবং একমাত্র মুহাম্মদ বিন তুঘলক স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিনটি ধাতুর মাধ্যমেই বাংলায় মুদ্রা প্রণয়ন করেন। (খ) মুহাম্মদ বিন সাম, ইলতুৎমিসের সঙ্গে ওয়ালী বা ইক্তাদার গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর, নাসিরউদ্দিন মাহমুদের সাথে গভর্নর ইউজবক, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সাথে গভর্নর গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরের যৌথ নামযুক্ত মুদ্রা পাওয়া যায়। যৌথ নামীয় মুদ্রার মধ্যে সবই রৌপ্য মুদ্রা। (গ) ইক্তাদারদের মধ্যে আলী মর্দান খলজির স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা পাওয়া গেছে। (ঘ) সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আজম শাহেরও রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের সোনারগাঁও, জান্নাতাবাদ, ফিরোজাবাদ ও মুয়াজ্জেমাবাদ টাকশাল থেকে মুদ্রা পাওয়া যায়। হোসেনশাহী বংশের চারজন শাসক-আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ), নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ), আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) এর নামেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। শাসকগণ সাধারণত কেন্দ্রীয় শহরগুলোর নিয়মিত দাপ্তরিক টাকশাল ও সাময়িক টাকশাল থেকে এসব মুদ্রা মুদ্রণ করতেন। Md. Rezaul karim, A Critical Study of the Coins of the Independent Sultan of Bengal, *Phd Thesis*, Dhaka University, 2001, p. 19, 92

[৮] আবুল ফজল আলামী, *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম ও দ্বিতীয় ভণ্ড, অনুবাদ, আহমেদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৪

[৯] Muhammad Mohar Ali, *History of Muslim of Bengal*, vol. 1(B), Imam Muhammad Ibn Sa’ud Islamic University Dept. of Culture and publication, Rayadih, 1985, p. 927

বাংলার মুসলিম শাসনের শুরু থেকে শাসকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন, যা মুসলিম আমলে অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়।[১০] কিন্তু সেন শাসনে মুদ্রার অনুপস্থিতির কারণে রাজা লক্ষ্মণ সেন কড়ির মাধ্যমে উপহার প্রদান করেন।[১১] মুসলিম সুলতানগণ কর্তৃক মুদ্রা প্রচলনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু শহর ও বন্দরের বিকাশ ঘটায় ব্যবসায়-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে, যা বাংলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১২] মুদ্রার প্রচলনে বাংলায় বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বন্দরের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বহির্বিশ্বে বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এদেশে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিকে আরো বেশি বিকশিত করেছিল। বিদেশেও বাংলার মুদ্রার চাহিদা ছিল Favourable balance of trade এর মতোই। বাংলার বণিকগণ সুতিবস্ত্রের বিনিময়ে চীন, পেগু ও আরাকান থেকে রূপা সংগ্রহ করত। ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে রূপার চাহিদা বেড়ে যায়। শাসকের পরিবর্তনের পর নতুন শাসক ক্ষমতা গ্রহণ করলে সুলতানের নির্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ও টাকশালের অধ্যক্ষগণ সঞ্চিত মুদ্রা জাল ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের কাছ থেকে ফেরত নিতেন। এসব মুদ্রা গলিয়ে পরবর্তী নতুন শাসকের নামে নতুন আকৃতিতে মুদ্রা তৈরি করা হতো। ব্যবসায়ী, বণিকশ্রেণি ও ধনী ব্যক্তির নিকট থেকেও মুদ্রা সংগ্রহ করা হতো। শাসকের পরিবর্তনের সাথে সাথে মুদ্রার পরিবর্তনের জন্যই এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। এছাড়া প্রত্যেক শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী মুদ্রার মাপের পরির্বতন (হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতো) করতেন।

সুলতানী বাংলার মুদ্রাগুলোর নির্মাণ কৌশল দেখে মুদ্রা অঙ্কন শিল্পীদের কারিগরি দক্ষতা ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতানী যুগের মুদ্রার ওজন, ধাতুর বিশুদ্ধতা ও নির্মাণশৈলী দেখে তৎকালীন সময়ের নতুন প্রযুক্তি ও কারিগরগণের ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে পারদর্শিতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, একটি টাকশালে মুদ্রা তৈরির সাথে জড়িত ছিল একুশ শ্রেণির কর্মচারী। এদের কেউ কেউ মুদ্রা তৈরির জন্য ধাতুকে রাসায়নিক দ্রবণে রেখে বিক্রিয়া করত, কেউ ধাতুর বিশুদ্ধতা নিরূপণ করত, কেউ ধাতুর খণ্ডকে ছাঁচে ফেলে মুদ্রার আকার দিতো। অন্য কেউ

[১০] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫-১৯৮

[১১] Minhaj–I-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, pp. 575-576

[১২] C R Boxer, *The Portuguese Sea-borne Empire*,1415-1825, London, 1969, p. 41; ময়মনসিংহ গীতিকায় বাংলার মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিনোদ ও মলুয়ার বিয়ের সময় দেওয়ানকে নজরানা দেওয়া হয়নি তাই দেওয়ান কাজীকে দিয়ে বিনোদের নজর মরেচা বাবদ পঞ্চশত রূপ্যা (রৌপ্য মুদ্রা) জারি করে। দৈনন্দিন হাট-বাজারে কড়ির প্রচলন ছিল। কড়ির প্রচলন সম্পর্কে বলা হয়েছে-হাজার টাকার শাল দিল আরো টাকা কড়ি। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, পৃ. ৮, ৭২

মুদ্রার গায়ে লিপি অঙ্কন করত।[১৩] এভাবে মুদ্রা তৈরির প্রত্যেকটি ধাপেই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সুলতানী বাংলায় প্রবর্তিত মুদ্রার অধিকাংশ মুদ্রাই ছিল রৌপ্যমুদ্রা। সুলতানদের প্রত্যেকেই নিজ নামে আরবি ভাষায় রৌপ্যমুদ্রা জারি করেন। ইবনে বখতিয়ার খলজি গৌড় বিজয়ের পর বাংলায় নতুন পদ্ধতির স্মারক মুদ্রা (চিত্র-৫.১) প্রবর্তন করেন।[১৪] তাঁর মুদ্রার নতুনত্ব ছিল এই যে, এই মুদ্রার এক পিঠে অশ্বারোহী সুলতানের রাজদণ্ডসহ প্রতিকৃতি ও অন্য পিঠে সুলতানের নাম ছিল। মুদ্রার কর্ণারে মাস ও তারিখ আরবি লিপিতে লেখা হয়েছে। এছাড়া গৌড় বিজয়ের তারিখ লেখা হয়েছে স্থানীয় দেবনাগরী লিপিতে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, গৌড়ে কেবলমাত্র বাংলা ভাষাই নয়

চিত্র-৫.১: বখতিয়ার খলজির মুদ্রা

বাংলা লিপিরও প্রচলন ছিল, এই মুদ্রা থেকে সেই বিষয়ই প্রমাণিত হয়। পরবর্তী সুলতানগণ এই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুদ্রা জারি করেন। এ সময়ের মুদ্রাগুলো ছিল গোলাকৃতি। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১০-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) এক তোলা ওজনের রৌপ্যমুদ্রা জারি (১২১৯ খ্রিস্টাব্দ) করেন।[১৫] এ মুদ্রায় একদিকে সুলতানের উপাধিসহ নাম (চিত্র-৫.২) এবং অপরদিকে কালেমা এবং কর্ণারে বৃত্তাকারে তারিখ লেখা হতো। এ মুদ্রাই ছিল বাংলায় প্রচলিত মুদ্রার নতুন কৌশল ব্যবহার দ্বারা জারিকৃত প্রথম মুদ্রা। যেখানে আরবি হরফে কালেমা লেখা রয়েছে।[১৬]

---

[১৩] Abul Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari*, eng.tr. Colonel H.S Jarret, The Asiatic Society, Kolkata, vol. 2, 2010, p. 134

[১৪] Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, vol. 1, eng.tra., Major. H.G.Raverty, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1881, reprint: Oriental Book Corporation, New Delhi, 1970, pp. 427, 555-556.

[১৫] Nalini Kanta Bhattashali, *op.cit.*, pp. 32-33

[১৬] Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to A.D 1538) Asiatic Society of Pakistan, Publications no. 6, Dacca, 1960, pp. 18-21

চিত্র- ৫.২: ইওয়াজ খলজির মুদ্রা

পরবর্তী সুলতানগণ এ মুদ্রার অনুসরণে মুদ্রা জারি করেন। দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিসের সময় থেকেই বাংলার রৌপ্যমুদ্রার কর্ণারে তারিখের সাথে টাকশালের নাম উল্লেখ করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য যে, এসব মুদ্রায় ব্যবহৃত লিপি ও ভাষা ছিল আরবি এবং কর্ণারে লিপির তারিখ সংখ্যায় না লিখে কথায় লেখা হতো।[১৭] দিল্লির নিয়োগপ্রাপ্ত স্বাধীনতা ঘোষণাকারী গভর্নরদের মধ্যে রুকনউদ্দিন কায়কোয়াস (১২৯১ খ্রিস্টাব্দ), শামসুদ্দিন ফিরোজশাহও (১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) নিজ নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। স্বাধীন সুলতান ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁও এ স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বনামে মুদ্রা জারি করেন। তাঁর মুদ্রার ওজন ছিল ১৬০.৫ গ্রাম।[১৮] শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়ে প্রচলিত ২ টাকা মূল্যমানের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। অন্যান্য স্বর্ণমুদ্রা ছিল ১ টাকা মূল্যমানের। ইলিয়াস শাহের সময়ে নতুন বৈশিষ্ট্যের মুদ্রা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র-৫.৩)।[১৯] তাঁর সময়ে প্রকাশিত মুদ্রায় নতুন করে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা গণেশের (১৪১৪-১৪১৯) মুদ্রা অন্যান্য মুদ্রা থেকে আলাদা ছিল। তাঁর নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার মুদ্রা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে দেখা যায় ইলিয়াস শাহের মুদ্রার ন্যায় আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মুদ্রার আকৃতি ও ছাপ প্রায়ই একই। সুলতানী বাংলার অন্যান্য শাসকগণের মুদ্রার থেকে রাজা গণেশের মুদ্রা ছিল ভিন্ন আকৃতির।

[১৭] Abdul Karim, *Corpus*, pp. 20-21; মোঃ রেজাউল করিম, মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা, মধ্যযুগ ও পরবর্তী মধ্যযুগ, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১১৮ Nalini Kanta Bhattashali, *op.cit.*, pp. 32-33

[১৮] Khan Sahib Abid Ali Khan, *Memories of Gour and Pandua.*, p. 10

[১৯] *Ibid*, p. 22

চিত্র-৫.৩: শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা (উৎস-*প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১২২)

রাজা গণেশ বা দনুজমর্দন দেব তাঁর মুদ্রায় পূর্বের শাসকগণের ন্যায় আরবি ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেননি। তিনি আরবির পরিবর্তে বাংলা এবং হিজরি সনের পরিবর্তে শকাব্দ শব্দের ব্যবহার করেন (চিত্র-৫.৪)। গণেশের সময় মুদ্রার লেখনীতে প্রথম বাংলা শকাব্দ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[২০]

চিত্র-৫.৪: দনুজমর্দ্দন দেব/ রাজা গণেশের মুদ্রা

[২০] Nalini Kanta Bhattashali, *op.cit.*, pp. 118-119; Khan Sahib Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 29

পরবর্তী সুলতান রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ পিতার নীতি অনুসরণ না করে তাঁর মুদ্রায় আরবি লিপি ও হিজরি সনের পুনঃপ্রবর্তন করেন। এছাড়াও অনেক দিন পর তিনি বাংলার মুদ্রায় কালেমা প্রবর্তন করেন। সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ[২১] (চিত্র-৫.৫) ষড়ভুজ ও আট পাপড়ি আকৃতির ব্যতিক্রমী মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তাঁর এ মুদ্রা ছিল বাংলা থেকে প্রবর্তিত সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির মুদ্রা।

চিত্র-৫.৫: জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের মুদ্রা

এতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব মুদ্রার ওজন ছিল ১৭৭ গ্রেন বা ১১.৬ গ্রাম। রাজা গণেশের পরবর্তী শাসকদের সময়ে মুদ্রার ওজন কমে দাঁড়ায় ১৬৬ গ্রেন বা ১০.৮ গ্রাম।[২২] তখন রাজধানী ছাড়া অন্যান্য প্রশাসনিক অঞ্চল থেকেও মুদ্রা জারি করা হতো।

শেরশাহের শাসনামলে মুদ্রায় ভিন্ন কৌশলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর মুদ্রায় কালেমা লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া 'আস সুলতান আল আদিল' (ন্যায় বিচারক সুলতান), চার খলিফার নাম, নিজের নাম 'ফরিদ্দুনিয়া ওয়াদ দীন আবুল মুজাফফর শেরশাহ আস সুলতান- এই বাক্যসহ টাকশালের নাম ও দেবনাগরী লিপিতে শ্রী শেরশাহ উৎকীর্ণ করেন। শেরশাহের সময়ের মুদ্রার ছাঁচ বড় (চিত্র-৫.৬), লিপিশৈলীও পরিশীলিত যা পূর্বের সুলতানদের মুদ্রা থেকে কিছুটা ভিন্ন।[২৩]

[২১] Khan Sahib Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 30; Nalini Kanta Bhattashali, *op.cit.*, p. 119
[২২] Nalini Kanta Bhattashali, *op.cit.*, p. 120
[২৩] মো: রেজাউল করিম, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১১৫

চিত্র-৫.৬: শেরশাহের মুদ্রা, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১২৮

সুলতানী শাসন প্রবর্তিত হলে মুদ্রায় মাপের ভিন্নতা, আকৃতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এছাড়া কোনো শাসকের মুদ্রা ছিল ভারী আবার কোনো শাসকের মুদ্রা ছিল হালকা। কোনো কোনো মুদ্রা ছিল গোলাকার এবং কোনো কোনো মুদ্রা ছিল চতুর্ভুজ আকৃতির। এছাড়া কোনো কোনো শাসকের মুদ্রা ষড়ভুজ আকৃতির ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, সুলতানী বাংলায় অনেক দক্ষ কারিগর ছিল এবং মুদ্রা তৈরিতে নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করা যায়।

আলোচ্য সময়ে মুদ্রা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন- সুলতানগণ কর্তৃক নতুন এলাকা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত অঞ্চলের জন্য সম্পূর্ণ নতুন মুদ্রা চালু করা সম্ভব হতো না। কারণ- ১. বিজিত অঞ্চলের অধিকার সুসংহত করে শাসন প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন ছিল। ২. এছাড়া বিজিত অঞ্চলের জনগণের পক্ষে নতুন মুদ্রা গ্রহণের বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল। তাই সুলতানগণ যে সকল অঞ্চল জয় করেন ঐ বিজিত অঞ্চলের প্রচলিত মুদ্রার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই মুদ্রা প্রচলন করা হতো। যেমন- মুদ্রার ওজন, ধাতুর মান, সুলতানের নাম, মুদ্রায় ব্যবহৃত ভাষা। মূলত ১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত মুদ্রার ওজন ছিল এগারো গ্রামের বেশি কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় এসব মুদ্রার ওজন কমে যায়। আলোচনাধীন সময়ের প্রতি লক্ষ করলে পরিলক্ষিত হয় যে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। হোসেন শাহের সময়ে বাংলায় তিন রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যার ওজন ছিল ১৬০ গ্রেন, ৮০ গ্রেন এবং ৪০ গ্রেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মুদ্রার অনুপাত ছিল ২ঃ১ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ওজনের সমানুপাতিক প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণির মুদ্রার

ওজনের অনুপাত ৪ঃ১। তবে প্রথম সারির বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া যায় যার ওজন ১৪৮ থেকে ১৭০ গ্রেনের মধ্যে। এই তিন রকম মুদ্রা ছিল পূর্ণ, অর্ধ ও সিকি টাকার প্রতীক। নুসরাত শাহের পূর্ববর্তী একমাত্র ইলিয়াস শাহ অর্ধ টাকার মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন যেখানে ফিরুজাবাদ টাকশালের নাম পাওয়া যায়। এই মুদ্রার ওজন ছিল ৮৩ থেকে ৮৪ গ্রেন।[২৪] হোসেন শাহের আমলের দুটি সোনার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর পূর্বের ৫টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। এছাড়া জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের মুদ্রার ওজনের চেয়ে সম্রাট হুমায়ুনের মুদ্রার ওজন কম ছিল। জালালউদ্দিনের মাহমুদ শাহের মুদ্রার ওজন ছিল ১১.৬ গ্রাম এবং সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রার ওজন ছিল ১০.৬ গ্রাম। সময়ের সাথে সাথে সব ধরনের মুদ্রার ওজনহ্রাস পায়।

আলোচ্য সময়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ মুদ্রায় ভূমি রাজস্ব প্রদান করত। গ্রামে তাদেরকে এসব মুদ্রা সরবরাহ করত সারাফ নামের বিনিয়োগকারী। সারাফগণ প্রতিটি শহরে এমনকি গ্রামের বাজারেও মুদ্রা বিনিময়ের কাজে নিয়োজিত ছিল। মুদ্রা বিনিময় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে এসব সারাফগণ ছিল খুবই প্রভাবশালী। সারাফদের প্রধান কাজ ছিল মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা। মুদ্রার খাদ, ওজন এবং মুদ্রণের সময় নিরূপণের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সারাফরা মুদ্রা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে অচল মুদ্রা বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করত। বাংলার টাকশালগুলো থেকে অল্প খরচে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা তৈরি[২৫] করা যেতো এবং কারিগরগণ মুদ্রা নির্মাণ কৌশলে খুব দক্ষ ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ সময়ে মুদ্রা তৈরিতে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেহেতু প্রাক্-মুসলিম যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, তাই শাসকগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ নতুনভাবেই মুদ্রা তৈরির সব পদ্ধতি শুরু করতে হয়। মুদ্রা তৈরির জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কারিগদেরকে ধাতুবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব ও ছাঁচ ব্যবহারের কৌশলসহ বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হতো।[২৬] মুদ্রা তৈরির এই জটিল প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন আবুল ফজলের তাঁর *আইন-ই আকবরী* গ্রন্থে।[২৭] সাধারণত ধাতুকে নতুন করে গলানো ও মুদ্রার ছাঁচ (dices) তৈরি করতে হয়। ছাঁচে প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থায় বা নির্দিষ্ট

---

[২৪] M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 160

[২৫] সারাফরা সাধারণত তাদের ব্যবসা থেকে প্রচুর লাভ করত। যেহেতু আসল টাকার মূল্য সবসময়ই পরিবর্তন হতো কারণ সারাফরা তাদের ইচ্ছামত কমিশন/বাট্টা ধার্য করতে পারত। এ ব্যাপারে তাদের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না বা সরকারের এই ব্যবসা থেকে অর্থ আসতো না। অনেক ক্ষেত্রেই সারাফরা ধনী লোকদের প্রতারিত করত। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৮

[২৬] M.R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 85

[২৭] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, pp. 18-27

ওজনের ধাতব টুকরা ছাঁচের উপর রেখে হাতুড়ির সাহায্যে পিটিয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা হতো। প্রথমদিকে ধাতু পরিশুদ্ধ করে তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ মিশিয়ে মাপ অনুযায়ী টুকরা করে নেওয়া হতো। মোগল শাসনামলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মুদ্রা তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট বানওয়ারি, সারাফ উপাধিধারী লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য দারোগা উপাধিধারী কর্মকর্তা থাকত। এসব পদবিধারী কর্মকর্তা পূর্বেও ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ সুলতানী শামনামলে যেহেতু মুদ্রার প্রচলন ছিল তাই এসব পদবির কর্মকর্তাও মুদ্রা তৈরির সাথে জড়িত ছিল। মূলত আধুনিক যুগে বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশল বা নব নব প্রযুক্তির মাধ্যমে মুদ্রা তৈরি করা হয়। সুলতানী আমলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি একথা সত্য তবে তৎকালীন যুগোপযোগী প্রযুক্তির সাহায্যে হাতেই মুদ্রা তৈরি করা হতো।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির সংযোজন

সুলতানী শাসনামলে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাগজ শিল্পের বিকাশ ঘটে। মুসলিম শাসনের পূর্বে শিক্ষা শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু মুসলিম শাসনামলে উঁচু-নীচু সব শ্রেণির মানুষ শিক্ষাগ্রহণের অধিকার লাভ করে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য মুসলিম শাসকগণ শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাগজের ব্যবহার সম্প্রসারিত করেন। অফিস আদালতে কাগজের ব্যবহার করায় খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন হতো। বাংলায় কাগজের ব্যবহার সম্পর্কে চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান উল্লেখ করেন যে, তারা এক ধরনের গাছের বাকল থেকে সাদা কাগজ তৈরি করত যা হরিণের চামড়ার মতো মসৃণ এবং উজ্জ্বল ছিল।[২৮] কাগজ তৈরির কৌশল ছিল সম্পন্ন নতুন প্রযুক্তি (চিত্র, ৫.৭)। অন্যদিকে বাংলায় কাগজের ব্যবহার হুণ্ডি ব্যবস্থাকে সহজ করেছিল। হুণ্ডি ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছিল। কাগজ ব্যবহার করে একদিকে সামরিক শাসনকর্তা দ্রুত কাজ করতে পারত অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রাহকগণ খুব সহজেই তথ্য আদান প্রদান করতে পারত। অফিস আদালতে কাগজ ব্যবহারের ফলে সরকারি পত্রাদি বিভিন্ন অফিসে প্রেরণ ও সিল ব্যবহার করা সহজ ছিল। সুলতানদের আদেশনামা প্রচারের জন্য কাগজের ব্যবহার ছিল সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। এ পদ্ধতি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে।[২৯] সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৪-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) একডালা দুর্গে তিন খণ্ডে সহিহ বুখারির অনুলিখনের[৩০] কাজ সহজ হয়েছিল কাগজ ব্যবহারের ফলে।

---

[২৮] Ma huan, *op.cit.*, p. 163
[২৯] M R Tarafder, *Trade Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 89
[৩০] *Ibid*

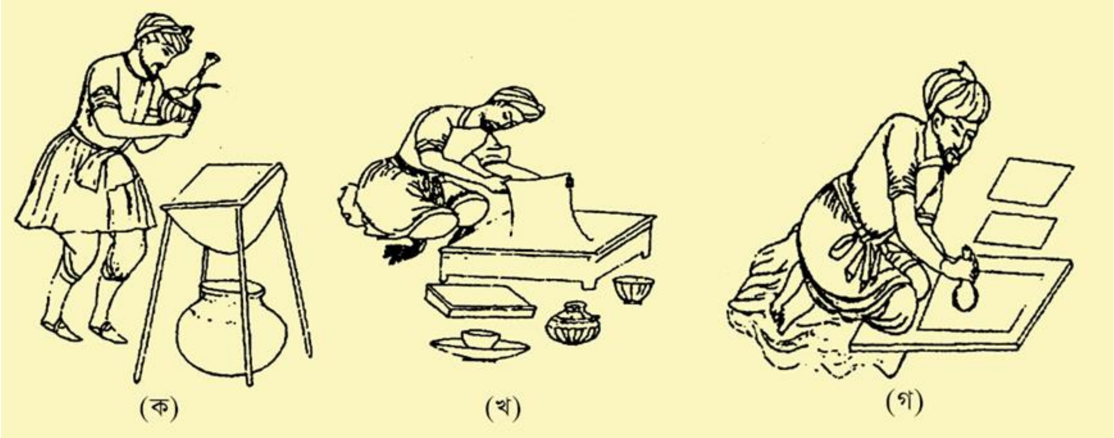

চিত্র-৫.৭: কাগজ প্রস্তুতের বিভিন্ন ধাপ, Habib- *Technology*, p. 65

এছাড়া নুসরত শাহের সময়ে (১৫৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়ে ইরানি রীতিতে নিজামীর সফরনামার কয়েকটি অনুকাহিনির চিত্রণ দ্বারা বাংলায় কাগজ ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১] বাংলায় কাগজের ব্যবহার শুরু হওয়ায় শিক্ষার প্রসার ঘটে। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি ও সাহিত্যিকগণ অনেক কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করেন। মানুষের হাতে সেসব গ্রন্থ পৌঁছানোর ফলে ব্রাহ্মণ ছাড়াও অনেকেই অধ্যয়নের সুযোগ পায়। সুলতান হোসেন শাহের সময়ে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বেশি হয়, এজন্যই এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সুলতানী শাসনামলে শাসকবর্গের উদারতায় হিন্দু, মুসলিম উভয় শ্রেণির কবিগণ কাব্য রচনা ও অনুবাদ করেন। ফলে সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষা সহজলভ্য হয়। নিম্নশ্রেণির মানুষ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়।

শিল্প ও প্রযুক্তি

মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ শিল্পকারখানা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির। পর্যায়ক্রমে গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গ্রামে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরি হতো। এ সময়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ, বিভিন্ন ধরনের নগরকেন্দ্রের উত্থান ও বিকাশ, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, বিদেশি বণিকদের আগমন, পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি প্রভৃতি কুটির শিল্পকারখানা বৃদ্ধির কারণ ছিল।[৩২] এছাড়া অন্যান্য সব পণ্যদ্রব্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকারখানায় তৈরি হতো এসব কারখানা ছিল ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। রাজকীয় শিল্পকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি হতো। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধানত সামরিক সরঞ্জামাদি,

[৩১] M R Tarafder, *Trade Technology and Society in Medieval Bengal*, p.89; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 285

[৩২] কুমুদ রঞ্জন দাস, সুলতানি আমলে বাংলায় অর্থনৈতিক বিকাশ, *ইতিহাস অনুসন্ধান-৮*, ১৯৯৩, পৃ. ৩২; মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রযুক্তি*, পৃ. ২৮২

অভিজাতদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাজকীয় কারখানায় তৈরি হতো।[৩৩] অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যক্তিগত কারখানায় তৈরি হতো।

বস্ত্রশিল্প

সুলতানী বাংলার সবচেয়ে বিস্তৃত ও বিখ্যাত শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের পতনের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপথ পরিবর্তন হয়। এসময়ে পূর্বে মালাক্কা ও পশ্চিমে ক্যাম্বের বন্দরগুলোর উত্থান বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সহায়ক ছিল। তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ পারস্য উপসাগর থেকে পরিবর্তিত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া-এডেন-ক্যাম্বে-মালাক্কা দিগন্তে গড়ে ওঠে।[৩৪] এ পথ ভারত ও বাংলার বাণিজ্যকে প্রসারিত করেছিল। ফলে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একধাপ অগ্রসর হয়। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বড় অংশ দখল করেছিল বাংলার বস্ত্রশিল্প। আলোচ্য সময়ে বাংলার বস্ত্রশিল্পে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। নতুন প্রযুক্তি চরকার ব্যবহার কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল। ইসামীর *ফুতুহ-উস সালাতিন* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতে সুতা কাটার যন্ত্র চরকা ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল আর বাংলায় চরকার প্রচলন হয়েছিল চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে।[৩৫] বস্ত্রশিল্পে বাংলায় চরকার ব্যবহার ছিল নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যা বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

চিত্র-৫.৮: Part F. Baltazard Solvyns, Les Hindous Volume 4, Paris.

[৩৩] Md.Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, pp. 325-326

[৩৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১০৪

[৩৫] Irfan Habib, *Technology in Medieval India*, c. 650-1750, Aligarh Historians Society, New Delhi, 2017, p. 39; মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩

পনেরো শতকের প্রথমদিকেই বাংলায় নতুন প্রযুক্তি চরকার (চিত্র-৫.৮) ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমাণে মোটা সুতিবস্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়। পর্তুগিজ পর্যটক বার্বোসা লিখেছেন যে, লোকজন চরকায় সুতা কেটে বস্ত্রবয়ন করে।[৩৬] ইরফান হাবীব উল্লেখ করেন যে, শুধু চরকা নয়, পাদানি[৩৭] দিয়ে তাঁত চালানোর প্রথাও চর্তুদশ শতকে বাংলায় চালু ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে এসব প্রযুক্তির উল্লেখ থাকলেও পাদানি অংশের (treadle) কথা উল্লেখ নেই।

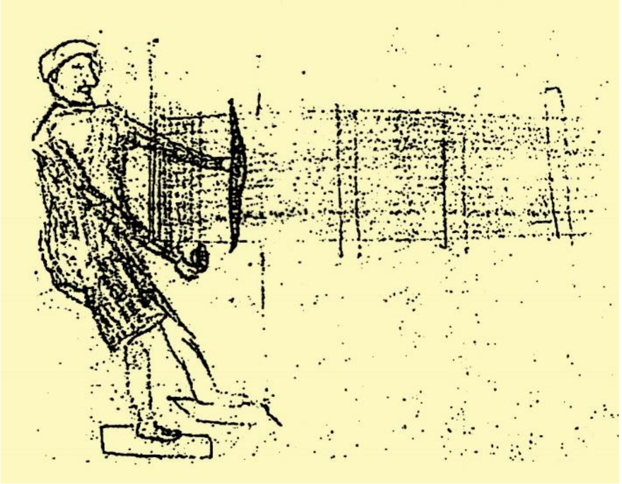

চিত্র-৫.৯: তাঁত চালানোর পা-দানি, মিফ্‌তাহ্-ল ফুজালা, ১৪৬৯, Irfan Habib, *Technology*, p. 43

চরকার ব্যবহার করায় সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সঙ্গত কারণেই অধিক সুতার ব্যবহারের জন্য বেশি তাঁতের প্রয়োজন পড়ে। ইরফান হাবীবের প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় তাঁত শিল্পীরা পাদানি ব্যবহার করত। এ দুই প্রযুক্তির ব্যবহারে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন ছয় সাত গুণ বৃদ্ধি পায়।[৩৮] ইতোঃপূর্বে এ প্রযুক্তি বাংলায় প্রচলিত ছিল না। ফলে শিল্পকারখানায় উৎপাদন কম হতো। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল।

সুলতানী আমলের অন্য বয়ন প্রযুক্তি হলো তুলা ধুননযন্ত্র[৩৯] (cotton-carder's bow)। তুর্কিদের মাধ্যমে চর্তুদশ শতাব্দীতে এ যন্ত্রটি প্রথম ভারতে আসে এবং পরে বাংলায়। সুলতানী শাসনের পূর্বে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তুলা বয়ন উপযোগী করা হতো কিন্তু সময় ও পরিশ্রমের তুলনায় এতে তুলার পরিমাণ কম হতো। সুলতানী শাসনামলে ধুনন যন্ত্রেরও ব্যবহার শুরু হয়। ধুনুরির ধনুক প্রচলিত হলে

---

[৩৬] Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, vol. 2, p. 146

[৩৭] M. R. Tarafder, *Trade and Technology and Society in Mevieval Bengal*, p. 72

[৩৮] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, reprint. 2019, pp. 283-284; সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন* (১২০০-১৭৫০), কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৪৫

[৩৯] Irfan Habib, *Technology in Medieval India* c. 650-1750, Aligarh Historical Society, Tulika Books, New Delhi, 2017, pp. 41-43

অল্প সময়ে বেশি পরিমাণে তুলা বয়নের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়।[৪০] এ সময়ে তুলার অনেক উন্নত বস্ত্র তৈরি হতো। ভারত এবং বিদেশ এর অনেক চাহিদা ছিল। মার্কো পোলো (১২৭১-১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন যে, বাংলায় অধিক পরিমাণে তুলা উৎপাদন হতো এবং এর বাণিজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[৪১] *তারিখ-ই ফিরোজশাহী*তে উল্লেখ রয়েছে যে, লখনৌতি থেকে ভারতে এক ধরনের তুলাজাত কাপড় রপ্তানি হতো এবং এর নাম ছিল 'বারদ' (bard)।[৪২] চরকা, পাদানি ও তুলা ধুনন যন্ত্রের প্রচলন হলে একদিকে সুতার উৎপাদন বেড়ে যায়, অন্যদিকে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমে আসে। সুলতানী শাসনাধীনে তাঁত শিল্পে আরো কিছু পরিবর্তন আসে। এ সময়ে তাঁতশিল্পে একাধিক সূঁচের ও মাকুর প্রচলনে তাঁতশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের জন্য আদিম যন্ত্র টাকু বা তকলির ব্যবহার হতো। বাঁশের তৈরি সূচের মতো যন্ত্র তকলি ফাঁপা খোলকের (shell) ওপর ঘুরিয়ে বয়নের কাজ সম্পন্ন করত।[৪৩] সুতার উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নীচু শ্রেণির অনেক লোক এ শিল্পের সাথে যুক্ত হয়। চৈনিক দূতগণ বাংলার সুতিবস্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং এ প্রদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। মাহুয়ান বাংলায় ছয় প্রকার সুতিবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) পি- পো (pei-po) নামে বিভিন্ন রঙের এক প্রকার কাপড় ছিল। এটি ছিল প্রস্থে দু থেকে তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ৫৬ ইঞ্চি। এই বস্ত্র খুবই সূক্ষ্ম ও মিহি ছিল। (২) চার ফুট বা তারও অধিক চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট লম্বা 'মান-চে-তি'(man-che-t'i) ছিল আদার রঙের মতো হলদে বস্ত্র (ginger-black cloth)। এ কাপড়ের বুনন ছিল খুবই ঠাসা এবং মজবুত।[৪৪] (৩) 'শা-না-কিয়ে'/শাহ-না-পা-ফু (sha-na-pa-fu) নামক বস্ত্র ছিল পাঁচ ফুট প্রশস্ত ও বিশ ফুট লম্বা। এটি চীনা কাপড় 'লু-পু' (শেঙ্গ-লো) মতো ছিল। (৪) তিন ফুট প্রশস্ত ও ষাট ফুট লম্বা এক প্রকার বস্ত্রের বিদেশি নাম ছিল 'হিন-পেই টাঙ্গ টা-লি' /ফি-পাই-লাও-টা লি (hsin-pai-ch'in-ta-li)। এটি ছিল এক ধরনের মোটা কাপড়। (৫) 'শা-তা-ইউল' (sha-t'a-erh) ছিল দুই রকমের। যার একটির মাপ ছিল প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং অন্যটি ছিল আড়াই ফুট প্রস্থ ও চার ফুট লম্বা। এটা একান্তই চীনা 'সান-সো' বস্ত্রের

---

৪০ Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (Edited by), *The Cambridge Economic History of India* 1200-1750, vol. 1, Orient Black Swan, Cambridge University Press, India, 1982, pp. 77-78

৪১ Marco Polo, *The Travels of Marco Polo,* Manual Komroff & illustrations by Wilford Gordon, New York, 1930, p. 204

৪২ Syed Ejaz Hussain, Crafts and Economy: Bengal Sultanate, *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Period* (c.1200 to 1800 C. E), vol. 2, ed. by Abdul Momin Chowdhury, Asiatic Society of Bangal, Dacca, 2020, p.146

৪৩ N.K.Sinha, *Economic History of Bengal,* Calcutta, 1956, pp.172-173

৪৪ Ma hung, *Ying-Yai Sheng-Lan* , The overall Survey of the Ocean's Shores, Translated from the Chinese text edited by Feng Ch'eng-Chin with introduction, notes and appendices by J. V. G. Mills, Hakluyt Society, Cambridge, 1970, pp. 162-163

অনুরূপ ছিল। (৬) 'মা-হেই-মা-লি' (mo-hei-mo-le) বস্ত্র তৈরি হতো বিশ বা ততোধিক ফুট দৈর্ঘ্যে এবং চার ফুট প্রস্থে। এর এক দিকে আধা ইঞ্চি লম্বা আবরণ ছিল। এটা দেখতে চীনা 'তুলো-ফিয়া' বস্ত্রের মতো ছিল।[৪৫] এছাড়া এ সময়ে উন্নতমানের কাপড় উৎপাদনের কথা জানা যায় আমির খসরুর বিবরণ থেকে।

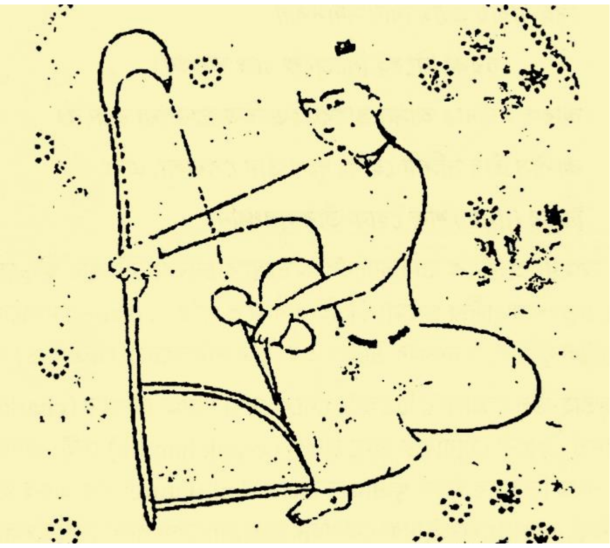

চিত্র-৫.১০: তুলা-পেঁজার ধনুক, মিফ্‌তাহ্‌-ল ফুজালা, ১৪৬৯, Irfan Habib, *Technology*, p. 40

তিনি বাংলায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট সুতিবস্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এছাড়া মসলিন সম্পর্কে আমির খসরু বলেন যে, এই কাপড় (মসলিন) এতো সূক্ষ্ম ও মিহি ছিল যে ১০০ গজি মসলিনের থানও অনায়াসে মাথায় জড়ানো যেতো এবং তার নিচ দিয়ে আবার চুল স্পষ্ট দেখা যেতো।[৪৬] তিনি লক্ষ করেন যে এই কাপড়ের পুরো একখণ্ড যে কেউ তার আংটির মধ্যে ধারণ করতে পারত অথচ যখন এর ভাজগুলো খোলা হতো তখন তা দ্বারা পৃথিবী আবৃত করা যেতো।[৪৭] আমির খসরুর এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন যে, সোনারগাঁও সরকারে এক প্রকার মিহি মসলিন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এগারসিন্ধু শহরে একটি বড়পুকুর আছে। এই পুকুরে ধোয়া কাপড় খুব চমৎকার সাদা হয়। এছাড়াও তিনি আরো বলেন যে, বারবকাবাদ সরকারে (রাজশাহী, দক্ষিণ বগুড়া ও দক্ষিণ পূর্ব মালদাহ) গঙ্গাজল নামে এক রকম খুব মিহি কাপড় তৈরি হয়।[৪৮] এই উন্নত বস্ত্রের মূল্য জানা যায় মীর্যা নাথান এর *বাহারিস্তান-ই-গায়েরী* থেকে। মীর্যা নাথান বাংলা

---

[৪৫] Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan*, pp. 162-163

[৪৬] Amir Khusrau, *Qiran-us-Sadain*, Translated and edited by Professor Ishrat Husain Ansari and others, Delhi, 2012, pp. 36-50

[৪৭] Amir Khusrau, *Qiran-us-Sadain*, pp. 32-33, 100-101; M. A. Rahim, *op.cit.*, pp. 391-392

[৪৮] Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, vol, 2, p. 136

থেকে চার হাজার টাকায় এক খণ্ড মসলিন কাপড় ক্রয় করেন।[৪৯] সিলেটের মসলিনের নাম ছিল 'সালাকাতি'। এছাড়া বাংলার একটি বিখ্যাত মসলিন ছিল 'শিরিন-বাফত'। মুসলিম শাসনে কারিগরদের সুনিপুণ দক্ষতায় বিভিন্ন রকমের কাপড় তৈরি হতো।

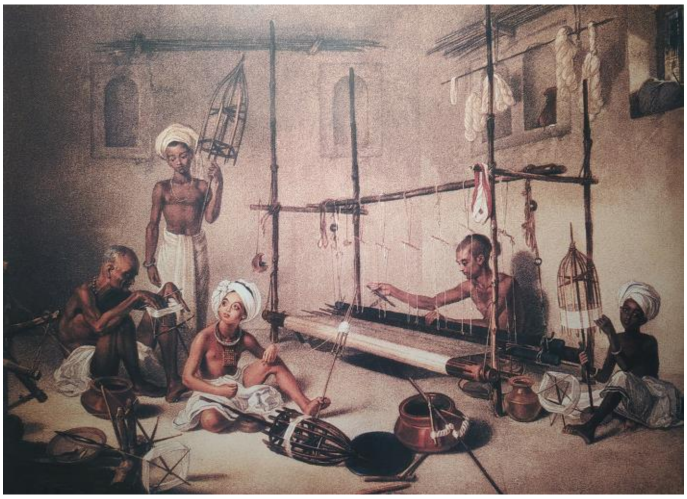

চিত্র-৫.১১: ঢাকার নিকটবর্তী শান্তিপুরে মসলিন বুনন পদ্ধতি (আর্থার উইলিয়াম ডেভিস, ১৭৮৫)

এ সময়ে ডাই করে রং করার পদ্ধতি জানার ফলে তারা বিভিন্ন রং এর কাপড় তৈরি করত। বাংলার উন্নত বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে বার্বোসা বলেন যে, এদের প্রচুর সুতা আছে। তারা সূক্ষ্ম ও মিহিন অনেক প্রকারের বস্ত্র তৈরি করে। এসব বস্ত্র তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রঙিন করে এবং ব্যবসায়ের জন্যে সাদা রাখে। এগুলো খুবই মূল্যবান কাপড়। তারা কিছু কাপড়কে 'ইসত্রাভানতিস' বলে। এই কাপড়গুলো এক ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতি কাপড় যা আমাদের দেশের মহিলারা শিরোভূষণের জন্য এবং আরব মূর ও ইরানিরা পছন্দ করে পাগড়ির জন্য।[৫০] বাংলার মসলিন বস্ত্র সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল।[৫১] এমনকী বিদেশি রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিগণ এই বস্ত্রের কদর করতেন। এতে দেখা যায় সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের উৎপাদনে উন্নতমানের নৈপুণ্যের প্রয়োজন হতো। মুসলিম শাসনে সুতিবস্ত্রের উৎকৃষ্টতা ও এর পর্যাপ্ত উৎপাদন থেকে সুলতানী বাংলার কারিগরদের দক্ষতা, কৌশল ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমসাময়িক উৎস থেকে পাওয়া যায় যে, বস্ত্রশিল্প সেই সময় গতিশক্তি এবং নতুন মাত্রা পায়।[৫২] আলোচ্য সময়ে বাংলার নদী তীরবর্তী শহর, বন্দরগুলো ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যনির্ভর এবং ধন ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এই ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কালক্রমে বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। যেমন- লখনৌতি, সোনারগাঁও

---

[৪৯] Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi*, eng. tra. M.I. Borah, Guahati, Assam,1936, p. 392
[৫০] Barbosa, *op.cit.*, pp. 145-146; Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 391
[৫১] Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 390
[৫২] K M Ashraf, *Life and Conditions of the People of Hindustan*, Munshiram Monoharlal, Oriental Pub. New Delhi, 1970, p. 261

ও চাটগাঁও।[৫৩] এ সব অঞ্চলে কিছু শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল। বাংলায় সুতিবস্ত্র তৈরির শিল্পকারখানা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূণ শিল্প। বাংলায় রপ্তানিযোগ্য উন্নত মানের সুতিবস্ত্র তৈরি হতো এরূপ তথ্য পাওয়া যায় পর্তুগিজ পর্যটক তোমো পিরেসের (Tome Pires) বিবরণ থেকে। তিনি রপ্তানির জন্য সাত রকম সুতিবস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল- সিনাবাফো (sinabafos), চৌতর (chautares), বিয়াতিলহা (beatilhas) ও বেইরাম (beirame)।[৫৪] এসব কাপড়ের মধ্যে 'বিয়াতিলহা'কে মমতাজুর রহমান তরফদার এক প্রকার মসলিন কাপড় বলে উল্লেখ করেছেন। এ বস্ত্রের খুব চাহিদা ছিল। মালাক্কায় এসব বস্ত্র খুব চড়া দামে বিক্রি হতো।[৫৫] বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অনন্য এ সকল উন্নত মানের কাপড়ের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আকার গুণাগুণ ও রঙের বৈচিত্র্যে খ্যাত এ সকল কাপড় বণিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করত। তৎকালীন সময়ে এসব বণিকগণ এত বিত্তবান ছিল যে তাদের গৃহে সোনা, রূপা ও মূল্যবান সামগ্রী বহুল পরিমাণে পাওয়া যেতো।[৫৬] মুসলিম শাসনামলে উন্নত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বাংলা সমকালীন পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। মুসলিম সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতা, মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন, নগরায়ণের বিকাশ, কৃষির পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পকারখানার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে বস্ত্র উৎপাদন বেড়ে যায় যা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিল। এ সকল নিয়ামক বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল।

আরব, চীন ও মিশরসহ অনেক দেশেই বাংলায় উৎপাদিত বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল।[৫৭] এসব দেশে বস্ত্রের চাহিদা থাকায় সংগত কারণেই বাংলার শাসকগোষ্ঠী নিজ দেশের আন্তর্জাতিক মানের বন্দরের সুবিধা গ্রহণ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। বিদেশি পর্যটকগণ তাদের বিবরণে বাংলার কাপড়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলার শাসনকর্তা বুগরা খান তার পুত্র কায়কোবাদকে উপহার হিসেবে যে কাপড় দেন আমির খসরু তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এছাড়াও তিনি সোনার সুতোয় কারুকার্য করা টুপি ও রেশমি রুমালের উল্লেখ করেছেন।[৫৮] বার্বোসা (১৫১৬-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ) বলেন যে, আরব দেশীয় বণিকদের কাছে বাংলার 'সিনবফ' কাপড় ও খুব পছন্দসই ছিল। এ কাপড় দিয়ে তারা কামিজ বানাত।[৫৯] বাংলার নিজস্ব চাহিদা ছিল সুতি, রেশমির ধুতি ও শাড়ি যা এখানে প্রচুর

---

[৫৩] Ibn Battuta, *Travels of Ibn Battuta*, H.A.R Gibb, 3rd ed., New Delhi, 1993, p. 618
[৫৪] Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, vol. 1, London, 1944, p. 192
[৫৫] মমতাজুর রহমান তররফদার, তোমো পিরেসের বিবরণে বাংলাদেশ, *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১, পৃ.১৯৮-১৯৯
[৫৬] Ziauddin Barani, *Tarikh-I-Firuz Shahi*, ed. Saiyid Ahmad Khan, Calcutta, 1962, p. 120
[৫৭] K M Ashraf, *op.cit.*, pp. 126-127
[৫৮] *Ibid.*, pp. 126-127
[৫৯] Barbosa, *op.cit.*, vol. 2, pp. 145-146

পরিমাণে তৈরি হতো। বার্থেমা বলেন যে, ক্যাম্বে বন্দরে প্রতি বছর ৩০০ জাহাজ আসত। তন্মধ্যে বাংলা হতে ৫০টি জাহাজ সুতি ও রেশমি কাপড় নিয়ে আসত।[৬০] মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই বিভিন্ন শ্রেণির বণিক বাংলায় আগমন করে ও নিজেকে ব্যবসায় সম্পৃক্ত করে। চীনা পরিব্রাজক দল পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় ভ্রমণ করেন। তাঁরা দেখেন যে, চট্টগ্রাম বন্দর, সোনারগাঁও ও পাণ্ডুয়া শহরের মুসলিমগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে জড়িত।[৬১] এসব নগরের অনেক লোক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি স্বাবলম্বী ছিল।

ঐতিহাসিক তথ্য ও পর্যটকদের বিবরণ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন মানের ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সময়ে বাংলার সাধারণ লোক সাশ্রয়ী মূল্যের সুতিবস্ত্র পরিধান করত। গ্রামে তৈরি হতো সুতি শাড়ি, ধুতি, গামছা, লুঙ্গি প্রভৃতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কাপড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের মহিলারা বুনত নিজস্ব তাঁতে। সুতা কাটা থেকে শুরু করে রঙ করা পর্যন্ত সব কাজ নিজেরা করত। মৈমনসিংহ গীতিকায় মলুয়াকে পরিবারের অভাব দূর করতে সুতা কাটতে দেখা যায়। তাঁতিরা বিভিন্ন রকম কাপড় বুনে তা হাটে বিক্রি করত, যা থেকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ধারণা পাওয়া যায়। বাংলায় সুতিবস্ত্র তৈরি ও বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২]

বাংলায় নিজস্ব প্রযুক্তি বা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পাটের শাড়ি তৈরি হতো। এসব শাড়ি অত্যন্ত সুন্দর করে তৈরি হতো। পাটের আঁশ থেকে কাপড় তৈরি পর্যন্ত অনেক ধাপে রয়েছে যেখানে প্রযুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাটের আঁশ থেকে সুতা প্রস্তুত এবং তা দ্বারা কাপড় তৈরি করতে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন ছিল। এসব কারিগরগণ বংশপরম্পরায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে পাটবস্ত্র তৈরি করত। গ্রামের গরিব পরিবারের নারীরা এ শাড়ী ব্যবহার করত। তাঁত শিল্পের সাথে তাঁতি ছাড়াও সরাক সম্প্রদায় জড়িত ছিল। সরাকদের পেশা ছিল পাটের শাড়ী তৈরি করা।[৬৩] *কালকেতুর উপাখ্যানে* দেখা যায় গুজরাট নগরীতে বসতি স্থাপনের পর সরাকগণ অতি উন্নতমানের 'পাটের শাড়ী' তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ

---

[৬০] Mohar ali, *op.cit.*, p. 937; Abdur Rahim, *op.cit.*, vol. 1, p. 399

[৬১] Mohar ali, *op.cit.*, p. 937

[৬২] বস্ত্র বয়ন ও বাজারে বিক্রি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে- সুতি তুমি যে বুনিবা ধুতি
হাটে নিলে বেচিলে হবে কড়ি।
আহমেদ শরিফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২২৭

[৬৩] মুকুন্দরাম (১৫৪৪-১৫৭৭) উল্লেখ করেন যে, সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাঞি কাটে
সর্বকাল করে নিরামিস।
পাইআ ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিস।
মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, পৃ. ৮২; আহমেদ শরীফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৭

করে। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* পাটশাড়ীর বিবরণ রয়েছে। মলুয়ার বাবা হিরাধন চিন্তিত নিজের মেয়েকে দরিদ্র বিনোদনের সাথে বিয়ে দিলে পাটের শাড়ী পরে মেয়ে হয়ত সুখী হবে না।[৬৪]

সাধারণত দেশের ভেতরে বা বিদেশে রপ্তানির জন্য বড় শহরের ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাম ও ছোট শহরে চাহিদাসম্পন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা হতো। কখনও কখনও উৎপাদনকারীগণ মৌসুমের মেলায় তাদের পণ্য নিয়ে বিক্রি করত। বড় বড় ব্যবসায়ীগণ পণ্য উৎপাদনকারী অথবা দালালদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করত এবং বন্দর নগরীতে প্রেরণ করত। মুসলিম শাসনের পূর্বে এগুলো এতো ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিল কিনা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা না গেলেও সুলতানী আমলেই যে এ শিল্পের বিকাশ সাধিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রেশমশিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার

সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় সুতিবস্ত্রের সাথে সাথে বিলাসজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলায় রেশমের চাষ ছিল না। পনেরো শতকের প্রথমে বাংলায় রেশম চাষ শুরু হয়। আলোচ্য সময়ে বাংলায় অনেক রেশম চাষ করা হতো।[৬৫] উল্লেখ্য যে, রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লি এবং এরপরেই ছিল বাংলার অবস্থান। খাদ্যশস্য ছাড়া বাংলায় যেসব পণ্য উৎপাদন করা হতো তার মধ্যে ছিল কার্পাস ও রেশম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেশম সরাসরি কৃষিজাত না হলেও কৃষিনির্ভর ছিল। রেশম চাষের প্রণালি চীন থেকে আসামের পথ হয়ে বাংলায় আসে। এ সময়ে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হতো। মাহুয়ান বাংলায় ব্যাপকভাবে তুঁত গাছ ও রেশম কীট দেখেছিলেন। কার্পাস থেকে তৈরি মসলিন বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছিল। এর বুনন এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ৪০ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া এক খণ্ড কাপড় একটি আংটির মধ্যে ঢুকিয়ে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যেতো।[৬৬] প্রায় তেত্রিশ রকমের মসলিন কাপড় তখন বাংলায় তৈরি হতো। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন নামের মসলিন বস্ত্র তৈরি হতো। যেমন- অগ্নিপাট, কাঞ্চাপাট, কালপাট, পাটের বুনি, নীলাদক্ষেমী, তসর প্রভৃতি। বিশ্বভারতী এনালসে

---

[৬৪] *মৈমনসিংহ গীতিকায়* দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে,

পাটের শাড়ী পিন্দ্যা সুখ নাহি পায়।
হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জুরায়।

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর (সম্পাদিত ও সংকলিত), *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৯; ডক্টর মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পাদিত): *শ্রী রায় বিনোদ: কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৫, ২৩৬

[৬৫] ইরফান হাবীব, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*, অনুবাদক, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৪

[৬৬] আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৪

কাপড়গুলোর আকার, আকৃতি, রং প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আবুল ফজল বাংলার বারবকাবাদ ও সোনারগাঁও সরকারে উন্নতমানের মসলিন কাপড় তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৭] বার্থেমা রেশমিবস্ত্রকে এদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৮] ঘোড়াঘাট সরকার মূলত রেশমি পণ্যের জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।[৬৯] মোগল আমলেও মসলিন জাতীয় সূক্ষ্ম কাপড়ের উৎপাদন অব্যাহত ছিল।

রেশমবস্ত্র বয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ধাপ ছিল। যথা- (ক) তুঁতগাছ ও রেশমগুটি উৎপাদন (খ) গুটি সংগ্রহ করে তা থেকে সুতা কাটা ও (গ) রেশমবস্ত্র বয়ন। এ সময়ে বাংলা বৃহত্তর রেশম উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং এখানে গুটি পোকা থেকে বছরে ছয়বার রেশম তন্তু সংগ্রহ করা হতো।[৭০] যারা রেশমশিল্পের সাথে যুক্ত ছিল তাদের একটি সম্প্রদায়কে বলা হতো বসুনিয়া। তুঁতগাছ চাষ করত চাষি আর রেশম গুটি সংগ্রহ করত ভিন্ন পেশার লোক। রেশম কাপড় বুনত তাঁতিরা এবং এসব বস্ত্র তৈরি হতো শহরের উপকণ্ঠে। আর এসব বস্ত্র তৈরির সাথে যুক্ত ছিল গ্রামের অভিজ্ঞ পেশাজীবীরা। রেশম গুটির উৎপাদন, তা বস্ত্র তৈরির কাঁচামালে রূপান্তর বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল ছিল বাংলার কারিগরদের নিজস্ব প্রযুক্তি। কারিগররা তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই রপ্তানির জন্য বিভিন্ন নামের এসব উন্নত বস্ত্র তৈরিতে সক্ষম ছিল।

রেশমবস্ত্র উৎপাদনের প্রাথমিক ধাপ ছিল তুঁতগাছ ও রেশমগুটি উৎপাদন। তুঁতগাছ (mulberry) চাষ করতেন কৃষক। গুটি পোকা চাষ ও রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের বলা হতো 'চসর'। এ থেকে গুটি সংগ্রহ করে সুতা কাটার কাজটি করতেন 'নকদ' নামের আরেক শ্রেণির লোক। বেশিরভাগ রেশম উৎপাদন ছিল একটি ঘরোয়া ধরনের শিল্পকর্ম। গুটির লালন, সুতা কাটা, সুতা পাকানো ও সুতার কুণ্ডলীকরণ জাতীয় কাজগুলো পরিবারের লোকজনের সাহায্য-সহায়তা নিয়ে তাঁতি ঘরের বারান্দায় বা বাড়ির আঙিনায় শেষ করত। মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের সাথে তাঁতি ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণির পেশা ও শ্রমজীবী মানুষ জড়িত ছিলেন। যেমন- মসলিন বস্ত্রে যে ফুল তোলার কাজ করত তাকে চিকনদাজি (chuckendose) বলা হতো। মসলিন, পশমী, শাল ও রুমালে যারা সোনা, রূপার ও রেশমি সুতার

---

[৬৭] Abul Fazl Allami, *The Ain–I-Akbari,* vol.1, eng.tra., Colonel H. S. Jarrett, The Asiatic Society, Kolkata, 2nd reprint. p.13

[৬৮] Varthema, *op.cit.,* p. 212

[৬৯] Abul Fazl Allami, *The Ain –I-Akbari,* vol. 2, p. 136

[৭০] Irfan Habib, *Technology in Medieval India,* pp.7-8 ; সুশীল চৌধুরী, *পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ১৬০০-১৮০০*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমি. কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৩৪

কাজ করত তাকে বলা হতো জরদজি (zurdose)।[৭১] ছেঁড়া মসলিন রিপু করার কাজ করতেন 'চুনাই' নামের একশ্রেণির লোক। এলোমেলো সুতা ঠিক করার কাজে নিয়োজিত ছিল 'নাদিয়া' নামক আরেক শ্রেণির কারিগর। এরা মসলিন ভাঁজ করা ও রপ্তানির জন্য গাঁট বাঁধার কাজটিও করতেন। এছাড়া একশ্রেণির অভিজ্ঞ কারিগর বড় শঙ্খ দিয়ে মসলিন ঘষে মসৃণ করার সূক্ষ্ম কাজটি করতেন। মসলিন শিল্পের সাথে জড়িত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারিগর ছিলেন 'রঞ্জনশিল্পী'। এরা নীল ও ফুলের রঙ দিয়ে মসলিন বস্ত্রের রঙ করতেন। মসলিন বস্ত্র সাধারণত নীল, লাল, বাসন্তী, হলুদ, সবুজ, কালো প্রভৃতি রঙের হতো। নানা রঙের এসব মসলিন বস্ত্রের বহুল চাহিদা থাকায় বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি হতো।[৭২] বার্বোসা ও ট্যাভারনিয়ারের মতে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে কার্পাসের উৎপাদন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এ সময় গুজরাটের ক্যাম্বে, আহমেদাবাদ ও সুরাটের বস্ত্র বয়নের জন্য বাংলা থেকে কাঁচা রেশম আমদানি করা হতো।[৭৩]

উল্লেখ্য যে সুলতানী আমলেই প্রথম বাংলায় এমব্রয়ডারি শিল্পের কাজ শুরু হয়। এই সময় উন্নতমানের কাপড়ে এমব্রয়ডারি করা হতো। এ সকল কাপড় খুব বিখ্যাত ছিল। পর্তুগিজরা বাংলা থেকে এই এমব্রয়ডারিযুক্ত কাপড় আমদানি করত। তাদের মধ্যে অভিজাতগণ সাধারণত ঘোড়ায় চড়ত এবং প্রতিটি ঘোড়ায় যে লাগাম থাকত সেই লাগামে সিল্কের এমব্রয়ডারিযুক্ত কাপড় জড়ানো থাকত। এসব কাপড়ে তারা সংযুক্ত করত সোনা, রূপা এবং মুক্তা। এছাড়া পর্তুগালে বিয়ের পাত্র যে ঘোড়ায় চড়ত সেই ঘোড়াতে কারুকার্য করা লাল ভেলভেট কাপড় দিয়ে সাজানো হতো।[৭৪] এই এমব্রয়ডারির সুনিপুণ কাজ করা কাপড় বাংলা থেকে তারা সংগ্রহ করত। তৎকালীন বাংলায় এসব বস্ত্র তৈরির কারিগরগণ অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সতেরো শতকের শুরুতে পাইরাড ডা লাভাল (Pyrard de Laval) বাংলা পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, বাংলার অধিবাসীরা পণ্য উৎপাদনে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। যেমন- সুতা, কাপড় ও রেশম। তারা সূচকর্মে অনেক পারদর্শী ছিল। এমব্রয়ডারিতে তাদের সুঁইয়ের ক্ষুদ্রতম ফোঁড়গুলো এতটাই সূক্ষ্ম ছিল, যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।[৭৫]

---

[৭১] James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* Calcutta, 1840, p. 176

[৭২] ঢাকার মসলিন ইংল্যান্ডে পরিচিত লাভ করে এবং ঐ সময় থেকে ইংরেজরা ও এর কয়েক বছর আগে থেকে ডাচ এবং পরবর্তীতে ফরাসিরা মসলিনের ব্যবসা ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে। James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840, pp. 172-175

[৭৩] Barbosa, *op.cit.,* vol. 1, p. 154; Travenier, *Travels in India,* vol, 2, p.3

[৭৪] J.J.A Campos, *op.cit.*, p. 120

[৭৫] Faancois Pyrard de Laval, *The Voyage of Francois Pyrard,* Trans- by, Albert Gray for Hakluyt Society, vol. 2, 1887-1890, vol, 1, p. 329; উদ্বৃতি, J.J A. Campos, *op.cit.*, p. 117

চিনিশিল্প ও প্রযুক্তি

সুলতানী বাংলায় আখের ব্যাপক চাষ হওয়ায় চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। এ সময়ে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হতো। যেমন- দানাদার চিনি, সাদা চিনি এবং আখ ও খেজুরের রস দিয়ে তৈরি করা গুড়।[৭৬] ষোড়শ শতকের শুরুতে সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি নিয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো বলে গবেষক নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন।[৭৭] সুলতানী শাসনে চিনিশিল্পের উন্নতির মূলে ছিল এর কারিগরি দক্ষতার উন্নতি সাধন। এ সময়ে চিনি উৎপাদনের জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করা হয়। আখ থেকে রস নিংড়ানোর নতুন কৌশলের প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। সুলতানী শাসনের পূর্বে বাংলায় হাতে ঘোরানো চাপযন্ত্রের সাহায্যে আখ থেকে রস বের করা হতো। এ যন্ত্রে রোলার বা ভারী বেলনা থাকত। পরবর্তীতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বা পশুর শক্তির ব্যবহারে অল্প সময়ে বেশি আখের রস নিংড়ানো সম্ভব হয়।[৭৮] একদিকে কম সময়ে বেশি আখের রস সংগ্রহ করা যায় অন্যদিকে পূর্বের তুলনায় খুব সহজে বা অল্প সময়ে বেশি গুড় বা চিনি তৈরি করা যায়।

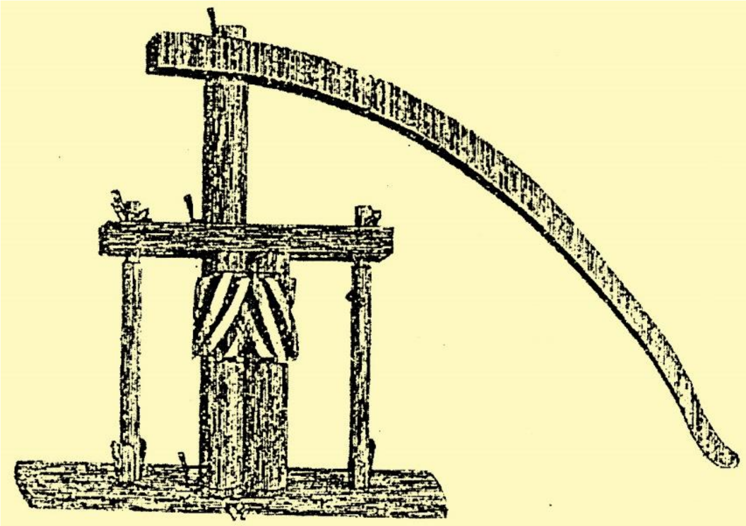

চিত্র-৫.১২: চিনিকলে যুক্ত রোলার পেষাই যন্ত্র, ফ্রান্সিস বুকানন, ১৮০০-১৮০১

ইতোপূর্বে বেলনা অনেক ভারী হওয়ায় হাতের সাহায্যে যন্ত্রটি বেশি ঘোরানো যেতো না, ফলে স্বাভাবিকভাবেই আখ থেকে কম রস বের হতো। সুলতানী শাসনামলে হাতে ঘোড়ানোর যন্ত্রের পরিবর্তে

[৭৬] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৩; যে প্রক্রিয়ায় কোনো মিশ্রণের একটি তরল উপাদানকে তাপ প্রয়োগে বাষ্প পরিণত করে বাষ্পকে শীতল ও ঘনীভূত করে আবার তরলে পরিণত করে মিশ্রণ থেকে পৃথক করা হয় তাকে পাতন বলে।

[৭৭] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫; মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত* (প্রযুক্তি) পৃ. ২২

[৭৮] M. R. Tarafder, *Trade, Technology and Society in Mevieval Bengal,* Icbs, Dhaka, 1995, pp. 98-99; ইমতিয়াজ আহমেদ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য (১৪৯৮-১৬৪১), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২

আখের রস বের করতে পশুর শক্তি ব্যবহার শুরু হয়। ফলে অল্প সময়ে অনেক বেশি রস সংগ্রহ করা সম্ভব হতো। এতে চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে।[৭৯] নতুন পদ্ধতিতে আখ মাড়াই যন্ত্রের বেলনার মাঝে আখের টুকরাগুলো ঢুকিয়ে একটি বেলনার বিপরীতে স্থাপিত অন্য একটি বেলনাকে পশু শক্তির সাহায্যে ঘুড়িয়ে রস নিংড়ানো হতো। অবশ্য বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে আখ মাড়াইয়ের জন্য অন্য ধরনের আরো একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হতো। আখের টুকরোগুলো খলের মধ্যে মুষলের সাহায্যে পিষে রস তৈরি করা হতো।[৮০] এ প্রযুক্তি থেকে বেলনার সাহায্যে আখ মাড়াই করা সুবিধাজনক ছিল। কারণ রসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় চিনি উৎপাদনের পরিমাণও বেশি হতো। প্রাক -মুসলিম যুগে আখের রস থেকে শুধু গুড় বা লাল চিনি তৈরি হতো। সুলতানী শাসনে লাল চিনি ছাড়াও সাদা চিনি তৈরি হতো। ধারণা করা হয় এ সময়ে সাদা চিনির উৎপাদনই সম্ভবত বিশ্বে বাংলার চিনির কদর বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও পশ্চিম এশিয়ার তরল পাতন যন্ত্রের আগমন এদেশে চিনি শিল্পের উন্নতি ঘটায়। খুব সহজে এ পাতন প্রক্রিয়ায় চিনির দ্রবণ থেকে চিনি পরিশোধন করা যেতো। বারানী এ পাতন যন্ত্রের এবং এর কার্যকারিতার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।[৮১] বাংলার সমৃদ্ধ চিনিশিল্প সম্পর্কে বার্বোসা উল্লেখ করেন যে,

> বাংলায় অত্যন্ত ভালো মানের সাদা চিনি তৈরি হয়। কিন্তু চিনি মিশিয়ে কিভাবে পাউরুটি তৈরি করতে হয় তা তারা জানে না। সেজন্য তারা গুড়া অবস্থায় এটা কাঁচা চামড়া দিয়ে থলে বা ব্যাগ বানিয়ে আবৃত করে উত্তমরূপে সেলাই করে। এ পণ্যদ্রব্য তারা বহু জাহাজ বোঝাই করে মেসোপটেমিয়া এবং বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে রপ্তানি করত।[৮২]

বাংলার চিনি ও চাল গঙ্গার নদী পথ দিয়ে পাটনাতে যেতো এবং দাক্ষিণাত্যের করমণ্ডল উপকূল হয়ে কেরালা পৌঁছাত। দানাদার চিনি বা মিছরি দিয়ে ফল সংরক্ষণ এবং আচার বানিয়ে তা বিদেশে রপ্তানি করা হতো। বার্থেমাও এ প্রদেশে চিনি শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। স্থানীয়ভাবে আখ থেকে যে চিনি তৈরি হতো তা ছিল ধবধবে সাদা এবং উন্নতমানের। . . . এটাকে চামড়ার মোড়কে করে মালাবার, ক্যাম্বেসহ বিভিন্ন দেশে পাঠাতো। সেখানে এগুলো চড়াদামে বিক্রি হতো।[৮৩] মাহুয়ান এদেশে তিন

---

[৭৯] M.R.Tarafder, *op.cit.*, p. 82
[৮০] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬
[৮১] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 392
[৮২] Ma Huan, *op.cit.*, p.162; Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa,* Translated from Mansel Longworth, vol. 1, London, 1918, p.146
[৮৩] Verthema, *op.cit.*, p.212

ধরনের চিনি দেখেছিলেন। এগুলো হচ্ছে কণা সমষ্টির আকারে তৈরি চিনি (গুড়) বা granulated sugar, সাদা চিনি বা white sugar এবং দানাবাঁধা চিনি (মিসরি) বা crystallized sugar.[৮৪] লালচে গুড়কে সাদা রং-এ রূপান্তরের মাধ্যমে সাদা চিনি তৈরি ছিল নিঃসন্দেহে সূক্ষ্ম প্রকৌশলগত প্রযুক্তির প্রয়োগ। ইবনে বতুতার বর্ণনায় বাংলায় চিনিশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসকগণ চিনি রপ্তানিতে সরাসরি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[৮৫] পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলা থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি হতো তার মধ্যে চিনি ছিল অন্যতম। ঐতিহাসিকগণের বিবরণ ছাড়াও বাংলার চিনিশিল্পের বিকাশ সম্পর্কে মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে। এসব কাব্যগ্রন্থে চিনি বা গুড় দিয়ে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা রয়েছে। *ইউসুফ জুলেখা* কাব্যে চিনি দিয়ে তৈরি খাবাবের নাম রয়েছে। *চৈতন্যচরিতামৃতে (১৪৭৮-১৫৩৩)* ভোগের খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় হরেক রকম মিষ্টিজাতীয় খাবার ছিল।[৮৬] প্রতিটি খাবার তৈরিতে গুড় বা চিনি ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার গ্রামীণ পেশাজীবী মোদক এ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য তৈরির কাজ করত।

ধাতব শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার

সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় ধাতব শিল্প ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল। এসব ধাতব শিল্পের মধ্যে রঙিন জিনিসপত্র, উন্মুক্ত গোলাকার জলপাত্র, ইস্পাতের বন্দুক, বাটি, ছুরি, জিনিস তৈরি হতো এবং খোলা বাজারে বিক্রি হতো বলে মাহুয়ান উল্লেখ করেছেন।[৮৭] লোহা, ব্রোঞ্জ, দস্তা, তামা, সোনা ও রূপা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে লোহা দ্বারা তৈরি সরঞ্জামাদির ব্যবসা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। কৃষি যন্ত্রপাতি ও সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বেশি তৈরি হতো। চৈনিক দূতের বর্ণনানুসারে

---

[৮৪] Ma Huan, *op.cit.*, p.162 ; M R Tarafder, *op.cit.*, p. 81; J N Dasgupta, *Bengal in the sixteen century A.D*, p.117

[৮৫] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 235

[৮৬] *Visva Bharati Annals*, vol.1, pp. 119-125 ; *ইউসুফ জুলেখায়* (১৩৯৭-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখ রয়েছে যে,

কনক বাটোয়া ভরি মধুমিষ্ট মুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইসুফক মুখে।
ঘৃত মধু শকরা বহুল দুগ্ধ দধি
সুধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি।। *ইউসুফ জুলেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার ডালিয়া মরিচা নাড়ু নবাত অমৃতি।
অমৃতা গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।। পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
অমৃতমণ্ডা ছেনাবড়া আর কর্পুর কেলি। রিয়ড়ী কদমা তিলেখাজার প্রকার।।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলি।। দধি দুগ্ধ দধি-তক্র রসালা শিখরিণী।
হরিবল্লভ সেবতি কর্পূরমালতি। সলবণ মুগদাঙ্কুর আদা খানি খানি।। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রী সুবোধ কুমার মজুমদার সম্পাদিত, মধ্যলীলা, কলকাতা, ১৯৪১, পৃ. ৩৭১

[৮৭] Ma Huan, *op.cit.*, p. 163

তৎকালীন প্রাসাদসমূহের দেওয়াল পিতল দ্বারা মোড়া ছিল।[৮৮] তেরো শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে চৈনিক উৎস থেকে জানা যায় যে, পাং-কোলা (বাঙ্গালা) এর নিজস্ব উৎপাদন ছিল এক ধরনের ধারালো অস্ত্র। এছাড়া ঘণ্টা (বেল), লোহার আংটা তৈরি হতো যা ঘোড়ার গলায়, নাকে নিতম্বে ব্যবহার করত। তিনি আরও বলেন যে, ধারালো অস্ত্র তৈরিতে ত্রিহুতে তিনজন দক্ষ ব্যক্তি ছিল।[৮৯] এছাড়াও এ সময়ে শাসকগোষ্ঠীর নতুন সেনাদলের অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের জন্য অশ্ব পাদুকা, অশ্বারোহীর পা রাখার জন্য লোহার পাদানি এবং ঘোড়ার পিঠে বসার জন্য জায়গা দরকার হতো। এসব সামরিক সরঞ্জামাদি যেমন- ধারালো অস্ত্র, অশ্বারোহীর নাকের ও ঘাড়ে ব্যবহারের জন্য (iron hook) হুক, ঘণ্টা, ঘোড়ার পিঠে বসার জায়গা ও বর্ষা/বলম প্রভৃতি তৈরি হতো।[৯০] ধাতব শিল্পের কারিগরগণও দক্ষ ছিলেন। বাংলা কাব্যগ্রন্থে অনেক ধরনের ধাতব শিল্পের সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। *চর্যাপদে* একাধিকবার পশুপালনের জন্য এমনকি হাতি ও নৌকা বাঁধার জন্য লোহার শিকল ব্যবহার করার প্রমাণ রয়েছে।[৯১] লোহা দ্বারা শিকল তৈরিতে নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হতো। লোহা দিয়ে গৃহস্থালীর বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরি করা হতো। *কালকেতু উপাখ্যানে* কালকেতুকে কোদাল, কোদালের ফাল, লোহার শাবল, জালের কাঠি, শিকল ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৯২] এভাবেই প্রতিনিয়ত ব্যবহারের জন্য লোহ শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। *তবকাত-ই-নাসেরী*, *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, *বাহারিস্তান-ই-গায়েবী*, *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থে বিভিন্ন যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে তরবারি, তীর, ধনুক, বর্ম, ঢাল, শিঙ্গা প্রভৃতি ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে। *ইউসুফ জুলেখা (১৩৯৭-১৪১০)* কাব্যে আজিজ মিসির ও ইউসুফের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে- ঢাল, খড়্গ, ধনুক, লোহানি ছেল ইত্যাদি।[৯৩] এ কাজের সাথে জড়িত ছিল কামার নামের পেশাজীবী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কামারের ব্যস্ত জীবনের চিত্র ফুটে

---

[৮৮] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 325-326

[৮৯] *Ibid*

[৯০] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 333

[৯১] মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *চর্যাগীতিকা*, স্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫৫

[৯২] *কালকেতুর উপাখ্যানে* উল্লেখ রয়েছে- চণ্ডীকা বলেন বাছা লহ সিকাভার।
ঔহ ঝুড়ি কোদালী খন্তা খরধার।

খুড়িতে খুড়িতে বীর ধনের লাগ পাইল
লোহর শিকল ধরি ঘড়ারে তুলিল।

আয় পাইল বেড়াজাল ঢালে বান্ধে উরুমাল। মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *কালকেতু উপাখ্যান*, স্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃ.১২, ৬৫ ও ১১০

[৯৩] *ইউসুফ জুলেখা* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, অশ্ব আরোহণ সে বিচিত্র রূপ বেশ।
নানা অলংকার পড়ি সুবাসিত কেশ।।
নানা অস্ত্রে টন ভরি ধনুক টঙ্কারি।
পথরথিগণ চলে খড়্গ চর্মধারী।। শাহ মুহাম্মদ সগীর রচিত, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ইউসুফ জুলেখা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.১৪৩

উঠেছে।[৯৪] ধাতব শিল্পের সাথে জড়িত অন্য পেশাজীবী ছিল স্বর্ণবণিকগোষ্ঠীর লোক / সেঁকড়া। স্বর্ণ রৌপ্য গলিয়ে বিভিন্ন সৌখিন গহণা তৈরি করত। মহিলারা নানা রকম অলংকার ব্যবহার করত।[৯৫] ফিরিস্তা উল্লেখ করেন যে, বাংলার ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণপাত্র ব্যবহারই করত না। মাঝে মাঝে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এগুলো প্রদর্শন করাকে তারা সম্মানজনক বলে মনে করতেন।[৯৬]

এছাড়া সাধারণ মুসলিমরা বিশেষ করে অভিজাত শাসকশ্রেণি বহু মূল্যবান ধাতু দিয়ে তাদের রুচিসম্মত দ্রব্যাদি তৈরি করাতেন।[৯৭] পর্তুগিজ লেখক কাস্টানহিদা উল্লেখ করেন যে, ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ধাতুর কামান ও বন্দুক বানাতে শিখেছিল। ভেনিসের চারজন কারিগর এ উদ্দেশ্যে মালাবারে এসেছিলেন। এছাড়া এ সময়ে তুর্কিরা তাদের ঘোড়ার খুড়ে লোহার পাত ব্যবহার করত। ফলে তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর গতি ও ভেদশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৯৮] ঘোড় সওয়ারের নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ছোট ও সীমাবদ্ধ শাসকবর্গের হাতে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এসব বর্ণনা থেকে দেখা যায় সুলতানী আমলে বাংলায় ধাতব শিল্পের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চামড়া শিল্প ও প্রযুক্তি

সুলতানী বাংলার শিল্পগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল চামড়া শিল্প। চৌদ্দ শতকে চামড়া শিল্প বিভিন্ন কারণে সমৃদ্ধি লাভ করে। যেমন- মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে পশু জবাই থেকে অধিক পরিমাণে চামড়া ও হাড় পাওয়া যেতো। মুসলমানদের খাদ্যাভাসে আমিষের গুরুত্ব থাকায় পশু শিকার ও পশু জবাইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন বাংলায় লবণ খুব সস্তা থাকায় চামড়া শিল্পের উন্নয়ন ও চামড়া প্রক্রিয়াকরণে লবণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৯৯] মার্কো পোলো (১২৭১-১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন যে, মুসলমানরা তাদের পোশাকে আভিজাত্য বজায় রাখতে বিভিন্ন ধরনের চামড়া ব্যবহার করত। যেমন- ছাগলের চামড়া, ষাঁড়ের চামড়া, মহিষের চামড়া, বুনো ষাঁড়ের চামড়া, এক শিং ওয়ালা অশ্ব সদৃশ প্রাণী বিশেষ ও অন্যান্য প্রাণীর চামড়া ইত্যাদি।[১০০] প্রকৃতপক্ষে প্রতি বছর জাহাজে করে চামড়া আরব দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হতো। চামড়া দিয়ে মুসলমানরা

[৯৪] কবিকঙ্কণ, *চণ্ডীমঙ্গল*, পৃ. ৮১
[৯৫] Barbosa, *op.cit.*, vol. 2, p. 148; *Visva Bharati Annals*, pp. 119, 122, 124, 125, 132
[৯৬] M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 157
[৯৭] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
[৯৮] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 325-326
[৯৯] *Ibid*
[১০০] *Ibid*

ঘুমানোর জন্য সুন্দর পাটি তৈরি করত। *ফুতুহাত-ই-ফীরুজ শাহীতে* উল্লেখ রয়েছে যে, সুলতান ফীরুজ শাহ তুঘলক এর শাসনামলে পশু শিকারের জন্য সামরিক বাহিনী হাড় দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্রাদি তৈরি করেছিল। এছাড়া চামড়া দিয়ে জুতা, বেগ, কার্পেট, পানির পাত্র প্রভৃতি তৈরি হতো। তিব্বতীয়রা চামড়ার গোড়ালী সংযুক্ত জুতা ও বিভিন্ন ধরনের চামড়ার জুতা ব্যবহার করত। এসব জুতাকে বলা হতো পা-নি-হি (upanah)।[১০১] মাহুয়ান ও বার্বোসার উদ্ধৃতি থেকেও চামড়ার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়।[১০২] উল্লেখ্য যে, বাংলায় লবণ খুব সস্তা থাকায় চামড়া খুব সহজেই মজুত রাখা সম্ভব হতো। লবণের সাহায্যে পশুর চামড়া নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে চর্মজাত দ্রব্য তৈরির উপযোগী করা হতো। প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে চামড়া শুকিয়ে ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা হতো। আলোচ্য সময়ে রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং চিনি রপ্তানির জন্য চামড়ার মোড়ক ব্যবহার করা হতো। চিনি চামড়ার মোড়কে পুরে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো। পরবর্তীতে চামড়া বংলার রপ্তানি দ্রব্যে পরিণত হয় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলা অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করতে সক্ষম হয়।

মৎস্য শিল্প

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। নদীবহুল এদেশে নদী, পুকুর, খাল ও বিলে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো। ফলে মৎস্য শিল্প বাংলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বারো শতকে ভবদেব ভট্ট বলেছেন, হিন্দুদের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য খাবারের সাথে মাছও থাকত। বিদ্যাপতি, জৌনপুর শহরে মাছের বাজার সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং মালিক মোহাম্মদ জায়সি তার *পদ্মাবৎ* কাব্যে বিভিন্ন ধরনের মাছের কথা উল্লেখ করেছেন, যা বারো থেকে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত বাংলার মাছের চাহিদা ও বাণিজ্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন যে, বড় জাহাজে মাছ ভর্তি করে সোনারগাঁও থেকে মালদ্বীপে নিয়ে এসেছিল এবং ঐ মাছ বারাহনগর (আরাকান সমুদ্র তীরবর্তী একটি শহরের) রাজাকে প্রদান করা হয়েছিল।[১০৩] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করত এবং ব্যবসায়ীরা তা বাজারজাত করত। বার্নিয়ারের উদ্ধৃতি থেকে বাঙালিরা যে লবণাক্ত মাছ ইউরোপীয় জাহাজে সরবরাহ করত সেই প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০৪] এ থেকে বুঝা যায় যে, বাংলার জেলে ও ব্যবসায়ীরা মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানত। মাছ সংরক্ষণের একমাত্র উপাদান ছিল লবণ,

[১০১] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 338
[১০২] *Ibid*, p. 326
[১০৩] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 242; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 325-326
[১০৪] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 393-394

বাংলায় যা খুবই সস্তা ও সহজলভ্য ছিল। পরবর্তীকালে মসলা মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতো। লবণাক্ত মাছ রোদে শুকিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হতো। লবণ দেওয়া মাছ ও শুকনো মাছ প্রতিবেশী দেশগুলোতে রপ্তানি করা হতো।[১০৫] এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা থাকায় মুসলিম বাংলার প্রাথমিক দিকের মৎস্য পেশাজীবীদের ভাগ্য উন্নয়ন করেছিল।

লবণশিল্প

বাংলার লবণশিল্প বেশ উন্নত ছিল। এ শিল্পের সঙ্গেও প্রযুক্তি জড়িত ছিল। বাংলার চট্টগ্রাম থেকে কটক (উড়িষ্যা) পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র উপকূলের লবণকণা সমৃদ্ধ মাটিতে লবণ উৎপাদন হতো। এখানে দুই রকম লবণ ছিল যথা- কুরকুচ (kurkuch) লবণ ও পুঙ্গাহ (punga) লবণ। সাধারণত লবণ কনা সমৃদ্ধ সাগরের লোনা জলকে চারপাশে বাঁধ দিয়ে সূর্যতাপের সাহায্যে বাষ্পীভবন করা হতো। এরপর মোলুঙ্গিরা লবণাক্ত মাটি থেকে লবণের অংশকে ছেকে তৈরি করত কুরকুচ লবণ। এছাড়াও সাগরের নোনা জল হাড়িতে করে উনুনে/চুলায় শুকিয়ে মোলুঙ্গিরা যে লবণ তৈরি করত তা পুঙ্গাহ লবণ। পুঙ্গাহ লবণের ব্যবহার বেশি ছিল।[১০৬] এজন্য এ জাতীয় লবণের উৎপাদন ছিল ব্যাপক ও প্রচুর। লবণ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীরা হলেন লবণিঞা। এগারো শতক থেকে এদেশের মানুষ লবণ উৎপাদনের সাথে জড়িত বলে জানা যায়। মুসলিম শাসনামলে লবণের আড়ত ছিল পোখতান বা দারোগাদের অধীন। লবণ উৎপাদন শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদেরকে বলা হতো মোলুঙ্গি' তাফাল বা মাহিন্দার। মমতাজুর রহমান তরফদার এ পেশার লোকদেরকে 'মোলুঙ্গি' (maulangis) নামে অভিহিত করেছেন।[১০৭] প্রচলিত কুসংস্কার অনুযায়ী হিন্দুরা কুরকুচ লবণকে মঙ্গলদায়ক মনে করত এবং কোনো কোনো হিন্দু এ শ্রেণির লবণকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করত। তাই এ শ্রেণির লবণের উৎপাদন কম হতো। সমুদ্র তীরবর্তী লোকেরাই এ লবণ উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল। বাংলার চট্টগ্রামে অনেক লবণ উৎপাদিত হতো এবং সন্দ্বীপে লবণের রমরমা ব্যবসা ছিল। বছরে প্রায় দুইশ জাহাজ লবণ বোঝাই হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপ ছেড়ে যেতো।[১০৮] সিজার ফ্রেডারিক সন্দ্বীপ থেকে লবণ দেওয়া মাংস কেনার কথা বলেছেন।[১০৯] এইচ বিভারিজ উল্লেখ করেন যে, বাকেরগঞ্জের বেপারি, গোলদার, জমাদার উপাধিসমূহ অনেক পরিবারের সাথে উপাধি হিসেবে রয়েছে যা লবণ ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকার

---

[১০৫] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 393-394
[১০৬] Ma hung, *op.cit.*, p.161; M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 82
[১০৭] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 82
[১০৮] J.J.A Campos, *op.cit.*, p. 119
[১০৯] ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৪৫

প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১০] বংশানুক্রমে তারা এ পেশাকে ধরে রাখত এবং পেশার পরিবর্তন করত না এবং তারা লবণ তৈরিতে খুব অভিজ্ঞ ছিল।

কৃষি প্রযুক্তি

প্রযুক্তির ব্যবহার সুলতানী শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন নিয়ে আসে। কৃষি ক্ষেত্রেও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে উৎপাদন বেড়ে যায়। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় অরঘট বা ঘটিযন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কানায় কানায় কলসি বেঁধে দড়ির সাহায্যে পানি তোলা হতো। এই কলসি দ্বারা কেবল নদী বা ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি জলাশয় থেকে পানি তোলা হতো। সুলতানী শাসনে এক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় যেমন চাকার মাধ্যমে নদী ছাড়াও গভীর কূপ থেকে জল তোলা যেতো। গিয়ার ব্যবস্থা যুক্ত করে যন্ত্রটি পরিচালিত হতো বলেই দূরের শস্যক্ষেতে খুব সহজেই সেচের মাধ্যমে পানি পৌঁছানো সম্ভব হতো। ইবনে বতুতা বলেন যে, "The way of Bengal and Lakhnauti lies through this river, and along the bank if this river to the right as well as to the left there are water wheels, garden and villages such as those along the banks of the Nile in Egypt."[১১১] উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সেচ প্রক্রিয়ায় কয়েকটি যন্ত্র ব্যবহার করা হতো যা দ্বারা কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়।

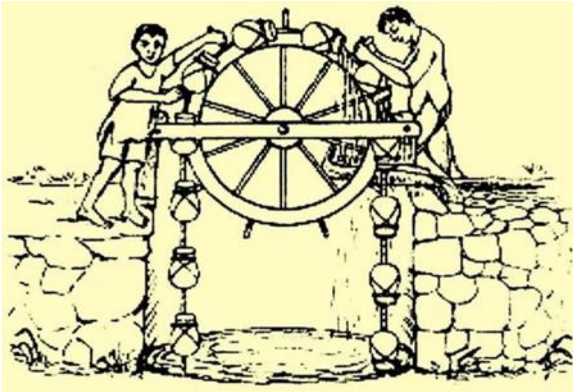

চিত্র-৫.১৩ জলচক্র, Habib, *Technology*, p. 10

উল্লেখ্য এ সময়ে সাকিয়া (saqiya or geared wheels) (চিত্রে ৫.১২, এক ধরনের চাকার মতো) ও চাপযন্ত্র বা লিভার (lever)[১১২] বাংলার কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে মূল্যবান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল।[১১৩] সুলতানী বাংলায় কৃষিকাজে পানি সেচের জন্য পশু দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে বা পশু ব্যবহার

[১১০] H Beveridge B.C.S, *The District of Bakargonj*, Trubner & co. Ludgate Hill, London, 1876, p. 297
[১১১] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 241
[১১২] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, ICBS, DU, 1995, pp. 91-92
[১১৩] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 284; মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগে বাংলায় প্রযুক্তি*, পৃ. ৩১

করে কূপ থেকে দীর্ঘ সময় পানি তোলা সম্ভব হতো। চাকা ব্যবহার ছাড়া বেশি পানি তোলা অসম্ভব ছিল। তাছাড়া সময়, শ্রম বেশি প্রয়োজন ছিল। চাকা ব্যবহার একদিকে যেমন অল্প সময়ে বেশি কৃষি জমিতে পানি দিতে সহায়তা করেছে অন্যদিকে কায়িক পরিশ্রমও কমিয়ে দেয়।[১১৪] কৃষি প্রধান বাংলায় এই প্রযুক্তি কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে বাংলার অর্থনীতিকে আরো একধাপ অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলার গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল। যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, নদীবহুল দেশে নৌযুদ্ধ ইত্যাদির জন্য বাঙালি কারিগরেরা হিন্দু যুগ থেকে ছোট বড় নানা আকারের নৌকা নির্মাণ করত। মুসলিম আমলে নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান আবশ্যকতা, সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুব বেশি সম্প্রসারিত হয়। বাংলার সাথে মালাবার, করমণ্ডলীয় উপকূল, সিংহল, মালদ্বীপসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর যোগাযোগ ছিল। আলোচ্য সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুরু হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাংলার নতুন করে যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। এ যোগাযোগ পরিচালিত হতো বাংলার উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি জাহাজের মাধ্যমে। এছাড়া বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত ছিল। ফলে এ অঞ্চলে বড় বড় জাহাজ নির্মিত হতো এবং এসব জাহাজ দ্বারা বণিকগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকে বাংলার সাথে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগের পথ সম্পর্কে জানা যায়। ইবনে বতুতা ৪৩ দিনে মালদ্বীপ থেকে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছান। বতুতা চট্টগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীপথ হয়ে কামরূপে যান এবং সেখান থেকে হবিগঞ্জ থেকে পরে সোনারগাঁও শহরে পৌঁছান। তিনি সোনারগাঁও থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লখনৌতির সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ গঙ্গা নদীপথে হতো। বতুতা এই পথে কামরূপ গিয়েছিলেন।[১১৫] বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদের সাথে সাক্ষাতের সময় কায়কোবাদ নৌভ্রমণে যে নৌযান ব্যবহার করেন তা থেকে বাংলার যোগাযোগব্যবস্থায় জাহাজ বা বৃহৎ নৌকা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১৬] পরবর্তীতে মাহুয়ান সমুদ্র পথে নিকোবর থেকে ২০ দিন যাত্রার পর ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে পৌঁছান। এখান থেকে ছোটো জাহাজে করে সোনারগাঁও শহরে উপস্থিত হন। সোনারগাঁও থেকে মাহুয়ান উত্তর পশ্চিম মুখ অতিক্রম করে পাংকোলার রাজধানীতে

[১১৪] M.R Tarafder, *op.cit.*, pp. 92-93 ইরফান হাবীব (সম্পাদিত), ইতিহাস গবেষণায় প্রযুক্তি চর্চার গুরুত্ব, *মধ্যকালীন ভারত*, কলকাতা, কে. পি বাগচী অ্যাণ্ড কো. ১৯৯০, পৃ. ২

[১১৫] Inb Battuta, *op.cit.*, pp. 233-234; Ma Huan, *op.cit.*, pp.160-161

[১১৬] Amir Khusrau, *Quran-us-Sadain*, 2012, pp. 39-40, 45-46

পৌঁছান। তিনি রাজধানীর নাম উল্লেখ করেননি। তখন বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়।[১১৭] ফেইসিন সুমাত্রা থেকে ২০ দিন যাত্রার পর বাংলার সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রামে পৌঁছান। চট্টগ্রাম থেকে ১৬টি চেক পোস্ট পার হয়ে সোনারগাঁও শহরে যান। সোনারগাঁও থেকে ২০ টি ঘাট অতিক্রম করে তিনি পাণ্ডুয়ায় পৌঁছান। এছাড়া ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে ডুয়ার্তো বারবোসা গঙ্গা নদীর খাত বেয়ে বাংলায় প্রবেশ করেন। সিজার ফ্রেডারিক ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার কটক বন্দর থেকে সমুদ্র পথে ৫৪ মাইল অতিক্রম করে গঙ্গার মোহনায় উপস্থিত হন। সেখান থেকে ১০০ মাইল নৌপথে যাওয়ার পর সাতগাঁও পৌঁছান। এভাবে সন্দীপ হয়ে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। ইতালীয় পর্যটক নিকোলো মানুচি ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হয়ে বাংলায় আসেন। রাজমহল থেকে ঢাকায় পৌঁছাতে তার সময় লেগেছিল ১৫ দিন। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে ঢাকা থেকে হুগলি যেতে তার ১৫ দিন সময় লাগে।[১১৮] সুলতানী বাংলায় বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের নিয়মিত যাতায়াত থেকে বাংলার উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ পথ ধরেই বাংলার বণিকগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। এই যোগাযোগ পরিচালিত হতো বড় বড় নৌকা বা জাহাজের মাধ্যমে।

সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাঙালি বণিকেরা মুসলিম শাসনামলে নানা ধরনের বৃহৎ ও দ্রুতগামী নৌকা নির্মাণ করত। বাংলা সাহিত্যেও মুসলিম শাসনামলে এ প্রদেশের বণিকদের ব্যবহৃত জাহাজ ও ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ প্রতিফলিত হয়েছে। তোমে পিরেসের বর্ণনাতে বাঙালি বণিক কর্তৃক চীনা জাঙ্ক ও জাহাজ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন বাংলা থেকে প্রতি বছর ৪-৫ টি জাহাজ পণ্যদ্রব্য নিয়ে মালাক্কায় যেতো।[১১৯] মূলত বাংলায় স্থানীয়ভাবে নির্মিত বাণিজ্যিক জাহাজকে পালের জাহাজ বলা হতো। পর্যটক র‍্যালফ ফিচ উল্লেখ করেন যে, বাংলার নৌকা চালানোর জন্য ২৪ থেকে ২৬ জন মাঝির প্রয়োজন হতো।[১২০] এক রকম নতুন জাহাজ ছিল যার অগ্রভাগ কুমিরের মাথা ও সিংহের মাথার মতো। এরূপ ১০০ গজ দীর্ঘ ও ২০ গজ প্রস্থের জাহাজে গৌড়ের ধনপতি সওদাগর ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী কবি মুকুন্দরাম লিপিবদ্ধ করেছেন।[১২১] বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সমৃদ্ধি সম্পর্কে *মনসামঙ্গল* কাব্যেও উল্লেখ রয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ইতালীয় পর্যটক বার্থেমার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে,

---

১১৭ Ma Huan, *op.cit.*, p. 160
১১৮ ওয়াকিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৮
১১৯ Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, pp. 88-92
১২০ Ralph Fitch, *Early Travels in India*, p. 26
১২১ R.K Mukherjee, *A History of Indian Shipping.* Orient Longmans, 1957, p. 158

> বাংলার অধিবাসীরা বিভিন্ন প্রকারের প্রকাণ্ড জাহাজ ব্যবহার করে। এসব জাহাজের মধ্যে কতগুলো চেপ্টা তলবিশিষ্ট করে নির্মাণ করা হয়। কেননা এরূপ জাহাজ খুব অগভীর পানিতে চলাচল করতে পারে। এর সামনে ও পেছনে প্রসারিত অগ্রভাগ (গলুই) বিশিষ্ট এক ধরনের নৌকা বাংলায় প্রস্তুত করা হয়। এগুলোর দুটো হাল, দুটো মাস্তুল আছে এবং এগুলো অনাবৃত থাকে। এক ধরনের বড় জাহাজও ছিল, যা 'গিউঙ্কী' নামে পরিচিত। এই 'গিউঙ্কীর' নামে প্রত্যেকটি জাহাজ এক হাজার বড় পিপার (টন হিসেবে) মাল বহন করে। এর ওপর তারা কয়েকটি ছোট নৌকা মেলাচা নামক শহরে নিয়ে যায়।[১২২]

বাংলায় তৈরি নৌকার দৈর্ঘ্য হিসাবে এসব নৌকার নাম রাখা হতো 'বাইশ' 'পঁচিশ' ইত্যাদি। গলুইতে বিভিন্ন জন্তুর মুখ খোদাই করে সেই অনুসারে নৌকার নাম হত 'সিংহমুখী' 'ব্যাঘ্রমুখী' 'শঙ্খচুড়' ইত্যাদি। যুদ্ধে যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হতো সেগুলোর নাম ছিল রনজয়, নরভীমা, দুর্গাবর ইত্যাদি। সাধারণত সুসজ্জিত বিলাস তরীর নাম ছিল চন্দ্রপান, হীরামুখী, নাটশালা প্রভৃতি। সওদাগররা যে নৌকা ব্যবহার করত সেসব নৌকার নাম ছিল 'মধুকরা'। সমুদ্রগামী বড় নৌকাকে বলা হতো 'বুহিত'।[১২৩] চৌদ্দ শতকের আরব ঐতিহাসিক ফয়জুল্লাহ্ আল উমর উল্লেখ করেন যে, বাংলার অনেক জাহাজের ভেতরে কারখানা ও বাজারের ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন যে, এসব জাহাজ এত বৃহৎ ছিল যে, একই জাহাজের যাত্রীরা বেশ কিছুকাল পরে একে অন্যকে জানতে পারত। এছাড়া নৌকার গতিশীলতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি একটি তীর দু'শত চলন্ত নৌকার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী নৌকাটি লক্ষ করে নিক্ষেপ করা হতো তাহলে তাদের দ্রুতগতির দরুন তীরটি ঐ নৌকায় না পড়ে এদের মাঝের নৌকাগুলোর একটির ওপর গিয়ে পড়ত।[১২৪] মার্কো পোলো বলেন যে, বাংলায় তৈরি জাহাজে একটি হাল, চারটি মাস্তুল এবং ইচ্ছানুযায়ী ওঠানামা করা যায় এমন আরো একটি মাস্তুল থাকত এবং জাহাজের আকার অনুযায়ী প্রতিটি জাহাজে দেড়শ থেকে তিনশ পর্যন্ত নাবিক থাকত।[১২৫] পর্যটক ট্যাভারনিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঢাকার নদী তীরে দুই ক্রোশ স্থান জুড়ে কেবল বড় বড় নৌকা নির্মাণকারী সূত্রধরেরা বাস করত।[১২৬] বড় বড় উন্নত প্রতিটি জাহাজের নির্মাণ কৌশল দেখে অনেকটা আধুনিক প্রযুক্তির আভাস পাওয়া যায়।

---

[১২২] J N Das Gupta, *Bengal in the Sixteenth Century A.D,* The University of Calcutta, 1914, p. 117
[১২৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *(মধ্যযুগ) প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
[১২৪] শ্রী নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, বৈশাখ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১
[১২৫] Marco Polo, *The Travels of Marco Polo,* eng. tra. by R.E Latham, London, pp. 213-214
[১২৬] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *(মধ্যযুগ) প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

মূলত জলপথে বাণিজ্য বিস্তারের ফলে জাহাজ তৈরির ও জাহাজ পরিচালনার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। বাংলায় তৈরি উন্নত মানের জাহাজে করে সিংহল, ভারতের পশ্চিম উপকূল, গুজরাট ও মালদ্বীপের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হতো। এছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বাংলা থেকে সুতিবস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য বহনের জন্য এসব জাহাজ ব্যবহার করত। বিভিন্ন ধরনের কাঠ থেকে এসব বড় বড় জাহাজ তৈরি করা হতো। দেবদারু জাতীয় গাছের তৈরি জাংকে একটি মাত্র ডেকে ৫০ থেকে ৬০টি কেবিন থাকত। জাহাজের দৈর্ঘ্য ২৫০ ফুট ও প্রস্থ ১১০ ফুট হতো। এর ভেতর ও বাইরে জল নিরোধের ব্যবস্থা ছিল। ডেকের নিচে আবাসিক প্রয়োজনে কতগুলো কক্ষ তৈরি হতো। এসব জাহাজের আকার অনুযায়ী নাবিকের সংখ্যা ১৫০ থেকে ৩০০ এর মধ্যে সীমিত থাকত।[১২৭] মার্কো পোলোর মতে, দাঁড় টানা জাংকে প্রত্যেকটি বৈঠা নিয়ন্ত্রণ করত চারজন নাবিক। এছাড়া জাহাজের সঙ্গে দড়িবাঁধা তিনটা ক্ষুদ্রাকার জাহাজের কোনোটি চালাতো ৬০ জন নাবিক, কোনোটি ৮০ জন কোনোটি ১০০ জন। . . . ক্ষুদ্র যানগুলোও প্রচুর মাল বহন করত। কোনো কোনোটিতে ১০০০ বাক্সভর্তি গোলমরিচ স্থান পেতো। বড় বড় জাহাজের সাথে আরো থাকত দ্রুত ধাবমান ১০টি ছোট নৌকা। নৌঙর ফেলা, মাছ ধরা ও অন্যান্য কাজে এগুলো ব্যবহার করত। এছাড়া হালকা ধরনের জাহাজ ও নৌকা সঙ্গে নিতো।[১২৮] জাহাজের আয়তন অনুসারে নাবিকের সংখ্যা কম ও বেশি হতো। নৌকার দুই দিকে পাশে দুটি অংশ অনেক উঁচু করে তৈরি করা হতো যা আয়তাকার রূপ ধারণ করত। এই কাঠামোটি পেরেক ও আঠা দিয়ে দুই স্তরের তক্তায় তৈরি হতো। এর ভেতরে ও বাইরে জল নিরোধক ব্যবস্থা থাকত। এসব জাহাজে সাধারণত জল নিরোধক ব্যবস্থার জন্য কক্ষ তৈরি হতো যাতে তেরো চৌদ্দটি বিভাজক দেয়াল তোলা হতো। তাছাড়া ডেকের নিচে আবাসিক প্রয়োজনে কক্ষ তৈরি করা হতো। বাকি অন্য সব জায়গা মালামাল রাখার জন্য নির্দিষ্ট ছিল।[১২৯] এসব জাহাজ ছিল বড় আকৃতির।

আরব, ইরানি, আবিসিনীয় ও ভারতীয় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যটকগণ বর্ণনা করেছেন। বাঙ্গালা শহরের মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার্বোসা লিখেছেন, তারা সকলেই বড় বড় বণিক এবং 'মোকাহ' বন্দরের বণিকদের জাহাজের মতো একই ধরনের বাংলার বাণিজ্য তরীগুলো নির্মিত। তিনি বাংলায় ছোট, বড় দুই রকমের জাহাজের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন।[১৩০] মাহুয়ানের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বাংলার ধনী লোকেরা বৃহৎ জাহাজ তৈরি করাত এবং এসব জাহাজের মাধ্যমে তারা বিদেশের

---

[১২৭] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society,* p. 86
[১২৮] Marco Polo, *op.cit.,* pp. 214-215
[১২৯] *Ibid,* pp. 213-214
[১৩০] *The Book of Duarte Barbosa*, 1918, p. 135

সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাত।[১৩১] অন্যদিকে সিজার ফ্রেডারিকের বর্ণনা করেন যে, কনস্ট্যান্টিনোপলের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়ার চেয়ে সন্দ্বীপে জাহাজ নির্মাণ সস্তা মনে করেছিলেন।[১৩২] এখানে জাহাজ নির্মাণ সামগ্রী খুব সস্তা ছিল। ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে বাংলায় বহু সমুদ্রবন্দর ও নদীবন্দরের উন্নতি হয়। মুসলিম শাসনের শুরু থেকে চট্টগ্রাম ছিল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। একজন চীনা দূত লিখেছেন "সা-টি-কিং (চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম) সাগরের মুখে অবস্থিত। বিদেশি বণিকগণ এখানে আগমন করে এবং জাহাজ নোঙ্গর করে। তারা এখানে সমবেত হয় এবং তাদের পণ্যদ্রব্যের মুনাফা বণ্টন করে।[১৩৩] পর্তুগিজরা এ বন্দরটিকে 'পোর্টো গ্রান্ডি (বড় বন্দর)'[১৩৪] বলে অভিহিত করে। তাদের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, এটা মুসলিম বণিকদের বাণিজ্যের কর্মব্যস্ত কেন্দ্র ছিল এবং এর প্রতি পর্তুগিজ বণিকদের লোভ ছিল।

সুলতানী শাসনাধীনে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। এ সময় প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটিয়ে বৃহাদাকার ও মজবুত জাহাজ তৈরি হতে থাকে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাংলায় তৈরি মধুকর, মধুপাল, দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচুড়, ছোটমুঠি, শতগজ, মকরমূখী, রণজয়া, রণভীমা, সর্বধরা, চন্দ্রতারা, নাটশালা, আগল-পাগল, চন্দনপাট, টিঞাঠুটি, যাত্রাবর, সুতারেখি, হিঙ্গুলবাড়ি, কাজলরেখি, রত্নমালা, উদয়তারা প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ও আকৃতির ডিঙা ও নৌকার নাম পাওয়া যায়।[১৩৫] চীনা বিবরণে বাংলার শাসক কর্তৃক জাহাজ তৈরি এবং সে জাহাজে রাজার লোকদের বিদেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গমনের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩৬] বাংলার মিন বংশের সরকারি নথি থেকে জানা যায় যে, বাংলার সুলতান একটি বিরাট জাহাজে করে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী এবং মণিমুক্তায় পূর্ণ করে চীন, সুমাত্রা ও ব্রুনাইতে এক বাণিজ্য মিশন পাঠিয়েছিলেন।[১৩৭] বার্থেমার বিবরণে জাহাজভর্তি পণ্যদ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য করার প্রমাণ মেলে।[১৩৮] বাংলার সমৃদ্ধ নৌশিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন পর্তুগিজ পর্যটকগণ। বার্বোসা এদেশের নৌশিল্প সম্পর্কে বলেন যে, এরা (বাঙালিরা) সবাই বড় বড় ব্যবসায়ী। এদের নিজেদের জাহাজগুলোর নির্মাণ কৌশল মক্কার জাহাজের

[১৩১] Ma-Huan, *op.cit.*, p.165

[১৩২] J.J.A Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, p.119

[১৩৩] অধীর চক্রবর্তী, বাংলা ও বহির্বিশ্ব, *ইতিহাস অনুসন্ধান*- ৪, ১৯৮৯, পৃ. ৭১

[১৩৪] J.J.A, Campos, *op.cit.*, p. 23

[১৩৫] মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল*, সম্পা. সুকুমার সেন, নয়াদিল্লি বাংলা অ্যাকাডেমি, ১৯৭৫, পৃ. ১৯১-২২৪; নারায়ণ দেব, *পদ্মপুরাণ (মনসামঙ্গল)*, সম্পা, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাস গুপ্ত, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭, পৃ. ১৫৮

[১৩৬] অনিল দাস, *বাঙালি কবি বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিতে বাঙালির বাণিজ্য, ইতিহাস অনুসন্ধান-৪*, ১৯৮৯, পৃ. ১০৮

[১৩৭] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩০

[১৩৮] Varthema, *The Travels of Ludovico Di Varthema.*, p. 212

ন্যায়, অন্যগুলো চীন দেশের জাঙ্ক-এর ন্যায়। এগুলো খুবই বৃহৎ এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাল বহন করে। এসব জাহাজ নিয়ে তারা মান্দার, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, টেনাসেরিন, সুমাত্রা, সিংহল এবং মালাক্কায় যেতো।[১৩৯] উপরিউল্লিখিত বর্ণনা থেকে দেখা যায় বাংলায় নানা আকৃতির বিভিন্ন নামের উন্নতমানের জাহাজ তৈরি হতো এবং সেই জাহাজ দ্বারা পৃথিবীর অনেক দেশের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পাশাপাশি কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করা হতো।

তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি ছাড়াও প্রধানত দুটি কারণে নৌকা ও জাহাজ তৈরির কারখানা খুবই গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রথমত, বাংলায় অসংখ্য নদ-নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এসব নদ-নদী যোগাযোগ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। দ্বিতীয়ত, সুলতানী শাসনামলে বাংলা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সংযুক্ত ছিল। ফলে জাহাজ নির্মাণ করা আবশ্যক ছিল। তৎকালীন বাংলায় তিন ধরনের জলযানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন- ছোট নৌকা, রণতরী (ফ্রোটিলা), যাত্রী ও বণিকবাহী বড় জাহাজ। ইবনে বতুতার তথ্যে জানা যায়, তখন অসংখ্য নৌকা ছিল এবং প্রতিটিতে একটি করে দাস থাকত। যখন একটি নৌকা অপর নৌকার সম্মুখবর্তী হতো একজন নাবিক আর একজন নাবিককে অভিনন্দন জানাত। মোহাম্মদ বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) যখন বাংলা জয় করেন তখন লখনৌতির গঙ্গা নদীতে দুই লক্ষ ছোট, বড় অসংখ্য নৌকা চলাচল করত।[১৪০] যতদূর সম্ভব এগুলো ছিল নৌবাহিনীর রণতরী। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তিন থেকে চারশ বছর পর চীনা জাহাজকে বলা হতো জাংক (junk) এবং আরবীয় জাহাজকে বলা হতো 'ধো' (dhaw)।[১৪১] এসব নৌকা নির্মাণে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এদেশের নৌকার আকৃতি ছিল চামচের মতো, মাঝে নিচু, দু'পাশে উঁচু, দুই প্রান্ত সূচালো সামনে ও পেছনের অংশে গলুই। এসব নৌকা তৈরির জন্য তারা করাত, বাটালি, হাতুড়ি, তুরপুন ইত্যাদি নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। এছাড়াও তাদের প্রয়োজন মতো তারা তক্তা বাকানোর জন্য যাতি বা বাগন এবং অপরিশীলিত কম্পাস[১৪২] ব্যবহার করত।

---

[১৩৯] Barbosa, *op.cit.*, pp. 135-136 ; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 325-326; মৈমনসিংহ গীতিকায় ছোট ছোট নৌকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে মলুয়ার নেওয়ার জন্য তার ভাইয়েরা কয়েকখানি ছোট ছোট নৌকা নিয়ে ছুটে আসে এবং ঐ নৌকাগুলো দেওয়ান সাহেবের বড় নৌকা ছোট নৌকাগুলো ঘিরে ফেলে। মলুয়ার ভাইয়ের নৌকার মধ্যে বড় নৌকাটি ছিল আট দাড়ি নৌকা-বাইশ। দীনেশচন্দ্র সেন নৌকার বর্ণনা দিয়ে আরো উল্লেখ করেন যে, পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পানসী নাও (পানসী নৌকা ভাড়া) করে। . . . পানসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরী।। . . . পঙ্খী উড়া করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪; এমন সোনার পানসী তাতে মাঝি নাই। *ঐ*, পৃ. ২৬

[১৪০] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 339; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রা.লি.সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৮২ ও ৪৩৫

[১৪১] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society*, p. 85

[১৪২] গোকুল চন্দ্র দাস, *বাংলার নৌকা, প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৬৬,

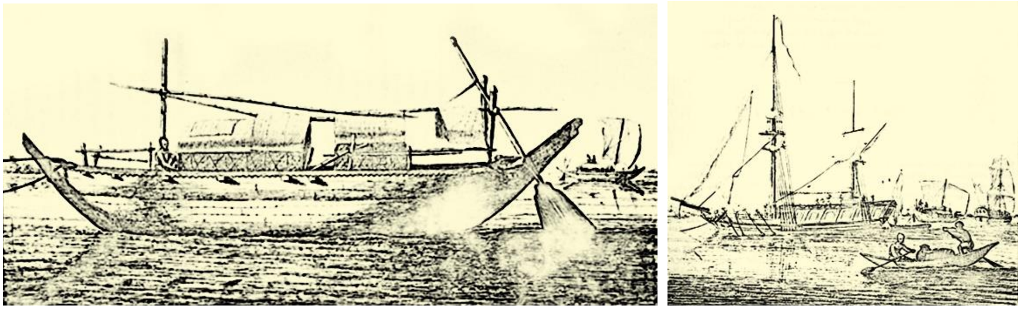

চিত্র-৫.১৪: নৌকা. Les Hindous Vol-3-Boats Par f. Baltazard Solvyns. Paris

সলভিন্স এর আঁকা নৌকার চিত্র (চিত্র-৫.১৩) বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাংলার নৌকায় পাতাম দিয়ে পর পর তক্তা জুড়ে তৈরি কীল ছাড়া এ নৌকার খোল, প্রশস্ত ও দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট। একটি মাত্র মাস্তুল কিছুটা সামনে এগিয়ে এবং পাল ঢোকানো। কখনো অতিরিক্ত একটি ছোট বাঁকানো পাল মাস্তুলের মাথায় টাঙানো হতো। হিন্দু মালিকের পলওয়ার নৌকার গলুই এর দু'পাশে দুই তিন সারি পিতলের বড় মাথাযুক্ত পেরেক এমনভাবে লাগানো হতো যে দূর থেকে এগুলো দেখলে গলুই এর মাথায় ঝুলানো ফুলের মালার মতো মনে হতো।[১৪৩] বাংলার বড় নৌকার নির্মাণ থেকে বোঝা যায় এসব জাহাজ নির্মাণে মিশরীয় প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এ নৌকাগুলোর পেছন ও পেছনের শেষ অংশ গলুই বা সামনের অংশের তুলনায় উঁচু করে তৈরি করা হতো। প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলায় মিশরীয় নৌকার ধ্বংসাবশেষ আর নীল নদীতে চলমান নৌকাগুলোর সাথে বাংলার নৌকাগুলোর মিল রয়েছে। মিশরীয় নৌকার ৩টি বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলার নৌকার মিল রয়েছে বলে হর্নেল বর্ণনা করেন। যেমন- (ক) পেছনের অংশ উঁচু, গলুই নিচু ও কোয়ার্টার অংশে বৈঠার ব্যবহার। এছাড়া হালযুক্ত ছোট ও মাঝারি ডিঙি নৌকা প্রাচীন মিশরীয় নৌকার প্রতিরূপ। দাঁড় ব্যবহারের সুবিধার জন্য বড় নৌকার সন্মুখাংশ ও অনেকটা নিম্নতলে নির্মিত হতো। (খ) প্রাচীন মিশরীয় নৌকার চৌকোনা বর্গাকার পাল বাংলার নৌকায় ব্যবহৃত হয়। (গ) কোয়ার্টার অংশে (পেছনের থেকে কিছুটা সামনে) ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণকারী বৈঠা, হাল প্রাচীন নীলনদের বৈঠার অনুরূপ। এছাড়া বাংলার বড় নৌকায় দীর্ঘ হালদণ্ডের ওপরের দিকে সমকোনো একটি ছোট সরু কাঠের হাতল (Cross bar) লাগানো হতো। এ হাতল ধরে বৈঠা বা হাল টানা মাঝির পক্ষে বিশেষ সুবিধা ছিল। বাংলায় সাধারণত বড় পণ্যবাহী নৌকায় দীর্ঘদণ্ডের বৈঠা হালের ব্যবহার ছিল। এছাড়া কোয়ার্টার অংশের বৈঠা হাল ও পেছনের ভারসাম্যযুক্ত বড় হালের মধ্যে আরো এক ধরনের হালও বাংলায় দেখা যেতো। এই ধরনের হালের ব্যবহারে নৌকায় ভারসাম্য রক্ষা করা যেতো। এরূপ হাল পেছনের খুঁটির পরিবর্তে নৌকার কোয়ার্টার অংশে ব্যবহৃত হতো।[১৪৪]

---

[১৪৩] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society*, pp. 86-87; গোকুল চন্দ্র দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০
[১৪৪] Basil Greenhil, *Boat and Boatsman of Pakistan*, New Jersey, 1972, p. 93

পূর্বে উল্লেখিত বাংলার বড় বড় নৌকা ও প্রাচীন নীলনদের নৌকাগুলোর বৈশিষ্ট্য একই। নৌকাগুলো চামচের আকৃতির মতো। এর খোলের মাঝখান থেকে উভয় দিকে দুই পাশ ক্রমশ সরু হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। ফলে নৌকার মাথা ও পেছনের অংশ সূচালো আকৃতি হয়। এ ধরনের নৌকায় সমানভাবে তক্তা বসানো যায় না। মাঝখান থেকে তক্তাগুলো ক্রমশ সরু করে পাতাম দিয়ে বা খাঁজ কেটে জুড়তে হয়। বাংলার নৌকার কারিগররা নৌকার মাঝের টুকরা তক্তা বা 'চোরাগোড়' এর ব্যবহার করত। উল্লেখ্য যে, এ কারিগররা মাথা ও পেছনে সূচালো আকার দিতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। চামচাকৃতি খোলের সবচেয়ে প্রশস্ত অংশটি তৈরি করার পর খোলের ওপরের দুদিকের শেষ তক্তার ওপর একাধিক লম্বা তক্তা দৈর্ঘ্য বরাবর মাথা থেকে পেছন পর্যন্ত জুড়ে দেয়। ফলে দু'পাশের লম্বা তক্তগুলো দু'পাশের গলুইতে মিলে সূচালো আকার নেয়। কারিগররা সূচালো অংশগুলোকে আরো স্পষ্ট করতে কখনো কখনো লম্বা তক্তাগুলোকে নারিকেলের রশি দিয়ে বাঁধার ফলে নৌকার কাঠামো দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ভেতরের জায়গাও অনেকটাই বৃদ্ধি পায়।[১৪৫] তবে এসব নৌকার আকার বিভিন্ন রকম হতো এবং এখানে তক্তার সংখ্যা কম বেশি হতো।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা ছাড়া বাংলা সাহিত্যেও বিভিন্ন নামের এবং বিভিন্ন আয়তনের জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ এবং সেগুলো ব্যবহারের কথা উল্লেখ রয়েছে। *মঙ্গলকাব্যে* ডিঙ্গা বা পানসির বর্ণনা রয়েছে। এ পানসি এক ধরনের জাহাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ নৌকাগুলো যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো। *মনসামঙ্গল* এবং *পদ্মপুরাণ*-এ সপ্তডিঙ্গা ও নৌকা উভয় নামেই জাহাজের উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪৬] চাঁদ সওদাগরের ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও নামের বাণিজ্য তরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ধনপতির সাতটি ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্তের নয়টি জাহাজের উল্লেখ রয়েছে।[১৪৭] *মনসামঙ্গল* কাব্যে সপ্তডিঙ্গার আয়তন থেকে বড় জাহাজের আয়তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া

---

[১৪৫] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society*, p. 86

[১৪৬] *পদ্মপুরাণ* এ-উল্লেখ রয়েছে যে- সাত নৌকা ধন লয়ে দেশেতে চলিল
বাহু বাহু বল্যে চান্দ বলিতে লাগিল শ্রীরায় বিনোদ কবি ও কাব্য, *পদ্মাপুরাণ*, সম্পাদনা ডক্টর মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১০৭

[১৪৭] *পদ্মপুরানে* উল্লেখ রয়েছে যে,
আগে চলে মধুকর চন্দ্রধর সদাগর
তবে চলে সিঙ্গা দুর্গাবর।
তবে চলে তেলধার সোনামুখী চাঁপাডাল
তবে চলে রাঙিয়াচামর।।
মনসুখ ডিঙ্গা চলে ডাক দিয়া দাঁড় ধরে।
দাঁড়ের উলাসে ডিঙ্গা চলে।

মেলে ডিঙ্গা তেলধার জেন বিদ্যুৎসঞ্চার।
তব চলে ডিঙ্গা শঙ্খচুড়।
চৃঞাঠুটী ডিঙ্গা মেলে খগপতি জেন চলে

যায়। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দডিঙ্গার আকার থেকে বাংলায় নির্মিত জাহাজের আকার সম্পর্কে জানা যায়।[১৪৮] চাঁদের চতুর্দশতম বড় ডিঙ্গায় ফুল ও ফলের বাগান পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছিল। এ জাহাজভর্তি পণ্যদ্রব্য নিয়ে চাঁদ বহির্বাণিজ্যে যেতো।[১৪৯] প্রতিটি জাহাজ তৈরি হতো আধুনিক প্রযুক্তিতে। বাংলা সাহিত্যে জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, বণিক চাঁদ সওদাগর কুসাই নামক সুদক্ষ মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠান এবং তাকে দ্রুত ১৪টি জাহাজ/বড় নৌকা তৈরির করার আদেশ দেন।[১৫০] বড় বড় জাহাজের ওপরের দিকে বিশ্রামের জন্য আধুনিক যুগের কেবিনের ন্যায় বড় বড় কক্ষ তৈরি করা হতো এবং সেখানে আবাসিক সুবিধাও ছিল। সওদাগর, বণিকদের বাণিজ্যের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে রপ্তানির জন্য এসব জাহাজ নির্মাণ করা হতো। উল্লেখিত জাহাজগুলোতে থাকত প্রধান নাবিক ও তার প্রশাসনিক মুখ্যপাত্র, বেতন দেওয়ার ব্যক্তি, কম্পাসের অধ্যক্ষ, কর্ণধার/হালরক্ষক, মাস্তুল পরিদর্শক, রশির তত্ত্বাবধায়ক ও তার সহায়তাকারী, নোঙরগুলোর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক, প্রায় ৩০ জন নাবিক, তাওবাদী, পুরোহিত ও ধর্মরক্ষক।[১৫১]

পানীয় ও সুগন্ধি-জাতীয় দ্রব্য

বাংলায় প্রাচীন কাল থেকে নেশাজাতীয় দ্রব্য তৈরি হতো। সুলতানী আমলে অপরিশোধিত তেল, মদ, স্পিরিট ও সুগন্ধি তৈরি হতো। সমসাময়িক চৈনিক বর্ণনা মতে, এসব মদ, নারিকেল, ভাত ও জলজ উদ্ভিদ থেকে তৈরি হতো।[১৫২] বাংলায় সুগন্ধ জাতীয় দ্রব্য তৈরি হতো। মালিক মহম্মদ জায়সী বিশেষ দু'রকম তীব্র গন্ধযুক্ত আতরের নাম উল্লেখ করেছেন- 'মৈদু' (maidu) ও 'চুবাই' (chuvai)। কিন্তু সেগুলো কিসের নির্যাস থেকে তৈরি তা সঠিকভাবে বলেন নি।[১৫৩] বাংলায় অপরিশুদ্ধ চিনি, মহুয়া ও ভাত থেকে বিয়ার প্রস্তুত করা হতো। আমির খসরু উল্লেখ করেন যে, আখ থেকেও উগ্র পানীয় তৈরি

ডিঙ্গা ঠেলি চলি গেল দূর। শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত এবং ডক্টর মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, *পদ্মাপুরাণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৫

[১৪৮] চৌদ্দ ডিঙ্গার বর্ণনা পাওয়া যায়-- চৌদ্দয়ডিঙ্গায় নামাইল করি শুভক্ষণ।
ডিঙ্গার উপরে বান্ধে চন্দন চৈরি ঘর।

চাপা নাগেশ্বর রোপে লবঙ্গ গুলাল।
কল্লিকা মল্লিকা রোপে যূথী জাতি আর।
শিমলী পারলী ওর মালতী টগর। *পদ্মাপূরাণ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯০

[১৪৯] গোকুল চন্দ্র দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[১৫০] কুসাই মিস্ত্রী দ্রুত তাঁর নিজের বেশ কয়েকজন কারিগরকে সঙ্গে নিয়ে কাছের বনে গিয়ে কাঠ কাটে। করাতীরা অল্প সময়ের মধ্যে তিন চার হাজার তক্তা প্রস্তুত করে। পরে সেই তক্তাগুলোকে লোহার পেরেকের সাহায্যে সংযুক্ত করে জাহাজ তৈরি করা হয়। পাণ্ডুয়ার পাশের কয়েকটি গ্রামের মাটির নিচে জাহাজের কয়েকটি খুব পুরাতন মাস্তুল পাওয়া যায়। ঐ স্থানের মধ্য দিয়ে মহানন্দা নদী প্রবাহিত হতো। R.K.Mukherjee, *History of Indian Shipping*, p.159; M A Rahim, *op.cit.*, p. 395

[১৫১] Ma Huan, *op.cit.*, Appendix. 3, p. 306

[১৫২] Ma Huan, *op.cit.*, p. 161

[১৫৩] K.M Ashraf, *op.cit.*, pp. 121-122

হতো।[১৫৪] এছাড়া খেজুরের রস ও তালের রস থেকেও একশ্রেণির উগ্র পানীয় তৈরি হতো। বাংলায় সবরকম উগ্র পানীয় তৈরি করার সুবিধা ছিল এবং এখানে খোলাবাজারে মদ বিক্রি হতো বলে জানা যায়। এসব মদ তৈরিতে চোলাই পদ্ধতির ব্যবহার করা হতো। যা ছিল তৎকালীন সময়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। মাহুয়ান বাংলায় তৈরি চার রকম মদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লেখিত মদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল চোলাই করা।[১৫৫] মদ তৈরি প্রযুক্তির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক আবুল ফজল। তাঁর মতে, মদ তৈরিতে তিন রকমের পাতন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন- প্রথমত, একমণ আখের রসের সাথে দশ সের বাবুলের ছাল গুড়া করে (gum acacia) এবং তিনগুণ পানিতে মিশিয়ে বড় বড় কলসিতে মুখ বন্ধ করে সাত থেকে দশ দিন মাটিতে পুঁতে রেখে পচানো হয়। পরে তাতে সুগন্ধি (কর্পুর) বা অনেক সময় মাংস মেশানো হয়। দ্বিতীয়ত, পাত্রটিকে একটি মাটির হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং দুটি পাইপের দুটি প্রান্ত পাত্রের ভেতর দেওয়া হয়। এছাড়া ঠান্ডা পানিতে একটি মাটির গ্রহীতা পাত্র (earthern receiver) রাখা হয়। বাষ্প যখন সেখানে পৌঁছায় তখন ঠান্ডা তাপমাত্রার কারণে মদ (arq) এ পরিণত হয়। তৃতীয়ত. একটি মাটির কলসিতে পচানো মিশ্রণ ভর্তি করে এর ওপর একটি উল্টা করে চামচ বসানো হয়। এর চ্যানেলে পাইপ যুক্ত করে গ্রহীতা পাত্রের সাথে লাগানো হয়। মদ তখন চামচ বেয়ে গ্রহীতা পাত্রে জমা হয়।[১৫৬] এভাবে পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চমাত্রার পানীয় তৈরি হতো। দিল্লিতে আগত অভিবাসী শাসকগোষ্ঠীর সাথে এ প্রযুক্তি বাংলায় আসে। দিল্লিতে বকযন্ত্রের সাহায্যে চোলাই করে মদ তৈরির কথা জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেছেন।[১৫৭] গোলাপ জল তৈরির জন্য গোলাপের পাপড়ি পিষে পানির সাথে মিশিয়ে উনুনে গরম করা হতো। গরমের ফলে এই পানি সিদ্ধ হয়ে এর বাষ্প নলের সাহায্যে পাত্রে রক্ষিত হতো। গরম গোলাপ জলের ওপরের আস্তরণে এক মিহি সর পড়ত যা চড়া সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৫৮] ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গৌড়ের রাজসভায় চীনা অতিথিদেরকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সাথে গোলাপ জল ও নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য মিশিয়ে সরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল।[১৫৯] এখানে যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তা পাতন ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।

---

[১৫৪] K.M Ashraf, *op.cit.*, p.122
[১৫৫] Ma Huan, *op.cit.*, p. 161
[১৫৬] Abul Fazl, *The Ain-i-Akbari*, vol, 1, pp. 73-74
[১৫৭] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 286
[১৫৮] Irfan Habib, *Technology in Medieval India*, c. 650-1750, Aligarh Historical Society, Tulika Books, New Delhi, 2008, pp. 25-26
[১৫৯] Fei Hsin, *Hsing-Ch'a Sheng-Lan The Overall Servey of Star Raft*, tra. by J.V.G Mills, Revised, edited by Roderich Ptak, wiesbaden, 1996, pp. 73-74; M R Tarafder, *Trade, Technology and Society*, p. 83

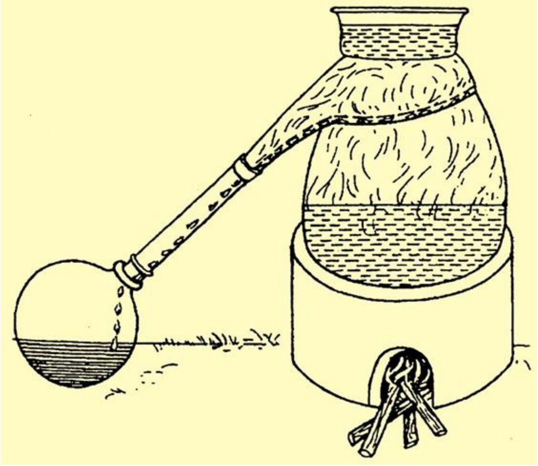

চিত্র-৫.১৫: পাতন যন্ত্র, Habib- *Technology*, p. 25

এভাবেই পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানীয় জাতীয় দ্রব্য তৈরি হতো। অভিজ্ঞ কারিগরগণ এসব পেশায় জড়িত ছিল। এসব শিল্প বংশগতভাবে চালু ছিল। বংশানুক্রমে একই পেশায় লেগে থাকার জন্য এই সব কারিগর বংশগত নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতার অধিকারী হতো। কাজেই তাদের তৈরি দ্রব্যগুলোর শৈল্পিক মূল্য ছিল অসাধারণ।

চিত্রকলা ও আধুনিক প্রযুক্তি

একটি দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল হলে সেই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়ে। প্রতিটি দেশের চিত্রকলা সেই দেশের সংস্কৃতির একটি বড় স্থান জুড়ে থাকে। পাল আমলে বাংলার চিত্রকলা সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু সেন আমলে এরূপ উন্নত কোনো চিত্রকলার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। বাংলায় সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এক নতুন দরবারি শিল্প বাংলায় গড়ে ওঠে। মধ্য এশিয়া থেকে আগত শাসকগোষ্ঠী তাঁদের নিজস্ব শিল্প পারসিক চিত্রকলাকে বাংলায় নিয়ে আসে। যদিও এর সাথে ভারতীয় শিল্পের কিছু মিশ্রণ ঘটে এবং তা সীমিত থাকে অল্প সংখ্যক অভিজাতদের মধ্যে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বাংলার অধিকাংশ পুঁথিই তালপাতায় লেখা হতো। প্রায় সব ছবিই ছিল দেব দেবীর প্রতিকৃতি। এসব পুঁথি চিত্রগুলিতে যে রঙ ব্যবহার করা হয় তা হলো- হরিতালের হলুদ, খড়ি মাটির সাদা গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালি, সিঁদুরে লাল এবং গাছের পাতার সবুজ রঙ। সুলতানী আমলের প্রাথমিক পর্যায়ে তালপাতায় লেখা হতো কিন্তু ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে চিত্রিত একটি পুঁথিতে দেখা যায় যে, কাগজগুলোকে কেটে নেওয়া হয়েছে তালপাতার মাপে।[১৬০] ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে চৌদ্দ শতকের মধ্যে বাংলায় কাগজের ব্যবহার বেড়ে যায়। বাংলায় আগত পারসিক অভিবাসীগণ নিজেদের

[১৬০] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলার চিত্রকলা, *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে.পি বাগচী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৯৮-১৯৯

প্রয়োজন মতো নিয়ে আসেন পোশাক, অস্ত্র ও পারসিক চিত্রকলার নিদর্শন। যদিও ইসলাম ধর্মে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকা ছিল বর্জনীয় অপরাধ। তারপরও এ সময়ে চিত্রকলা চর্চায় মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে চিত্রকলায়ও পরিবর্তন আসে। চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান লিখেছেন যে, এ সময় গৌড়ে বেশ কিছু দক্ষ শিল্পী কাজ করতেন।[১৬১]

সুলতান হোসেন শাহের আমলের (১৪৯৮-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) তিন খণ্ডের সহিহ বুখারিতে এবং নুসরাত শাহের আমলে (১৫৩১-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়ে ইরানি রীতিতে চিত্রিত *নিজামীর সফরনামার* কয়েকটি অনুকাহিনীর চিত্রণে কাগজের ব্যবহার করা হয়।[১৬২] সফরনামার প্রথম পৃষ্ঠায় নীল ও সোনালি রঙের লিপিতে উৎকীর্ণ আছে লিপিকারের নাম। আরবি ভাষায় চিত্রটির ওপরে লেখা হয়েছে সুলতানের প্রশস্তি। যার অর্থ হলো- "এই গ্রন্থটি সুলতানের আদেশে রচিত হয়েছে। তিনি সুলতান যিনি সকল গুণের অধিকারী, বহু উপাধি দ্বারা ভূষিত। সুলতানের সুলতান, পৃথিবী ও ধর্মের রক্ষক, আবু মুজাফফর নুসরাত শাহ যিনি হুসেন শাহের পুত্র। ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য চিরকালের জন্য রক্ষা করুন। তাঁর বংশধররা চির আয়ুষ্মান হোক।" এই প্রার্থনা করেছেন সুলতানের প্রিয় বান্দা হামিদ খান। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে/৯৩৮ হি. তারিখযুক্ত ও লিপিকারের স্বাক্ষরসহ এই পুঁথিটি বাংলার সুলতানী আমলের চিত্রকলার সবচেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য নিদর্শন।[১৬৩]

চিত্র-৫.১৬: সুলতানী চিত্রকলা, ইস্কান্দর নামা

[১৬১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, *মধ্যযুগ*, পৃ. ৩১০-৩১১
[১৬২] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 89
[১৬৩] Muhammad Mohar Ali, *op.cit.*, pp. 937-938

এছাড়াও সুলতানী শাসনের আরোও একটি বিখ্যাত চিত্র হলো নুসরাত শাহের আমলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত ইস্কান্দর নামার কপিতে ব্যবহৃত চিত্র (ওপরের চিত্র ৫.১৫)। এখানে গাছপালা, জীবজন্তু এবং মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে। মূলত চিত্রটিতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ থেকে বহিরাগত শিল্পকলার সাথে স্থানীয় শিল্পের এক ধরনের সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়।[১৬৪] এ চিত্রগুলোতে শিল্পীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা উৎকীর্ণ মানুষের শারীরিক আদলে, স্থাপত্যের চিত্রণে, দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের আভাস খোঁজে। লাল ইটের ব্যবহার, ত্রিকোণ ছাদের বাঁকানো কার্নিস, জীবজন্তু, বিশেষ করে ঘোড়ার চেহারায় ফুটে উঠে ভারতীয় লক্ষণ। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এ ছবিগুলোতে পারসিক চিত্রকলার বিশেষ রূপ রয়েছে বলে মনে করেন। অনেকের মতে, বাংলার সুলতানদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাইরে থেকে চিত্রের নিদর্শন এনে অথবা লাইব্রেরিতে রক্ষিত পারসিক চিত্রকলার নিদর্শনগুলো অনুধাবন করে চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।[১৬৫] সুলতানের রাজপ্রাসাদের শিল্পীরা বাংলায় এক প্রাদেশিক চিত্ররীতি সৃষ্টি করেন যা মোগল যুগ পর্যন্ত টিকে ছিল।

স্থাপত্য শিল্প ও প্রযুক্তি

বাংলায় সুলতানী শাসন দীর্ঘস্থায়ী ছিল এবং শাসকগণ অনেক ইমারত ও স্থাপত্য নির্মাণ করেন। এ সময় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে পাথর খোদাই ও ইট নির্মাণ শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। ভারতবর্ষে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বাংলার কারিগরেরা এ দুটি শিল্পে বিশেষ দক্ষতা ও খ্যাতি লাভ করেছিল। ইলিয়াস শাহি যুগের (১৪৩৬-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম দিকের অভিলিখন থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাথর খোদাই শিল্পে বাংলা তখন ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান ছিল। ইট, পাথর দ্বারা তখন দালানকোঠা, প্রাসাদ ও অনেক মসজিদ তৈরি হয়েছিল। এসব ইমারতগুলোতে ছাদ, গম্বুজ ও খিলানের ব্যবহার করা হয়। এ সময়ের স্থাপত্যে ইট, পাথরের টুকরাগুলোকে জোড়া লাগানোর জন্য সুরকির ব্যবহার[১৬৬] করা হয়- যা ছিল সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। যদিও সেসব ইমারতগুলো বা সেগুলোর ভগ্নস্তূপ এখন আর দেখা যায় না। তবে শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে ঐসব ইমারতের নাম, স্থাপনের তারিখ ও অবস্থানের কথা জানা যায়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন গৌড়ে এসে বাংলার রাজপ্রাসাদগুলোর দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। প্রাসাদের পাশে ঝরনা, ফুলের বাগান ও জলের জন্য পাথরের খাল ছিল। ঐসব প্রাসাদের

[১৬৪] ফয়েজুল আজিম, চিত্রকলা প্রস্তরযুগ থেকে পরবর্তী মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*- ১, (সম্পাদক) সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৭৪

[১৬৫] পোড়ামাটির শিল্প, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪২৫

[১৬৬] A H Dani, *op.cit.*, pp. 18-19, 63-67; মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ.২০৪

কক্ষগুলোর মেঝে ও ভেতরের দেওয়ালে চীন থেকে আমদানি করা টালি ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৬৭] এ কক্ষগুলোতে দামি আসবারপত্র ও বিলাসবহুল পর্দা ছিল। সম্রাট হুমায়ুনের মনে বাংলার পরিবেশ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

মুসলিম শাসনাধীনে স্থাপত্য শিল্পে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হয়। প্রথমত, এই সময়ের অনেক স্থাপত্য ইট দ্বারা নির্মিত। স্তম্ভের কোনো কোনো স্থানে প্রাচীরের বাইরের আবরণের জন্য পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আবহাওয়া ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বনিম্নে একসারি পাথর বসানো হতো। আবার ইটের গাঁথুনি মজবুত করার জন্য চুন ব্যবহার করা হতো। দ্বিতীয়ত. বাংলার বেশিরভাগ ঘর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে- কাঠের ও ইটের বাড়ির ছাদ দিয়ে দোচালা ও চারচালা করে তৈরি হতো। দুটি বাঁশ দূরে বেঁধে তার মাথা নিচু করে বাঁধলে যে আকৃতি ধারণ করে, ইটের ও পাথরের স্তম্ভের তৈরি খিলানগুলোও একইভাবে তৈরি হতো। তৃতীয়ত. হিন্দুদের মন্দিরের গায়ের ফলকে মানুষের মূর্তি খোদিত হতো কিন্তু মুসলিম শাসনে এর বদলে নানারকম লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা খোদাই করা হয়। চতুর্থত. এ সময়ে নতুন পদ্ধতিতে খিলান নির্মিত হয়। হিন্দু যুগে সাধারণত একটি পাথরের ওপর ঠিক সমান্তরালভাবে আর একখানা ইট বা পাথর বসানো হতো কেবল তার সামান্য একটু অংশ নিচের ইটের বা পাথরের চেয়ে একটু বাড়ানো থাকত কিন্তু আলোচ্য সময়ে ইট বা পাথরগুলোকে পাশাপাশি না বসিয়ে কোণাকুণিভাবে সাজিয়ে খিলান তৈরি হতো যার নাম প্রকৃত খিলান (True Arch)। এই খিলান ও গম্বুজ সুলতানী স্থাপত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। পঞ্চমত, সুলতানী আমলে স্থাপত্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা রংয়ের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচের ন্যায় মসৃণ টাইল্স ও ইট ব্যবহার করা হয়। ষষ্ঠত, ছাদের গম্বুজের পাশে ছোট কক্ষের ন্যায় কক্ষ তৈরি করা হয়।[১৬৮] সুলতানী আমলে স্থাপত্য তৈরিতে এই ছয়টি কৌশল বা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সুলতানী আমলে স্থাপত্য নির্মাণে নতুন প্রযুক্তি খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার শুরু হয়। এ পদ্ধতি তারা সাসানীয় স্থাপত্য থেকে গ্রহণ করেছিল। এই সময়েই নানা রকমের ও নানা আকৃতির মিনা করা টাইল্স ও ইটের ব্যবহার শুরু হয়। তৎকালীন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে হুগলি জেলার ত্রিবেণী ও ছোট পাণ্ডুয়ায়। তেরো শতকে ত্রিবেনীতে জাফরখান গাজীর (১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ) মসজিদে টেরাকোটার ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা

[১৬৭] M RTarafder, *op.cit.*, p. 339; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp, 288-289 ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০
[১৬৮] A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, pp. 10-15; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, *মধ্যযুগ*, পৃ. ৩১০

মসজিদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মসজিদটিতে অনেকগুলো স্তম্ভ রয়েছে এবং উত্তরে আট ফুট উঁচু মোটা, খাটো ২১টি কারুকার্যখচিত স্তম্ভের ওপর 'বাদশাহ্-কি-তক্‌ত (badshah-ka-takht)' বা মহিলাদের বসবার মঞ্চ[১৬৯] তৈরি করা হয়েছিল-যা ছিল তৎকালীন বাংলার সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদটি উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন যার দেওয়ালের পাথরের গায়ে বিভিন্ন রকম চিত্র, নকশা খোদিত আছে। এছাড়া গৌড়ের বড় সোনা মসজিদটিতেও নুসরাত শাহ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে একটি কক্ষ তৈরি করেন অনেকটা আদিনা মসজিদের বাদশাহ্-কি-তক্‌ত এর (ladies gallary) মতো।[১৭০] স্থাপত্য ছাড়াও বিভিন্ন প্রযুক্তি লক্ষ করা যায় সমাধি সৌধগুলোতে যেমন গৌড়ের আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সমাধির গায়ে ইটের তৈরি মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা নকশা এবং নীল ও সাদা রংয়ের মসৃণ টালি ব্যবহৃত হয়েছিল। মসজিদ বাদ দিলেও তোরণ কক্ষ বা মিনার সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।[১৭১] অর্থাৎ এ সময়ের স্থাপত্যের বিশেষ দিক ছিল যে, এ সময় ছাদ-গম্বুজ প্রভৃতির পলেস্তরা দেওয়ার জন্য চুনের বিশেষ ব্যবহার ছিল। স্থাপত্যে উজ্জ্বল টালির ব্যবহার বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছিল। গম্বুজ, টালির ব্যবহার ও চুনের ব্যবহার ছিল সুলতানী শাসনের সবচেয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

শিল্পনির্ভর পেশাজীবী

বাংলার শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা পেশাজীবী শ্রেণির বিকাশ ঘটে। বস্ত্রশিল্পের সাথে অনেক লোক সংযুক্ত ছিল। মুসলিম শাসনের পূর্বে সামাজিক বৈষম্য বিরাজমান থাকায় বস্ত্রশিল্প কারখানায় উৎপাদনে সীমাবদ্ধতা ছিল। সুলতানী বাংলায় শাসকগোষ্ঠীর উদারনৈতিক শাসনে সামাজিক বৈষম্য পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায় ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শিল্পী ও কারিগররা একত্রে কাজ করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে মুসলিমরা হিন্দু যুগের শিল্পীদের নিপুণতাকে কাজে লাগিয়ে বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করে। আলোচ্য সময়ে শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পী কারিগরদের সমাজে নতুন নতুন জাতি ও জাতি শাখার জন্ম হয়েছিল। এ সময়ে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বস্ত্র উৎপাদনের জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণে নতুন পেশাগত শ্রেণি তৈরি হয় যাদের জোলা/জুলাহা (তাঁতি যারা কাপড় বোনো) বলা হতো।[১৭২] সময়ের ব্যবধানে তাঁতশিল্পে- নিপুণ কাপড় তৈরি, মাকু, স্পিনিং, সুতা পেঁচানো, ডিজাইন করা প্রভৃতি কাজের জন্য শিল্পীর বিভিন্ন জাত ও উপজাত তৈরি হয়েছিল।[১৭৩] একশ্রেণির তাঁতির কাজ

---

[১৬৯] A.H. Dani, *op.cit.*, pp. 10-15

[১৭০] Abid Ali Khan, *op.cit.*, pp. 47, 82, 127; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০-৩১১

[১৭১] Muhammad Mohar Ali, *op.cit.*, pp. 937-938

[১৭২] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society*, pp. 74-75; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 325-326

[১৭৩] M R Tarafder, *op.cit.*, p. 76

ছিল শুধু ধুনন যন্ত্র দিয়ে সুতা ফেটা বা ধুনন করা। যারা সুতা কাটত, তারা সুতা কাটুনি বলে আলাদা শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। শুধু সুতা কাটার কাজে ও বস্ত্র বয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ কারিগরি নৈপুণ্যের কারণে তাঁতিদের মধ্যে জাতি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকার বস্ত্র তৈরি হতো জাতি শাখার হাতে। যেমন- তুলা পেঁজা, সুতা কাটা, সুতা কুণ্ডলী করা, সেই কুণ্ডলী খুলে পুনরায় কুণ্ডলীর আকার দেওয়া বিন্যস্ত করা, সুতার শুভ্রকরণ, রং লাগানো, কাপড়ে নকশা তোলা, চিত্রাঙ্কন ফুটিয়ে তোলা, এ জাতীয় সব কাজ স্বতন্ত্র তাঁতিরা করত।[১৭৪] মূলত বস্ত্র বয়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের বিন্যাস ছিল সবচেয়ে জটিল কাজ। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বস্ত্র বয়নে বহু শিল্পী কারিগর যুক্ত হয়ে বয়নের কাজ করত। মসলিন বস্ত্র বয়নের দীর্ঘ সময় ব্যয় হতো। বাংলার কারিগরগণ অনেক দক্ষ ছিল। মমতাজুর রহমান তরফদার উল্লেখ করেন যে,

> কাশিমবাজার, মালদাহ এলাকার তাফতা বা উজ্জ্বল মোচড়ানো রেশমিবস্ত্র, বিভিন্ন রেশম পোকা থেকে তৈরি তসর ও মুগা হুগলি অঞ্চলের একরঙা রেশমের পটে তৈরি বিচিত্র সূচিকার্যের নকশী কাথা বিখ্যাত ছিল। এছাড়া মসলিনের ওপর চেইনের ডিজাইনের একটানা রেশমি সুতায় সূচিকর্মযুক্ত কাজ সুতিবস্ত্রে ঢাকাই চিকন নকশি কাথা এবং ঢাকাই মসলিনসহ অন্যান্য সাধারণ সুতিবস্ত্রের সাথে জড়িত বুনন কাজের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে এ সকল বস্ত্র তৈরির প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই কারিগরদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস ঘটে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি শাখার সৃষ্টি হয়।[১৭৫]

উল্লেখ্য যে, চৌদ্দ শতক থেকে ষোলো শতক পর্যন্ত সময় ছিল শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির ও বাণিজ্য বিস্তারের যুগ। এ সময়ে তুলা পেজা, সুতা কাটা, বস্ত্র বয়নের জন্য বেশি লোক যুক্ত হয়। একই সময়েই ধুনরী নামে আলাদা পেশার লোক যুক্ত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। ধুনরীদেরকে যদিও মন্দ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থগুলোতে দেখা যায় জোলা, রংরেজ, সানাকার, সরাক প্রভৃতি শ্রেণিপেশার লোক ছিল মুসলিম কারিগর। এককথায় বলা যায় যে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটায়। এই বস্ত্র বয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পেশাগত নৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে নানা শ্রেণির শিল্পী কারিগরদের জাতি গঠন হয়েছিল।

বাংলার নারীরাও রং তুলির কাজে যুক্ত ছিল। তুলি ব্যবহার করে তারা কাপড়ের বিভিন্ন নকশার মাঝে রং দিয়ে চিত্র ফুটিয়ে তুলত। নারী কারিগরকে পাটের শাড়ি রং করতে দেখা যায়।[১৭৬] আলোচ্য সময়ে

---

[১৭৪] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society*, p. 76

[১৭৫] মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, পৃ. ১৫-১৬

[১৭৬] মুহাম্মদ কবির বলেন, রঙ্গিয়া পটের শাড়ি কমলা সুন্দরী। অর্থাৎ- সুন্দরী কমলা পাটের শাড়ি রঙিন করে। মুহাম্মদ কবির বিরচিত, *মনোহর মধুমালতি*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১

কাঠের ব্লকে প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফল, ফুল বা প্রাণী চিত্র খোদাই করে তা দিয়ে কাপড়ে নকশা তোলা হতো। শিহাবউদ্দিন আল উমরি উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কারখানায় সোনা বা রূপায় কারুকার্যখচিত এবং হাতে সেলাইয়ের মাধ্যমে নকশা করা পোশাক প্রস্তুত হতো। অভিজাতশ্রেণির পছন্দের কিছু দ্রব্যাদি রাজকীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে তৈরি হতো।[১৭৭] তেরো ও চৌদ্দ শতকে বড় বড় শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত না হলেও কৃষিজ পণ্যদ্রব্যাদি কেন্দ্রিক বাজার অর্থনীতির শুরু এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে শিল্পদ্রব্যাদির পরিমাণ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১৭৮] যেখানে অধিক সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে রংয়ের কাজে ব্যবহার করা হতো গাছের ক্ষার, যা গ্রামেই তৈরি করা হতো এবং এসব কাজে দক্ষ আলাদা শ্রমিক কাজ করত। নীল শিল্পের ক্ষেত্রেও নতুন প্রযুক্তি পাতন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। জিপসাম ও চুন দিয়ে এক ধরনের চৌবাচ্চা বানানো হতো যাতে নীল গাছ ডুবিয়ে রেখে নির্যাস বের করা সম্ভব হতো। ইতোপূর্বে ছোট পাত্রে নীলের নির্যাস উৎপন্ন করা হতো। ফলে এ সময়ে বাংলায় নীলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৭৯] মুদ্রাব্যবস্থা বাংলার গ্রামীণ জীবনেও প্রবেশ করেছিল এবং এই মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত বাংলার পোদ্দার শ্রেণি। পোদ্দাররা গ্রামীণ সমাজের সাধারণ জনগনকে মুদ্রা বিনিময়ে সাহায্য করত। জাহাজ নির্মাণে, স্থাপত্য শিল্পে, মৃৎশিল্পে সাথে অনেক লোক যুক্ত ছিল। মাদুর তৎকালীন বিলাস পণ্যের তালিকায় স্থান লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যে লোহিতপাটি/লাল মাদুর ও শীতলপাটি/ঠাণ্ডা মাদুর সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৮০] এসব কুটির শিল্পের সাথে কিছু লোক জড়িত ছিল। বাংলার শিল্পনির্ভর এসব পেশাজীবীরা মোটামুটি ভালো অর্থই আয় করত। তবে সাধারণ কারিগর ও শ্রমিক থেকে অভিজ্ঞ কারিগর শ্রেণির পেশাজীবী বেশি উপার্জন করত।

উল্লেখ্য যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলার যে অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে মোগল সম্রাট আকবরের সময়েও তা অব্যাহত ছিল। মানুষের হাতে অর্থ আসায় তাদের জীবনমানও পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়। কুটির শিল্পকারখানায় কর্মরত কারিগর ছাড়াও এ সময়ের সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ছিল সুতার মিস্ত্রী, বাঁশ-কাটারু, ঘরামী, সাধারণ রাজমিস্ত্রীসহ এই ধরনের বহু কারিগর। তৎকালীন সময়ে এসব শ্রমিকগণও ন্যায্যমূল্য পেতো এবং তাদের পারিশ্রমিক ছিল নিম্নরূপ।[১৮১]

---

[১৭৭] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 325-326
[১৭৮] *Ibid*
[১৭৯] Irfan Habib, *op.cit.*, p. 26
[১৮০] Momtazur Rahman Tarafder, *Husain shahi Bengal*, p. 157
[১৮১] Abul Fazl, *op.cit.*, vol, 1, pp. 235-236

শ্রমিকদের শ্রেণি	প্রথম শ্রেণি মূল্য	দ্বিতীয় শ্রেণি মূল্য	তৃতীয় শ্রেণি মূল্য
গিলকার (যারা চুনকাম করে)	৭ দাম	৬ দাম	৫ দাম
গাঙ্গ তারাস (পাথর কাটার কাজ করে)	৬ দাম (গজ প্রতি)	৫ দাম	-
বিলদার (রাজমিস্ত্রি)	৩.৫ দাম	৩ দাম	২.৫ দাম
কাঠ মিস্ত্রি	৭ দাম	৬ দাম	৪ দাম
চাপকান (কূপ খননকারী)	২ দাম	১.৫ দাম	১.৫ দাম
ঘট-খুড়	৪ দাম (শীতকাল)	৩ দাম (গরম কাল)	-
কিস্ত তারাস (টালি প্রস্তুতকারী)	৮ দাম (একশত ছাচের জন্য)	-	-
কাচ কাটারু	১০০ দাম (দৈনিক)	-	-
বাঁশ কাটারু	২ দাম (দৈনিক)	-	-
ছাপ্পর বন্দ (ঘরামী)	৩ দাম	২৪ দাম (১০০ গজ কাজের জন্য)	-
আকবাশ (পানিবাহক)	৩ দাম	২ দাম	-

প্রদত্ত ছকের তথ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সুলতানী আমলেও শ্রমিকদের অনুরূপ পারিশ্রমিক ছিল। এখানে সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির মজুরি ছিল চাপকানের এবং এই তৃতীয় শ্রেণির শ্রমিকের দৈনিক মজুরির হার ছিল ১.৫ দাম। ১.৫ দাম হিসেবে তার মাসিক আয় ছিল ৪৫ দাম (৩০ দিনে) এর অর্থ দাঁড়ায় বছরে ৫৪৭.৫= ৫৮৪ দাম (৩৬৫ দিনে)। ৪০ দাম=১ টাকা[১৮২] হলে ১ জন চাপকানের পরিবারে যদি সর্বমোট ৬ জন সদস্য থাকত। তবে তাদের খাদ্যদ্রব্য, কাপড় চোপড় সন্তানের ও অন্যান্য সব রকমের খরচ হিসাবে করলে তার বাৎসরিক সর্বমোট ব্যয় ৮ টাকার বেশি হতো না। সেদিক থেকে দেখলে এটা বোঝা যায় যে, সারা বছরের বাৎসরিক খরচ বহনের পরও একজন চাপকান বছরে ৫ টাকা থেকে ২৮ দাম সঞ্চয় করতে পারত। সুদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির হার আরও বেশি হওয়ায় তাদের বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ আরোও বেশি হতো। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে একজন দাসীর বাজার করার চিত্র থেকে দেখা যায় সাধারণ মানুষ ভালোভাবেই জীবনযাপন করত। দুর্বলা দাসী ৫০ কাহন কড়ি নিয়ে বাজারে যায় এবং সেই কড়ি দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করে। যেমন- লাউ, কুমড়া, আম, চিংড়ি, বোয়াল, চিতল মাছ, সরিষার তেল ও একটি ছাগী।[১৮৩] ইবনে বতুতার বিবরণেও আমরা পণ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্য লক্ষ করি। সম্পদের প্রাচুর্য ও দ্রব্যমূল্য সস্তা ছিল তাই এসব শ্রমিকশ্রেণির এবং অপরাপর সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রার মান খুব একটা খারাপ ছিল না বলেই আমরা ধারণা করতে পারি।

[১৮২] Edward Thomas, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, p. 227, উদ্বৃতি, N K Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, p. 144

[১৮৩] মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, পৃ. ১৫৫-১৫৬

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ মুদ্রার প্রচলন করেন। এসব মুদ্রা প্রচলনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। সুলতানগণ কর্তৃক মুদ্রা জারি করায় বাংলায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এছাড়া শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় অভিবাসীদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে এবং নগরায়ণের বিকাশ ঘটে। আলোচ্য সময়েই বাংলায় প্রথম নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কৃষিকাজে স্বল্প পরিসরে সেচব্যবস্থা চালু হওয়ায় কৃষিজ উৎপাদনও বেড়ে যায়। এই সময় চরকার ব্যবহার শুরু হয় ফলে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বাংলায় বিভিন্ন নামে ও নানান রঙের কাপড় তৈরি হতো যা বিদেশি পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় কাগজের ব্যবহার চালু হয় এবং শিক্ষার প্রসার ঘটে। কাগজের ব্যবহারে অফিস আদালতে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। শিল্পকারাখানায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগ ও পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির জন্য বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় স্থাপত্য শিল্পে টালি, ইট, সুরকির ব্যবহার করা হয়। চিত্রশিল্পেও ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্পকারখানার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণ কারিগরদের হাতে অর্থ আসায় তাদের জীবনযাপনের ওপর প্রভাব পড়ে। যেমন- বস্ত্রশিল্পে নতুন প্রযুক্তি চরকার ব্যবহারে বস্ত্র উৎপাদন বেড়ে যায় এবং অনেক লোক এসব শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক নতুন পেশার জন্ম হয়। এ সময়ে বাংলার সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু না হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ধরনের সুতিবস্ত্র, রেশম, চিনি, চাল প্রভৃতি পণ্য রপ্তানি হয়ে আসছিল। যা বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করতে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছিল। এককথায় বলতে পারি মুসলিম শাসনাধীনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্পজাতপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বের তুলনায় বাংলার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার প্রযুক্তি ও শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কোনো জাতির সভ্যতার ইতিহাসে তার ধাতু নির্মিত মুদ্রার প্রচলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যে সমাজ অর্থনৈতিক ব্যাপারে যত বেশি সুবিন্যস্ত, সুনিয়ন্ত্রিত, সে সমাজে মুদ্রার প্রচলন তত বেশি। মুদ্রা বিনিময় নির্ভর অর্থনৈতিক জীবনকে সভ্যতার অন্যতম দ্যোতক বলে মনে করা হয়। বহুযুগ ধরে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে মুদ্রার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মুদ্রা প্রচলনের প্রাথমিক যুগে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল। সময়ের পরিক্রমায় ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি, মুদ্রার মান এবং নির্মাণ কৌশল আরো উন্নত হয়েছে। প্রাচীন যুগে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, গুপ্ত ও পাল আমলের মুদ্রা আবিষ্কৃত হলেও সেনামলের কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। এই নদীয়া/গৌড় বিজয় মুহাম্মদ ঘুরির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই ইবনে বখতিয়ার খলজি ঘুরির নামে স্মারক স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন।[১] পরবর্তী শাসকগণও এরই ধারাবাহিকতায় মুদ্রা জারি করেন। সুলতানী শাসনামলে মুদ্রা প্রচলনের পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটে যা বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল। এছাড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঋণ ও জমার সুবিধাসহ সব ধরনের সুযোগ বিদ্যমান ছিল। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে ঐক্যসাধন, তীর্থযাত্রা, পরিব্রাজক, বণিক ও ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। মূলত মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার সম্প্রসারিত ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবসায়ী, বণিকদের আরো একধাপ অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল। সুলতানগণ নতুন নতুন টাকশাল স্থাপন করে মুদ্রা জারি করেন। বাংলায় তিন রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং এই মুদ্রা তৈরির সাথে নানা কারিগর ও পেশাজীবী শ্রেণি যুক্ত ছিল। মুদ্রা তৈরির সাথে যুক্ত থাকায় এসব কারিগর শ্রেণি অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি পারিশ্রমিক পেতো। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ছিল বড় বড় বণিক, মহাজন এবং আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশালী পরিবার। এসব পরিবারগুলো উত্তরাধিকারসুত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম

---

[১] Minhaj–I-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, pp. 575-576

পরিচালনা করত, সমাজে অনেক বেশি সম্মানিত ছিল এবং তাদের প্রত্যেকটি পরিবার ছিল এক একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আলোচ্য অধ্যায়টি দুটি অংশে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অংশে সুলতানী বাংলার মুদ্রা ও মুদ্রা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় অংশে বাংলার ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুলতানী বাংলার মুদ্রা

মুদ্রা প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামক। প্রাক-মোগল বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।

মুদ্রা

ইংরেজি coin শব্দের বাংলা পরিভাষা মুদ্রা। coin শব্দটি ল্যাটিন শব্দ cuneus (কিউনিওস)। coin-এর সংজ্ঞায় *Webster's New Collegiate Dictionary* তে বলা হয়েছে যে- a flat (usually) round piece of metal issued by Governmental authority as money.[২] সাধারণভাবে বলা যায়, মুদ্রা হলো স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি এমন একটি নির্দিষ্ট খণ্ডকে বোঝায়, যার আকৃতি, পরিমাপ, সুনির্দিষ্ট এবং যাতে প্রশাসন ক্ষমতা কর্তৃক বিশুদ্ধতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে প্রতিকৃতি, নমুনা, চিহ্ন, ব্যবহৃত হয়। মুদ্রার প্রচলন কখন, কোথায় শুরু হয়েছে সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে লিভীয় জাতি সর্বপ্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন।[৩] আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় বলে ঐতিহাসিকগণ একমত প্রকাশ করেছেন।[৪] ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসকগণ সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবায় নিজের নাম উল্লেখ করতেন এবং স্বনামে মুদ্রা জারি করারও প্রচলন ছিল। সুলতানী শাসনামলের মুদ্রা তিন শতাব্দীর বেশি সময় বাংলাতে চালু ছিল এবং এর প্রভাব মোগল মুদ্রা ব্যবস্থায়ও পড়েছিল। এদেশে প্রচলিত মুদ্রাগুলো ছিল একক ধাতুর রৌপ্য মুদ্রা (monometalic), কিছু কিছু স্বর্ণমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রারও প্রচলন ছিল। আলোচ্য সময়ে বাংলায় তিন শ্রেণির মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মুদ্রার পাশাপাশি কড়িরও প্রচলন ছিল। মুদ্রাগুলো হলো– স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা।

---

[২] *Webster's New Collegiate Dictionary,* A Merriam Webster, U.S.A, 1973, p. 216

[৩] Stanley Lane Poole (ed.), *Coins and Medals in History and Art.* Chicago, Argonaut, INC, Pub. 1968, p.6

[৪] এ. কে. এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫

সুলতানী আমলের স্বর্ণ মুদ্রা

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বর্ণ মুদ্রা চালু করেন কুষাণ সম্রাটগণ। ধারণা করা হয় সম্রাট বীম কদফিসেসই প্রথম স্বর্ণ মুদ্রা জারি করেন। পরবর্তীতে সম্রাট কনিষ্ক ও হুবিষ্ক তাদের স্বর্ণ মুদ্রায় নানা নকশা ও প্রতীক ব্যবহার করেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পাল আমলের কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হলেও সেনামলের কোনো স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়নি। পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা উৎকীর্ণ স্বর্ণ মুদ্রার সংখ্যাও কম। সুলতানী শাসনামলের প্রথম স্বর্ণ মুদ্রা জারি করেন ইবনে বখতিয়ার খলজি। এই সময়ে দিল্লির সুলতান ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.) এবং সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬ খ্রি.)। এছাড়া খলজি বংশের পরবর্তী শাসক আলী মর্দান খলজিও (১২০৪-১২১১ খ্রি.) স্বর্ণ মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। তাঁর জারিকৃত এই মুদ্রার ওজন ছিল মাত্র ২.২৬ গ্রাম। মুদ্রার উভয় পিঠে অশ্বারোহীর ছবি অঙ্কিত ছিল। সুলতান গিয়াউদ্দিন বাহাদুর শাহের (১৩১০-১৩২৩ খ্রি.) স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। স্বাধীন সুলতানগণের মধ্যে ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁও টাকশাল থেকে স্বর্ণ মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। সুলতান মোজাফফর শাহ ৮৯৬ হিজরিতে স্বর্ণ মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর রাজত্বের শুরুতে ৮৯৯ হি. ৯০৫ হি. ৯০৭ হি. ও ৯১৯ হিজরিতে স্বর্ণ মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। সুলতান নুসরাত শাহ তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের বছরেই ৮২২ হিজরিতে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন। পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরন থেকে আমরা স্বর্ণ মুদ্রায় দাস-দাসী ক্রয়ের প্রমাণ পাই। বাংলায় প্রচলিত এসব স্বর্ণ মুদ্রা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুপ্ত শাসকদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমার গুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত প্রথম স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করেন ১২০ গ্রেন ওজনের। কুমার গুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১২৭ গ্রেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের (৬০০-৬৩৫ খ্রি.) স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ৯০ গ্রেন।[৫] সুলতানী বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ে মুদ্রার ওজন ছিল ১২ গ্রাম এবং পরে তা বদলে গিয়ে ওজন দাঁড়ায় ১০.৪ থেকে ১০.৮ গ্রাম। ইবনে বখতিয়ার খলজির স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১৭২ গ্রেন। সুলতান ফকরউদ্দিন মোবারক শাহের স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১৬৮.৮২ গ্রেন। শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের মুদ্রার ওজন ১৬৬ গ্রেন, জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের মুদ্রার ওজন ১৬০ গ্রেন ও ১৬৮ গ্রেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ খাজানাহ নামক স্থান থেকে ১৫৯ গ্রেন ও ১৬৬ গ্রেনের মুদ্রা জারী করেন। জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের স্বর্ণ মুদ্রার ওজন ছিল ১৬৩ গ্রেন। মুজাফফর শাহের মুদ্রার ওজন ১৬২ গ্রেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মুদ্রার ওজন ১৫৯

[৫] রণবীর চক্রবর্তী, “কড়ি” *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩০

গ্রেন, ১৬২ গ্রেন, ১৬৩.৫ গ্রেন, ১৬৪.৩৩ গ্রেন, ১৬৪. ৫ গ্রেন ও ১৭৬.৪ গ্রেন। ১৬৩.৪০ গ্রেন ছিল সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের স্বর্ণ মুদ্রার ওজন।[৬] শেরশাহের সময়ে মুদ্রার ওজন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১ গ্রাম। আফগান ও মোগল শাসকরা শেরশাহের পদ্ধতি অনুসরণ করে।

বাংলার রৌপ্য মুদ্রা

স্বর্ণ মুদ্রা ছাড়াও বাংলার সুলতানগণ প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। প্রাচীন বাংলার হরিকেল (চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চল) ও পট্টিকের (কুমিল্লা) অঞ্চলে সপ্তম ও অষ্টম শতকে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। হরিকেল রৌপ্য মুদার ওজন ছিল ৮ গ্রাম। পালযুগের ধাতবমুদ্রার ওজন ৮ গ্রাম। পালযুগের ধাতবমুদ্রা আবিষ্কৃত হলেও সেনযুগের কোনো ধাতবমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। একই ধারায় মুদ্রা তৈরি হতো এবং মুদ্রার ভাষা ছিল আরবি। তবে আলোচ্য সময়ে বাংলার শাসকগোষ্ঠীর যত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল রৌপ্য মুদ্রা এবং প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার নাম ছিল তঙ্কা।[৭] সুলতান ইওজ খলজির (১২১০-১২২৭ খ্রি.) রৌপ্য মুদ্রার ওজন ছিল ১ তোলা।[৮] মুদ্রা বিশেষজ্ঞ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে ২২ জন শাসকের ৩৪৬ টি রৌপ্য মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৯] বাংলার রৌপ্য মুদ্রার সবচেয়ে বড় তালিকা দিয়েছেন মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ আব্দুল করিম। তিনি ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ থেকে শুরু করে মাহমুদ শাহ পর্যন্ত ২৯ জন শাসকের মুদ্রা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১০] রৌপ্য মুদ্রাগুলো সাধারণত গোলাকৃতি। মুদ্রার ভাষা আরবি এবং তবে কিছু কিছু মুদ্রায় ফার্সি লিপিও উৎকীর্ণ করতে দেখা যায়।

তাম্র মুদ্রা

বাংলায় প্রচুর কুষাণ তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন কুষাণ তাম্র মুদ্রার অনুকরণেই বাংলায় তাম্র মুদ্রা প্রচলন করা হয়। মূলত প্রাচীন তাম্র মুদ্রা ছিল ঢালাই করা সীলমোহর মুদ্রিত মুদ্রা। পাল আমলের তিনটি তাম্র মুদ্রা পাওয়া যায়। মহাস্থানগড় (বগুড়া), বানগড় (দিনাজপুর), চন্দ্রকেতুগড় (২৪ পরগণা) প্রাপ্ত এর প্রমাণ। সুলতান ইলতুৎমিসের সময় ভারতে তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিল। বাংলার

---

[৬] Abdul Karim, *op.cit.*, pp. 118-126
[৭] Ma Huan, *op.cit.*, p. 161
[৮] N.K Bhattasali, *op.cit.*, pp. 32-33
[৯] *Ibid.*, p. 7
[১০] Abdul Karim, *op.cit.*, pp. 03-133

শাসকগণের খুব কম তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সুলতান বারবক শাহ, নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ এবং গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের তাম্র মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েছে। সুলতান শেরশাহের তাম্র মুদ্রার নাম ছিল পয়সা।[১১]

বিনিময়ের মাধ্যম কড়ি

স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ছাড়াও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বাংলায় কড়ির প্রচলন ছিল। কড়ি শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Shell-money. কড়ির আরেকটি নাম কপর্দক। ভারত মহাসাগর থেকে শুরু করে আফ্রিকার মোজাম্বিক অঞ্চল পর্যন্ত সীমানায় কড়ি পাওয়া যেতো। মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্ণিও অঞ্চল থেকে উন্নত মানের কড়ি বাংলায় আমদানি করা হতো। যদিও পাইকারি হিসেবে এগুলো ক্রয় করা হতো এবং বাংলায় ও আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে এই কড়ি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাংলার ন্যায় উড়িষ্যায়, আরাকানে, পেগুর অন্তর্গত বার্তাবান বন্দরে কড়ি মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল। বাংলায় প্রচলিত কড়িগুলো ছিল অনেক বড়। প্রত্যেকটি কড়ির মাঝখানে থাকত একটি হলুদ রঙের ডোরা। বাংলায় ও উড়িষ্যায় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা যেমন ব্যবহৃত হতো তেমনি কড়িও ব্যবহৃত হতো। কড়ি আসত মালদ্বীপ থেকে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বাংলায় কড়ির বহুল প্রচলন ছিল বলে প্রচুর কড়ি আমদানি করা হতো।[১২] বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যদিও কড়ি ধাতব মুদ্রার উপযোগী ছিল না। স্থানীয় পর্যায়ে লেনদেনে কড়ি ব্যবহৃত হতো।[১৩] পঞ্চদশ শতকের পর্যটক মাহুয়ান বাংলায় কড়ি প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন।[১৪] সুলতানী শাসনাধীনে তংকার পাশাপাশি কড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কড়ি কয়েকটি দেশ থেকে আমদানি করা হতো। মালদ্বীপে ৪০ থেকে ৪২ পণ কড়ি বিক্রি হতো ৬ থেকে ৭ আনায়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৮০ কড়িতে = ১ পণ এবং ১৬ আনায় = ১ রুপি। আরো একটি হিসেবে দেখা যায় যে, মালদ্বীপে ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ কড়ি ক্রয় করা হতো ১ রুপিতে। এই কড়িই বাংলায় কিংবা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রি হতো ২৫০০ থেকে ৩২০০ কড়ি মাত্র ১ রুপিতে।[১৫]

---

[১১] Edward Thomas, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, p. 409

[১২] Toma pires, *op.cit.*, vol, 1, pp. 93-95

[১৩] R S Sharma, *Urban Decay in India (c.300-c.1000)*, New Delhi, 1987, p. 124

[১৪] Ma Huan, *op.cit.*, p. 161

[১৫] হারুন অর রশিদ সিকদার, *সুলতানী বাংলার মুদ্রা ও টাকশাল*, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৬৯

আলোচ্য অধ্যায় ছাড়াও প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার্থে ব্যবসায়-বাণিজ্য অধ্যায়েও কড়ির হিসেব দেখানো হয়েছে। ভাস্করাচার্যের (১১১৪ খ্রি.) *লীলাবতী* গ্রন্থের একটি আর্যা রয়েছে, যেখানে কড়ির সংখ্যা ও লেনদেনে বিনিময়ের তথ্য পাওয়া যায়।

২০ কড়ি = এক কাকিনী

৪ কাকিনীতে = ১ পণ

১৬ পণে = ১ দ্রক্ষ (রৌপ্য মুদ্রা)

১৬ দক্ষ = ১ নিষ্ক

১ নিষ্ক = ১ দিনার

১৬ নিষ্ক = ১ দিনার

১৬ দ্রক্ষ = ১৬ রূপক।[১৬]

বাংলায় প্রচলিত কড়ির হিসেব পদ্ধতি আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে–

৪ কড়ি = ১ গণ্ডা

৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি

৪ বুড়ি = ১ পণ

১৬/২০ পণ = ১ খায়ান (কাহন)

১০ কাহন = ১ টাকা।[১৭]

এই তথ্য থেকে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসনে যেমন কড়ির ব্যবহার ছিল তেমনি ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত কড়ির ব্যবহার অব্যাহত ছিল।

ঐতিহাসিক এবং পর্যটকদের বিবরণ ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কড়ি ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে। স্থানীয় হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে দুর্বলা দাসীকে কড়ি দিয়ে বাজার করতে দেখা যায়। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে– দুর্বলা দাসী ৫০ কাহন কড়ি নিয়ে বাজার করেছিল।[১৮] সাধারণ মানুষ দান করতে কড়ি ব্যবহার করত।

কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি

গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি।[১৯]

---

[১৬] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

[১৭] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p. 138

[১৮] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীকাব্য*, পৃ. ১৫৫-১৫৬

[১৯] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কালকেতু উপাখ্যান*, পৃ. ৯৫

মুসলমান মোল্লা মোরগ জবাই করে ১০ গণ্ডা ও বকরি জবাই করে ৬ বুড়ি কড়ি পেতো।[২০] ব্যবসায়ীরা কড়ি দিয়ে কেনাকাটা করত। *কালকেতু উপাখ্যানে* তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধনের পাইয়া আঁশ আশিতে বীরের পাশ

ধায় বাণ্যা খিড়কির পথে।

মনে বড় কুতুহলি কান্ধেতে তঙ্কার থলি

হড়পি তরাজু করি থাতে।[২১]

গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারে কড়ির ব্যবহার বেশি ছিল। তবে কবির বর্ণনা থেকে দেখা যায় থলে ভর্তি তঙ্কা নিয়ে বাজার করছে। অর্থাৎ গ্রামের হাটেও তঙ্কার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সুলতানী আমলের নতুন প্রযুক্তি ছিল মুদ্রা তৈরিতে ছাঁচের ব্যবহার। মুদ্রা তৈরির জন্য প্রথমে ছাঁচ তৈরি করা হতো। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রযুক্তি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রথমে ধাতুকে পরিশুদ্ধ করে মুদ্রা তৈরির উপযোগী করা হতো। মুদ্রা তৈরিতে ২১ শ্রেণির কর্মচারী যুক্ত ছিল।[২২] এরপর ধাতুতে খাঁদ মিশ্রিত করে গরম করে নির্দিষ্ট ওজনে টুকরা করে কেটে ছাঁচের ওপর রাখা হতো। ছাঁচে রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা হতো। তৈরীকৃত মুদ্রার ওপর খোদাই করে শাসকের নাম, প্রতীক চিহ্ন অঙ্কিত হতো। মোগল শাসনামলে বানওয়ারী, সারাফ প্রভৃতি পদবিধারী লোক টাকশালে নিযুক্ত করা হতো। (পরিশিষ্ট-৫) তাদের দেখাশোনার জন্য দারোগা পদবিধারী কর্মকর্তা (Mint Master) থাকত বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। মুদ্রা সরবরাহ, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি সরকারি তত্ত্বাবধান করা টাকশাল অধিকর্তার দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল। উল্লেখ্য যে এই বিষয় সম্পর্ক আমরা প্রযুক্তি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ত্রয়োদশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে মুদ্রার ব্যবহার কম হলেও মুদ্রার সংগ্রহশালা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে প্রায় সকল শাসক প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা জারি করেন। মুদ্রার ধাতুমূল্যই ছিল মুদ্রার মূল্যমান। অর্থাৎ এক টাকায় এক টাকার সমপরিমাণ রূপা পাওয়া যেতো।

[২০] মোল্লারা তাদের কাজে বিনিময়ে কড়ি নিতো এর প্রমাণ পাওয়া যায়–

করে দরি খর ছুরী কুঁকুড়া জবাই করি।

দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।

বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা

দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কালকেতু উপাখ্যান*, পৃ. ৯৩

[২১] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কালকেতু উপাখ্যান*, পৃ.৬৭

[২২] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, p. 134

সাধারণত অর্থ ব্যবস্থায়, বাজার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় দ্বারা মুদ্রা ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। মুদ্রা ব্যবস্থার জন্যই কেন্দ্রীয় কোষাগারকে খাজানাহ বা খাজাঞ্চিখানা বলা হয়। মুদ্রা তৈরির পর খাজানাহ বা খাজাঞ্জিখানায় জমা রাখা হতো। বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৫-১৪৩৬ খ্রি.) মুদ্রায় খাজানাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া সুলতান বারবাক শাহ, ইউসুফ শাহ, ফতেহশাহ, ফিরোজশাহ, সুলতান মোজাফফর শাহ, হোসেন শাহ, নুসরত শাহ এবং আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ প্রমুখ শাসকগণ খাজানাহ নামক স্থান থেকে মুদ্রা জারি করেন।[২৩] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গৌড় একদিকে রাজধানী শহর ছিল অন্যদিকে এখানে খাজানাহ অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থাকার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে ছিল। গৌড় ছিল প্রাচীর ঘেরা দুর্গ নগরী।[২৪]

সুলতানী আমলে বাংলায় ব্যাপক রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন থাকায় নগদ টাকায় ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য শুল্ক সংগ্রহ করা হতো। গ্রামগুলো মুদ্রার আওতায় চলে আসে। সারাফরা প্রতিটি শহরের প্রতিটি গ্রামের এমনকি প্রতিটি বাজারে মুদ্রা বিনিময়ের কাজে নিয়োজিত ছিল। টাকার বিনিময় ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সারাফগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল।[২৫] শেঠ বা সারাফগণ ছিলেন ব্যাংকের মালিক। তারাই টাকশালের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করত। সারাফগণ পুরানো ও খাদ মেশানো মুদ্রা আবার নতুন করে মুদ্রা তৈরির জন্য টাকশালে আনত। এছাড়াও তারা পুরাতন মুদ্রাকে নতুন মুদ্রায় তৈরি করার জন্য পুরাতন মুদ্রা কিনত। দেশের বিভিন্ন স্থানে টাকশাল থাকায় এবং সেসব টাকশাল থেকে মুদ্রা মুদ্রিত হওয়ায় বিভিন্ন মানের মুদ্রা বাজারে চালু ছিল। ফলে দেশীয় ব্যাংকারদের ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল।

আলোচ্য সময়ে মুদ্রাগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ও গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির মুদ্রায় জীবন্ত প্রাণীর ছবি অর্থাৎ ঘোড়ার ছবি লক্ষ করা যায়। এছাড়া আরবি লিপি ব্যবহারের পাশে স্বদেশি লিপি ব্যবহার করা হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকের কিছু মুদ্রা ছিল দ্বিভাষিক মুদ্রা। আরবি ভাষা ও নাখস লিপির সাথে প্রোর্টো বাংলা ও দেবনাগরী/গৌড়ীয় লিপি ব্যবহৃত হয়। শেরশাহের মুদ্রায় একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। শেরশাহ, ইসলাম শাহ এবং আদিল শাহ শুরের মুদ্রায় নাম সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও দেবনাগরী লিপির ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আফগান শাসকদের সময় এই ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। ইবনে বখতিয়ার

---

[২৩] Abdul Karim, *op.cit.*, pp. 108-118
[২৪] Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 58
[২৫] K.M Mohsin, *op.cit.*, p. 114

খলজির পর সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের মুদ্রায় সিংহের প্রকৃতির দেখা যায়।[২৬] সাধারণত মুদ্রায় সিংহ প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের ঐতিহ্য পরবর্তীতে অনুকরণ করেছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। সুলতান ফতেহশাহের মুদ্রায় সূর্য, সাতটি বৃত্ত এবং ছোট ছাতা নকশার প্রচলন করেন।[২৭] শাসকগোষ্ঠীর প্রচলিত যেসব মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে সেসব মুদ্রার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় একই বংশের সব শাসকের মুদ্রার মধ্যেও সামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেকেই নিজস্ব স্টাইলে মুদ্রা জারী করেন। মুদ্রায় বিভিন্ন লিপি অঙ্কন করা হতো সুলতানী শাসনামলের শাসকগণের জারিকৃত মুদ্রার মধ্যে ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের মুদ্রার লিপিকে বাংলার সুলতানী আমলের মুদ্রার শ্রেষ্ঠ লিপির নিদর্শন বলে নলিনীকান্ত ভট্টালাশী উল্লেখ করেছেন।[২৮]

মুদ্রা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

সুলতানী আমলে উৎকীর্ণ মুদ্রায় টাকশালের নাম ও তারিখের সাথে কোন স্থান থেকে তা মুদ্রিত হয়েছে সেই স্থানের নামও পাওয়া যায়। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে কামরূপ অঞ্চল জয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহের মুদ্রায় আরবি শব্দ 'চাওলিস্তান উরফ আরসাহ কামরু' যুক্ত করেন। শব্দগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসক কামরূপ ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কৃষি ভূমি যেখানে ধান উৎপন্ন হতো সেই সীমানা পর্যন্ত জয় করেন। এছাড়াও সুলতান মুজাফফর শাহ তাঁর মুদ্রায় 'কামতা মর্দান' বা কামতা অঞ্চল ধ্বংসকারী শব্দটি ব্যবহার করেন। হোসেন শাহী বংশের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কামরূপ জয় করেছিলেন। তাঁর বিজয় চিহ্নস্বরূপ উৎকীর্ণ মুদ্রায় 'আবু আল ফাতাহ কামতা ওয়া কামরু' ও 'আবু আল ফাতাহ কামতা ওয়া কামরু ওয়া জাজনগর' বাক্যটি উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া অন্য একটি মুদ্রায় 'আবু আল ফাতাহ কামরু ওয়া কামতা ওয়া জাজনগর ওয়া উড়িষ্যা' বাক্যটি উৎকীর্ণ করা হয়।[২৯] এ সময়ে বাংলার প্রতিবেশী প্রদেশগুলো আসামের কামতা অথবা কামতাপুর, কামরূপ অঞ্চল, জাজনগর বা জয়পুর এবং উড়িষ্যায় হোসেন শাহের রাজ্য সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া যায়। হোসেন

---

[২৬] Sutapa Sinha, "A New Light on the Significance of Lion Motif Appeared on Coins and on a single Inscription of the Sultans of Bengal." Journal of Bengal Art, 16, Dhaka, 2011, pp. 139-155

[২৭] সুতপা সিন্হা, " মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থা" আব্দুল মমিন চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, সুলতানি ও মোগল* (আনু. ১২০০-১৮০০ আনু.*)*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৯৭

[২৮] N.K Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultan of Bengal,* Cambridge, 1922, p. 147-161

[২৯] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, পৃ. ৩০৮; Sutapa Sinha, `Coins and Coinage System'*History of Bangladesh, Society Economy Culture,* ed. Abdul Momin Chowdhury, vol.2, Asiatic Society oF Bangladesh, 2020, p. 113

শাহী বংশের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নিজেকে বিজয় পিতা বা 'আবু আল ফাতাহ' হিসেবে ঘোষণা করেন। এই বংশের পরবর্তী তিন জন সুলতান নুসরাত শাহ, সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ এবং গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ 'ত্রিহুত মর্দান' বলে ঘোষণা করেন। এর অর্থ ত্রিহুত ধ্বংসকারী।[৩০] উত্তর বিহারের ত্রিহুতে তাদের সুদৃঢ় কর্তৃত্ব ঘোষণার জন্য মুদ্রায় এই শব্দ ব্যবহার করেন।

বাংলার সুলতানগণ মুদ্রা তৈরির জন্য বেশকিছু টাকশাল প্রতিষ্ঠিত করেন। টাকশাল একটি রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে মুদ্রা জারি করা হয়। বাংলা সালতানাত বিস্তারের সাথে সাথে শাসকগণ নতুন নতুন টাকশাল শহর স্থাপন করে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে টাকশালের সংখ্যা কম থাকলেও স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার পর টাকশালের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুদ্রার সাক্ষ্যে বাংলার ৩৭ টি টাকশাল শহরের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, স্বাধীন সুলতানী আমলের ২২ টি টাকশাল শহরের নাম আবিষ্কৃত হয়েছে। টাকশালগুলো হলো– লক্ষনৌতি, বারবকাবাদ, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, গিয়াসপুর, ফিরোজাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ, শহর-ই-নও, চাটগাঁও, ফতেহাবাদ, জান্নাতাবাদ, রোটাসপুর, মুজাফফরাবাদ, মুহাম্মদাবাদ, হোসনাবাদ, নুসরাতাবাদ, চন্দ্রাবাদ, খলিফাতাবাদ ও খলিফাতাবাদ বদরপুর প্রভৃতি।[৩১] বাংলার সুলতানী শাসকগণ স্থানীয় মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ করার জন্য টাকশালের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। এসময় রাজধানী ছাড়াও দেশের প্রশাসনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাকশাল স্থাপন করে মুদ্রা জারি করেন। টাকশালের নামের পূর্বে নানা রকম বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- প্রশাসনিক বিভাজন অর্থে ইকলিম, খিত্তা, আরসাহ, বালদাতুন প্রভৃতি। সাধারণত প্রদেশ, জেলা, অঞ্চল এবং শহর অর্থে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও স্থানের মর্যাদার্থে হযরত জালাল, রাজধানী অর্থে বালদাতুল মুয়াজ্জম, সম্মানিত শহর অর্থে বালদাতুল মাহরুসাহ সুরক্ষিত শহর প্রভৃতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

টাকশাল ছাড়াও দুটি স্থান থেকে মুদ্রা জারি করা হতো। বাংলায় টাকশালের বিকল্প হিসেবে মুদ্রায় দুটি নাম পাওয়া যায় যেমন- খাজানাহ ও দার-উল-যবর। ঐতিহাসিক ও মুদ্রা গবেষকগণ মনে করেন রাজধানীর কোষাগার বুঝাতে 'খাজানাহ' শব্দ ব্যবহৃত হতো। কোষাগার থেকে মুদ্রা জারি সম্ভবত

---

[৩০] Sutapa Sinha, `Coins and Coinage System'*History of Bangladesh, Society Economy Culture,* ed. Abdul Momin Chowdhury, vol.2, pp. 113-114

[৩১] Khan Sahib M. Abid Ali Khan, *op.ct.,* p. 41-42; Abdul Karim, *op.cit.,* pp. 157-178

সুলতানগণের মুদ্রানীতির কেন্দ্রীয়করণের উদ্দেশ্য পতিফলিত করেছে। টাকশাল শব্দের প্রতিরূপ 'দার-উল-যবর'। এর অর্থ হলো এই টাকশালটি শুধু একটি ছোট শহর নয় বরং এটি টাকশালের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় একটি বড় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। উদাহরণ হিসেবে আমরা গৌড়ের কথা বলতে পারি। খাজানাহ গৌড়ে অবস্থিত ছিল। যেহেতু এটি রাজধানী শহর তাই কোষাগার হবার মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। গৌড় ছিল প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ নগরী। গৌড় রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকে খাজানাহ বা খাজাঞ্চিখানা অবস্থিত ছিল। খাজানাহ এর পাশেই ৩১৫ x ২৩৫ ফুট আয়তনের দিঘি ছিল। আবিদ আলী খান উল্লেখ করেন যে, নগরটি পরিত্যক্ত হবার পরেও স্থানীয় লোকেরা এটিকে টাকশালের দিঘি বলে জানত।[৩২] মুসলিম শাসনাধীনে বাংলায় তিন প্রকার মুদ্রার প্রচলন লক্ষ করা যায়।

বাংলার সুলতানগণ তাদের মুদ্রায় কতগুলো সাধারণ তথ্য উৎকীর্ণ করেছেন। মুদ্রায় সুলতানের নাম, উপাধি, টাকশালের নাম, পূর্ব পরিচয়, পিতার নাম, কালেমা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । আলাউদ্দিন হোসেন শাহ অন্য শাসকগণের তুলনায় বেশি স্বর্ণ মুদ্রা জারী করেন এবং তিনি অনেক রৌপ্য মুদ্রাও উৎকীর্ণ করেন। কোনো কোনো মুদ্রায় তিনি নিজেকে কামরূপ, কামতা, জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ী বলে উল্লেখ করেছেন। খলিফাতাবাদ, নুসরাতাবাদ[৩৩] খলিফাতাবাদ বদরপুর[৩৪] প্রভৃতি স্থান মুসলিম সাম্রজ্যের অংশ ছিল তাঁর মুদ্রা থেকেই তা ধারণা করা যায়।

মুদ্রার বিকাশ

ইবনে বখতিয়ার খলজি মুদ্রা জারী করলেও পরবর্তী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এই ধারা অব্যাহত রাখেন। স্বাধীন সুলতান ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ ও ইলিয়াস শাহের সময়ে মুদ্রার প্রচলন আরো বৃদ্ধি পায়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মুদ্রার সাহায্যে বাংলার আঞ্চলিক বিস্তৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– বিহার বিজয়, কামতা অধিকার। শর্কি রাজ্যের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তরফদারের মতে, আসাম, নেপাল, তিব্বত এবং আরাকানের মতো রাজ্যগুলো বাংলার মুদ্রা অনুসরণ করেছিল। এরূপ তিনটি রাজ্যের উদাহরণ হলো-

> অহোম রাজ্যের মুদ্রা ছিল সুলতান নুসরাত শাহ এবং গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালের এক ধরনের মুদ্রার অনুকরণে তৈরি। নেপালের রাজা জয় মহেন্দ্র (১৫৬৬ খ্রি.-১৫৭৬ খ্রি.) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের দুটি

---

[৩২] Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 58
[৩৩] Abdul Karim, *op.cit.*, p. 126
[৩৪] Abdul Karim, *op.cit.*, pp. 130-133

মুদ্রা অনুসরণ করেন। এই ধরনের মুদ্রা তিব্বতেও প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতকে আরাকানের কোনো কোনো রাজা তাদের মুদ্রায় ফার্সী অক্ষরে কালেমা উৎকীর্ণ করেন।[৩৫]

গুজরাটের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কামরূপ, কামতার উপর নুসরাতের শাহের সময়েও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সুলতানী আমলের রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল তঙ্কা এবং মোগল আমলে ঐ একই রৌপ্য মুদ্রা নাম ‘সিক্কা’। মূলত মোগল শাসনাধীনের ‘সিক্কা’ টাকা বাংলার চলতি টাকা ছিল না। রৌপ্য মুদ্রা সিক্কাকে চলতি টাকায় সমন্বয় করতে হতো। যেমন– যেসব টাকা বাজারে প্রচলিত ছিল তার থেকে নতুন যে মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হলো সেসব টাকাকে ১৬ ভাগ উৎকৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া হতো। অর্থাৎ এর মান দাড়ায় নতুন বছরের ১০০ সিক্কা চলতি/ প্রচলিত ১১৬ টাকার সমান। দ্বিতীয় বছরের ঐ নতুন ১০০ সিক্কার মূল্য চলতি ১১৩ টাকার সমান। তৃতীয় বছরে ঐ ১০০ সিক্কার চলতি টাকার ১১ ভাগ বেশি। ঐ টাকাকে ‘সানওয়াত’ টাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি একই মানের কোনো টাকা মাদ্রাজ, সুরাটে মুদ্রিত হতো তাহলে সেই টাকাকে ১০ ভাগ উৎকৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া হতো।[৩৬] মূলত বাট্টা বা কমিশনের মাধ্যমে বাজারে প্রচলিত মুদ্রার সমন্বয় করা হতো। বাংলার শাসকগণ এভাবেই মুদ্রার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

বাংলায় বিভিন্ন রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরেই সাত রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যেমন– সুরাটের মুদ্রা, ইংরেজগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মাদ্রাজের মুদ্রা, মালাক্কার এবং পর্তুগিজ, ওলন্দাজদের মুদ্রা প্রভৃতি। এছাড়াও ছিল বাংলার নিজস্ব টাকশালে তৈরি মুদ্রা।[৩৭] সুলতানী আমলেও অনেক টাকশাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মুদ্রা মুদ্রিত হতো। নানান টাকশালের মুদ্রা চালু থাকায় এসব মুদ্রার সামঞ্জস্যের জন্য এক শ্রেণির প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তারা ছিল মুদ্রা বিশেষজ্ঞ বা মুদ্রা বিনিয়োগকারী। এক শ্রেণির মুদ্রার সাথে অন্য শ্রেণির মুদ্রার বিনিময় করাই ছিল তাদের কাজ। এসব বিনিয়োগকারীগণ উত্তরাধিকারসুত্রে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় মুদ্রা বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। সাধারণত বাজারে জারীকৃত নতুন মুদ্রা এবং চলতি টাকার মধ্যে পার্থক্য কমিশন বা বাট্টা নিরূপণ করার ক্ষমতা ছিল এই

---

[৩৫] M.R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal,* p. 42

[৩৬] James Stewart, *The Principles of Money Applied to the Present State of the Coin of Bengal,* 1772, p. 16; J C Sinha, *Economic Annals of Bengal,* pp. 112-113; উদ্বৃতি, K.M Mohsin, “Mughal Banking System” *History of Bangladesh, Economic History* (1704-1971), vol. 2, ed. Sirajul Islam, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2017, p.175

[৩৭] Sirajul Islam (ed.), *Bangladesh District Records; Dacca District,* vol. 1, 1884-1887, pp. 418-419; উদ্বৃতি, K. M Mohsin, *op.cit.,* p.176

অভিজ্ঞ সারাফদের। তারাই ‘সিক্কা’ ও ‘সানাওয়াত’ মুদ্রার মধ্যে বাট্টা ধার্য করে চলতি টাকায় সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করত।[৩৮] এই পদ্ধতিতে মুদ্রার মান সুনিশ্চিত হতো কিন্তু জনসাধারণের কাছে তা গ্রহণ করা খুবই অসুবিধাজনক ছিল। কারণ সারাফদের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারত না তার কাছে রক্ষিত মুদ্রার মূল্য কত। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্য হয়েই সারাফদের কাছে যেতে হতো।

মুর্শিদকুলি খার সময়ে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার ওপর শেঠদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসার পূবেই সারাফদের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাংলায় কোম্পানির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের কোর্ট অফ ডাইরেক্টর ঘোষণা করেন যে,

> বাংলায় প্রচলিত সব ধরনের মুদ্রা পুনরায় তৈরি ও সিক্কা টাকার ওপর বার্ষিক কমিশন বন্ধ করার মাধ্যমে ‘সিক্কা’ ও চলতি টাকার মধ্যে মানসম্মত করে মুদ্রা তৈরি করতে হবে। . . . এ সময়ে কলকাতা টাকশালের অধ্যক্ষ আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল আপত্তি তুলে যুক্তি দেন যে, সারাফরা নতুন ‘সিক্কা’ পরিমাপে ব্যর্থ হবেন এবং এভাবে বাজারে নতুন মুদ্রার ঘাটতি দেখা দিবে।[৩৯]

কাউন্সিলের কিছু সদস্যদের বিরোধীতা অগ্রহ্য করে কোর্ট অফ ডাইরেক্টর ১৭৭১ সালে সানওয়াত টাকার ওপর বাট্টা উচ্ছেদের জন্য পূর্ববর্তী আদেশ পুনরায় ঘোষণা করেন। পরবর্তী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে ১৭৭১ সালের দ্বাদশ বছর থেকে কোম্পানির টাকশালে ‘সিক্কা’ টাকা তৈরি করা হবে এবং এসব ‘সিক্কা’ টাকা ১৬ শতাংশ বাট্টায় আদান প্রদান করা হবে। এখানে আরো বলা হয় যে, নতুন সিক্কাগুলো একাদশ সালের ‘সিক্কার’ মূল্য হ্রাসে বাধ্য করবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সিক্কাগুলো ১৭৭০ সালে তৈরি হয়েছিল সেগুলো টাকশাল থেকে আসার সময় প্রথমে তাদের যে মান ছিল তা অক্ষুন্ন থাকবে এবং পরের বছরগুলোতে যেসব ‘সিক্কা’ প্রচলিত করা হয় সেগুলো তাদের পূর্ণমান রক্ষা করবে যার মাধ্যমে ‘সিক্কা’ টাকার ওপর তাদের সানওয়াত সময়কালের আগে প্রতিষ্ঠিত ক্রয়মূল্য হ্রাসকরণের বিধান বিলোপ করা যায়।[৪০] এভাবেই ‘সিক্কা’ টাকার অভিন্ন মান নির্ধারণ করা হয়।

জগৎ শেঠের ব্যাংকের বহু শাখা ছিল। ঢাকা থেকে উত্তর ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরেই তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকত। তাদের ব্যাংকের কার্যাবলী থেকে দেখা যায় ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ ও ১৭৭২

---

[৩৮] James Stewart, *op.cit.*, p.17
[৩৯] J. C. Sinha, *Economic Annals*, p.117
[৪০] *Bengal Public Consultation, 28 August* 1771; উদ্বৃতি, K.M Mohsin, *op.cit.*, p.177

খ্রিস্টাব্দের পুর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের রাজস্বের সাথে জড়িত প্রতিনিধিরা জগৎ শেঠের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রেরণ করেছিল।[৪১]

জগৎ শেঠ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মুদ্রা সিক্কামানে রূপান্তরিত করার জন্য বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা, ওজন করার অধিকার ভোগ করত। তৎকালীন অর্থ বছরের প্রথম দিনে 'পুন্যাহ' অনুষ্ঠানে জগৎ শেঠ জমিদার ও কৃষকদের পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া খাজনার জন্য জামিনদার হতেন এবং জগৎ শেঠ নিজের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পত্র প্রদান করতেন। বিনিময়ে তিনি জমিদারদের নিকট থেকে ১০ ভাগ কমিশন নিতেন। বিগত দশ বছরের (১৭৭৩ খ্রি.-১৭৮৩ খ্রি.) অনেক জমিদার ও কৃষকের বড় অঙ্কের খাজনা এভাবে পরিশোধ করা হতো।[৪২] তৎকালীন সময়ের কয়েকজন ব্যাংকার হলেন গোপাল দাস, জগৎ শেঠ, কিশোরী মোহন, জগবন্ধু রায়, বাহাদুর সিংহ, বিজয় রাম রায় ও কাশীনাথ প্রমূখ ব্যক্তিগণ ব্যাংকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মুদ্রা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ

সুলতানী বাংলায় মানসম্মত মুদ্রা প্রচলনের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকশিত হয়। আমদানি-রপ্তানি পরিমান বৃদ্ধি পায়। এসময়ে অভিজাত শ্রেণির জন্য বিলাসজাত দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়াও বিনিময়ের জন্য কড়ি আমদানি করা হয়। মালদ্বীপ থেকে চালের বিনিময়ে কড়ি আমদানি করা হতো। *মঙ্গলকাব্যে* পণ্য বিনিময়ের প্রমাণ রয়েছে।[৪৩] ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে জড়িত দালাল, ফড়িয়ার হাতে চলে যেতো পণ্য বিক্রয়ের লভ্যাংশের অর্থ।[৪৪] উপকূলবর্তী বন্দরসংলগ্ন এলাকায় বড় বড় ব্যবসা একদল দালালের সহায়তায় পরিচালিত হতো। তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক লেনদেনে জড়িত ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে দস্তুরি আদায় করত। একইভাবে তারা জিনিসের দামও বৃদ্ধি করত। আলাউদ্দিন খলজি তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য

---

[৪১] K.M Mohsin, *op.cit.*, p. 129

[42] K.M Mohsin, *op.cit.*, p. 181

[৪৩] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বলেন যে,

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ পাটসোন বদলে ধবর চামর কাঁচের বদলে নীলা।
বিঙঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক চিনির বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নাঠি
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রা বদলে সুয়া সকল্লাথ পামরী কম্বল পাব বদল করিয়া পাটি।
গাছফল বদলে জয়ফল পাব বয়ড়ার বদলে গুয়া হরিদ্রা বদলে গোরোচনা পাব সোলফার বদলে জিরা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল*, পৃ. ১৯৬, ২৩১, ২৫৪

[৪৪] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১৪২

ভকিল নিযুক্ত করত।[৪৫] আন্তর্জাতিকমানের মুদ্রার প্রচলনের ফলে মালাক্কা ছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরাকান, পেগু, শ্যাম, সুমাত্রার পাশেই ও পেদির, বান্দা, পাপুয়া দ্বীপ, আরুদ্বীপ ও লিউ কিউ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পশ্চিমদিকে সিংহল, ক্যাম্বে, মালদ্বীপ, ওরমুজ ও এডেন পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্যিক জগৎ বিস্তৃত ছিল।[৪৬] এসকল দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রমাণ করে যে বাংলায় উন্নতমানের মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

আলোচ্য সময়ে মুদ্রার মান প্রতিটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইবনে বতুতা, তোমে পিরেসের বর্ননা থেকে আমরা এ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। বতুতা তাঁর বিবরনে দিনার ও পাউন্ড মূল্যমানে পণ্য বিক্রির তথ্য দিয়েছেন।[৪৭] রাতলকে বাংলার মণের হিসেবে সাথে তুলনা করেছেন। পিরেসের মতে, ১৯৪৪ সালে এক ক্রুসেডো ছিল ২ পাউন্ড ১৭ শিলিং এর সমান। বার্বোসার বিবরণের অনুবাদক Dames বলেছেন যে, ১৯১৮ সালের দিকে ১ ক্রুসডো ১০ শিলিং এর সমান ছিল।[৪৮] প্রতি বছর করমণ্ডল উপকূল থেকে মালাক্কায় তিন চারটি জাহাজ যেতো। প্রতিটি জাহাজে থাকত ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ ক্রুসেডো মূল্যের পণ্যদ্রব্য। কালিকট থেকে ১টি বা ২টি বড় জাহাজ রওয়ানা দিতো প্রত্যেকটিতে থাকত ৯০,০০০ ক্রুসেডো মূল্যের পণ্যদ্রব্য।[৪৯] পিরেস বলেন যে, রৌপ্য মুদ্রাকে তারা তঙ্কা বলে। এই মুদ্রার ওজন ছিল এক তায়েল তঙ্কা বা ছয় ড্রামের কাছাকাছি। এক তঙ্কা ছিল মালাক্কার কুড়ি কালাইনের বা বাংলার ৭ কাহনের সমান। ১৬ পণে এক কাহন হয়। ৮০ কড়িতে হয় এক পণ। এভাবে এক কাহন ধরা হতো ১২৮০ কড়িতে। আর এক টাকা = ৮৯০৬ কড়ির সমান এবং ৪৪৮ কালাইনের সমান।[৫০] গুপ্ত যুগে একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় মূল্য ছিল ২০,৪৮০ টি কড়ি।[৫১]

তোমে পিরেস বলেন যে, সোনা, রূপা বা কড়ি দিয়ে বেচাকেনা ছিল মুনাফার একটি উৎস। বাংলা থেকে মালাক্কায় নিয়ে যাওয়া রূপার দাম হতো ১/৪ বা ১/৫ ভাগ বেশি। বণিকগণ তাই সোনা, রূপার ব্যবসায় বেশি গুরুত্ব দিতো। কড়ি আমদানি করেও তারা মুনাফা লাভ করত। বাংলা থেকে মালাক্কায় বিদেশি মুদ্রা এনে তা হস্তান্তর করেও তারা মুনাফা লাভ করত। পাসাই বন্দরে এই মুদ্রার ব্যবসা ছিল শুধুমাত্র

---

[৪৫] K.M.Ashraf, *op.cit.*, pp. 138-140
[৪৬] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১৩৬
[৪৭] Inb Battuta. *op.cit.*, pp. 234-235
[৪৮] Barbosa, *op.cit.*, p. 148
[৪৯] Toma pires, *op.cit.*, vol, 1, p. 255-272
[৫০] *Ibid*, vol, 1, pp. 93-95
[৫১] B.N. Mukherjee, *Coin and Currency System in Gupta Bengal*, (c. A.D.320- 550), New Delhi, 1992, p. 58

গোল মরিচের বিনিময়ে।[৫২] মুদ্রা ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় অনেকেই এই ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামগঞ্জেও মুদ্রা ব্যবসা চলত। সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে পল্লী গ্রামের বাজারে পোদ্দার তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করত। পোদ্দার তামার পয়সা ও কড়ির বিনিময়ে রৌপ্য মুদ্রা তঙ্কা ও রৌপ্য দিতো। এজন্য সে বাট্টা আদায় করত।[৫৩] পোদ্দারের উদ্দেশ্যই থাকত সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত বাট্টা আদায় করা।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। ব্যাংক-এর যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। মুদ্রা ব্যাংক ব্যবস্থাপনার হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। ব্যাংক-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'an organization that makes loans and keep customers' money for them.'[৫৪] ইতিহাসের পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকিং এর প্রকৃতি ও ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্যাংকিং হলো এক ধরনের ব্যবসানির্ভর কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রতিষ্ঠান, যেখানে এক ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থ গৃহীত হয় এবং সেই অর্থ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তিকে ধার দেওয়া হয়।

Henry Dunning Macleod ব্যাংকিং এর সংজ্ঞায় বলেন যে, Banking is a department of the great Science of Economics: or the Science of Exchanges; or of Commerce in its widest extent and in all its forms and varieties.[৫৫] তৎকালীন ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এক ধরনের দেশীয় ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রচলনের কথা জানা যায়। যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাড়োয়ারি, জৈন, মুলতানীরা তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা করত। এই দেশজ বাংকিং দেশের বিভিন্ন শহরে বা গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয় বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের সময় থেকে এবং প্রাচীন আমলে হিন্দু শাসনামলে ভারতে প্রচলিত অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিষয় থেকেই ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি। মূলত আরব বণিকদের বিরাট ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে একশ্রেণির ব্যাংক কারবারির উদ্ভব ঘটে। তারা ঋণ প্রদানের কাজ করত এবং ভ্রমণকারীদের 'সুফতাজাহ' নামে অভিহিত হুণ্ডি চেক ও টাকা দেবার আজ্ঞাপত্র

[৫২] Toma pires, *op.cit.*, vol, 1, pp. 92-93
[৫৩] K M Ashraf, *op.cit.*, pp. 138-140
[৫৪] *Oxford English Dictionary*, Oxford University Pres, New Delhi, 2006, p. 47
[৫৫] Henry Dunning Macleod, *The theory and Practice of Banking*, vol.1, Longmans, Green and Co., London, 1892, p.01

প্রদান করত।[৫৬] বাংলার ব্যাংকারদের কাজকর্মকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) অভিজাত শ্রেণির টাকা জমা রাখা অর্থাৎ তারা ব্যাংকারদের কাছে টাকা রেখে সুদ গ্রহণ করত, (২) সুদে টাকা ধার দেওয়া (loans on interest), (৩) বিভিন্ন ধরনের হুণ্ডি কাটা ও আদায় করা (bill of exchange) ও (৪) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের বেচাকেনায় অংশগ্রহণ করা। আলোচ্য সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্ত কার্যাবলীই সম্পাদিত হতো।

ধারণা করা হয় বাংলার বণিকগণের মধ্যে অনেকেই ব্যাংকিং কাজের সাথে জড়িত ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে বণিক চাঁদ সওদাগর, ধনপতি, হীরামাণিক ও দুলালধনের নাম জানা যায়। এসব বণিকগণ শুধুমাত্র বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল না। তারা মূলত বণিক কিন্তু কিছু মূলধন ব্যাংকিং ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করত। তারা অনেকেই ব্যবসা এবং ব্যাংকিং দুই কাজই করত।[৫৭] পরবর্তীতে ব্যাংকিং এর কাজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল জগৎ শেঠ পরিবার। জগৎ শেঠ পরিবার ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে বার্ষিক ৯% হারে টাকা ধার দিতো।[৫৮] এসব পরিবারের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ছিল- তাদের রাজনৈতিক যোগাযোগ খুব ভালো ছিল। তারা রাজপরিবারের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রাখত। এসব ব্যাংকারদের কাছে পর্যাপ্ত পুঁজির যোগান ছিল এবং ব্যাংকিং কাজকর্ম পরিচালনায় তারা দক্ষ ছিল। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদের হার গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যবসায়ীদেরকে অনেক মহাজন সুদের টাকার বিনিময়ে টাকা ধার দিতো। তাদের সুদের হার চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যেতো। জিয়াউদ্দিন বারানী উল্লেখ করেন যে, মুলতানি মহাজনরা সুদের ওপর সুদ চড়াইয়া তঙ্কার অঙ্ক এতো বৃদ্ধি করে যে গৃহহীন, সহায়হীন বহু লোক লখনৌতির দিকে চলে আসে।[৫৯] বাংলার মহাজনরাও অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করত বলেই অনুমান করা যায়।

সুলতানী যুগের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে এক ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার বিস্তার ঘটেছিল। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে এর পুরোপুরি মিল ছিল না সত্য। তবে এ ব্যবস্থায়ও ব্যাংকের মতো টাকার লেনদেন হতো। এই সময়ে ব্যাংক ব্যবসায়ীরা সাধারণত মহাজন, পোদ্দার, ঋণদাতা, সারাফ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। তারা গচ্ছিত বস্তু বা হুণ্ডির পরিবর্তে টাকা ধার দিতো। প্রাপককে অথবা তাঁর নির্দেশানুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোনো ব্যক্তি বা

[৫৬] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 436
[৫৭] K.M.Mohsin, *A Bengal District in transtion: Mursidabad*, 1765-1793, Dhaka, 1973, pp. 140-142
[৫৮] M.A Rahim. *op.cit.*, p. 438
[৫৯] Barani, *op.cit.*, p. 100

প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রদানকারীর লিখিত নির্দেশ সম্বলিত শর্তহীন হস্তান্তরযোগ্য দলিল হলো হুণ্ডি। আলোচ্য সময়ে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে হুণ্ডি প্রচলিত ছিল। এক কথায় বলা যায় হুণ্ডি হলো স্থানীয় বিনিময় বিল। এটি স্থানীয় ভাষায় লিখতে হতো এবং সেই যুগের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রথা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে নিয়ন্ত্রিত হতো। হুণ্ডি গ্রহীতার পক্ষে ভিন্ন একটি প্রদেশ থেকেও টাকা গ্রহণ করার সুযোগ ছিল। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ব্যাংকাররা বাট্টা গ্রহণ করত। উদাহরণ হিসেবে দ্বারকানাথেরর ব্যাংকের কথা বলা যায়। জনৈক বৈষ্ণব দ্বারকানাথে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বের হন এবং হুণ্ডির জন্য একজন ব্যাংকারের কাছে যান। ঐ বৈষ্ণবের হুণ্ডি প্রদানের শর্তে এক শত টাকা বাট্টা গ্রহণ করে এক হাজার টাকার হুণ্ডি প্রদান করা হয়। এছাড়া হুণ্ডি গ্রহীতাকেও দ্বারকানাথে ব্যাংকের এজেন্ট থেকে টাকা গ্রহণ করতে বলা হয়।[৬০] সমগ্র ভারতবর্ষে হুণ্ডির ব্যবহার ছিল। সারাফ বা ব্যাংকাররা তাদের কাছে গচ্ছিত টাকার বিনিময়ে অন্যান্য জায়গায় তাদের দালাল বা প্রতিনিধিদের নামে হুণ্ডি কাটত। যা দিয়ে গ্রহীতা ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে হুণ্ডির টাকা গ্রহণ করত। এই ক্ষেত্রে হুণ্ডি ছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর একটি উপায় মাত্র।[৬১]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদায়কৃত রাজস্ব কোষাগারে প্রেরণের জন্য তারা হুণ্ডি ব্যবহার করত। এসব হুণ্ডির বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন- দর্শন হুণ্ডি, যোগ হুণ্ডি, শাহযোগ হুণ্ডি, পুজা ও ফরমান যোগ হুণ্ডি ইত্যাদি।[৬২] এজন্য যে খাতকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ বা কমিশন গ্রহণ করত। সুদ, বিমা খরচ ও টাকা বহনের জন্য খরচ সাধারণত বাট্টার অন্তর্ভুক্ত হতো। ব্যাংকাররা অভিজাত শ্রেণির আর্থিক অসুবিধার সময় টাকা ধার দিতো। দেশীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু নগদ, কিছু বিলের মাধ্যমে এবং কিছু ক্ষেত্রে টাকা আদান প্রদান করা হতো 'হুণ্ডির' মাধ্যমে। ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি হুণ্ডি ব্যবসা প্রসার লাভ করে। উল্লেখ্য যে, সরাফরা হুণ্ডি দেওয়া ও নেওয়ায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হুণ্ডি ব্যবসা ব্যাংকে

---

[৬০] M.A Rahim. *op.cit.*, pp. 403-404

[৬১] *Akbarnama*, vol. 3, p.762

[৬২] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ৭ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ১০০; অর্থনীতির ভাষায়, কোনো বিক্রেতা ক্রেতার ওপর কোনো বিশেষ সময়ের ভেতর তার বিক্রীত দ্রব্যের দাম তার ব্যাংকে জমা দেওয়ার যে আদেশনামা দেয়, তাকেই বলা হয় হুণ্ডি। ক্রেতা তার পক্ষ থেকে কেউ উক্ত আদেশনামায় সই করলেই যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যাংক তা সিকিউরিটি হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। বিক্রেতাকে হুণ্ডি প্রেরক বা drawer এবং ক্রেতাকে হুণ্ডি বাহক বা drawee বলা হয়। sola বা solo এমন একটি একক বিল বা হুণ্ডি, যার কোনো কপি বা অনুলিপি নেই। অপরদিকে set bill of exchange হচ্ছে এমন বিল বা হুণ্ডি, প্রয়োজনে যার দ্বি- নকল বা ত্রি- নকল অনুলিপি থাকতে পারে। সোলা বিল ব্যবহার করা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। মুনীর তৌসিফ, *অর্থ-বাণিজ্য শব্দকোষ*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৩, পৃ, ৩২

জমানো টাকার কাজ করত[৬৩] এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নগদ অর্থ পরিবহণের ঝুঁকি থেকে মালিককে রক্ষা করত।

সুলতানী শাসনের পরবর্তী সময়ে বা মোগল আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বাংলায় চার প্রকার হুণ্ডি ব্যবহার করা হতো। যথা- (ক) দর্শনী হুণ্ডি, এটি ছিল আজ্ঞা পত্র। এই কাগজ দেখামাত্রই টাকা পরিশোধ করা হতো। (খ) নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টাকা পরিশোধ করাকে বলা হতো মিথি হুণ্ডি। (গ) শাহযোগ নামে এক প্রকার হুণ্ডি ব্যবহার করা হতো যা ছিল মুদ্রার মতো। এই হুণ্ডি বহনকারী ইচ্ছা করলে যেকোনো ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করতে পারত। (ঘ) বিমার ন্যায় বিনিময় পত্র ছিল জোহখামী হুণ্ডি।[৬৪] জোহখামি হুণ্ডির একটি উদাহরণ দেওয়া হলো- এই হুণ্ডি শর্ত অনুসারে ধরা যাক পাটনার 'করিম' গুজরাটের গনি মিয়ার নিকট ১,০০০ টাকা মূল্যের সুতিবস্ত্র বিক্রি করল। করিম তার মূল্য বা বিল পাটনাস্থ ব্যাংকারের নিকট কিছুটা বাটা/বাদ দিয়ে বিক্রি করে দিলে ৮৪০ টাকা পায়। ব্যাংকার পণ্যদ্রব্য ও বিল সুরাটস্থ গনি মিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেয়। গনি মিয়া ব্যাংকারকে সুরাটে তার নিকট নিরাপদে মালামাল পৌঁছানোর পর এক হাজার টাকা মূল্যের বিল প্রদান করে। এখানে ব্যাংকার অগ্রিম টাকা প্রদান করে এবং সুরাটে মালপত্র প্রেরণের ঝুঁকি গ্রহণ করে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালপত্র বহন করার সময় হারিয়ে গেলে নষ্ট হলে ব্যাংকার বিলের টাকা পেতো না। তাকে সমস্ত ক্ষতিই বহন করতে হতো। তাই এটা দেখা যায় যে, ঝুঁকি নেওয়ার জন্য বিমা টাকা ও অগ্রিম প্রদানের জন্য সুদসহ ব্যাংকার ১৬০ টাকার কমিশন আদায় করত।[৬৫] এটাই ছিল জোহখামি হুণ্ডি পরিচালনার পদ্ধতি। আলোচ্য সময়ে হুণ্ডি ব্যবসা বিস্তৃত হয় এবং মোগল শাসনামলে তা আরো বিস্তৃত হয়।

মহাজনরা অনেক সময় ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করত। মহাজন বা সাহুদের বড় বড় প্রতিষ্ঠানও ছিল। বেপারিরা তাদের কর্তাদের প্রতিনিধি (শাহু/সাহু) হয়ে বিভিন্ন স্থানের দোকানে বসতেন। ঋণ হিসেবে অগ্রিম টাকা দিয়ে এসব সাহু বা মহাজনরা বাণিজ্যিক উন্নয়নে সহায়তা করলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল চড়া

[৬৩] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 260-361; মূলত. ব্যাংকের নানা রকম কাজ রয়েছে- (ক) গচ্ছিত টাকা নিরাপদে রক্ষা করা, (খ) গচ্ছিত টাকার সুদ প্রদান ও গ্রাহক দাবি করলে তৎক্ষণাৎ তা ফেরত দেয়। (গ) নগদ টাকা, ব্যাংক নোট বা চেকের মাধ্যমে পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা করা। বারানী উল্লেখ করেন যে, ঋণগ্রস্ত অভিজাতশ্রেণি কখনো কখনো দেশি ব্যাংকার/মহাজনদের কাছে টাকার বিনিময়ে নিজেদের জায়গির বা ইকতা হস্তান্তরিত করতেন। অথবা টাকার প্রয়োজনে জায়গির মহাজনকে দিয়ে অগ্রিম টাকা নিতেন। Kunwar Muhammad Ashraf, *Life And Conditions Of The People of Hindustan*, (Munshiram Manoharlal, New Delhi 1970), p.139

[৬৪] D Pant, *Commercial Policy of the Mughals*, London, 1936, pp.78-79

[৬৫] M.A Rahim. *op.cit.*, pp. 438-439

দামে সুদ নিয়ে টাকা খাটানো। এরা সর্বস্তরে সাহু/শাহু বা মহাজন নামে পরিচিত ছিল।[৬৬] সাধারণত সমাজের ওপর মহলে এদের খুব কদর ছিল। কারণ ঋণগ্রস্ত অভিজাতশ্রেণি অনেক সময় দেশি মহাজনদের কাছে জায়গির বন্ধক রাখতেন। পূর্বেও এবিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাজনকে ঋণের বিপরীতে প্রচুর সুদ দিতে হতো। আমির খসরুর মতে, মোটা অঙ্কের ঋণ হলে তার সুদের হার ছিল বছরে দশ শতাংশ। আর টাকার পরিমাণ অল্প হলে সুদ দিতে হতো বছরে বিশ শতাংশ। . . . তিনি আরো বলেন যে, এক তঙ্কার সুদ ছিল এক জীতল অর্থৎ বছরে প্রায় বিশ শতাংশ।[৬৭] তাঁর এই বর্ণনা থেকে তৎকালীন মহাজন ও সাহুরা ঋণ প্রদান করে যে সুদ গ্রহণ করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সব ধরনের ব্যবসায়ীরাই কম বেশি ঋণ নিতো সুদও প্রদান করত। তবে সাধারণ মানুষ ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারলে অনেক সময় গৃহহারা হতে বাধ্য হতো।

জমিদাররা জঙ্গল কেটে চাষের জমি বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাংকারদের কাছ থেকে টাকা ধার করত। সুতি বস্ত্রের ব্যবসায়ী, রেশম শিল্পের মহাজনরা এদের কাছ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করত। উল্লেখ্য যে ব্যাংকাররা ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হতো না। তারা প্রচুর সম্পদের মালিক ছিল। জগৎ শেঠ পরিবারের মোট মুলধনের পরিমাণ কত ছিল তা বলা মুশকিল, তবে মারাঠারা তাদের দুই কোটি টাকা লুট করেছিল। জগৎ শেঠ পরিবার যেকোনো সময় এক কোটি টাকার হুণ্ডি কাটত। তারা ব্যাংকি- এর কাজ ছাড়াও নানা রকম ব্যবসা করত। শস্যের ব্যবসা বাধ্য হয়ে করত কারণ তারা জমিদারদের বাকী খাজনার জামিনদার থাকত। বেশিরভাগ সময়ই জমিদাররা শস্য দিয়ে দেনা পরিশোধ করত। ওলন্দাজদের কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ব্যাংকাররা চারটি প্রধান মশলার খুচরা বেচাকেনা (retail trade) করত। জগৎ শেঠের মতো ব্যাংকাররা দেশি বিদেশি বণিকদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। বণিকদের পক্ষে নানারকম পণ্য বিনিময় করে তারা কমিশন লাভ করত। কখনও কখনও সরকার এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কয়েকটি জেলার রাজস্ব এদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতো।

সুলতানী শাসনামলে হুণ্ডি ব্যবসা যেসব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল মোগল আমলে তা আরো বিকশিত হয়েছিল। যেমন শায়েস্তা খানের সময়ে- ট্যাভারনিয়ারকে শায়েস্তা খানের কাছ থেকে নগদ অর্থ না নিয়ে কাশিমবাজার থেকে হুণ্ডি নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়।[৬৮] মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে শেঠ, সাহা, মহাজন ও সাররাফ নামে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাংকের কার্যাবলি টাকা জমা রাখা, ঋণ দান ও

[৬৬] K M Ashraf, *op.cit.*, p. 140
[৬৭] Amir Khusrau, *Ijaz-i-Khusravi*, vol.1, Lucknow,1875-76, p. 174, উদ্বৃতি, K M Ashraf, *op.cit.*, p. 140
[৬৮] মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রযুক্তি*, পৃ. ৩০

হুণ্ডি বা চেক প্রদান প্রভৃতি ব্যবসা পরিচালিত হতো।[৬৯] মহাজন, শেঠ, সাররাফগণ বড় আকারে ব্যাংকের ব্যবসা চালাত। মির্জা নাথান উল্লেখ করেন যে, যুবরাজ শাহজাহান যখন বাংলায় আসেন ঐ সময় তাকে দুর্লভ দ্রব্যের উপহার দেওয়ার জন্য তিনি (মীর্জা নাথান) ঢাকার জাহাঙ্গীরনগরের মহাজনদের কাছ থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।[৭০] বাংলা ও উত্তর ভারতের সর্বত্রই ব্যাংকারদের শাখা বিস্তৃত থাকায় যে কোনো শাখা থেকে ব্যবসায়ীরা ঋণ গ্রহণ করত পারত।

ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠ পরিবার এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন দখল করে আছে। জগৎশেঠ সাধারণত নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রয়োজনের সময় অনেক ঋণ প্রদান করত। প্রায় সকল নবাব, জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রয়োজনের সময় বড় অঙ্কের ঋণ প্রদান করত। জগৎ শেঠ ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে মোগলদেরকে রাজস্ব, কর প্রেরণ করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জগৎ শেঠ জমিদারদের বকেয়া রাজস্বের জন্য অনেক সময় জামিন থাকতেন।[৭১] ব্যবসায়ী ও বণিকরা জগৎ শেঠ এর ব্যাংকিং ব্যবস্থার পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও প্রেরণ করত। ডাচ বণিকরা বার্ষিক শতকরা ৯% সুদে জগৎ শেঠের নিকট থেকে সারে চার লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেছিল।[৭২] পর্যটক ট্যাভারনিয়ার উল্লেখ করেন যে,

> কোনো বণিক আগ্রাতে পণ্য কিনে সুরাটে পাঠাবে এমন সময় তাঁর টাকার প্রয়োজন পড়ায় তিনি আগ্রার মহাজনদের মাধ্যমে দুই মাসের হুণ্ডি বা বিনিময় বিলের ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারতেন। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুযায়ী কমিশন নির্ধারিত হতো। সাধারণত ঢাকায় ১০%, বেনারসে ৬% বাট্টা দিতে হতো। পণ্যদ্রব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়ার পথে হারিয়ে গেলে বা খোয়া গেলে বিল পরিশোধ করা হতো না। তাই বিমার খরচ ও সুদের টাকার সাথে যোগ করা হতো। ভারতের বাইরে হলে মহাজনরা সমুদ্রপথের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য ১৬% থেকে ২২% কমিশন দাবি করত।[৭৩]

গুজরাটের মহাজনরা খুব বিশ্বস্ত ছিল। পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেকোনো লোক মহাজন বা পোদ্দারের কাছে টাকা গচ্ছিত রাখতে পারত এবং অর্থ ফেরত চাওয়ার সাথে সাথে তা ফেরত দিতো। তবে তাদের সুদের হার কত ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না।

---

[৬৯] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 90-92
[৭০] Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghabi*, vol. 2, 1936, p. 715
[৭১] Ghulam Hussain Salim, *op.cit.*, p.
[৭২] S.C Hill, *Bengal in 1756-1757,* London, 1902, p. 104; Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, vol. 2, p. 437
[৭৩] Tavernier, *op.cit.*, pp. 23-25

ব্যাংকের টাকার সুদ সম্পর্কে বকুানন বলেন যে, “দিনাজপুর, পুর্ণিয়ার মতো উত্তরাঞ্চলীয় শহরে সুদের গড় হার ছিল ১২ থেকে ১৮ শতাংশ। কিন্তু তারা মুনাফার উপর আরো সুদ ধার্য করত।[৭৪] আমির খসরুর বিবরণ থেকে আমরা একই চিত্র লক্ষ করেছি। অনেক সময় মহাজনরা শস্যের মৌসুম আসার আগে কৃষকদের ঋণ দিতো। ঋণের পরিবর্তে তারা কৃষকের কাছ থেকে শস্য নিয়ে অধিক লাভের জন্য গুদামজাত করত। ব্যাংকাররা বিভিন্ন জেলা থেকে যে সুদ আদায় করত তা প্রতি মাসে ২ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত উঠানামা করত।[৭৫] যে কোনো সময় সুদের হার কমবেশি হতো এবং এই বিষয়ে প্রশাসনের নজরদারী ছিল না।

বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বণিকরাও হুণ্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাত। বাংলার বাইরে অন্য কোনো স্থানে টাকা পাঠানোর প্রয়োজন হলে হুণ্ডির মাধ্যমে যেমন পাঠানো যেতো তেমনি অন্য জায়গা থেকে ব্যাংকাররা তাদের ওপর হুণ্ডি এনে প্রাপককে প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিতো। ব্যাংকাররা এক্ষেত্রে কমিশন নিতো এবং একে বলা হতো হুণ্ডির বাট্টা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বছরের কোনো কোনো সময় হুণ্ডির চাহিদা বেশি থাকত এবং তখন হুণ্ডির বাট্টার হারও বৃদ্ধি পেতো। বিদেশি বণিকদের জাহাজগুলো বন্দর ছেড়ে গেলে হুণ্ডির কমিশনের হার নেমে যেতো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–

> ১৫৩৭ খ্রি. উড়িষ্যা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণ পর্তুগিজদের জাহাজগুলোর অধীনে চলে যেতো। মৌসুমি বায়ুর চলাচল শুরু হওয়ার আগে পর্তুগিজরা তাদের মালামাল নিয়ে হাজির হতো এবং বর্ষাকালে বাংলায় কেনাকাটা আর মালামাল বিক্রি করে কাটিয়ে দিতো। বর্ষা শেষ হলে পর্তুগিজরা তাদের জাহাজ মেরামত করতে গোয়ায় ফিরে যেতো। সেই সাথে গোয়াসহ অন্য বন্দরগুলোতে বাংলার পণ্যসামগ্রীর ঢল নামত।[৭৬]

সুলতানী শাসনামলে পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ের যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী শ্রেণির জীবনমান

মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে পেশাজীবী শ্রেণির লোকেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য পেশাজীবীর তুলনায় বেশি সমৃদ্ধ ছিল। সারাফ ও পোদ্দাররা টাকার বিনিময়ে ব্যবসা করত। বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়

[৭৪] Francis Buchanan, *Dinajpur*, p. 211
[৭৫] K.M Mohsin, *op.cit.*, p. 184
[৭৬] J.J.A Campos, *op.cit.*, pp. 111-112

অনেক বেশি লাভজনক ব্যবসা ছিল। বাংলায় যে তিন রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে তঙ্কা ও কড়ির ব্যবহার বেশি ছিল। মোগল শাসনামলে দেখা যায় হরেক রকম মুদ্রার প্রচলন ছিল কিন্তু বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অরাজকতা দেখা দেয়নি। আমিল ও জমিদাররা জগৎ শেঠের গদীতে সরকারি খাজনা জমা দিত। মূলত কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনায় ব্যাংকাররা পুঁজির যোগানদার ছিল।

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান ছিলেন বণিক গোষ্ঠীর প্রধান নগর শেঠ। তিনি নগরের সব বণিকের প্রতিনিধি। অভিজাত শ্রেণির ন্যায় বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। তিনি অন্যান্য বণিকদের সাথে, বেপারির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। ব্যবসায়-বাণিজ্য সমৃদ্ধির ফলে এসব বণিকদের হাতে অনেক অর্থের সমাগম ঘটত ফলে তারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করার সুযোগ পায়। এমন প্রভাবশালী বণিক ছিলেন হীরামানিক, দুলালধর। বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ায় বাংলায় রৌপ্যের সরবরাহ বাড়ে। এসময়ে পর্তুগিজদের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ায় আরো বেশি মুদ্রা জারির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মুদ্রা তৈরির সাথে ২১ শ্রেণির লোক যুক্ত ছিল। টাকশালে মুদ্রা তৈরির কাজে জড়িত পেশাজীবীদের বেতন বা পারিশ্রমিক নিম্নরূপ।[৭৭]

পেশাজীবী	কাজের ধরন	পারিশ্রমিক/ দাম
ওজনকারী	১০০ জালালী মুদ্রা ওজন করলে	১.১/৩- দাম (২৪ জিতল=১ দাম)[৭৮]
কাঁচা ধাতু গলানকারী (সোনা)	সোনার পরিমাণ নিরূপণের জন্য	৩ বা ৪ দাম
কাঁচা ধাতু গলানকারী (রূপা)	রূপার পরিমাণ নিরূপণের জন্য	৫ দাম ১৩. ১/৪ জিতল
কাঁচা ধাতু গলানকারী (তামা)	তামার পরিমাণ নিরূপণের জন্য	৪ দাম ২১. ১/২ জিতল
চাকতি নির্মাণকারক (৬ আঙ্গুল লম্বা ও চওড়া)	স্বর্ণের জন্য	৪২. ১/ ৩ দাম
পরিশোধিত সোনা গলানকারী	১০০ মোহরের জন্য	৩ দাম
জাররাব(সোনা রূপা গোল করে কাটে)	১০০ মোহরের জন্য	২১ দাম ১. ১/৪ জিতল
শিককাচী (দুই ছাঁচের মাঝে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়)	১০০ সোনার মোহরের জন্য	১. ১/৫ দাম
কুরছফুর (রূপাকে গরম করে)	১০০০ মুদ্রার জন্য	৪. ১/২ দাম

---

[৭৭] Abul Fazl, *The Ain-i-Akbari*, Blochmann, 3rd vol, 1, reprint, 2010, pp. 19-27

[৭৮] ১ দাম = ২৪ জিতল, ১ তংকা= ৬৪ জিতল, ২০ তম্র মুদ্রা= ১ রৌপ্য মুদ্রা /তংকা, K.M Ashraf, *op.cit.*, pp. 287-288; ৪০ দাম= ১ টাকা, Edward Thomas, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, p. 227, উদ্ধৃতি, N K Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, p. 144

চাশনিগির (সোনা রূপার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে)	সোনা	১. ২/৩
চাশনিগির(সোনা রূপার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে)	রূপা	৩ দাম ২ জিতল
নিয়ারিয়া	সোনা রূপা ধৌত মিশ্রিত পানি থেকে স্বর্ণ বের করার জন্য	২০ দাম ২ জিতল
সাববাক, রূপাকে গোলাকার চাকতিতে রূপান্তরিত করে	১০০০ টাকা ওজনের জন্য	৫৪ দাম

উপরোক্ত ছক থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, মুদ্রা তৈরির সাথে যুক্ত পেশাজীবীরা অন্যদের তুলনায় বেশি পারিশ্রমিক পেতো। এছাড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে জড়িত বণিক, শেঠ, সাহু বা মহাজন, পোদ্দার, বেপারি প্রভৃতি পেশার ব্যক্তিগণ আরো বেশি লাভ করত। তাদের বাট্টার টাকা ইচ্ছে মতো বাড়াতে পারত এবং তাদের কোনো কৈফিয়ত দিতো হতো এমন প্রমাণ খুব কমই আছে। এছাড়া হুণ্ডি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের অঞ্চলিক প্রতিনিধিরাও প্রত্যেকেই পর্যাপ্ত অর্থের মালিক ছিল। মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত সকল শ্রেণির লোকই আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশালী ছিল।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, সুলতানী শাসনামলে মুদ্রার প্রচলন ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মুদ্রা স্থবির সমাজকে সচল করার একমাত্র মাধ্যম। মুদ্রানির্ভর সমাজব্যবস্থাই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করে। প্রাক-মুসলিম যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং বাণিজ্যিক বন্দরগুলো ব্যবহারের অভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। শাসকগণ শুধুমাত্র রাজধানী শহর থেকেই নয়, বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং বিজিত নতুন এলাকার টাকশাল থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। আলোচ্য সময়ের বেশকিছু টাকশালের নাম জানা যায়। মুদ্রা তৈরির সাথে নানা শ্রেণির কারিগর ও পেশাজীবী শ্রেণির লোক যুক্ত ছিল। প্রত্যেক বংশের শাসকের সময় মুদ্রায় উৎকীর্ণ কালেমা, মুদ্রার লিপি, উপাধি, প্রতীক চিহ্ন প্রভৃতি প্রায়ই আলাদা হতো। বাংলায় তিন শ্রেণির মুদ্রার প্রচলন ছিল, তবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল রৌপ্য মুদ্রা। এছাড়া স্থানীয় ব্যবসা, হাট-বাজারে কেনাকাটা তঙ্কা এবং কড়ির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। সুলতানী শাসনাধীনে একদিকে মুদ্রার প্রচলন অন্যদিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সম্প্রসারিত হয়। অর্থনৈতিকভাবে

সমৃদ্ধিশালী পরিবারই ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে সংযুক্ত ছিল। যেমন- জগৎ শেঠ পরিবার। তারা লক্ষ লক্ষ টাকার হুণ্ডি কাটত। এসব পরিবারই ছিল এক একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক। অনেক ক্ষেত্রে বণিকগণও ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল। তারা ছিল আদৌতে বণিক এবং এর পাশাপাশি ব্যাংকের প্রতিনিধি। হুণ্ডি ব্যবসা ছিল ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এসব ব্যাংক মালিকদের অনেক প্রতিনিধি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। হুণ্ডি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নগদ টাকা প্রেরণের ঝুঁকি থেকে মালিককে রক্ষা করে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হুণ্ডিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাট্টা দিতে হতো। মৌসুম অনুযায়ী বাট্টার হারও বেড়ে যেতো। বিদেশি বণিকদের জাহাজ বাংলায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করত এবং ঐ সময়ে বাট্টার পরিমাণ বেশি থাকত আবার বণিকগণ মালামালসহ ফেরত গেলেই হুণ্ডিতে বাট্টার টাকার পরিমাণ হ্রাস পেতো। বর্ষাকালেই তারা বাংলায় অবস্থান করত। এসময়ে তারা বাংলা থেকে প্রচুর পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত এবং বর্ষা শেষ হলেই বণিকগণ জাহাজভর্তি মালামাল নিয়ে ফেরত যেতো। বণিকগণের ফেরার পর গোয়াসহ অন্যান্য বন্দরগুলোতে বাংলার পণ্যসামগ্রীর ঢল নামত। এককথায় বলা যায়, মুদ্রার প্রচলন ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে রপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি পায়, নগরায়ণ বিকশিত হয়, নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে ও কর্মসংস্থানের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তৎকালীন বাংলায় এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে যার ওপর ভিত্তি করে মোগল বাংলার ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরো বেশি সম্প্রসারিত হয়। ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর নানারকম মুদ্রা চালু থাকলেও ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ– মোগল বাংলায় ইউরোপীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ন্যায় যে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি ছিল সুলতানী বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাক-মোগল বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন

সপ্তম অধ্যায়

প্রাক-মোগল বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলার মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে প্রাক-মোগল বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের সফলতায় বাংলায় মুসলিম শাসন ব্যাপ্তি লাভ করে স্বাধীন সালতানাতে পরিণত হয়। এ সময়ে বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। একত্রীভূত বাংলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজ্যগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ টানাপোড়নের বিলোপ সাধন ঘটে। মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে এবং বাংলা তদানিন্তন বিশ্বের একটি সম্পদশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তবে এ সমৃদ্ধিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও যে বিপুল ভূমিকা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেন আমলের বাণিজ্যিক স্থবিরতা কাটিয়ে মুসলিম আমলে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এটি মুসলিম শাসনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক কাজ করেছিল বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন তাহলো- ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ির পরিবর্তে মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুলতানগণের সরাসরি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। এছাড়াও কৃষিজ ও বহুমুখী শিল্পপণ্যের প্রাচুর্য, নগরায়ণ তথা নতুন নতুন নগরীর গোড়াপত্তন ও বিকাশ, বন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিদেশি বণিকদের জন্য বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশ, বাণিজ্যপথ, আমদানি ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্য, বিদেশি বণিকদের আগমন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মহাজন ও বণিকদের অবস্থা, হুণ্ডি ব্যবস্থা এবং দাদনি প্রথা, ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভর নতুন নতুন পেশাজীবী শ্রেণি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিজ পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন এবং কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে নদীমাতৃক বাংলা সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যবান্ধব দেশ হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করে। শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, বহির্বাণিজ্যের জন্যও বাংলার খ্যাতি ছিল সুবিদিত। বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের এ গৌরবদীপ্ত অধ্যায় পাল শাসনামল পর্যন্ত মোটামুটি অব্যাহত ছিল। তারপরই ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধোগতি শুরু হয় এবং সেন শাসনামলে এসে তা স্থবির হয়ে পড়ে। বাংলা তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে হারিয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও পতন ঘটে।[১] অর্থাৎ বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধোগতির ফলে সেন যুগে বাংলা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। এই অধোগতির নানা কারণ রয়েছে তন্মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছিল অন্যতম। তদুপরি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে অনুদার মনোভাব, মুদ্রার অনুপস্থিতি, ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সমুদ্র যাত্রায় অনীহা, কঠোর বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থায় বণিক ব্যবসায়ীদের সামাজিক অবস্থানের অধোগতি প্রভৃতি কারণে তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে মুদ্রার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মুদ্রা দ্বারাই বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয়ে থাকে। তেরো শতক পর্যন্ত বাংলায় রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ দাবি করেন এবং সমকালীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে এ দাবির যথার্থ প্রমাণ মেলে।[২] মূলত সেন শাসনামলে বাংলায় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি (Money economy) অনুপস্থিত ছিল[৩] এবং রাজা লক্ষ্মণ সেন কড়ির মাধ্যমে দান ও উপহার প্রদান করতেন এর প্রমাণ রয়েছে।[৪] সেনামলে বাংলার বাণিজ্যের দুর্গতির মূখ্য কারণ ছিল মানসম্মত মুদ্রার অনুপস্থিতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের গৌরবের যুগে তাম্রলিপ্তি ছিল প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এ বন্দরের সমৃদ্ধির কথা ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণীতে স্থান করে নিয়েছিল।[৫] কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার

[১] মমতাজুর রহমান তরফদার, 'প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজ', *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮৯.

[২] অনিরুদ্ধ রায় দাবি করেছেন যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (১২০০-১৭৫৭)*, মিত্রম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১৬.

[৩] M R Tarafdar, *Trade Technology and Society in Medieval Bengal*, International Center for Bengal Studies, University of Dhaka, 1995, pp. 11-26; নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ১২১.

[৪] Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, vol.1, eng.tra. Major. H.G.Raverty, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1881, reprint: Oriental Book Corporation, New Delhi, 1970, pp. 427, 555-556.

[৫] তাম্রলিপ্তি বন্দরটি ভাগিরথী নদীর উপর এবং সমুদ্র মোহনার কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ প্রমুখের বর্ণনায় এর সমৃদ্ধি ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণে এই বন্দরের তেমন কোনো কার্যক্রম দেখা যায় না। এছাড়া সেনামলে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো এমন উল্লেখযোগ্য কোনো বন্দরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না।

সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন

তোরো শতকের সূচনালগ্নেই ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। মুসলিম বিজয়কে বাংলার জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা, এ বিজয় বাঙালিদেরকে কেবল একটি রাজনৈতিক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ ও একক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে সহায়তা করেনি বরং তাদের অর্থনৈতিক জীবনেও উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছিল। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং বাংলা পৃথিবীর একটি অন্যতম সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়।[৬] একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পেছনে চারটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপাদানগুলো হলো- (১) কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের প্রাচুর্য, (২) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা, (৩) ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং (৪) স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতব পদার্থের প্রাচুর্য। মুসলিম শাসনাধীনে বাংলা আর্থিক সমৃদ্ধির এ চারটি নিয়ামকের অধিকারী ছিল বলে সমসাময়িক ইতিহাসবিদ ও পরিব্রাজকদের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। সুলতানী বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য পুনরুজ্জীবনের কতিপয় কারণ রয়েছে। এ সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো –

সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়েই বাংলায় মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া ও গৌড় বিজয়ের পর গৌড় থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরির নামে স্মারক মুদ্রা জারি করেন।[৭] এই মুদ্রাই ছিল বাংলা থেকে জারি করা প্রথম মুসলিম স্বর্ণমুদ্রা। পরবর্তীতে গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজি (১২১৩-২৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং অন্যান্য শাসকগণও মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। তারা সম্ভবত ব্যবসায়-বাণিজ্যের লেনদেনের কথা মাথায় রেখেই মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তবে তেরো শতকে লখনৌতির টাকশাল থেকে যেসব মুদ্রা চালু করা হয়েছিল, সেসব মুদ্রা কেবল বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি, এসব মুদ্রা সুলতানদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবেও চিহ্নিত হতো।

---

৬ Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* (1201-1576), vol.1, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, p. 384

৭ Minhaj-i-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, vol. 1, p. 427

আলোচ্য সময়ে বাণিজ্যিক পর্যায়ে লেনদেন হিসেবে আন্তর্জাতিকমানের এসব মুদ্রা ব্যবহৃত হওয়ায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়।

বাংলার অনেক টাকশাল শহর থেকে বিভিন্ন আকারের ও ওজনের মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হতো। বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক লেনদেনে মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। মাহুয়ান বাংলায় তঙ্কা নামের রূপার মুদ্রা এবং কড়ির ব্যাপক প্রচলন দেখেছিলেন। তিনি বলেন যে, মুদ্রার মাধ্যমে বাণিজ্যিক বড় বড় সব লেনদেন হতো কিন্তু অল্পমূল্যের জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সামুদ্রিক খোলা কড়ি ব্যবহার করত।[৮] স্বাধীন সুলতানী আমলে মুদ্রার ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এ সময় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। ইবনে বখতিয়ার খলজির (১২০৪-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ), আলী মর্দান খলজির (১২০৬-১২০৭ খ্রিস্টাব্দ), গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ (১৩১০-১৩২৩ খ্রিস্টাব্দ), ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ), সুলতান মুজাফফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ), আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টব্দ) ও নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি শাসকগণের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা মজুত ছিল বলে গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন। রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। রৌপ্যমুদ্রার মান ছিল সাধারণত ১৬৬ গ্রেন আবার কখনো ১৬০ গ্রেনও লক্ষ করা যায়। তাম্রমুদ্রার সংখ্যা তুলনামূলক কম। বাংলায় প্রচলিত মুদ্রার নাম তঙ্কা হলেও শেরশাহের মুদ্রার নাম ছিল আলাদা। শেরশাহের প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার নাম আশরাফি, রৌপ্যমুদ্রার নাম রুপিয়া এবং তাম্রমুদ্রার নাম ছিল পয়সা।[৯] হোসেন শাহী শাসনামলে বাংলায় তিন রকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যার গড় ওজন যথাক্রমে ১৬০ গ্রেন, ৮০ গ্রেন এবং ৪০ গ্রেন। মুদ্রাতত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যকে মমতাজুর রহমান তরফদার সমকালীন বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারমানতার দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করেন।[১০] সুলতানী যুগের মুদ্রা অর্থনীতির এ বিকাশকে তদানিন্তন বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১] বাংলায় ব্যাপকভাবে মুদ্রার প্রচলন ব্যবসায়-বাণিজ্যকে বিকশিত করেছিল।

---

৮ Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan*,The overall Survey of The Ocean's Shores, Translated from the Chinese text edited by Feng Ch'eng-Chin with introduction, notes and appendices by- J. V. G. Mills, The Hakluyt Society at the University Press, Cambridge, 1970, p. 161

৯ M.R.Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, pp. 159-160; *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, সম্পাদক, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২৮

১০ এম.আর তরফদার, 'বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ-বিভাগ সমস্যা', *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০.

১১ নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫-১৯৮; অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮.

ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটি পূর্বশর্ত। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে বিভক্ত থাকায় এখানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। সুলতানী শাসনের সূত্রপাত হলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। যদিও স্থানীয়দের সাথে বিরোধ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রদেশ পালদের প্রায়শই বিদ্রোহ চলত। অন্যদিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রমুখী প্রবণতা ইত্যাদি বাংলায় কিছুটা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজশাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) বিশ বছর স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করায় তখন থেকেই বাংলা রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ছিল।[১২] মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, চতুর্দশ শতক থেকে এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়।[১৩] অর্থাৎ ইবনে বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হলে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফকরউদ্দিন মোবারক শাহের সোনারগাঁও-এর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন সালতানাতের গোড়াপত্তন হয়। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলকে একীভূত করে বাংলা সালতানাত (১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ) নামের বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক সত্তার আবির্ভাব ঘটান।[১৪] এজন্যই শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাকে ইলিয়াস শাহকে *শাহ-ই-বাঙ্গালা, শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান* বা *সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ* হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৫] এই রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার ফলে বাংলা রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হয় এবং বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় আমদানি-রপ্তানির নিশ্চয়তা তৈরি হয় এবং শিল্প কারখানায় উৎপাদন বেড়ে যায় পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল।

সুলতানগণ বণিকদেরকে রাজপৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করায় বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। শাসকগণ নিজেরাও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতেন।[১৬] সুলতান আলী মর্দান খলজি (১২১০-১২১২ খ্রিস্টাব্দ) লখনৌতিতে আগত ইস্ফাহানের বণিকদেরকে অনেক অর্থ দান করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ) শিহাবউদ্দিনকে ভারতীয় পণ্যক্রয়ের জন্য একলক্ষ স্বর্ণ তঙ্কা

---

[১২] Syed Ejaz Hussain, ‘Crafts and Economy: Bengal Sultanate’ *History of Bengal, Sultanate and Mughal Period* (C.1200 to 1800 C. E), vol. 2, edited by Abdul Momin Chowdhury, Asiatic Society of Bangal, Dacca, 2020, pp.146-147

[১৩] মমতাজুর রহমান তরফদার, ‘প্রাক-মুসলিম যুগের বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমাজ’ পৃ. ৯০-৯২.

[১৪] Md. Akhtaruzzaman, *Society of Urbanization in Medieval Bengal*, p. 94

[১৫] Shams i-Siraj Afif, *Tarikh-i-Firuz Shihi*, Elite and Dowson (ed.), History of India, vol. 3, Allahabad, p. 296

[১৬] M.R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p.100

দিয়েছিলেন।[১৭] শাসকগোষ্ঠী বিদেশি বণিকদেরকে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বণিকগণ অভিজাতশ্রেণির বিলাসজাত দ্রব্যাদি যেমন- সিল্ক, চাইনিজ পোশাক, কসমেটিক, ফল, বিরল জাতীয় মসলা, প্রভৃতি সরবরাহ করত।[১৮] অভিজাতশ্রেণির চাহিদাসম্পন্ন এসব পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন দেশ হতে আমদানি করতে হতো। ফলে তাদেরকে রাজপৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হতো। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে শাসকগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন তাঁর তথ্য মাহুয়ান, তোমে পিরেস ও অন্যান্য সমকালীন রচনা থেকে জানা যায়। মাহুয়ানের বর্ণনা থেকে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের চীন সম্রাট ইয়াংলুর দূত ও পণ্য বিনিময়ের কথা জানা যায়।[১৯] এছাড়া তোমে পিরেসের বর্ণনায় মাল্লাক্কার সাথে বাংলার সুলতানদের বাণিজ্য সম্পর্কের কথাও আলোচিত হয়েছে।[২০] তদুপরি সুলতানগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারে বণিকদের নানারকম সহযোগিতা দিয়েছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হয়। শিল্পবিকাশে সহায়তা প্রদান করা হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে বণিক ও ব্যবসায়ীদের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করায় অনেকেই এ পেশার সাথে নিজেকে যুক্তকরণে আগ্রহী হয়। বিদেশি ব্যবসায়ীরাও বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে আসে। তরফদারের মতে, আলোচ্য যুগে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রকে এক অবিচ্ছিন্ন স্বার্থের সম্পর্কসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল।[২১] সর্বোপরি সুলতানী যুগে মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটায় ব্যবসায়-বাণিজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে।[২২] মূলত এ সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল।

---

[১৭] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 357

[১৮] *Ibid,* pp. 345-346

[১৯] Ma Huan, *op.cit.*, pp.160-162

[২০] Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, An account of the east, from the Red sea to Japan written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Translated from the Portuguese Afs in the Bibliotheque de la chamber des Deputes, Paris and edited by Armando Cortesao, vol. 1, Hakluyt Society , London, 1944, pp. 90-92

[২১] এম আর তরফদার, 'বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও যুগ-বিভাগ সমস্যা', পৃ. ১১০

[২২] ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলায় অঙ্কিত কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এ সময় মুদ্রা সম্ভবত বিনিময় বা আর্থিক লেনদেন হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। এসব মুদ্রা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। আর্থিক লেনদেন হিসেবে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল মূল স্বাধীন সুলতানী যুগে। সুলতানী বাংলায় যে প্রক্রিয়ায় মুদ্রা জারি করা হতো সেগুলো হলো-ক. ওয়ালী বা ইকতাদার দ্বারা জারি করা দিল্লির সুলতানদের নামে মুদ্রা, খ. দিল্লির নিয়োগপ্রাপ্ত ইকতাদারদের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ইকতাদারদের নিজ নামে মুদ্রা, গ. দিল্লির সুলতান ও ইকতাদারদের যৌথ নামের মুদ্রা; এবং ঘ.বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা। Md.Rezaul Karim, A Critical Study of the Coins of the Independent Sultans of Bengal, *Unpublished Ph.D Thesis*, Dhaka University, 2001, p. 19; সুলতানী আমলে বাংলার ১৫টি টাকশালের নাম পাওয়া যায়। টাকশালগুলো হলো গিয়াসপুর, শহর-ই-নও, মুয়াজ্জেমাবাদ, জান্নাতাবাদ, ফতেহাবাদ, রোটাসপুর, মাহমুদাবাদ, বারবাকাবাদ, মুহুম্মদাবাদ, হুসাইনাবাদ, চন্দ্রাবাদ, নুসরাতাবাদ, খলিফাতাবাদ, খলিফাতাবাদ বদরপুর। এসব টাকশাল থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা উৎকীর্ণ করা হতো। Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal*, (Down to A. D. 1538), Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1960, pp.157-165; Richard M Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal frontier*, London, 1994, pp. 317-321

সুলতানী শাসনাধীনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। এ সময়ে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। বস্ত্র উৎপাদনে 'চরকার' ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে বস্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় ছয়, সাতগুণ বেড়ে যায়।[২৩] বাংলার তৈরি বস্ত্রের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আলোচ্য সময়ে বাংলায় বিভিন্ন নামের বস্ত্র তৈরি হতো এবং বিদেশে এসব বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। এসব বস্ত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এদেশে তৈরি নানারকম বস্ত্র সম্পর্কে বার্বোসা বলেন যে,

> বাংলায় প্রচুর সুতা আছে। তারা সূক্ষ্ম ও মিহিন অনেক প্রকারের বস্ত্র তৈরি করে। এসব বস্ত্র তারা নিজেদের জন্য রঙিন করে এবং ব্যবসায়ের জন্য সাদা রাখে। এগুলো খুবই মূল্যবান কাপড়। কিছু বস্ত্রকে তারা ইসত্রাভানতিস (estraventes) বলে। এটা এক বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড়। যা আমাদের মধ্যে মহিলারা শিরোভূষণের জন্য এবং মুর আরব ও ইরানিরা পাগড়ির জন্য খুবই পছন্দ করেন। এসব কাপড় এত বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করা হয় যে এগুলো পণ্য নিয়ে অনেকগুলো জাহাজ বিদেশে যায়। অন্যান্য যেসব কাপড় তারা তৈরি করে সেগুলো মামনা (mamonas), দুগুয়াজা (duguazas) চৌতারী (chautares) এবং সিনাবাফা (sinabafas) নামে পরিচিত ছিল। সিনাবাফাকে সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় বলে মনে করা হয় এবং মুরেরা শার্ট তৈরি করার জন্য এটাকে খুব পছন্দ করে। এ সকল কাপড় খণ্ড খণ্ড এবং প্রতিটি খণ্ড কাপড় পর্তুগিজ গজে প্রস্থে ৩ বা ৪ ও দৈর্ঘ্যে ২০ গজ ছিল। . . . এগুলোর সুতা চরকায় কাটা হয়।[২৪]

বাংলায় তৈরি হতো আরো তিনটি কাপড়ের তথ্য পাওয়া যায় চৈনিক বিবরণে। কাপড়গুলো হলো সাহালা বা সাকালাত (হালকা পশমি জমিনের কাপড়), জেফু (আরবি সাফ), এক ধরনের পশমি কাপড় (কম্বল টাইপ) ও হেই দা লেবু এক ধরনের মোটা কালো কাপড়।[২৫] অন্যদিকে পর্যটক ভার্থেমা বৈরাম (biram), মামোন (momone), লিজাতি (lizati), সিয়ানতর (ciantar), দোয়াজর (doazar) এবং সিনাবফের (sinabaff) মতো বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[২৬] এছাড়া মাহুয়ান তাঁর বিবরণে পি চিহ (pi-chih), মান-চেতি (man-cheti), শা-না-কিহ (sha-na-kieh), হিন-পি-তুং-তা-লি (hin-pei-tung-ta), শা-তা-উর (sha-ta-urn), মোহ-হি-মো-লে (mo-hei-mo-leh) নামে পরিচিত নানা রকম মিহি সুতিবস্ত্রের কথা বলেছেন।[২৭] পর্যটক মার্কো পলো, ইবনে বতুতা, সিজার ফ্রেডারিকের বিবরণীতেও

---

[২৩] সুলতানী যুগে বিকাশমান প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে M R Tarafdar, *Trade Technology and Society in Medieval Bengal,* International Center for Bengal Studies, University of Dhaka, 1995, pp. 69-104; ইরফান হাবীব সম্পাদিত, *মধ্যকালীন ভারত*, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কো. ১৯৯০, পৃ. ২৩

[২৪] Barbosa, *op.cit.,* vol. 2, pp. 145-14

[২৫] Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire,* Oxford University Press, 1982, pp. 69-70

[২৬] Varthema, *The Travels of Ludovica Di Varthema,* p. 212

[২৭] Ma Huan, *op.cit.,* pp. 162-163

বাংলার সুতিবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮] বাংলার তৈরি এসব উন্নতমানের বস্ত্র বেশির ভাগ অভিজাতশ্রেণি ব্যবহার করত এবং বিদেশে এসব উন্নত বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল ফলে এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলার কারিগরগণ মসলিনের মতো অনেক সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের বস্ত্র এবং রেশম বস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম ছিল। তবে অভ্যন্তরীণ বাজারে এগুলোর কিছু ক্রেতা ছিল। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাজারে বস্ত্র সম্ভারের মধ্যে মোটা সুতি কাপড়ের চাহিদাই বেশি ছিল। পাট থেকে উৎপাদিত বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিশেষ চাহিদা ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে উল্লেখ রয়েছে।[২৯] সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাট ও পাটজাত বস্ত্রের উৎপাদনের ও প্রচুর চাহিদার কথা উল্লেখ আছে। সাধারণ ঘরের বাঙালি মেয়েরা পাটের তৈরি নানা রকমের শাড়ি বা পাটবস্ত্র পরিধান করতেন বলে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*, দীনেশচন্দ্র সেনের *ময়মনসিংহ গীতিকা*, বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলসহ* পনেরো-ষোল শতকের সাহিত্যিক অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায়।[৩০] বার্থেমা ও তরফদারের বর্ণনাতেও একই কথা উচ্চারিত হয়েছে।[৩১] উৎপাদিত চিনি স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে কেনাবেচা হতো এবং উদ্বৃত্ত অংশ ভারতসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হতো।

বাংলার নগরায়ণ বা নগরসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ ব্যবসায়-বাণিজ্য বিকাশের অন্যতম কারণ। সুলতানী যুগে যেসব নগরীর গোড়াপত্তন ও বিকাশ সাধিত হয়েছিল, তন্মধ্যে- গৌড়, পাণ্ডুয়া, নদীয়া, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, দেবকোট, হুগলি, সাতগাঁও প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কারুশিল্প ও কারিগর শ্রেণিসহ সকল পেশাজীবী তথা ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু সকল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য নতুন শহর বা নগরের প্রবেশদ্বার ছিল উন্মুক্ত। এসব নগর, বন্দরগুলোতে বসবাসরত নাগরিকদের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিপণি ও বাজার গড়ে উঠে এবং বণিক ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।[৩২] প্রতিটি নগরে অন্তত একটি বাজার থাকত এবং এসব বাজারে পাশের কৃষিভিত্তিক অঞ্চলগুলো থেকে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করত। নগর বা শহরে বসবাসরত অভিজাতবর্গ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের

---

[২৮] Marco Polo, *The Book of Marco Polo*, vol. 2, p.115; Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta*, p. 235

[২৯] পাট যে কেবল বাঙালির বস্ত্র বয়ন ও অন্যান্য কাজে লাগতো তা নয়, পাট-পাতা বাঙালির জনপ্রিয় সব্জি জাতীয় খাবারও ছিল। প্রাকৃত পিঙ্গল গ্রন্থের বর্ণনা মতে, সেই স্বামীকে সৌভাগ্যবান মনে করা হতো যদি তার স্ত্রী তাকে গরম ভাত, খাঁটি ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল ও পাট শাকের তরকারি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৩

[৩০] নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩৭; M A Rahim, *op.cit.*, pp. 386

[৩১] J N Das Gupta, *Bengal in the Sixteenth Century A.D*, p. 117; M A Rahim, *op.cit.*, pp. 386-387

[৩২] এম আর তরফদার. প্রাক-মুসলিম যুগের ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯০-৯২; Tapan Ray Chaudhuri and Irfan Habib (ed.), *Tha Cambridge Economic History of India*, vol.1, c. 1200- c. 1750, Orient Blackswan Private Limited, Cambridge University Press, 1st Published, 1984, Reprint. 2014, p. XII

চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন জন্য দোকান ছিল। রাজধানী, নগর, বন্দর ও প্রশাসনিক নগর ছাড়া স্থানীয়ভাবে সব শহরে বসবাস করত ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক যেমন- জমিদার। এসব জমিদারগণ ভূমিরাজস্ব থেকে পাওয়া অর্থ দিয়েই জীবনধারণ করত। অর্থাৎ তাদের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এভাবে স্থানীয় পরিসরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হতো।

আলোচ্য সময়ে অভিজাতশ্রেণির চাহিদা পূরণ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবনের অন্যতম কারণ। সুলতানী বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শাসক ও অভিজাতশ্রেণির রুচি ও জীবনাচরণ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ভিন্ন রকমের ছিল। তাঁরা বিলাসী জীবনযাপন করতেন। চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ানের বিবরণীতে সমকালীন মুসলিম রাজন্য ও অভিজাতদের জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। তাদের বিলাসী জীবনযাপনের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে নানা রকমের বিলাসদ্রব্য আমদানি করা হতো। তবে বিলাসজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মাথায় রেখে স্থানীয় উৎপাদকগণও কিছু পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতেন। ভোক্তারা স্থানীয় বাজার থেকে তা ক্রয় করতেন। অভিজাত ব্যক্তিগণ স্থানীয় বাজার থেকে চামড়ার তৈরি জুতা, চটি, গহনা, সুগন্ধি ও মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করতেন। দেশজ ও আমদানিকৃত বিলাসদ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শহর ও নগরীগুলোতে তুলনামূলক উন্নত ধরনের দোকান বা বিপণি গড়ে উঠেছিল। এসব দোকানসমূহে কর্পুর, জাফরান, কুমকুম, বিদেশি জুতা, নানা রকমের সুগন্ধি পণ্য, রেশম বস্ত্রসহ নানা রকমের উন্নতমানের বস্ত্র পাওয়া যেতো। এ সকল বিদেশি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশেও তা সহায়ক হয়েছিল।[৩৩] ইজাজ-ই-খসরু উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন শহরগুলো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[৩৪] বড় বড় শহরগুলোতে অভিজাত মুসলিম ও উচ্চবিত্তশ্রেণির লোকজন বসবাস করায় সেখানে বিলাসজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বেশি ছিল। তাই রাজধানী এবং শহরকে ঘিরেই বিলাসজাত দ্রব্যের মূল ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো।[৩৫] অর্থাৎ তেরো শতকের প্রথমদিকেই বাংলার বাজারসমূহে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান, খাবারের দোকান, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য বিপণি বিতানের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। যা চৌদ্দ ও পনেরো শতকের বাংলার গতিশীল বাণিজ্যিক অর্থনীতির কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।

---

[৩৩] Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009, pp. 343-348

[৩৪] *Ibid*, pp. 346-348

[৩৫] *Ibid*

উল্লেখ্য যে, তেরো শতকেই বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটা বড় পরিবর্তন আসে। কারণ সমসাময়িক সময়ে সেলজুক তুর্কিরা ক্রমশ পারস্য উপসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এ সময়ে মোঙ্গল আক্রমণকারীরা মধ্য এশিয়ার অনেকটা অংশ দখল করলে বাগদাদ শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আরবদের সমুদ্র যাত্রার ভাটা পড়ে। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক পার্থক্য ছিল। পারস্য উপসাগরের বণিকরা সাধারণত ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছে তিনটি স্তরে ভাগ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলো হয়েই চীনে যেতো। লোহিত সাগরের বাণিজ্য হতো পূর্ব উপকূল দিয়ে, যার মধ্যে বাংলার চট্টগ্রাম একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছিল।[৩৬] অর্থাৎ আলোচনাধীন সময়ে লোহিত সাগরের বাণিজ্য বাড়ার সাথে সাথে ভারতের পূর্ব উপকূলের বাণিজ্য ও বাংলার চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্যের উন্নতি হতে থাকে। বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে অরুণ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, তেরো চৌদ্দ শতকে আরব ও ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে চীনা ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারও এই বাণিজ্যিক প্রসারের কাজে সহায়ক হয়েছিল।[৩৭] তবে চীনের ভূমিকা তেরো ও চৌদ্দ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্তই সক্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে চৌদ্দ ও পনেরো শতকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল এমনকি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। চীনা বণিকগণও এই সময় জাভা, মালয় ও ভারতের উদীয়মান বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল এবং এই সময়ে আন্তর্জাতিক নব্য উদীয়মান দেশগুলোই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।[৩৮] আন্তর্জাতিক এই বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের সাথে বাংলার বণিকরা সক্রিয় ভূমিকা রাখত।

ঐতিহাসিক সূত্র ও পর্যটকদের বিবরণ ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্ত (১৪৮৪-১৪৮৫) *মনসামঙ্গলে* ও মুকুন্দরামের (১৫৪৪-১৫৭৭) *কবিকঙ্কন চণ্ডীতে* উল্লেখ রয়েছে যে, বাঙালি সওদাগরেরা অতি বৃহৎ বাণিজ্য তরী নিয়ে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল ধরে সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরব সাগরের পূর্বদিক হয়ে সওদা করতে করতে গুজরাটে পৌঁছাতেন।[৩৯] বাঙালি বণিকরা সাধারণত বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতে যেতেন। এছাড়া *মঙ্গলকাব্যে* উল্লেখ রয়েছে যে, বিদেশের সাথে বাণিজ্যের জন্য চাঁদ সওদাগরের ছিল চৌদ্দ ডিঙ্গা আর ধনপতির ছিল সাত ডিঙ্গা। প্রত্যেক নৌকারই আলাদা আলাদা নাম ছিল।[৪০] সুলতানী

---

[৩৬] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, পৃ. ৫২১

[৩৭] *Aspects of Bengals Sea Borne Commerce in the Pre-European Period*. pp. 144-151

[৩৮] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১১৩

[৩৯] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮

[৪০] মধুকর, মধুপাল, দুর্গাবর, গুয়ারেখি, শঙ্খচুর, ছোটমুঠি, শতগজ, মকরমুখী, রণজয়া, রণভীমা, সর্বধরা, চন্দ্রতারা, নাটশালা,আগল-পাগল, চন্দনপাট, টিঞাঠুটি, যাত্রাবর, সুতারেখি, হিঙ্গুলবাড়ি, কাজলরেখি, শঙ্খচুর, রত্নমালা, উদয়তারা প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ও আকৃতির ডিঙা ও

বাংলায় ব্যাপক মুদ্রার প্রচলন থাকায় স্থানীয় বণিকগণও মুদ্রার দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। অনেক সময় মুদ্রার বাইরেও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য বিনিময় হতো। মুকুন্দরাম *কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে* উল্লেখ করেন যে, ধনপতি সওদাগর সিংহলের রাজাকে[৪১] এরূপ বিবরণ দিয়েছেন।

বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায় মাহুয়ানের বিবরণ থেকে- বাংলার সুলতানরা নিজেদের জাহাজ দ্বারা তাঁদের বৈদেশিক বাণিজ্য চালাতেন।[৪২] দক্ষিণ উপকূলের সুলতান ও রাজারা এই ধরনের বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল। তৎকালীন বাংলার বণিকরা প্রচুর মালামাল ও টাকা নিয়ে দেশে ফিরত। বাংলার বণিকরা আরব সাগর, সিংহল, উড়িষ্যা, করমণ্ডল পার হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বন্দরে যেতো। বারথেমার বিবরণ থেকে জানা যায়, বাংলার বণিকরা লোহিত সাগর ও আরব সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। পর্যটক বার্বোসা (১৫১৬-১৫৮১) বলেন যে,

> এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তরভাগে বহু নগরী আছে। ভেতরের নগরগুলোতে হিন্দুরা বাস করে। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলোতে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই আছে। তারা জাহাজে করে বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়। আরব, পারস্য, আবিসিনিয়া ও ভারতবাসী বহু বণিক এসকল নগরে বাস করত। এদেশের বণিকদের বড় বড় জাহাজ আছে এবং জাহাজগুলোতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে তারা করমণ্ডল উপকূল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, সুমাত্রা, লঙ্কায় যায়।[৪৩]

বাংলায় কাশ্মিরী বণিকরাও বাণিজ্য করত। তারা অগ্রিম টাকা দিয়ে সুন্দরবনের লবণ চাষিদের দিয়ে লবণ তৈরি করাত। কাশ্মির ও আর্মেনিয়ান বণিকেরা বাংলা থেকে চামড়া, নীল, তামাক, চিনি, অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ও বস্ত্র নিয়ে নেপাল ও তিব্বতে বিক্রি করত।[৪৪] বাঙালি সওদাগরেরা ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করত। ষোড়শ শতকের জয়নারায়নের *হরিলীলা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, একজন বৈশ্য বণিক ভারতের যেসব স্থানে বাণিজ্য করতে যেতেন তন্মধ্যে- হস্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মির, পাঞ্জাব, কম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, অযোধ্যা, অবন্তী, কাম্পিল্য,

---

নৌকার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত সওদাগরগণ নিজেরাই এতে ভ্রমণ করতেন। এসব ডিঙ্গা নদীতে ডোবান থাকত, বিদেশ যাত্রার পূর্বে ডুবুরিরা নৌকা উঠাতেন।

৪১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উল্লেখ করেন যে ‘বদলাশে নানা ধন অ্যানাছি সিংহলে
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কতূহলে।।
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুচের বদলে ডঙ্গ (টঙ্ক)।
পিড়ঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

৪২ Ma Huan, *op.cit.*, p.165

৪৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০

৪৪ *ঐ*, পৃ. ১৬০

মায়াপুরা, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চন্দ্রকান্ত নামে মল্লভূমির একজন গন্ধবণিক সাতটি জাহাজে বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে গুজরাটে গিয়েছিলেন।[৪৫] উল্লেখিত স্থানগুলোতে ভারতীয় বণিক ছাড়াও বাংলার বণিকেরা পণ্যদ্রব্যাদি নিয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশ

আলোচ্য সময়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। এ সময় প্রশাসনিক দিক থেকে গ্রামগুলো প্রায় স্বাধীন ছিল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পন্ন। গ্রামকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন বাংলার মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে একটি বাজার বসত এবং অভ্যন্তরীণ এই বাজারসমূহ 'হাট' নামে পরিচিত ছিল। এসব হাটগুলো আয়তনে অনেক বড় ছিল। বাংলার গ্রামের হাটের বর্ণনা দিয়ে র‍্যালফ ফিচ উল্লেখ করেন যে, বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে একটি করে হাট/ বাজার আছে। এই হাটগুলোকে তারা 'চ্যাঙে' বলে। অধিবাসীদের 'পেরিকোস' নামক নৌকা আছে। তারা এই নৌকা করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। হাট থেকে চাল ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে। এই সকল নৌকায় ২৪/২৬টি দাঁড় আছে কিন্তু নৌকার কোনো আচ্ছাদন নেই।'[৪৬] যে সব নৌকায় ২৪ বা ২৬টি দাঁড় ছিল সেসব নৌকায় অনেক পণ্য পরিবহণ করা যেতো। এই পণ্য পরিবহণ স্থানীয় বাজারের উদ্দেশ্যে করা হতো বলেই ধারণা করা যায়। গ্রামীণ কৃষক ও উৎপাদক শ্রেণি নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে বাজারে তাদের পণ্যদ্রব্য বেচাকেনার উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতো। হাটগুলো সাধারণত সপ্তাহে দু'বার, সপ্তাহান্তে বা দু'সপ্তাহে একবার গ্রামের নির্দিষ্ট এলাকায় বসতো। এসব হাটে গ্রাম্য কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য- ধান, পাট, গম, সরিষা প্রভৃতি বিক্রি করতেন। কৃষিজ পণ্য ছাড়াও এসব হাটে গৃহপালিত পশুও বেচাকেনা হতো। উৎপাদক ছাড়াও গ্রামীণ হাটগুলোতে যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শস্য, মিষ্টান্ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। গ্রামীণ হাট-বাজারে স্থানীয় উৎপাদকদের বস্ত্রও বিক্রি করা হতো। স্থানীয় এসব বাজার থেকে পাইকারি বিক্রেতাগণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে শহর ও নগরে অধিক লাভের জন্য বিক্রি করত। মুসলিম শাসনে বাজারকেন্দ্রিক বাণিজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। পর্যটক মার্কো পলো, মাহুয়ান ও চৈনিক বিবরণীতে বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন, সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র, বিভিন্ন বর্ণের নিকাব, মিহি পর্দা (ফার্সি-সানাবফ), পাগড়ির সামগ্রী, নকশা করা সিল্ক এবং বুটিদার

---

[৪৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১

[৪৬] শ্রী যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, *সমসাময়িক ভারত*, ৪র্থ কল্প, ইউরোপীয় পর্যটক ১ম খণ্ড, প্রকাশক, শ্রী নলীনাক্ষ রায়, পাটনা, ১৩২২, পৃ. ৬৬

টাফেটা (পাতলা চকচকে কাপড় বিশেষ) উৎপাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৪৭] তবে এসব বস্ত্র সামগ্রীর মধ্যে সব ধরনের বস্ত্র গ্রামে উৎপন্ন হতো কিনা তা বলা মুশকিল। গ্রামে উৎপাদিত বস্ত্র গ্রামীণ হাটবাজারে বিক্রি হতো। কবি বিজয়গুপ্তের বর্ণনায়ও বস্ত্রশিল্পের কথা জানা যায়।[৪৮] এছাড়া গ্রামীণ বাজারে বস্ত্রসহ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী বেচাকেনা বহুমুখী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশ রয়েছে *কবিকঙ্কন চণ্ডী*তে।[৪৯]

গ্রামীণ হাটগুলো সাধারণত নদীর তীর কিংবা সহজ যোগাযোগব্যবস্থার অনুকূল স্থানে গড়ে উঠতো। তবে যে গ্রামের সন্নিকটে হাটগুলো বসতো, সেখানে শুধু ঐ নির্দিষ্ট গ্রামের ক্রেতা-বিক্রেতা নয়, পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রাম থেকেও ক্রেতা-বিক্রেতারা গ্রামীণ হাটে আসতেন। এ সময়ে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়েছিল। তাই ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনাও সংশ্লিষ্ট গ্রামে বেশি ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আসা গ্রামীণ হাটের বাজারজাত পণ্যের কিছু অংশ পাইকাররা কিনে নিয়ে অন্য শহর বা বিদেশে রপ্তানি করতেন। তবে গ্রামীণ হাটে বেচাকেনা হওয়া পণ্যের অংশবিশেষ স্থানীয় চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হতো। হাটগুলোর মধ্যে বিক্রমপুরের শাঁখারীবাজার, পাটহাট্টা, ইদ্রাকপুর, যশোরের পয়গ্রাম কসবা, নৌহাটি (বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনার পৌরসভা), গোলাহাট, চট্টগ্রামের অঙ্গারখালি, বালুখালি, চন্দন্যা হাট প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সুলতানী বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে এরূপ হাট-বাজার বাজারকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে বিকশিত করেছিল। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ কেবল তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার জন্য হাটে আসতেন না, চাহিদা অনুযায়ী তারা নিজেরাও কিছু কিছু পণ্যের ক্রেতা ছিলেন। গ্রামীণ হাটগুলোতে বেচাকেনা হওয়া পণ্যসামগ্রী একদিকে যেমন গ্রামীণ জনমানুষের প্রয়োজন মেটাতো, তেমনি এর অংশ বিশেষ শহরের রপ্তানি বাণিজ্যেরও যোগান দিতো।

---

[৪৭] Marco Polo, *The Travels of Marco Polo,* The Orient Press, New York, Book. 2, pp. 204-205; Ma Huan, *Ying-Yai Sheng-Lan,*The overall Survey of The Ocean's Shores, pp. 162-163; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, ২য় খণ্ড, সরকার পাবলিশিং এন্ড কো, কোলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৬১

[৪৮] বিজয়গুপ্ত তাঁর বর্ণনায় বলেন যে,

জোলা ছিল বড় ধনী
বুনাইয়া দিতো লাল ধুতি,
পরিয়া বেড়াইতাম বাড়ী বাড়ী।
....

চিকন কাপড় তাঁতে বিকেন বড় টান। বিজয়গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, সাল নেই, পৃ. ৬০

[৪৯] মুকুন্দরাম বলেন যে,

সুনার পাটত বৈসাতির বৈসএ হাট।

নানা বস্তু আনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী*, মুকুন্দরাম বিরচিত শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, সম্পাদনা, তরুণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬৪, ৩৯০

গ্রামীণ বাজারগুলোতে সাধারণত কড়ি ও পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে লেনদেন হতো। তবে গ্রামীণ এসব বাজারে পণ্য বিনিময়ের সাথে সাথে সীমিত পরিমাণে হলেও মুদ্রার ব্যবহার চালু হয়েছিল। অর্থাৎ- গ্রামীণ কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি ও অন্যান্য পেশাজীবীরা এ সময় মুদ্রা অর্থনীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। গবেষকদের ধারণা, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যই গ্রামীণ পর্যায়ে মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন বাড়ে। এভাবে গ্রাম পর্যায়ে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হলে বাংলা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে এক ধরনের মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। আর মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাবে গ্রামীণ ক্রেতা, উৎপাদক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে এক ধরনের নতুন সম্পর্ক ক্রেতা-বিক্রেতার[৫০] সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল গ্রামীণ মেলা। এসব মেলায় বৃহৎ পরিসরে পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান করা হতো। মেলায় উৎপাদকগণ পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে ভোক্তার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অর্থ লাভ করত। মেলায় সাধারণত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হতো। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পালা-পার্বণকে কেন্দ্র করে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে বিভিন্ন ধরনের মেলা বসত। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাওয়ার পথে জ্যৈষ্ঠ মাসে গৌড়ে আগমন করেন এবং রামকেলীতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। কবি জয়ানন্দ *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে 'রামকেলীকে'(বর্তমান মালদাহ জেলায়) কৃষ্ণকেলী বিশেষণে অভিহিত করেছেন। এই রামকেলীতে রূপ ও সনাতন চৈতন্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন। চৈতন্যের আগমনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'রামকেলীতে' অনেক বড় বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হতো।[৫১] বিভিন্ন উৎসবকে ঘিরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এরূপ আরো অনেক মেলা বসত। এসব মেলায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি যেমন- ঝুড়ি, বেতের তৈরি জিনিসপত্র, ছুরি, কাচি, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, শাখা ও শঙ্খের বিভিন্ন গহনা, পিতলের জগ, থালা বাসন, পানের বাটা, ঢাক-ঢোল, বাদ্যযন্ত্র, তীর-ধনুক, ফাল, কুঠার, কোদাল, কাস্তে প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হতো। কবি মুকুন্দরামের কাব্যে এসব পণ্যের কথা বিধৃত হয়েছে।[৫২] এছাড়া গ্রামের সুপরিচিত স্থানে গবাদি পশুর বিশাল মেলা বসত। মেলায় গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ষাঁড়, ঘোড়া ইত্যাদির বেচাকেনা হতো। পুরনো পশু বেচাকেনা বা নতুন পশু কেনার প্রয়োজনে বহু লোক পশু নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে এসব মেলায়[৫৩] আসত। গ্রামের একশ্রেণির লোক আখ মাড়াই করে, খেজুরের রস ও নারিকেলের পানি থেকে

[৫০] এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, 'অর্থনৈতিক জীবন', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৪

[৫১] Khan Sahib Abid Ali khan, *op.cit.*, pp. 34-35

[৫২] মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[৫৩] K.M Ashraf, *op.cit.*, pp. 137-138

নেশাজাতীয় পানীয় তৈরি করে এসব মেলায় বিক্রি করত। মাহুয়ান বাংলায় উৎপাদিত চার রকমের মদের কথা উল্লেখ করেছেন। ভাত ও ট্যারি দিয়েও এক প্রকারের মদ তৈরি করা হতো। তাছাড়া মহুয়া থেকেও এক ধরনের সুরা বানানো হতো। এ পানীয়টির স্বাদ ছিল রোদে শুকানো খেজুরের মতো। তখন খোলাবাজারে মদ বিক্রি হতো। তাছাড়া বাংলার বড় শহরগুলোতেও মদের দোকান ছিল।[৫৪] মেলাগুলোতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রচুর লোক সমাগম হতো এবং সেখানে কড়ি, নগদ মুদ্রা ও পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় চলত। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মেলা থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে জমা রাখতো এবং পরে তারা অধিক লাভে সেই পণ্য বিক্রি করত আড়তদারদের কাছে। আড়তদারগণ এসব পণ্য আরো অধিক মুনাফা করে দালালদের মাধ্যমে শহরে বড় বণিক ও রপ্তানির জন্য বিদেশি বণিকদের কাছে সরবরাহ করতেন।

সুলতানী যুগে বাংলার শহরগুলোতে বাজার বসত যা দ্বারা পণ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ হাটগুলো যেখানে সপ্তাহান্তে বা সপ্তাহে দু'তিন দিন বসত, সেখানে শহরের হাট-বাজারগুলো নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই বসত। এসব হাট-বাজারের পরিধি ছিল অনেক বড় এবং এসব বাজারগুলোর ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধরন কম-বেশি প্রায় একই রকমের ছিল। গ্রামের কৃষক প্রথম স্থানীয় বাজারে কৃষিজ পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে নিতেন। পাইকারি বিক্রেতা ঐ পণ্যদ্রব্য শহর ও নগরে পাঠাতেন। এসব পণ্যদ্রব্য মজুত করার পর রপ্তানির জন্য চাহিদাপূর্ণ দেশে প্রেরিত হতো। এভাবেই পণ্যদ্রব্যের গতিশীলতা বাড়তে থাকে। মূলত, উৎপাদিত পণ্য প্রথমে গ্রামের হাটে পরে শহরে এবং শেষ পর্যায়ে নগর ও বন্দরে পৌঁছাত। এক্ষেত্রে অনেক হাত বদল হয়ে পণ্যদ্রব্য নগর বা বন্দর নগরীতে রপ্তানির জন্য প্রেরণ করা হতো। রোমিলা থাপার উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক শহরেই বড় বাজার ছিল যেখানে ব্যবসায়ীরা এসে জমা হতো। এসব বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাঙালি সুবর্ণ বণিক ও গন্ধ বণিক ছাড়াও গুজরাটি, মুলতানি ও রাজস্থানি বণিকরা ছিলেন। শহরগুলোতে বাস করতেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তাদের চাহিদাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এসব মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামের উৎপাদিত দ্রব্যাদি গ্রামীণ হাট-বাজার থেকে ক্রয় ও সংগ্রহ করে তা বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীগণ নগর বা শহরের বাজারে নিয়ে আসতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা স্থানীয় হাট-বাজার থেকে নিত্যব্যবহার্য পণ্য ছাড়াও সুতি ও ছাপা কাপড় সংগ্রহ করে বড় শহরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। সুলতানী বাংলার প্রতিটি টাকশাল শহরই বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এছাড়া সুফি মাশায়েখদের খানকাহগুলোতে স্বল্প পরিসরে বেচাকেনা হতো।

[৫৪] Ma Huan, *op.cit.*, p. 160; K M Ashraf, *Life and Conditions of the People of Hindustan*, (1200-1550), Delhi, 1959, p. 122

বাংলার অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- গৌড়ের সাগরদীঘি, মথুরা, শ্রীহট্ট, যশোরের বারোবাজার, মুড়ালী কসবা (খান জাহান আলী প্রতিষ্ঠিত শহর), বাকলাহ-এর ইদিলপুর, ঝালকাঠি প্রভৃতি।[৫৫] এসব নগরকেন্দ্রিক বড় বড় বাজারে প্রচুর লোক সমাগম হতো। মথুরার হাটে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হতো বলে বড়ু চণ্ডীদাস লিখেছেন।[৫৬] বড়ু চণ্ডীদাসের এ বক্তব্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যে অতিশোয়ক্তি থাকতে পারে, তবে এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সে সময়কার নগরকেন্দ্রিক হাট-বাজারের বিশালতা ও পরিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

আলোচ্য সময়ে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক মুদ্রার প্রচলন, নগরায়ণের বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরজ্জীবিত হওয়ায় পাইকারি বাজারও বিস্তৃত হয়। নগরায়ণের বিকাশে বিভিন্ন শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিকশিত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতমানের পণ্য স্থানীয় শহরে মজুত রাখা হতো। পাইকারি ব্যবসায়ী ও বণিকগণ ঐ বাজার থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। অর্থাৎ প্রতিটি শহর ও নগরে আঞ্চলিক এক বিশেষ ধরনের স্থায়ী পাইকারি বাজার ছিল। বিভিন্ন স্থানের হাট-বাজার থেকে সংগৃহীত পণ্যাদি এসব পাইকারি বাজারে জমা করা হতো। পরে তা দেশে এবং দেশের বাইরে অন্যত্র রপ্তানি করা হতো। এসব পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা বড় মাপের অর্থের মালিক ছিলেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই পাইকারি বাজারের পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে একশ্রেণির দালাল ছাড়াও প্রচুর শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। এই ধরনের বিশেষ বিস্তৃত পাইকারি বাজার পরিচালিত হওয়ায় দালাল ও শ্রমিক সকলেই অর্থ উপার্জনের বাড়তি সুযোগ পেয়ে নিজেরা পূর্বের তুলনায় স্বাবলম্বী হয়।

স্থায়ী পাইকারি বাজার ছাড়াও সুলতানী যুগে অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ দোকানের মাধ্যমে পণ্য বেচাকেনা করা হতো। পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণলিপিতে এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ দোকানের কথা উল্লেখ করেছেন। নদীমাতৃক বাংলার নদীবন্দরগুলো থেকে যে কেবল রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্য ও মালামাল পরিবহণ করা হতো তা নয় বরং নদীবন্দরসংলগ্ন এলাকাতেও বাজার বসতো। পার্শ্ববর্তী ঐসব বাজারে স্থানীয় পণ্য ছাড়াও বাংলার দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ এমনকি বিদেশ থেকেও আমদানি করা পণ্যও পাওয়া যেতো।

[৫৫] Khan Sahib Abid Ali khan, *op.cit.*, pp. 41-50; H. Beveridge, *The District of Bakerganj, Its History and Statistics,* Trubner & Co.Ludgate Hill, 1876, p. 125; *Bengal District Gazetters, Bakarganj,* by J.C Jack, Calcutta, 1918, p. 81; Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier* 1204-1760, University of California Press, London, 1994, pp. 156-157; সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১; রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১০০০-১৫২৬ খ্রি.), ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৩, পৃ. ২২২

[৫৬] বড়ু চণ্ডীদাস, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দান খণ্ড, সম্পাদনা, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দেশ পাবলিশিং, ১৪ তম সংস্করণ, ২০১৩, পৃ. ২৬৯

সিজার ফ্রেডারিক বলেন যে, বাংলায় (সন্দ্বীপে) পণ্যদ্রব্যের মূল্য খুব সস্তা ছিল এবং এখানের অধিবাসীরা আমাদের জাহাজ আসতে দেখলে তৎক্ষণাৎ একটি বাজার বসাত। সেখানে জিনিসপত্রের দাম এতো কম ছিল যে, আমরা বিস্মিত হতাম।[৫৭] বন্দরসংলগ্ন বাজারগুলোর বণিক ও ব্যবসায়ীরা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুলতানী আমলে নদীবন্দর হিসেবে সোনারগাঁও এবং সমুদ্রবন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের বিকাশ ঘটেছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়াও দূরের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক লোক স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য সোনারগাঁও এ জমা করত। পরবর্তীতে সোনারগাঁও থেকে তা চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতো।

নদীবহুল বাংলায় নৌপথে এক অঞ্চলের উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করত। নদী পথে মালামাল পরিবহণের খরচ কম হওয়ায় বেশির ভাগ ব্যবসায়ী ও বণিকগণ এ পথেই মালামাল বহন করতেন। নদীবন্দরসমূহ ছাড়াও নদীপথের দু'ধারে এক ধরনের বাজারের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। পর্যটক ইবনে বতুতা নদীপথে সিলেট থেকে আসার সময় এ ধরনের অনেক বাজার দেখেছিলেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, নদীর দু'পাড়ে তিনি এতো অধিক সংখ্যক বাজার দেখেছিলেন যে, তাঁর মনে হয়েছিল তিনি বাজারের মধ্য দিয়েই যাচ্ছেন।[৫৮] উল্লেখ্য যে, নদীপথের দু'ধারে গড়ে উঠা বাজারগুলোর মধ্যে কিছু বাজার ছিল স্থায়ী, আবার কিছু বাজার অস্থায়ী ছিল। এসব বাজারে স্থানীয় জনগণই বেশি বেচাকেনা করতেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়াও নদীপথে পরিভ্রমণকারী সাধারণ মানুষ ও বণিকরাই এ বাজারের মূল ক্রেতা ছিল।

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নগর হিসেবে লখনৌতি সুপরিচিত ছিল। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে লখনৌতির যে সকল স্থানে মালবাহী নৌকা বা জাহাজ থেকে পণ্য দ্রব্যাদি খালাস করা হতো, সেসব স্থান এখনো চিহ্নিত হয়ে আছে। 'সাগরদীঘির উত্তর পূর্ব কোনো পীরানো পীর যাওয়ার মধ্যপথে নির্মিত একটি প্রাচীন সেতু ইঙ্গিত দেয় যে, এপথে ছোট ছোট নৌকা দ্বারা মালামাল নগরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হতো। শহরের ভেতরে দুই মাইল দীর্ঘ একটি বাজার ছিল এবং বাজারের দোকানগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল।[৫৯] লখনৌতির এই বড় বাজারের বর্ণনা এবং পণ্যদ্রব্য নৌকা দ্বারা এক

---

[৫৭] J J A Campos, *History of the Portuguese in Bengal,* London, 1919, reprint: Janaka Prakashan, Patna, 1979, p.119

[৫৮] Ibn Batutta, *The Rehla of Ibn Battuta,* eng.tra. Agha Mahdi Hussain, Orient Institute, Borada, 1953, pp. 241-242

[৫৯] Khan Sahib Abid Ali khan, *op.cit.,* p.42

স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে এক নগর থেকে চাহিদাপূর্ণ অন্য নগরে পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান হতো। এভাবেই স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সব অঞ্চলে সব ধরনের পণ্য উৎপন্ন হতো না তাই চাহিদাসম্পন্ন পণ্যদ্রব্যাদি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রেরিত হতো এবং স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হতো।

সপ্তগ্রাম ছিল তৎকালীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। সপ্তগ্রাম আন্তর্জাতিক মানের বন্দর হওয়ায় স্থানীয় বণিকরা অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই বাণিজ্য করত।[৬০] র‍্যালফ ফিচের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, ষোলো শতকে আরব বণিকরা সপ্তগ্রাম বন্দরে এসেছিল।[৬১] ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিজার ফ্রেডারিক বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, সপ্তগ্রাম বন্দরে প্রতি বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি ছোট বড় জাহাজ চাল, জমকালো বিভিন্ন রকম বস্ত্র, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণে চিনি, শুকনো হরতকি, মরিচ, তিলের তেল ও নানা রকমের পণ্যদ্রব্য বোঝাই করা হতো।[৬২] ফ্রেডারিক সাতগাঁও-এ চাল, বস্ত্র, লাক্ষা, চিনি, বড় গোলমরিচ, তেল, শুকনা হরতকিসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্যবোঝাই বেশ কিছু ছোট বড় জাহাজ দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে বন্দরটি সব ধরনের পণ্য সমৃদ্ধ, বণিকশ্রেণি অধ্যুষিত মানানসই একটি শহর বলে মনে হয়েছে।[৬৩] সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা জানিয়ে পর্তুগিজ গভর্নর আল বুকার্ক পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েলকে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন।[৬৪] পর্তুগিজরা এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে এসে খড়ের দোকান সাজিয়ে বাংলা থেকে চাল, কাপড়, চিনি, শুকনো হরতকি ও মরিচ ইত্যাদি ক্রয় করত। বন্দরটিকে 'পোর্টো পিকুইনো' (Porto Pequeno) বা ছোট বন্দর বলত। কবিকঙ্কন (১৫৪৪-১৫৭৭) উল্লেখ করেন যে, 'সপ্তগ্রামের বেনে সব কোথাও না যায়, ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।'[৬৫] ভেনেসীয় পর্যটক সিজার ফ্রেডারিক সপ্তগ্রাম বন্দরে ছোট বড় ৩০টি জাহাজ দেখেছিলেন। পর্তুগিজরা দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার পণ্যদ্রব্য নৌকা করে সপ্তগ্রামে পাঠাত ও সেখানে শুল্ক দেওয়ার পর পাটনাতে পাঠাত। ভাগীরথী নদীর

---

৬০ চৈতন্যভাগবত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮১

৬১ Ralph Fitch, *Travels in India.* by. J Horton, Ryley, T. Fisher Unwin, Paternoster Square, London, 1899. pp.100

৬২ Purchas His Pilgrims, X, P.182, উদ্ধৃতি, M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, p. 137

৬৩ Purchas-His Pilgrimages, Hakluyt Society, Edinburg, 1911; EF Oaten, European, Travellers in India, Lucknow, 1973, reprint of 1st ed 1909; http://bn.banglapedia.org/index.php?; M A Rahim, *Social Cultural History of Bengal*, (1201-1576) vol. 1, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, p.397

৬৪ J J A Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, London, 1919, reprint: Janaka Prakashan, Patna, 1979, p. 26

৬৫ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবিকঙ্কন চণ্ডী*, পৃ. ১৯৬ ; J J A Campos, *op.cit.*, p. 23; শ্রী নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ. ৪২

পথ ধরেই এই বাণিজ্য যাত্রা হতো।[৬৬] সপ্তগ্রামের জমিদার ও সওদাগরেরা প্রথমে চৌদ্দ ডিঙ্গা (ছোট জাহাজ) ও পরে সাত ডিঙ্গা নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করতেন।

সুলতানী বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে সোনারগাঁও-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁওকে সমৃদ্ধ বন্দর হিসেবে দেখতে পান।[৬৭] র‌্যালফ ফিচ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ণনা করেন যে, এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ সুতিবস্ত্র এবং চাল সমগ্র ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হতো।[৬৮] ঐতিহাসিক আবুল ফজল সোনারগাঁওকে কাপড় উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে উল্লেখ করেন। এখানে সুতিবস্ত্র, মসলিন কাপড় (খাসা) দাস ও নপুংশকের বিশাল বাজার ছিল।[৬৯] সোনারগাঁও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র ছিল সত্য, তবে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও যে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলাবাহুল্য। কেননা এ বন্দর দিয়ে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি যেতো সেগুলো সংগ্রহ হতো স্থানীয় অভ্যন্তরীণ বাজার থেকেই।

কর্ণফুলী নদীর তীরে চাটগাঁও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে এবং চতুর্দশ শতকে এটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বন্দর নগরীতে উন্নীত হয়। বতুতার বর্ণনায় চট্টগ্রামকে সমুদ্র তীরবর্তী একটি বড় বাণিজ্য নগরী বলে উল্লেখ করেছেন।[৭০] দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন- ১. এটি কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত ছিল। ২. এই বন্দরের বিপরীত দিকে সন্দ্বীপ অবস্থিত ছিল। উল্লেখ্য যে, সন্দ্বীপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। বলা হয় যে, সুলতানী বাংলার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। এই বন্দর নগরী যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল, তেমনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেরও একটি বড় কেন্দ্র ছিল। বড় বড় ব্যবসায়ীরা রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগ্রহ করে এখানে জমা করত। তাছাড়া এ বন্দর নগরীর সমৃদ্ধির সাথে সাথে এখানে বিপুল জনবসতি গড়ে ওঠে। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পণ্যসামগ্রীর যোগান দিতো অভ্যন্তরীণ বাজার। এ বন্দর দিয়ে যে সব আমদানি পণ্যদ্রব্য আসতো তার কিছু অংশ অবশ্যই এখানকার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হতো। উপর্যুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ছাড়াও সুলতানী আমলে তাণ্ডা ও গৌড় প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। এসব কেন্দ্রে সবরকম পণ্যদ্রব্য বিক্রি হতো। তাণ্ডায় বিপুল পরিমাণে

---

[৬৬] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, পৃ. ৫০৪, ৫০৭
[৬৭] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 237
[৬৮] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 396-397
[৬৯] Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 1, p.136
[৭০] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 235

সুতা ও সুতিবস্ত্রের সমাহার ছিল বলে র‌্যালফ ফিচ উল্লেখ করেছেন।[৭১] এছাড়া বাকলা ছিল বাংলার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর। চৌদ্দ শতকে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত শহরটির রাজধানী ছিল বাকলা। *আইন-ই আকবরী* থেকে জানা যায় যে, ষোলো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাকলা সমুদ্রসংলগ্ন সমৃদ্ধশালী শহর ছিল।[৭২] এখানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস ও রেশম বস্ত্র পাওয়া যেতো। মোগল শাসনে এটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, বাকলা হঠাৎ করেই মোগল শাসনের সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেনি। এজন্য আমরা ধারণা করতে পারি যে, সুলতানী আমলেও এখানে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তবে এটি যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তাই ধরে নেওয়া হয় যে, এটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল।

বাংলায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মূল্য মোটামুটি সুলভই ছিল। সমসাময়িক তথ্য বিবরণীতে সময়ের বাংলাকে একটি প্রাচুর্যময় ও সুলভ পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের দেশ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বাংলার মতো সস্তায় জিনিসপত্র পৃথিবীর আর কোথাও বিক্রি হতে দেখেননি। চৈনিক ও ইতালীয় পর্যটকসহ সমকালীন ঘটনাপঞ্জি লেখকদের বিবরণীতে ইবনে বতুতার বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী বাংলার পণ্যদ্রব্যের মূল্য তালিকা হলো- চাল: আনুমানিক ৮ মণ ৩০ সের (২৫ দিল্লি রতল) ৭.০০ টাকা; ধান: আনুমানিক ২৮ মণ (৮০ দিল্লি রতল) ৭.০০ টাকা; ঘি: আনুমানিক ১৪ সের (১ দিল্লি রতল) ৩.৫০ টাকা; তিল তৈল: আনুমানিক ১৪ সের (১ দিল্লি রতল) ১.৭৫ টাকা; গোলাপ জল: আনুমানিক ১৪ সের (১ দিল্লি রতল) ৩.৫০ টাকা; চিনি: আনুমানিক ১৪ সের (১ দিল্লি রতল) ৩.৫০ টাকা; ৮টি তাজা মুরগি: ০.৮৮ টাকা; ৮টি তাজা ভেড়া: ১.৭৫ টাকা; ১টি দুগ্ধবতী গাভী: ২১.০০ টাকা, ১৫টি পায়রা: ০০.৮৮ টাকা; ১৫ গজ সূক্ষ্ম সুতি কাপড়: ১৪.০০ টাকা।[৭৩] প্রদত্ত তালিকা থেকে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে জিনিসপত্রের মূল্য খুব কম ছিল এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকায় তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারত। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* কাব্যে একজন তাঁতির বাজারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ তাঁতি বাজার থেকে বিভিন্ন রকমের মাছ এবং শাক-সবজি ক্রয় করেছিলেন বলে উল্লেখ করা রয়েছে।[৭৪]

---

[৭১] Purchas-His Pilgrimages, Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 398

[৭২] Abul Fazl, *The Ain-i-Akbari,* eng.tra. Colonel H.S Jarret, The Asiatic Society of Pakistan, Kolkata, vol. 2, 2010, p. 135

[৭৩] Ibn Battuta, *op,cit.*, pp. 234-235

[৭৪] বিজয়গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০; Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 403

সামুদ্রিক বাণিজ্য

সুলতানী বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) পূর্ব দিকের বাণিজ্য ও (খ) পশ্চিম দিকের বাণিজ্য। পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর হয়ে বাংলার বাণিজ্যতরী সুমাত্রা, মালাক্কা, জাভা ও চীনে বাণিজ্য করত। আর পশ্চিম দিকে বঙ্গোসাগর ও আরবসাগরের উপকূল ধরে পারস্য উপসাগর হয়ে হরমুজ, বসরা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ভারতীয়রা বাণিজ্য করত। লোহিত সাগর থেকে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ কায়রো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছাত। কায়রো ছিল মুসলিম জগতের জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী নগরী। রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রেরিত এসব জাহাজ বাংলা ও ভারতীয় পণ্য নিয়ে সিরিয়া, মিশর, রাশিয়ায় যেতো। শুধু তাই নয় কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বাংলার বস্ত্র সিরিয়া, ইরাক, রাশিয়া, ইরান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছে যেতো।[৭৫] বার্থেমার বিবরণে বাংলার দুটি প্রধান বাণিজ্য পথের বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) একটি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, আভা, শ্যাম, মালাক্কা, সুমাত্রা, সুন্দ, জাভা, মশলা, দ্বীপপুঞ্জ, সেলিবিস, বোর্নিও এবং চম্পা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৭৬] (২) অন্যপথটি দক্ষিণ পশ্চিমমুখী যা উড়িষ্যা, করমণ্ডল, শ্রীলংকা এবং মালাবার উপকূল অতিক্রম করে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর হয়ে আরব ও আবিসিনিয়া যেতো।[৭৭] মূলত বার্থেমার বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি বাংলায় নদীগুলোতে চৈনিক পালের জাহাজ দেখেছিলেন। ইবনে বতুতার বিবরণে বাংলার বাণিজ্যপথের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন মালদ্বীপ থেকে তিনি চট্টগ্রামে আসেন এরপর সোনারগাঁও থেকে সুমাত্রা যান। অর্থাৎ মালদ্বীপ, আরাকান করমণ্ডল অঞ্চল এবং এসব অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী সব দেশের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।[৭৮] এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বাংলার সাথে চীনেরও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চীনের জাহাজগুলো মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপগুলো ভারত, আরব এবং পারস্য উপসাগরে যেতো।[৭৯] চট্টগ্রাম দিয়ে প্রবেশ করে সাধারণত সমুদ্রগামী জাহাজগুলো মেঘনার গতিপথ দিয়ে সোনারগাঁও পর্যন্ত পৌঁছাত।[৮০] বিদেশি পর্যটক ও চৈনিক দূতগণ উল্লিখিত পথ অনুসরণ করেই বাংলায় আগমন করে। এসব বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার পণ্যদ্রব্য এসব পথের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে রপ্তানি হতো। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে বাংলার রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের বাজার আবিসিনিয়া থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় চীনের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং নিয়মিত বাণিজ্য পরিচালিত হতো।

---

[৭৫] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬
[৭৬] Varthema, *op.cit.*, vol. 2, p.145
[৭৭] *Ibid*, p. 212
[৭৮] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 354-355
[৭৯] Varthema, *op.cit.*, pp. 214-215
[৮০] Ibn Battuta, *op,cit.*, pp. 235, 241

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য পথ

সুলতানী বাংলার শাসকগণ চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও বাণিজ্য পরিচালনার প্রতি গুরুত্ব দেন। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান চীনা রাজদরবারে আফ্রিকার জিরাফ পাঠালে তা বিশেষ সমাদৃত হয়। এছাড়াও সুলতানগণ চীনা সম্রাটকে উপঢৌকন প্রেরণের জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করতেন। বাংলা থেকে একটা বড় জাহাজ নানা রকমের উপঢৌকন নিয়ে চীন দেশে গিয়েছিল। চীনে সাধারণত ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া থেকে মসলা ও ঔষধ এলেও মসলার চাহিদা ছিল ব্যাপক। চীনের হ্যাংচাউ শহরে দিনে প্রায় হাজার পাউন্ডের মতো মরিচ ব্যবহৃত হতো বলে মার্কো পোলো বর্ণনা করেছেন। সিংহল ও ইন্দোনেশিয়াতে মরিচ পাওয়া গেলেও মালাবার থেকেও তারা মরিচ আমদানি করত।[৮১] ইন্দোনেশিয়ার বাজারের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাপড় বাংলা থেকে রপ্তানি হতো। বাংলা ও গুজরাটের মুসলিম বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ আরব ও ওমানের লোকেরা বাংলার কাপড়ের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল।[৮২] মূলত গুজরাট ও বাংলার বিভিন্ন পণ্য লোহিত সাগর হয়ে দামাস্কাস ও আলেকজান্দ্রিয়ায় যেতো। এরপর ঐ দুই শহর থেকে এসব পণ্য অন্যান্য দেশের বাজারে বড় জায়গা দখল করে নিয়েছিল। বিশেষ করে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, সুদূর পূর্বাঞ্চল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দেশে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল।

[৮১] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, পৃ. ৪৪

[৮২] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯

বহির্বাণিজ্যের জন্য পশ্চিম গুজরাটের ক্যাম্বে ও বাংলার বাঙ্গালা বন্দর খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। বার্থেমার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ক্যাম্বেতে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৩০০ জাহাজ আসত। তাঁর বিবরণ অনুসারে, বাংলায় ৫০টি জাহাজ বোঝাই করার মতো সুতি রেশমি বস্ত্র উৎপাদন করা হতো।[৮৩] সুলতানগণও ব্যবসার জন্য জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে পণ্য পাঠাতেন।[৮৪] পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার শাসনগণ এডেন, হরমুজ, ক্যাম্বে ও মালাক্কার সুলতানের নিকট পত্র, উপহারসামগ্রী পাঠাতেন এবং বাংলার বণিকদেরকে সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিতেন।[৮৫] এখানে উল্লেখ্য যে, ষোলো শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলায় যারা রাজত্ব করেছিলেন তারা ছিলেন আরব, তুর্কি ও আবিসিনীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত বা তাদের বংশধর। এদেশের মুসলিম শাসকগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সবসময়ই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আলোচ্য সময়ে পেগু, বার্মা বা আরাকানের সাথে এবং পশ্চিম দিকে সিংহল, মালাবার উপকূল, মালদ্বীপ, ক্যাম্বে, দাবোল, চৌল, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও আরব উপকূলীয় অঞ্চলের সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[৮৬] মালাক্কার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেক লাভজনক ছিল। মালাক্কায় ৩.২৫ শতাংশ রপ্তানি কর ও বাংলায় ৩৫ শতাংশ আমদানি কর দিয়েও যে লাভ থাকত তা ছিল ২০০ শতাংশ থেকে ৩০০ শতাংশ।[৮৭] মুনাফার অন্যতম উৎস ছিল সোনা, রূপা ও কড়ি ক্রয়-বিক্রয়। সোনার দাম মালাক্কার থেকে বাংলায় ছয় ভাগের এক ভাগ বেশি ছিল। মালাক্কায় বাংলা থেকে রূপা নিয়ে গেলে তার দাম সেখানে চার ভাগের এক ভাগ অথবা পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেশি থাকায় বাংলার বণিকগণ সোনা, রূপার ব্যবসায় বেশি আগ্রহ দেখাত। তাছাড়া তারা কড়ি আমদানি করে যথেষ্ট মুনাফা লাভ করত। কারণ বাংলায় মুদ্রা চালু থাকলেও কড়ির মাধ্যমেই স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলার মুদ্রা মালাক্কায়ও চালু ছিল এবং এটি ছিল বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের লক্ষণ। বণিকগণ বিদেশি মুদ্রা নিয়ে আসত এবং তা হস্তান্তর করে লাভবান হতো।[৮৮] পনেরো শতকে চৈনিক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে-

> Bengal is rich and civilized. To our ambassador they presented gold basins, gold girdles, and gold bowls and to our vice-ambassador the same

[৮৩] K M Ashraf, *op.cit.*, p. 145
[৮৪] Ma huan, *op.cit.*, p. 165
[৮৫] Tome Pires, *op.cit.*, vol.1, p. 24, vol. 11, p. 271
[৮৬] Tome Pires, *op.cit.*, pp. 145-145; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p.356
[৮৭] *Ibid*, p. 93
[৮৮] Tome Pires, *op.cit.*, pp. 144-145; মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

articles in silver. To our officials of the ministry of foreign affairs they presented golden bells and long gowns of white hemp and silk. Our soldiers got silver coins. If they had not been rich how could they do it in such an extravagant way?[৮৯] বৈদেশিক বাণিজ্যের সফলতার জন্যই বাংলা এতটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ৪টি। যথা- ক.পারস্য উপসাগর ও লোহিত উপসাগরীয় অঞ্চল, খ. ভারত, গ. ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ ও ঘ. চীন ও জাপানের অন্তর্গত এলাকা। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। কারণ এশিয়ার বাণিজ্য মৌসুমি বায়ুর গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করত এবং পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায় বাণিজ্য করতে সময় লাগত এক বছর। যেকোনো জাহাজের পক্ষে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে প্রত্যাবর্তন করা কষ্টকর ছিল। তাই ধাপে ধাপে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে হতো। চীন থেকে দ্রব্যসামগ্রী প্রথমে ইন্দোনেশিয়ার মাল্লাকায় আসত এবং এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত চীনা বণিকগণ। এরপর ঐ দ্রব্য প্রথমে পৌঁছাত ভারতের উপকূলে ক্যাম্বে বন্দরে ও পরবর্তীতে সুরাটে। এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত গুজরাট ও বাংলার মুসলিম বণিকরা।[৯০] এসব বাণিজ্য জাহাজ পণ্যদ্রব্য নিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় যেতো কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ লোহিত সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত যেতে পারত না। কারণ ঐ অঞ্চলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরব বণিকরা। তাই ভারতীয় উপকূল ভাগের সামুদ্রিক বন্দরগুলো এশিয়ায় বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এক অঞ্চলের বাণিজ্য দ্রব্য অন্য অঞ্চলের বন্দরগুলো পার হয়েই পৌঁছাত। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দেশে বাংলার বস্ত্রের অনেক চাহিদা থাকায় ঐ বস্ত্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাজারে জিনিসপত্র কেনার অন্যতম মাধ্যম ছিল।

---

[৮৯] "Si yamg ch'ao Kung tien lu" *Visva Bharati Annnals*, ed. P.C. Bagchi, vol. 1, Calcutta, 1945, p.127

[৯০] গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

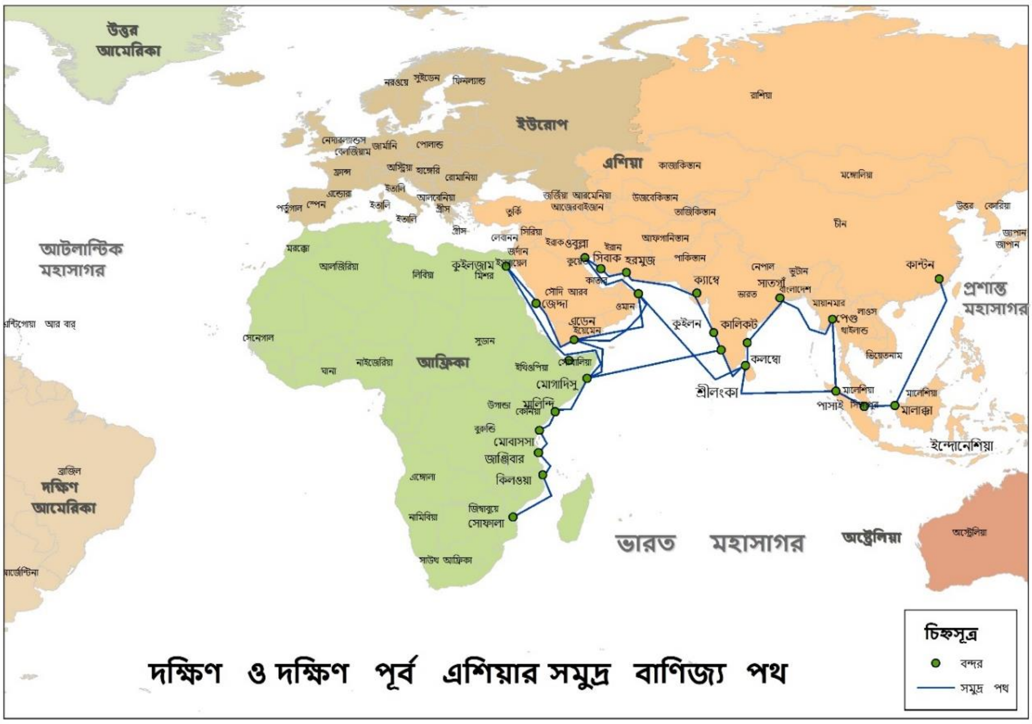

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্য পথ

বিদেশি বণিকরা সোনা, রূপা দিয়ে কাপড় কিনত এবং সেই কাপড় দিয়েই তারা ইন্দোনেশিয়ার মসলা কিনত।[৯১] অর্থাৎ বাংলার কাপড় দিয়ে বড় রকমের বাণিজ্যিক লেনদেন হতো। কাপড় ছাড়াও বাংলার চাল, চিনি ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য অনেক দেশে রপ্তানি হতো। কেবলমাত্র ভারতের করমণ্ডল উপকূলভাগের বন্দরগুলোতেই নয়, মালাক্কা বা লোহিত সাগরের মোখাকেও চাল সরবরাহ করত বাংলা। সব ধরনের জিনিসই এখানে ক্রয়-বিক্রয় হতো। এসব পণ্যের লাভ লোকসান লক্ষ রেখেই বাংলার বণিকরা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বাংলার এই বাণিজ্য হুগলি, বালেশ্বর, আরাকান, পেগু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, মালয় এবং শ্যামদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে বাংলা থেকে চার, পাঁচটির বেশি জাহাজ যেতো পারত কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ষোলো শতকের শেষে বা সতেরো শতকে হুগলিতে আসা ভারতীয় বণিকদের ১১টি জাহাজের মধ্যে ৫টি জাহাজ আসে সুরাট থেকে, ৫টি মাদ্রাজ ও মালাবার থেকে এবং আরেকটি জাহাজ এসেছিল মুসলিপট্টম থেকে।[৯২] এসব জাহাজে থাকত গোলমরিচ, কাঁচা তুলা ও বিভিন্ন বিলাসজাত দ্রব্য। রপ্তানির মধ্যে ছিল বাংলার তুলার কাপড়, চাল, তামাক ও গন্ধক। এই বাণিজ্যের সাথে জড়িত বণিকরা বিশেষ বিশেষ এলাকায় বসবাস করত। গুজরাটের সুরাট বন্দর, দক্ষিণ ভারতের কালিকট, করমণ্ডলের মুসলিপট্টন এবং নিম্ন গঙ্গার হুগলি বন্দরে ভারতীয় বণিকদের পাশাপাশি বাংলার বণিকরাও বসবাস করত। এসব বন্দরের সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের

[৯১] গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ৭১

[৯২] *ঐ*, পৃ. ৭২

যোগাযোগ ছিল। মূলত, সমুদ্র পথে ইউরোপ, মালয়, দ্বীপপুঞ্জ এবং চীনের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত।

নৌপথের বাণিজ্য

বাংলার বড় বড় নদনদী এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করা খুব সহজ ছিল। রেনেলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের শাখা প্রশাখাসহ বাংলার বিভিন্ন দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যে, তাতে খুব সহজে নৌ যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও বাংলার প্রাকৃতিক খালগুলো এমন সুন্দরভাবে ছড়ানো রয়েছে যে ...আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে পারি যে, বর্ধমান ও বীরভূম সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া দেশের আর সব অংশেই শুকনো মৌসুমেও কমপক্ষে ২৫ মাইলের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার এক-তৃতীয়াংশ দূরত্বের মধ্যে নৌচলাচলযোগ্য নদীপথ ছিল।[৯৩] তিনি আরও বলেন, বাংলার জলপথে প্রায় ত্রিশ হাজার মাঝি নৌপরিবহণের কাজে সবসময় নিযুক্ত থাকত। সারা বাংলায় দশ লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় লবণ ও বেশির ভাগ খাদ্যশস্য এই জলপথে সরবরাহ করা হতো। এই অভ্যন্তরীণ জলপথই বাংলার রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন ছিল। এই পথে বছরে ২ লক্ষ পাউন্ড বা প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য হতো।[৯৪]

বাংলার সব অঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলার মধ্য দিয়ে অনেক শাখা নদী, নালা, খাড়ি প্রবাহিত ছিল। এজন্য ঐ সকল পথে সহজে যোগাযোগ সম্ভব হতো। যার ফলে বাংলার অভ্যন্তরে সুদূরতম প্রান্তেও বণিক ও পর্যটকরা সহজে যাতায়াত করতে পারত। এ প্রসঙ্গে রেনেল আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলার পূর্বাঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে সুবিধাজনক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। কারণ নদীগুলো এমনভাবে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে যে জনগণ সব প্রধান স্থানেই জলপথে সহজে যাতায়াত করতে পারত।[৯৫] ওলন্দাজ পর্যটক স্ট্যাভোরিনাস বাংলা সম্পর্কে বলেন, বড় এবং প্রশস্ত খাল দিয়ে দেশটি সর্বত্র বিভক্ত ... এই জলপথেই দেশের সব মালপত্র খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পরিবহণ করা হয়। নদীর প্রধান শাখাগুলোও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ... তাদের দুই ধারে শহর, গ্রাম, মনোরম শস্য ক্ষেত ও প্রান্তর দেশের শোভা বৃদ্ধি করেছে।[৯৬] সুসংগঠিত যোগাযোগব্যবস্থার ফলে বাংলার

---

[৯৩] James Rennell, *Memories of the Map of Hindustan*, London, 1793, pp. 335, 345

[৯৪] *Ibid*

[৯৫] Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh, Economic History*, vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, Reprint. 2017, pp. 30-31

[৯৬] J.S. Stavorinus, *Voyage in the East Indies*, tra. S.H. Wilcoke, vol.1, London, 1798, p. 399

সঙ্গে একদিকে যেমন বাইরের জগতের সম্পর্ক গড়ে উঠে, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়। এছাড়া নৌপথে সুলভমূল্যে এবং সহজেই বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য এক অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে অন্য অঞ্চলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চাঙ্গা হয়। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মালামাল পরিবহণে এসব ডিঙা ব্যবহৃত হতো। মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্যিক জাহাজের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ডিঙা নামে পরিচিত ছিল। মঙ্গলকাব্যে যে ডিঙার বর্ণনা আছে তাতে ছোট জাহাজের ওজন ছিল একশ টনের মতো। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক পর্তুগিজ দোভাষী গৌড় প্রাসাদের সামনে সোনারগাঁও-এর শাসকের একটি জাহাজ দেখেন যা ছিল পর্তুগিজ জাহাজের মতো। ফলে সুলতানী বাংলার গ্রামগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা গতিশীলতা লাভ করে।

স্থলপথের বাণিজ্য

বিভিন্ন দেশের সাথে স্থলপথে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পারস্য ও আফগানিস্তানের সাথে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিল। মুলতান, কোয়েটা সড়ক, খাইবার গিরিপথ ও কাশ্মীরে যাওয়ার রাস্তাগুলোই ভারতের ও বাংলার সাথে সংযোগ রক্ষা করত। স্থলপথে বোখারা, ইরাক ও দামাস্কাসের সঙ্গেও ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু ছিল।[৯৭] অর্থাৎ আফগানিস্তান, পারস্য, তুরস্ক, তিব্বত, ভুটানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আলোচ্য সময়ে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে অনেক লোক ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর কিছুটা প্রভাব পড়ে এবং তুরস্কের অধিবাসী ও মোঙ্গলরা প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত হতে থাকে।[৯৮] তাদের (এসব বিদেশিদের) চাহিদার পণ্যের মধ্যে ছিল মৃগনাভি, নানা রকম ফার, অস্ত্রশস্ত্র, বাজপাখি, উট এবং ঘোড়া (musk, furs, arms, falcons, camels and horses)। চাহিদানুযায়ী এসব পণ্য স্থলপথের মাধ্যমেই আমদানি-রপ্তানি করা হতো। সম্রাট বাবর ও আকবরের সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য ভারতের পাশাপাশি বাংলায়ও ঘোড়ার ব্যাপক চাহিদা ছিল। সামরিক প্রয়োজন ছাড়াও ঘোড়ার গাড়ি তৈরির জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ঘোড়ার গাড়ি স্থানীয়ভাবে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণের জন্য ব্যবহার করা হতো। এছাড়া বাংলার সুলতানগণ প্রতি বছর বেশকিছু ঘোড়া উপহার হিসেবে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতেন। সেজন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়া বিভিন্ন দেশ থেকে

---

[৯৭] K. M Ashraf, *op.cit.*, p. 142; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 350
[৯৮] K. M Ashraf, *op.cit.*, p. 146

আমদানি করা হতো। হরমুজ ও এডেন থেকেও কিছু ঘোড়া আমদানি করা হতো।[৯৯] ভারতবর্ষের আমদানিকৃত ঘোড়া দিল্লির বাজারে বিক্রি হতো। তাছাড়া তুর্কিস্তানের 'অজক'(Azaq) এর অধিবাসীরা ভারতবর্ষে রপ্তানি করার জন্যই অতি যত্ন করে ঘোড়া লালন-পালন করত। এজন্য তারা একটি বড় সংগঠন গড়ে তুলেছিল, যার কাজ ছিল ঘোড়াগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং পথে ঘোড়াগুলোর সঠিক যত্ন নেওয়া। এই বিশাল ঘোড়ার দলের মালিকানার অংশীদার ছিল অনেক। প্রতিটি মালিক ও বণিকের ভাগে ২০০টি করে ঘোড়া থাকত। প্রতি ৫০টি ঘোড়ার জন্য একজন করে কাশী বা রক্ষক থাকত। এই কাশীর কাজ ছিল পথে ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করা ও তাদের খাওয়ানো।[১০০] এভাবেই স্থলপথে বিভিন্ন হাত বদল হয়ে ভারত তথা বাংলায় ঘোড়া আমদানি হতো।

সুলতানী বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ করা হয়। যেমন- *তারিখ-ই-শেরশাহ* গ্রন্থে 'সড়ক-ই-আজম' নামে একটি বিস্তৃত পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার পূর্ব প্রান্ত সোনারগাঁও হতে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত ছিল। সড়ক-ই-আজম বা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়াও শেরশাহের সময় বহু নতুন পথ নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে আগ্রা হতে দক্ষিণগামী বুরহানপুর পথ, আগ্রা হতে যোধপুর চিতোর পথ এবং লাহোর হতে মুলতানগামী বুরহানপুর প্রভৃতি পথ উল্লেখযোগ্য ছিল।[১০১] সংক্ষেপে বলা যায় যে, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে ভারতের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমানা থেকে পূর্বে বার্মার সীমান্ত পর্যন্ত স্থলপথগুলো বিস্তৃত ছিল। ছোট ছোট হাট-বাজার থেকে বণিকগণ পণ্য সংগ্রহ করে বড় বড় শহরে অবস্থিত বাণিজ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করত। তাছাড়া রপ্তানির জন্য এসব পথে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট আড়তে ও বন্দরে মজুত রাখত।

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় বিভিন্ন নদনদী থাকায় স্থলপথে যোগাযোগব্যবস্থা খুব বেশি উন্নত ছিল না। তবে এই অঞ্চলের সাথে বাংলার সব শহরের যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দুটি রাস্তা ছিল এবং আরেকটি রাস্তা ছিল শ্রীহট্ট হয়ে সোনারগাঁও পর্যন্ত। রেনেল উল্লেখ করেন যে, পূর্বাঞ্চলের বেশির ভাগই কাঁচা রাস্তা হওয়ায় যুক্তিসঙ্গত কারণে বর্ষাকালে সেগুলোর অবস্থা বেশ খারাপ হতো। স্থলপথে বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী মরিচা (ইংরেজ কোম্পানির নথিপথে মরিচা নামে অভিহিত) ছিল যোগাযোগ

---

[৯৯] K. M Ashraf, *op.cit.*, p. 144; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 350-351

[১০০] K. M Ashraf, *op.cit.*, p. 147

[১০১] Khan Sahib Abid Ali khan, *Memoirs of Gour and Pandua*, p. 36; গোরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত, *প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রা. লি. ১৯৭৬, পৃ. ৯২-৯৩

ও মাল পরিবহণের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মরিচা গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী ও ভাগীরথীর সংযোগকারী একটি খাড়ির ওপর অবস্থিত ছিল।[১০২]

সুলতানী বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি একটি পূর্বশর্ত। সুলতানী যুগে বাংলায় জলপথ ও স্থলপথ উভয় প্রকার যোগাযোগব্যবস্থারই উন্নতি বিধান করা হয়েছিল। স্থলপথে ঘোড়া বা গরুর গাড়ির মাধ্যমে মালামাল সরবরাহ করা হতো। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়। গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি রাজধানী লখনৌতি থেকে দেবকোট পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। লখনৌতি থেকে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত আরেকটি সড়কের কথাও জানা যায়। সুলতান ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেন। বর্তমানকালেও এ পথের কিছু অংশ অক্ষত রয়েছে যা নোয়াখালী অঞ্চলে 'হদ্দিনের হথ' নামে পরিচিত।[১০৩] এছাড়া ঘোড়াঘাট থেকে দমদম/গঙ্গারামপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা ছিল এবং দার্জিলিং সড়কটি (পূর্বে কিষাণগঞ্জ সড়ক নামে পরিচিত ছিল) দিনাজপুর থেকে বাংলাবন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুলতানী যুগে শুধু নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি, পুরাতন রাস্তাও সংস্কার করা হয়েছিল। তদুপরি পথিক ও বণিকদের সড়ক যাত্রাকে নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এ সময় নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সরাইখানা নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এসব সরাইখানায় পথিক ও ব্যবসায়ীরা বিনা খরচে বিশ্রাম নিতে এবং অবস্থান করতে পারতেন। ফলে স্থলপথে বণিকদের চলাচল ও পণ্য পরিবহণে সুবিধা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পণ্য পরিবহণে এ সড়কপথকে ব্যবহার করা হতো। তবে স্থলপথের তুলনায় নৌপথেই বেশি ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো বলে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়।[১০৪] উল্লেখ্য যে, সুলতানী যুগে বাংলার নৌপথে চলাচল সবচেয়ে সহজ ছিল। এ কারণেই এসময় নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।[১০৫] পর্যটক মাহুয়ান, ভার্থেমা ও বার্বোসার বর্ণনায় সুলতানী যুগে জাহাজ ও নৌশিল্পের উন্নতি এবং প্রচুর নৌকা ও জাহাজের

---

[১০২] Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh, Economic History*, vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, Reprint. 2017, p. 28

[১০৩] আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৩ ও ১৭৪. এই পথ ডেমরা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার সাথে প্রায় সমান্তরাল।

[১০৪] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশ ইতিহাস, মধ্যযুগ*, ২য় খণ্ড, সরকার পাবলি. কোলকাতা, ২০০৬, পৃ.৬০; *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর দিনাজপুর*, সম্পাদক, নুরুল ইসলাম খান, ১৯৯১, পৃ. ১৮৭

[১০৫] ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজন ছাড়াও ক্রমবর্ধমান নৌ-যুদ্ধের চাহিদা পূরণের স্বার্থেই সুলতানগণ জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ শিল্পে বিশেষ মনযোগী হয়েছিলেন।

কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৬] কবি বিপ্রদাস বিরচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যেও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে সুলতানী যুগের নৌশিল্পের বিকাশের কথা বিধৃত হয়েছে। এ সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মতো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে নৌপথই বেশি ব্যবহার করা হতো। বাংলার স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে পণ্য পরিবহণ সহজ ও খরচ তুলনামূলকভাবে কম থাকায় বণিক ও ব্যবসায়ীরা তাদের বাণিজ্য পণ্য পরিবহণে জলপথকেই অগ্রাধিকার দিতেন। মূলত স্থলপথে ও নৌপথে অভ্যন্তরীণ শহর, নগর, বন্দরগুলোর সাথে দ্বিমুখী যাত্রী ও পণ্য চলাচল ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

বাংলায় জলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো নৌকা ও ভেলা এবং স্থলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো পালকি। অর্থাৎ নৌকা ও পালকি নির্মাণ ছিল বাংলার একটি বড় শিল্প। প্রত্যেক শিল্পের একটি আঞ্চলিক বিশেষত্ব থাকে। তাই কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন শিল্পকারখানা। ঐ বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য হাট-বাজার ও গঞ্জ। দূর-দূরান্তের ক্রেতারা ঐসব বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে পণ্য সংগ্রহ করার জন্য আসত। প্রত্যেক কেন্দ্রের মালিককে বলা হতো মহাজন বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

রপ্তানি পণ্যদ্রব্য

উল্লিখিত সময়ে বিভিন্ন রকম পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হতো। এদেশের রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে সুতিবস্ত্র, রেশমি কাপড়, আফিম, লাক্ষা, মরিচ, চাল, চিনি, লবণ, পান-সুপারি, ঔষধপত্র, শুকনা মাছ প্রভৃতি। এগুলোর মধ্যে সুতিবস্ত্র সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য। গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরে রেশমি কাপড়। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে বার্নিয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮) বলেন যে,

> বাংলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতোবেশি চাল উৎপন্ন করে যে, তা কেবল প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতেই নয় দূরবর্তী রাজ্যসমূহেও সবররাহ করে। এসব চাল গঙ্গা থেকে পাটনা পর্যন্ত বহন করে আনা হয় এবং সাগর দিয়ে মসলিমপত্তন ও ভারতীয় উপকূলের বহু বন্দরে রপ্তানি করা হয়। এখান থেকে চাল বিদেশি রাজ্যগুলোতে বিশেষ করে সিংহল ও মালদ্বীপে পাঠানো হয়।[১০৭] তিনি আরো বলেন যে, বাংলা চিনি উৎপাদনে পরিপূর্ণ। এই চিনি গোলকুণ্ডা ও কর্ণাটক রাজ্যে সরবরাহ করা হয় . . .। মেসোপটেমিয়া, মোকা ও বসরা শহরের ভেতর দিয়ে আরব ও বন্দর আব্বাসের মাধ্যমে পারস্যে ও বাংলার চিনি রপ্তানি করা হতো।[১০৮]

---

[১০৬] Ma Hung, *op.cit.*, p. 161; M R Tarafder, *op.cit.*, pp. 86-87; এম মোফাখ্খারুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০-৭১

[১০৭] Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, eng.tra. from French. by Irving Brook, London, 1826, pp. 437-438

[১০৮] Francois Bernier, *op.cit.*, p. 437

বাংলার সাথে দক্ষিণ এশিয়ার ক্যারাভান পথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হতো। ক্যারাভান পথের প্রধান বাণিজ্য পণ্য ছিল ঘোড়া এবং রপ্তানি পণ্য ছিল ক্রীতদাস।[১০৯] পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের কোনো কোনো দেশ খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে ভারত ও বাংলার উপর নির্ভরশীল ছিল। ইয়েমেন নিজ দেশের প্রধান খাদ্য চাল বাংলা ও ভারত থেকে আমদানি করত। কলহটের অধিবাসীরা বাংলা ও ভারত থেকে আমদানিকৃত চাল, কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকত।[১১০] প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ভারত ও বাংলার বাজার বিস্তৃত ছিল। উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত পাসেই ও পেদিরে বাংলার বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হতো। বাংলার এসব পণ্যের তথ্যের বিষয়ে বার্বোসাও বার্থেমার সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু বার্বোসা বলেন যে, বাংলার প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল সুতি কাপড় ও চিনি। মুসলিমরা তাদের দ্রব্যাদি করমণ্ডল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, তিউনিসিয়া (Tennasserin), সুমাত্রা, মালাক্কা ও সীলোনে রপ্তানি করত।[১১১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক চীনে যে উপহার পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে বাংলার তৈরি পাঁচ রকমের মসলিন কাপড় ছিল। ঐ মসলিনের নামগুলো হলো- বায়রামি (ভাইরাম বা ভাইরন), সালাহিয়া (সিলাহাতি), শিরিনবাফ ও শানবাফ।[১১২] তোমে পিরেস বাংলার সুতিবস্ত্র সম্পর্কে বলেছেন যে, রপ্তানির জন্য বিশ রকমের অতি সূক্ষ্ম সাদা সুতিবস্ত্র উৎপাদিত হতো এবং সমগ্র প্রাচ্য ও ইউরোপের বাজারে এগুলোর খুবই চাহিদা ছিল।[১১৩] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশগুলোতে তুলার চাষ কম হওয়ায় সুতিবস্ত্রের জন্য তাদেরকে বাংলার ওপর নির্ভর করতে হতো। ইউরোপের মসলার চাহিদা মেটাত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মসলা। এই মসলা বাণিজ্যে যোগ দিয়ে ভারতীয় বণিকগণ, বাংলার, দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটের বস্ত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি করে বেশ লাভবান হতো। বার্নিয়ার বলেন,

> বাংলায় এই পরিমাণ সুতা ও রেশম আছে যে, রাজ্যকে এই দুটো পণ্যের সাধারণ ভাণ্ডার বলে অভিহিত করা যায়। বাংলার এই ভাণ্ডার কেবল হিন্দুস্তানের জন্য নয় বরং অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এমনকি ইউরোপের জন্যও। শুধুমাত্র ওলন্দাজ বণিকরা মিহি, মোটা, সাদা ও রঙিন প্রত্যেক প্রকার সুতিবস্ত্রের বিপুল পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করে তা দেখে আমি সব সময় বিস্মিত হয়েছি। পর্তুগিজ

---

[১০৯] Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India* 1200-1750, vol. 1, Orient BlackSwan, Cambridge University Press, India, 1982, p. 68

[১১০] সোনারগাঁও- এ বিভিন্ন রকম পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বণ্টন করা হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত চাল কেবল প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতেই নয়, দূরের রাজ্যসমূহেও সরবরাহ করে। এসব চাল গঙ্গা থেকে পাটনা পর্যন্ত বহন করে আনা হয় এবং সাগর দিয়ে মসলিপট্টম ও ভারতীয় উপকূলের বহু বন্দরে রপ্তানি করা হতো। এটা বিদেশি রাজ্যগুলোতেও বিশেষ, সিংহল ও মালদ্বীপে পাঠান হয়। K.M Ashraf, *op.cit.*, p.145 ; M.A Rahim, *op.cit.*, pp. 398-399

[১১১] M.A Rahim, *op.cit.*, pp. 398-399; Mohammad Yusuf Siddiq, *Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, (editor. Enamul Haque) Studies in Bengal Art Series No.13, The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, 2017, p. 62

[১১২] Tapon Raychaudhuri and Irfan Habib (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, p. 137

[১১৩] Tome pires, *op.cit.*, vol. 1, p. 93

ও দেশীয় বণিকরাও প্রচুর পরিমাণে এই পণ্যের ব্যবসা করে। রেশম ও রেশমি দ্রব্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।[১১৪]

আলোচ্য সময়ের রপ্তানি-বাণিজ্যে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলায় সুতি ও রেশম বস্ত্র ভারতবর্ষের নিকটবর্তী দেশসহ সুদূর জাপান ও ইউরোপে চালান হতো।[১১৫] বাংলা থেকে দক্ষিণ ভারত, গোলকুণ্ডা, কর্ণাট, আরব, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চিনি চালান হতো।[১১৬] বার্নিয়ার বলেন যে,

> বাংলা শোরা পণ্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। তিনি আরো বলেন যে, শোরা পণ্য বোঝাই বড় বড় মালবাহী জাহাজ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতেও ইউরোপে প্রেরণ করত। বাংলা উৎকৃষ্ট লাক্ষাও উৎপন্ন করত এবং ঐ লাক্ষা এর সঙ্গে আফিম, মোম, গন্ধগোকুল, লম্বা মরিচ ও বিভিন্ন রকম ঔষধ বিদেশে রপ্তানি করে। ঘি রপ্তানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে প্রচুর ঘি তৈরি হয়। রপ্তানির জন্য অসুবিধাজনক হলেও এই দ্রব্য সমুদ্রপথে বহু জায়গায় পাঠানো হয়।[১১৭] তাঁর মতে বাংলা থেকে বেশকিছু পরিমাণ মিষ্টি ফলমূল যেমন- আম, আনারস, হরিতকি, লেবু এবং আদা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হতো।[১১৮]

বাংলা থেকে রপ্তানিকৃত কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল- তুলা, তামাক, তেল, আদা, পাট, মরিচ, ফল প্রভৃতি। এছাড়া আফিম, মোমবাতি, মৃগনাভি, গালা, আফিম, নানা রকম মসলা জল ও স্থলপথে রপ্তানি করা হতো। এসব পণ্যদ্রব্য ভারতসহ, এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে বিশেষ করে লঙ্কা দ্বীপ ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হতো।[১১৯] বাংলা থেকে প্রতিবেশী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পিতলের বাসন, তাঁতে বোনা বিভিন্ন কাপড়, লুঙ্গি, পাট, চামড়া, ঘি, শুকনো মাছ, মাটির বাসন ইত্যাদি দ্রব্য বহুল পরিমাণে রপ্তানি করা হতো।[১২০] বহির্বিশ্বে বাংলার জিনিসপত্রের চাহিদা থাকায় উৎপাদনের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব পণ্যদ্রব্য বিদেশে অবিশ্বাস্য রকম উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো। ভাস্কো-দা-গামা বাংলার কাপড় সম্পর্কে বলেন যে, স্থানীয়ভাবে যে কাপড় ২২ শিলিং ৬ পেন্সে বিক্রি হয় কালিকটে তার মূল্য ৯০ শিলিং।[১২১] বার্বোসা এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন। এক কুইন্টাল চিনির দাম মালাবারে এক হাজার তিন শত রি, সর্বোৎকৃষ্ট একটি চৌতরের দাম ছয় শত রি, একটি সিনবফের দাম দুই ক্রুজদো এবং সর্বোৎকৃষ্ট এক খণ্ড বিটিলহর দাম তিনশত

---

[১১৪] Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, p. 439
[১১৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭
[১১৬] *ঐ*, পৃ. ১৫৭
[১১৭] Francois Bernier, *Travels in the Mughal Empire*, p. 430
[১১৮] *Ibid.*, pp. 30, 38
[১১৯] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮
[১২০] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩১৬ বাংলা, পৃ. ৩৫
[১২১] J. J. A. Campos, *op.cit.*, p. 25

রি; ফলে যারা এগুলো ঐ স্থানে নিয়ে যেতো তারা সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত।[১২২] উল্লিখিত এসব পণ্যের ওজন ও মান ছিল পর্তুগিজদের নিজেদের। কিন্তু বাংলায় এর মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। ষোড়শ শতকে ইউল এক রির যে মূল্য সে অনুযায়ী ক্রুজদো নামের এক প্রকার মুদ্রা ছিল ৪২০ রির সমান যার মূল্য ৯ শিলিং। আধুনিক মুদ্রায় পরিবর্তন করে বর্তমান ওজনের মান অনুযায়ী সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো[১২৩]-

পণ্যদ্রব্য	পর্তুগিজ ওজন বা মাপ	বর্তমান ওজন	পর্তুগিজ ওজন	বর্তমান মূল্য
চিনি	১ কুইন্টাল	১২৮ পাউন্ড	১৩০০ রি	প্রায় ১ পাঃ ৮ শিঃ
চৈতর	২০ পর্তুগিজ গজ x ৩ বা ৪ পর্তুগিজ গজ	-	৬০০ রি	প্রায় ১৩ শিঃ
সিনবফ	”	-	২ ক্রুজদো বা ৮৪০ রি	প্রায় ১৮ শিঃ
বিটিলাহ	”	-	৩০০ রি	প্রায় সাড়ে ৬ শিঃ

উল্লেখ্য যে, চৌতর, মিনবফ এবং বিটিলাহ নামক এসব কাপড়ের প্রতি গজ ছিল ২০ পর্তুগিজ লম্বা ও গজ ৩ বা ৪ গজ চওড়া। ভাস্কো-দা-গামার বর্ণিত তথ্য বিশ্লেষণ করে এম আর তরফদার দেখান যে, বাংলা ও কালিকটে বিক্রীত পণ্যের মূল্যের অনুপাত ৪ঃ১।[১২৪] অন্যান্য পণ্যের সম্পর্কে একই অনুপাত ছিল কিনা তা বলা দুষ্কর।

বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে অরুণ দাশগুপ্ত তাঁর ‘Aspects of Bengals Sea-Borne Commerce in the Pre-European Period’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে, প্রত্যেক বছর চার বা পাঁচটি জাহাজে করে এদেশের পণ্য সরাসরি রপ্তানি হতো মালাক্কায় সুমাত্রার অন্তর্গত পাসেই-এ। ছোট জাহাজের মালামাল ছাড়াও চাইনিজ জাংক জাতীয় বড় ও ভারী একটি বা দুটি জাহাজে মালাক্কায় যে সকল দ্রব্যসামগ্রী যেতো তার মূল্য ছিল ৮০ হাজার থেকে ৯০ হাজার ক্রুসেডো। সুতিবস্ত্র, চিনি, চাল, লবণ মাখানো শুকনো মাছ, মাংস, সংরক্ষিত তরিতরকারি, আদা, কমলালেবু, লেবু, শসা, ডুমুর প্রভৃতি দ্রব্যগুলো ছিল প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।[১২৫] গুজরাটি বণিকরা আরবদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে বাংলায় আসত। সেখানে বাংলার নানা রকমের বস্ত্র, চিনি, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে মাল্লাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতো। মালাক্কায়

---

[১২২] Barbosa, *op.cit.*, vol, 2, pp. 146-147
[১২৩] Momtazur Rahman Tarafdar,, *Husain Shahi Bengal*, pp. 150-151
[১২৪] *Ibid*, p. 150
[১২৫] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১১১

পৌঁছে তারা নিজেদের নিয়ে যাওয়া পণ্য খালাস করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ধরনের মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং চীনা জিনিসপত্র সংগ্রহ করত। আরব বণিকরা নিজেরাও বাংলা এবং মালাক্কায় গমন করে প্রাচ্য পণ্য সংগ্রহ করত।[১২৬] বাংলায় রপ্তানি পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে সমসাময়িক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিজার দা ফ্রেডারিক চট্টগ্রাম বন্দরে আঠারোটির বেশি জাহাজ নোঙর করে থাকতে দেখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই বন্দর থেকে বণিকরা চাল, চিনি, শস্যদানা, নগদ অর্থ এবং আরও অনেক পণ্য ইন্ডিজে নিয়ে যেতো।[১২৭] তিনি আরো বলেন পর্তুগিজদের ছোট জাহাজগুলো সাতগাঁও এ যেতো এবং চাল, বিভিন্ন ধরনের কাপড়, লাক্ষা, চিনি, মরিচ এবং আরো নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য জাহাজ বোঝাই করত।[১২৮] এশিয়া মহাদেশীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকরা নির্দিষ্ট একটি দেশের উৎপাদিত জিনিসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন- করমণ্ডল উপকূলে ধান উৎপন্ন হতো না। এজন্যই বাংলা থেকে তারা ধান ও চিনি আমদানি করত।[১২৯] পণ্ডিচেরীর সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ করা হতো বাংলা থেকে।[১৩০] এ সকল পণ্যদ্রব্যাদি বাংলা থেকে রপ্তানি করা হতো। আলোচনাধীন সময়ে কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বিকশিত হওয়ায় অনেক পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হতো।

আমদানি দ্রব্য

বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হলে বিভিন্ন দেশ থেকে বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি করা হতো। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধির জন্য শাসকগণের প্রচুর সম্পদ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জোয়াও দ্য বারোস এর বর্ণনায়। তাঁর মতে, গুজরাটের বাহাদুর শাহ এবং বিজয় নগরের নরসিংগার একত্রে যে সম্পদ ছিল বাংলার রাজার একারই ঐ পরিমাণ সম্পদ ছিল।[১৩১] সম্পদশালী শাসকগোষ্ঠী, অভিজাতশ্রেণি ও ধনীদের জন্য বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি করা হতো। যেমন- রেশমি কাপড়, মখমল কাপড়, নকশাদার পর্দা, ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ এবং সোনা, রূপা, তামা ও আফ্রিকার ক্রীতদাস প্রভৃতি। আলেকজান্দ্রিয়া, চীন ও ইরাক থেকে কিছু কিছু রেশমি কাপড় আমদানি করা হতো। অভিজাতশ্রেণি ও রাজপরিবারের লোকজন বিদেশের এসব বিলাসজাত দ্রব্য খুবই পছন্দ করতেন।[১৩২]

---

[১২৬] ইমতিয়াজ আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২-১৪৩
[১২৭] J.J.A Campos, *History of the Portuguese in Bengal,* p. 113
[১২৮] *Ibid*
[১২৯] Moreland, *India at the Death of Akbar*, Delhi, reprint, p. 98
[১৩০] গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ.৭৫-৭৬
[১৩১] Joao de Barros, *Da Asia,* p. 246
[১৩২] K.M.Ashraf, *op.cit.*, p.143

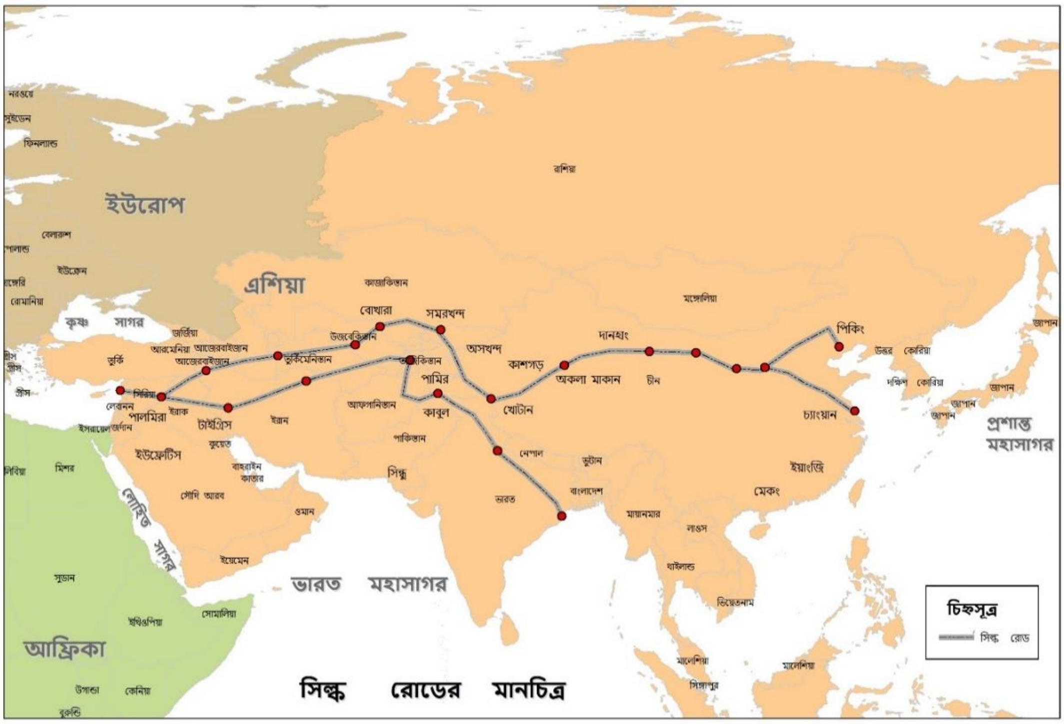

সিল্ক রোডের মানচিত্র

বাংলায় আমদানি পণ্যদ্রব্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঘোড়া। দিল্লি ছিল ভারতের ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের সর্ববৃহৎ বাজার। বাংলা পর্যন্ত এই ঘোড়ার ব্যবসা সম্প্রসারিত ছিল। ইবনে বখতিয়ার খলজির ঘোড়া ব্যবসায়ীর পরিচয়ে বাংলায় আসা তার প্রমাণ দেয়। তখন তুর্কিস্তান ও হিমালয় অঞ্চল থেকে বাংলায় ঘোড়া আমদানি হতো। বাংলায় আসা এসব ঘোড়া ছিল টাঙন (tanghan) ঘোড়া।[১৩৩] হিমালয় অঞ্চল থেকে স্থলপথে ঘোড়া আমদানি করা হতো। বর্তমানে এই পথই সিল্ক রোডের সাথে সংযুক্ত। এই সিল্ক রোডের/পথেই ঘোড়া ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হতো। হিমালয় থেকে সাধারণত ছোট ছোট ঘোড়া বাংলায় আনা হতো। রাজকীয় অশ্বশালার জন্য উন্নতমানের ঘোড়া আমদানি করা হতো। সাইমন ডিগবি উল্লেখ করেন যে, বাংলায় আমদানিকৃত ঘোড়া টাট্টু ঘোড়া নয়, এগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের বড় ঘোড়া। চীন থেকে জলপথের মাধ্যমে বাংলায় ঘোড়া আসত বলে ধারণা করা যায়।[১৩৪]

মালাক্কা থেকে বাংলায় যে সকল দ্রব্য আমদানি করা হতো তন্মধ্যে- বোর্নিও থেকে আনা হতো কর্পূর, গোল মরিচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, চন্দনকাঠ ও রেশম। চীন ও লিউ কিউ দ্বীপপুঞ্জ হতে আসত সাদা

---

১৩৩ Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 343; ক্যারাভান বাণিজ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে দক্ষিণ এশিয়ায় স্থলপথে পরিচালিত বাণিজ্যকে সাধারণভাবে ক্যারাভান বাণিজ্য নামে অভিহিত হতো। ইমতিয়াজ আহমেদ, *দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৪৮

১৩৪ অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

ও সবুজ মৃৎপাত্র, তামা, টিন, সীসা ও পারদ। এছাড়া এডেনের বিভিন্ন ডিজাইনের কাজ করা সাদা ও সবুজ রেশম বস্ত্র (damask), কার্পেট ও জাভায় তৈরি ছোরা, তলোয়ার এবং আরও অনেক কিছু।[১৩৫] পর্তুগিজ বিবরণে আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, পর্তুগিজরা বিভিন্ন স্থান থেকে বাংলায় নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসত। মালাক্কা, সুমাত্রা ও বোর্নিও থেকে তারা যেসব পণ্য বাংলায় আনত তার মধ্যে রয়েছে- জরি, বুটিদার রেশমি কাপড়, ভেলভেট, সার্টিন, সিল্কের মতো তাফতা প্রভৃতি। মালাক্কা থেকে আরো আনত লবঙ্গ, জয়ফল ও জৈয়ত্রী। বোর্নিও থেকে কর্পূর, শ্রীলংকা থেকে দারুচিনি এবং মালাবার থেকে আনত মরিচ। তারা চীন থেকে আনত সিল্ক, সোনার গিলটি, মুক্তা ও মূল্যবান রত্ন। মালদ্বীপ থেকে কড়ি, বড় আকারের ঝিনুক আনত সোলোর ও তিমুর হতে।[১৩৬] এই সময়ে সুলতান, অভিজাতবর্গ বা ধনী বণিকরা বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ায়, তাদের চাহিদা পূরণের জন্য মজুর বা শ্রমিকদের অনেক রকম কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।[১৩৭]

বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল দাস ব্যবসা। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের সাথে ভারতের বাণিজ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে বাংলার অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজাত মহলে ও রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কাজে দাসরা নিয়োজিত ছিল। এসব দাসদের ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণ তারা খুব পরিশ্রমী ছিল। সময়ের বিবর্তনে তারা ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয়। তুর্কি দাস বংশ দিল্লিতে রাজত্ব করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক শামস দামখানি নামক এক দাসকে গুজরাট প্রদেশ ইজারা দিয়েছিলেন। ইজারার পূর্বে একটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, দামখানি বছরে চারশ উন্নতমানের হাবশি (আবিসিনিয়ান) দাস দিল্লিতে প্রেরণ করবে।[১৩৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই দাস দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- (ক) হাবশি দাস[১৩৯] ও (খ) জাঞ্জি দাস (জাঞ্জিরার অধিবাসী)। সময়ের বিবর্তনে জাঞ্জিরার সিদ্দীরা (হাবশি) নৌ বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিল। বাংলার রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কাজের জন্যও ক্রীতদাস প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন শাসকের সময়ে ক্রীতদাস আমদানি করা হয়। ইলিয়াস শাহি বংশের শাসনামলে অনেক দাস নিযুক্ত করা হয়। সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ প্রায় আট হাজার হাবশি ক্রীতদাস

---

[১৩৫] Tome Pires, *op.cit.*, pp. 88-93

[১৩৬] J.J.A Campos, *op.cit.*, pp. 114-115

[১৩৭] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের বাংলা*, পৃ. ৫৬৪

[১৩৮] *ঐ*, পৃ. ৪৮, ৫০৭

[১৩৯] হাবশি নামের উৎপত্তি হয়েছে আরবি আল হাবশ শব্দ থেকে। সাধারণত আরবরা হাবশ বুঝাত আবিসিনিয়াকে। ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়ার জাহাজের ক্যাপ্টেনরা এ উপমহাদেশে পণ্যের সাথে ক্রীতদাস নিয়ে আসত এবং তাদেরকে বিক্রি করে দিত। উল্লেখ্য এ হাবশিরা খুব শক্তিশালী ছিল এবং অনেক বেশি পরিশ্রম করতে পারত। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থের লোভে ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে তাদেরকে ধরে এনে বিক্রি করে। এই হাবশিরাই বাংলায় দীর্ঘ সময় রাজত্ব করে। সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, পৃ. ২৫৬-২৫৬

আমদানি করে তাঁর প্রাসাদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেন। মূলত, সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ হিন্দুদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে হাবশি ক্রীতদাস নিযুক্ত করে এদের ক্ষমতাশীল করে তোলেন। এ হাবশি ক্রীতদাসররাই পরে ইলিয়াস শাহি বংশ উৎখাত করে বাংলায় হাবশি শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ১৪৯৩ সালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হাবশিদের পরাজিত করে হোসেন শাহি বংশের সূচনা করেন।[১৪০] এই বংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাবশিদের গুরুত্ব কমতে থাকে।

বাংলার স্থানীয় বাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। ইবনে বতুতার বিবরণে তার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন উপপত্নীরূপে সেবার জন্য উপযুক্ত একটি সুন্দরী যুবতী এক স্বর্ণ দিনারে আমার সামনে বিক্রি করা হয়। এক স্বর্ণ দিনার সমান মরক্কোর আড়াই দিনারের সমান (২½)। বতুতা নিজে আশুরা নামে সুন্দরী যুবতী ক্রীতদাস প্রায় একই দামে ক্রয় করেন। তাঁর সঙ্গীদের একজন এক স্বর্ণ দিনারে লুলু নামে একটি ছোট সুন্দরী ক্রীতদাস ক্রয় করেন।[১৪১] বাংলায় দাস-দাসীর দাম কম হলেও সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে হিন্দুস্তানে দাস-দাসীর দাম অনেক বেশি ছিল।[১৪২] বার্বোসা দাস ব্যবসা সম্পর্কে বলেন যে, এই শহরের মুরদেশীয় বণিকগণ দেশের অভ্যন্তরে চলে যায় এবং পিতামাতা বা অন্যান্যদের নিকট থেকে বহু ছেলেমেয়ে ক্রয় করে আনে। এরা এ ধরনের ছেলেমেয়েদেরকে চুরি করে নিয়েও খোজা বানায়। . . . তারপর এদেরকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং প্রত্যেককে ২০ বা ৩০ টি ইউরোপীয় স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রায় ইরানিদের কাছে বিক্রি করে দেয়। ইরানিগণ তাদের স্ত্রী ও গৃহের জন্য পাহারাদার হিসেবে এদেরকে খুব প্রয়োজনীয় মনে করে।[১৪৩] দাসী ক্রয়ের ব্যাপারে একজন মোগল ওমরাহ এর প্রস্তাব তুলে ধরেছেন ব্লকম্যান। তিনি বলেন, ঘরের কাজের জন্য খোরাসানের মেয়ে ক্রয় করো, দক্ষ শিশু পরিচর্যাকারিনী হিসেবে হিন্দু রমনী ক্রয়যোগ্য, হাস্যলাস্যে এবং রহস্যে মাতিয়ে রাখার জন্য পারস্যবাসীনির সঙ্গ চাই। আর অক্ষু নদীর ওপারের মেয়ে নগদ মূল্যে ঘরে এনো, যাতে তাকে বেত্রাঘাত করে অন্য তিনজনকে সাবধান করে দিতে পারো।[১৪৪] বাংলার বাজারে দাস ব্যবসার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে। তাঁর মতে শ্রীহট্ট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক

[১৪০] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, অখণ্ড সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩০-১৪০

[১৪১] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 235

[১৪২] আলাউদ্দিন খলজির সময়ে একজন সুদক্ষ ক্রীতদাসের মূল্য ১২০ তঙ্কা ছিল। গোলাপ বদন নামক একজন ক্রীতদাসকে ৯০০ তঙ্কা দিয়ে কেনা হয়েছিল। কোনো কোনো ক্রীতদাসের দাম ২০,০০০ তঙ্কা বা তার চেয়েও বেশি উঠত। আলাউদ্দিন খলজির সময়ে গৃহের কাজের জন্য দাসীর মূল্য ছিল ৫ থেকে ১২ তঙ্কার মধ্যে এবং একজন উপপত্নীর দাম ছিল ১০ থেকে ১৫ তঙ্কার মধ্যে। এছাড়া ২০ থেকে ৪০ তঙ্কার মতো খরচ করতে পারলে একটি সুন্দর ক্রীতদাসের মালিক হওয়া যেতো। পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে একটি দাসীর দাম ছিল ৮ ও উপপত্নীর দাম হয় ১৫ টাকা। K.M Ashraf, *op.cit.*, pp. 161-162

[১৪৩] Barbosa, *op.cit.*, pp.145-147

[১৪৪] Kunwar Muhammad Ashraf, *Life And Conditions Of The People of Hindustan*, p. 104

খোজা সরবরাহ করা হতো।[১৪৫] এছাড়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এর বিবরণ থেকে বাংলার দাস ব্যবসার তথ্য পাওয়া যায়, সম্রাট বলেন,

> হিন্দুস্তানে বিশেষ করে বাংলার অধীন রাজ্য শ্রীহট্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। তারা তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে খোজা বানাত এবং খাজনার পরিবর্তে এদেরকে শাসনকর্তার কাছে অর্পণ করত। এই প্রথা কিছু পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশেও প্রবর্তিত হয়। একইভাবে প্রতি বছর কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়ের জীবন বিনষ্ট হয় . . .। এ প্রথা সাধারণত সমাজের রীতিতে পরিণত হয়ে পড়ে। এ সময়ে আমি একটি আদেশ জারি করি যে, এখন থেকে কোনো ব্যক্তিই যেনো এই ঘৃণ্য প্রথা অনুসরণ না করে এবং তরুণ খোজা নিয়ে যারা এই ধরনের ব্যবসা করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।[১৪৬]

বার্বোসার বর্ণনার সাথে সম্রাটের প্রদেয় তথ্যের মিল রয়েছে। এ সকল তথ্য থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, বাংলায় দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল এবং স্থানীয়ভাবে দাস ক্রয়-বিক্রয় হতো। মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থেও দাস-দাসীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিদেশি বণিকদের আগমন

উপরোল্লিখিত বিবরণে দেখা যায় বাংলায় সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সুবিধা থাকায় বিদেশি বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আগমন করে। বিদেশি বণিকদের মধ্যে প্রথমে পর্তুগিজরা পরবর্তীতে ওলন্দাজ ও অন্যান্য বণিক বাংলায় আগমন করে। পর্তুগিজরা প্রথম চট্টগ্রাম বন্দরে আসে ১৫১৮ সালে।[১৪৭] প্রথমদিকে তারা সুবিধা করতে পারেনি কিন্তু বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩২-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) শেরশাহের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পর্তুগিজদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। পর্তুগিজরা সাহায্যের বিনিময়ে সুলতানের নিকট থেকে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। বাংলার চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও (হুগলির কাছে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রাম) বন্দরের শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয় স্থানীয়দের পরিবর্তে পর্তুগিজরা।[১৪৮] উল্লেখ্য যে, সুলতানের কাছ থেকে তারা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার পর্যন্ত লাভ করে।[১৪৯] সুলতান কর্তৃক

---

[১৪৫] Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, vol. 1, p. 136

[১৪৬] *Tuzuk-i-Jahangiri*, edited Saiyid Ahmed Khan, eng.tra. by Rogers, pp. 150-151; উদ্বৃতি, M A Rahim, *op.cit.*, vol. 1, pp. 299-300

[১৪৭] পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল পিরেস দ্যা আনড্রেডা নামক একজন ক্যাপ্টেনকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বাণিজ্য করতে পাঠান। কিন্তু ঐ ক্যাপ্টেন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায়ে প্রলুদ্ধ হয়ে বাংলায় আসেননি, বরং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলে যান। পরবর্তীতে জোয়াও কোয়েলহো নামক অন্য ব্যক্তিকে চট্টগ্রামে পাঠান। পর্তুগিজ কোয়েলহোই তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে আসেন। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে জোয়াও সিলভেরা নামক আরও একজন ক্যাপ্টেন ৪ টি জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। J.J.A Campos, *History of the Portugueses in Bengal*, London, 1919, pp. 26-27

[১৪৮] J.J. Campos, *History of the Portugueses in Bengal*, p. 39

[১৪৯] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২; M R Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, pp. 369-370

উপরিউক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভের ফলে এ অঞ্চলে পর্তুগিজদের শক্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে দলে দলে পর্তুগিজরা বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসতে শুরু করে। এতে করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলার বাণিজ্যের একটি অংশ তাদের অধিকারে চলে যায়।[১৫০] কিন্তু শেরশাহের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে পর্তুগিজদের বাণিজ্যিক সুবিধার অবসান হয়। বাংলায় কররানী শাসনের অবসানের পর চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে চলে যায়। প্রায় একই সময়ে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ দিকে 'দেয়াঙ' এ পর্তুগিজরা তাদের বাণিজ্য কুঠি এবং গির্জা নির্মাণ করে। চট্টগ্রামের এই 'দেয়াঙ' হয় এই অঞ্চলের পর্তুগিজদের প্রধান শহর এবং বাণ্ডেল বা বন্দর। ইউরোপীয়রা এ শহরের নাম লিখেছেন 'দিয়াংগা'। এই সময় থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হওয়া পর্যন্ত দেয়াঙ-এ পর্তুগিজদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে।[১৫১] পর্তুগিজ পাদ্রি সেবাস্টিয়ান মানরিক ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলায় আসেন। তাঁর (সেবাস্টিয়ান মানরিক) বর্ণনা থেকে দেখা যায়, চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানার পশ্চিম অংশে অঙ্গারখালিকে তিনি অঙ্গারকেল বলেছেন। হাটগুলো হলো- অঙ্গারখালি, বালুখালি ও চন্দন্যা হাট। এখানে বেশ বড় বড় হাট ছিল এবং ঐসব হাটে বৃহদাকারে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এই তিনটি অংশ নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। গির্জা ছাড়া অঙ্গারখালিতে তারা একটি বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। এই বন্দরে তাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সাতগাঁও, হুগলি, চট্টগ্রাম ছাড়াও বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য জলপথে তাদের বাণিজ্য পরিচালিত হতো। পর্তুগিজরা বার্মা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বাংলা থেকে পণ্যসামগ্রী রপ্তানি এবং ঐসব দেশ থেকে বাংলায় পণ্য আমদানি করত।

পর্তুগিজরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসলেও তাদের মধ্যে অনেকেই জলদস্যুতার সাথে জড়িত ছিল।[১৫২] এছাড়াও তারা বাণিজ্যিক জাহাজ ধ্বংস করত এমন প্রমাণ রয়েছে। সুলতান নুসরাত শাহের ২,৫০,০০০ ক্রুসেডো মূল্যের পণ্যবাহী দুটি জাহাজ তারা ধ্বংস করেছিল।[১৫৩] শাসকশ্রেণি, আরব ও পারস্যদেশীয় ব্যবসায়ীদের শত্রুতার কারণে এদেশে তাদের অবস্থানকাল ছিল সীমিত। সপ্তদশ শতকের শুরুতে তারা শুধু তাদের উপনিবেশগুলোতে রীতিসম্মত সামাজিক জীবনযাপন করতে শুরু করেছিল। অবশ্য সাতগাঁও ও চট্টগ্রামের শুল্ক ভবনগুলো পর্তুগিজ ইজারাদারদের সাথে স্থানীয়দের সম্পর্কে কেমন ছিল তা বলা

---

[১৫০] ইমতিয়াজ আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

[১৫১] J J A Campos. *op.cit.*, pp. 165-166

[১৫২] পর্তুগিজ বণিকরা ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য জাহাজের ওপর জলদস্যুতা করত ফলে জলপথের বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া তারা দক্ষিণ বঙ্গে ঢুকে অত্যাচার করত। তারা নগর ও জনপদ লুট ও আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করত, স্ত্রীলোকদের ওপর বহু অত্যাচার করত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নর-নারীকে পশুর মতো নৌকার খোলে বোঝাই করে নিয়ে দাসরূপে বিক্রি করত। উল্লেখ্য যে, তারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত কিন্তু বাঙালি বণিকেরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানত না বলে তাদের সাথে পেরে উঠত না। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬৪

[১৫৩] M.R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p.101, Footnote. 4 (বাংলা অনুবাদ)

মুশকিল। ধারণা করা হয় যে, তাদের মধ্যে এ সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না কারণ বাংলার সুলতান ও আরব বণিকদের প্রতি তাদের শত্রুতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। পর্তুগিজরা (বাংলা থেকে) রেশমি বস্ত্র, ঘৃতকুমারি কাঠ এবং কস্তুরির ব্যবসা করত। তারা পরিধান করত লাল টুপি ও ভাঁজ করা জ্যাকেট। জুতা ব্যবহার না করলেও তারা নাবিকদের পরিহিত চোগার মতো রেশমি চোগা পরত এবং এগুলো ছিল রত্নখচিত। তারা টেবিলে বসে আহার করত এবং সব রকম মাংস খেতো।[১৫৪] পর্তুগিজরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল এবং বড়দিন ও ইস্টার সানডে উদযাপন করত। বাংলায় অবস্থানের কারণেই তারা মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে স্থানীয় পণ্যদ্রব্যাদি ব্যবহার করত। বাংলায় আগত বণিকদের সম্পর্কে Om Prakash বলেন যে,

> সতেরো শতকের শুরুতে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রসামগ্রীর আধিক্য ইউরোপে ভারতের বাণিজ্যের এক নতুন পর্বের সূচনা করেছিল। এই পর্বে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে বাংলা শুধু ভারতের মধ্যেই সেরা নয় সমগ্র এশিয়ায় সেরা ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আঠারো শতকের শুরুতে ওলন্দাজরা এশিয়া থেকে যে পণ্যসম্ভার হল্যান্ডে রপ্তানি করত এর শতকরা চল্লিশ ভাগই সংগৃহীত হতো বাংলা থেকে। আর ওলন্দাজ কোম্পানি এশিয়া থেকে যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করত, মূল্যের নিরিখে এর অর্ধেকেরই বেশি বস্ত্র রপ্তানি হতো বাংলা থেকে। . . . এশীয় বাণিজ্যেরও প্রায় অর্ধেক পণ্য রপ্তানি হতো বাংলা থেকে।[১৫৫]

ওম প্রকাশের সাথে আমরাও একমত পোষণ করি কারণ বাংলায় আগত বিভিন্ন পর্যটকগণ এদেশের বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। এছাড়াও তারা বিভিন্ন দেশে এ বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদার কথা বলেছেন। বতুতা, মাহুয়ান, বার্থেমা ও বার্বোসার বর্ণনা থেকে এরূপ উন্নত বস্ত্রের নাম জানতে পারি।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাংলার স্থানীয় মহাজন ও বণিকদের অবস্থান

মুসলমানরা নৌযান পরিচালনা এবং বাণিজ্যিক কাজে অভিজ্ঞ থাকায় তারা ভারতীয় বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ তদারকি করত। মুসলিম নাবিকগণ সে সময়ের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সকল সমুদ্রপথ ও বাণিজ্যিক বন্দরগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিল। মূলত বাংলার হিন্দু বণিকগণ মুসলমানদেরকে তাদের বাণিজ্য জাহাজে পরিচালক বা কাপ্তান ও নাবিকরূপে নিয়োগ করতেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগাতেন। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু জাহাজের পরিচালক ও নাবিকগণ মুসলিম উপাধি যেমন 'মুয়াল্লিম' বা 'মালিম' (জাহাজের পরিচালক) উপাধি ধারণ করত। অনেক সময় হিন্দু

[১৫৪] Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, 1630-1720, Princeton, 1985, p.19; Momtazur Rahman Tarafdar,, *Husain Shahi Bengal*, p. 370

[১৫৫] Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, p. 8

পরিচালকদেরকেও 'মালিম' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[১৫৬] আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিকশিত হওয়ায় এদের সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলার বিভিন্ন শহর, নগর ও বন্দরে দূর-দূরান্তের ক্রেতারা পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য মহাজনের নিকট আসত। প্রত্যেক কেন্দ্রের মালিককে বলা হতো মহাজন বা শেঠ। অর্থনৈতিকভাবে মহাজন সত্যিকার অর্থেই ধনী বা শেঠ ছিলেন।[১৫৭] মহাজনের আড়ৎ থেকেই ক্রেতাদের পণ্য ক্রয় করতে হতো। মহাজনরা সবসময় অতিরিক্ত লাভে (মুনাফায়) পণ্য বিক্রি করত এবং তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করত। গ্রামীণ বাজারে সাধারণ মানুষ তাদের পণ্য বিনিময় করত। সেখান থেকে মহাজন, পোদ্দার, বণিক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সম্ভবত বিদেশি বণিকদের কাছে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করত। উল্লেখ্য যে তৎকালীন সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব বেড়ে যায় এবং তারা আর্থিকভাবে অনেক প্রভাবশালী ছিল। শাসকগোষ্ঠীর সর্বজনগ্রাহ্য মুদ্রার প্রচলন করায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। আলোচ্য সময়ে সুষ্ঠু বাণিজ্যিক পরিবেশের কারণে বাজার মালিক, মহাজন, দেশি ও বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু কারিগর ও শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যতটুকু লাভবান হয়েছিল তার চেয়ে বেশি লাভবান হয় এ সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা। বিভিন্ন উপাধির নানা বণিকরা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করত। আধুনিক গবেষক গৌতম ভদ্র বলেন যে,

> বানজার নামে একশ্রেণির যাযাবর জনগোষ্ঠী স্থলপথে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ব্যবসা করত এবং যাত্রাপথেই তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করত। প্রতি গোষ্ঠীতে ছয়, সাত শত লোক ছিল। তারা ব্যবসায় প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য বেচাকেনা করত।[১৫৮] এই বানজার গোষ্ঠীর পাশেই ছিল অন্য ক্ষুদ্র বণিকরা। তারা একইভাবে বাণিজ্য করত। তারা ফেরিওয়ালার মতো ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় জিনিস বেচাকেনা করত। প্রত্যেক জায়গায় তাদের দেশওয়ালি ভাইদের একটি স্থায়ী গোষ্ঠী ছিল। সেই অঞ্চলের স্থানীয় মালামাল বেচাকেনার সুযোগ করে দেওয়া ও বাজারের খবর এনে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সেই দেশওয়ালি ভাইদের ওপর। এইভাবে তারা বিশেষ বিশেষ

[১৫৬] বিজয় গুপ্ত, *মনসামঙ্গল*, পৃ. ১৪৪; M.A Rahim, *op.cit.*, pp. 304-305

[১৫৭] Sirajul Islam, `Economic History in Perspective', *History of Bengal, Economic History* (1704-1971), vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, reprint. 2017, p. 7; মহাজন সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় মুকুন্দরামের কালকেতু চরিত্র থেকে। কুসীদজীবী মহাজন মুরারী শীলের নিকট কালকেতু একটি আংটি বিক্রি করতে গেলে দু'জনের মধ্যে খুব দর কষাকষি হয়। প্রথম দিকে মুরারী আংটিটি বিনামূল্যে নেওয়ার চেষ্টা করে। মহাজন বলেন আংটিটি পালিশ করা তামায় নির্মিত হয়েছে এবং এর মূল্য নির্ধারণ করে কালকেতুকে আট পন পাঁচ গণ্ডা দাম দিতে চান। কালকেতু চণ্ডী দেবীর নিকট থেকে এর দাম পূর্বেই জেনে নিয়েছিল যে এই আংটির মূল্য সাত কোটি টাকা। কালকেতু টাকা না নিয়ে অন্য মহাজনের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। অবশেষে মুরারী শীল দাম বাড়িয়ে দিয়ে সাত কোটি টাকা মূল্যের আংটি ক্রয় করে। মুকুন্দরাম, *চণ্ডীকাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯২-২৯৫ বাংলার অধিকাংশ মহাজন একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষ ঠকিয়ে নিজের অর্থ বৃদ্ধি করা।

[১৫৮] Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia* (travels in Asia 1628-1634), edited by Lt. Col. Sir Richard Carnac Temple. vol. 2, The Hakluyt Society, London, 1914, pp. 167-168; Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal Delhi*, Delhi, 1963, p. 62; গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ৭৬

ঋতুতে নিজেদের জাত ভাই ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রাথমিক উৎপাদকের কাছ থেকে জিনিস কিনে অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বিক্রি করত।[১৫৯]

এসব ক্ষুদ্র বণিকরা হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ কিংবা ধার করা টাকা বা নিজের ব্যবসা থেকে লাভ করা টাকা দিয়েই ব্যবসা করত। তাদের ব্যবসার জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কাপড়, তেল, ঘি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এইসব ব্যবসায় অনেক মূলধনের প্রয়োজন হতো না। তারা খুব অল্প টাকায় জিনিস কিনে বেশি টাকায় বিক্রি করে অধিক লাভের চেষ্টা করত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা সাথে নানা শ্রেণির লোক জড়িত ছিল। সমসাময়িক বিবরণী থেকে জানা যায় যে,

> গুজরাটের বাণিজ্যের সিংহভাগই কারবারি। তারা সব অঞ্চলে তাদের প্রতিনিধি রাখে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করে।[১৬০] সাধারণত ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশিরভাগই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো। এই ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল লাভ করা। বাংলার সুলতানগণ বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনো বাধা থাকত না।[১৬১]

ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় এসব বণিকদের সাথে বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা জড়িত ছিল। অনেক পরিবারেই একজন সাধারণ মধ্যস্বত্বভোগী/দালাল ছিল। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির মাল সংগ্রহের জন্য ক্রেতা বিক্রেতা উভয়পক্ষের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং ঐসব পণ্যদ্রব্য অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প দামে ক্রয় করে বেশি দামে সরবরাহ করতেন। এর নিচে ছিল পাইকাররা, উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য খুচরা কাঁচামাল সংগ্রহ করত বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহের জন্য চুক্তি করত। চাহিদা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ বাড়ানো ও কমানো হতো। এক্ষেত্রে সরাসরি কোনো উৎপাদককে জড়ানো হতো না। ঢাকার বণিক ও কোম্পানির কাপড় ব্যবসা সম্পর্কে লিখেছেন যে, দালাল টাকা দিত পাইকারকে। পাইকার ঐ টাকা শহরে শহরে নিয়ে যেতো এবং তাঁতিদের মাঝে বন্টন করে দিতো। তাই পাইকারের টাকার জামিনদার তাঁতি, দালালের টাকার জামিনদার পাইকার এবং কোম্পানির টাকার জামিনদার দালাল।[১৬২] ক্রয়-বিক্রয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দালাল প্রয়োজন হতো। কাপড় তৈরি ও বিক্রির সাথেও চালান থাকত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দালাল ছাড়া কেউ লাভজনক ব্যবসা করতে পারত না। কাপড় তৈরির সাথে জড়িত বেশির ভাগ তাঁতি ছিল মুসলমান। অভিজাত বণিকরা বিভিন্ন উৎপাদনে জড়িত হতেন না এবং

---

[১৫৯] Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia* (travels in Asia 1628-1634), pp. 95-96; গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ৭৬

[১৬০] Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires*, vol. 1, pp. 61, 88, 93

[১৬১] গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ৭৩, ৭৪

[১৬২] S. Nandi, `The Silk Trade of Krishna Kanto Nandi, 1770-1772' *Bengal Past and Present*, 1976, July-December, p. 297; গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

এ কাজকে তারা সামাজিকভাবে অমর্যাদার কাজ বলে মনে করত।[১৬৩] অভিজাত বণিকদের জাহাজে মাল পাঠাতে বানিয়ার প্রয়োজন ছিল। বণিকদের সাহায্যে বানিয়ারা কাজ করত। বণিকরা শুধু ব্যবসায় বিনিয়োগ করত। ব্যবসার জগৎ থেকে উৎপাদনের জগতে তারা কখনও প্রবেশ করেনি।[১৬৪] মূলত বণিকদের নিজেদের প্রয়োজনে তথা ব্যবসায়িক সুবিধার্থে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি তথা দালালদের প্রয়োজন ছিল।

এসব অঞ্চলে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী প্রেরিত হতো উপকূলের গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এর সাথে জড়িত থাকত বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ীরা। এদের মধ্যে ছিল কেউ পাইকার আবার কেউ বা খুচরা ব্যবসায়ী। তাছাড়াও ছিল ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে সংযোগকারী মধ্যস্বত্বভোগী দালাল শ্রেণির লোক। মূলত দেশের ভেতরে ও উপকূলবর্তী অঞ্চলের বড় বড় ব্যবসায়-বাণিজ্য সাধারণত একদল সুসংগঠিত দালাল শ্রেণির সহায়তায় পরিচালিত হতো। তারা ব্যবসায়িক লেনদেনের সাথে জড়িত দুই পক্ষের কাছ থেকে দস্তুরি বাবদ অর্থ আদায় করত। তারা জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে সিদ্ধ হস্ত ছিল।

ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বার্বোসা উপকূলীয় অঞ্চল মুসলমান অধিবাসী দ্বারা পূর্ণ দেখেছিলেন এবং তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। বেঙ্গালা নগরীর বৃহৎ আয়তন, সম্পদ এবং আবহাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক আরবীয়, পারস্যবাসী, আবিসিনীয় এবং ভারতীয় বণিক সেখানে এসে হাজির হয়েছিল। এসব বণিক এদেশের বহু পণ্যদ্রব্য করমণ্ডল (Charamandel), মালাক্কা (Malacca), সুমাত্রা (Camatra), পেগু (Peeguu), ক্যাম্বে (Cambay) এবং সীলাম (Ceilam) এ নিয়ে যেতো।[১৬৫] ভার্থেমা উল্লেখ করেন যে বাঙ্গালা নগরীর সবচেয়ে ধনী বণিকগণ এদেশের সুতি, রেশমি কাপড় তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব, ইথিওপিয়া এবং ভারতে যেতো।[১৬৬] মাহুয়ান বাংলার বণিকদের সম্পর্কে বলেন যে ধনীরা জাহাজ নির্মাণ করে, সেগুলো দিয়ে বিদেশিদের সাথে ব্যবসা করত এবং বহুলোক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল।[১৬৭] র‍্যালফ ফিচের বিবরণে দেখা যায় সোনারগাঁও এর সুতিবস্ত্র ও চাল ভারত, শ্রীলংকা, পেগু, মালাক্কা সুমাত্রা এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হতো। [১৬৮] কবিকঙ্কনের বর্ণনায় একই তথ্য উঠে

---

[১৬৩] গৌতম ভদ্র , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

[১৬৪] হাতে হাতে বিক্রি করতে না পারলে বানিয়ারা কিছু কিনতে চাইত না। তারা তাদের নিজের থলে থেকে পুঁজি বের করে না। নিজেরা লাভ রেখে মাল বিক্রি করার পর বিক্রির টাকা পাওনাদারকে মিটিয়ে দেয়। W H Moreland, *op.cit.*, pp. 144-145; গৌতম ভদ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫

[১৬৫] Barbosa, *op.cit.*, vol. 2, pp. 135-145

[১৬৬] Varthama, *op.cit.*, p. 22

[১৬৭] Ma Huan, *op.cit.*, Appendix, 3, pp. 305-306

[১৬৮] Ralph Fitch, *Travels in India.* pp.119-120

এসেছে। বাংলার বণিকরা উৎকল ও করমণ্ডল উপকূল হয়ে শ্রীলংকা ও গুজরাটে গিয়েছিল এবং মগধ, মথুরা, বিজয়নগর, মারাঠা অঞ্চলও তাদের অপরিচিত ছিল না। তোমে পিরেসের মতে,

> মালাক্কায় বাঙালি বণিকদের একটি দল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এসব বণিকদের কেন্দ্র করেই সেখানে দর্জি ও জেলে শ্রেণির বাঙালির আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল।[১৬৯] বাঙালিদের কলোনি ছিল উত্তর সুমাত্রার অন্তর্গত পার্সেই-এ। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পার্সেই-এ প্রথম মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল বলে তোমে পিরেস ধারণা করেছেন। বাঙালি বণিকরাই মূলত এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিদেশে বণিকদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সফলতায় এটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছিল। বাংলায় যেসব বণিকগণ বাণিজ্য করতে আসতেন তাদের মধ্যে ছিল ভারতীয়, আবিসিনীয়, পার্সিয়ান ও আরবীয়।[১৭০]

তাদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেই বাংলার ব্যবসায়িক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। বাঙ্গালা শহরের সবচেয়ে ধনী বণিকদের উল্লেখ পাওয়া যায় ভার্থেমার বিবরণ থেকে। তাঁর বর্ণনা মতে, And here there are the richest merchants ever met.[১৭১] বাণিজ্যিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে যেসব বিলাসপরায়ণ মুসলিম ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় ভার্থেমার বিবরণে। অভিবাসিত অভিজাত মুসলমানগণ ছিলেন ভোজনবিলাসী ও অমিতব্যয়ী। উন্নত পোশাক পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা খচিত অঙ্গুরীয়, আবাসস্থল সংলগ্ন স্নানাগার, বহুবিবাহের রেওয়াজ প্রভৃতি ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েই তাদের আর্থিক বিত্তের ও আর্থিক প্রাচুর্য প্রকাশ পেতো।[১৭২] এই অভিজাতশ্রেণির বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য নানান রকম পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হতো।

আলোচ্য সময়ে বাংলায় পতুর্গিজদের আগমনের পর তাদেরকে সহায়তাকারী দালালশ্রেণি ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক মুনাফা অর্জন করেছিল। মধ্যস্থতাকারী এই বেনিয়াদের সাহায্যেই বিদেশি বণিকগণ এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। বাংলার স্থানীয় ভাষায় কথা বলা ছিল পর্তুগিজদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাই বেনিয়ারা স্থানীয়দের সাথে পণ্য ক্রয়ের জন্য কথা বলতে বলতে এক সময় অনেক শব্দ আয়ত্ত করে নেয়। ভাষার সমস্যা, ওজন ও মাপের সমস্যা, মুদ্রা পরিবর্তনের সমস্যা প্রভৃতি কারণে তারা বেনিয়াদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। পর্তুগিজ কোম্পানির দালাল হিসেবে বেনিয়ারা রপ্তানি

---

[১৬৯] Tome Pires, vol.1, *op.cit.*, p. 24, vol. 11, p. 271

[১৭০] *Ibid*, pp. 142-143

[১৭১] Ludovico di Varthema, *The Travels of Varthema*, John Winter Jones অনূদিত এবং George Percy Badger কর্তৃক সম্পাদিত Hakluyt Society, London, 1863, p. 212

[১৭২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১১৬

মূল্যের ওপর শতকরা দেড় টাকা থেকে আড়াই টাকা পর্যন্ত কমিশন দাবি করত। এটি ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। এই কমিশনভোগী বেনিয়া ছাড়া দূর-দূরান্তের হাটবাজারে পর্যায়ক্রমে নানা ধরনের দালাল নিযুক্ত হতো। এসব দালালরাও নির্দিষ্ট হারে কমিশন পেতো। রপ্তানি বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফার একটি বড় অংশ লাভ করেছিল মধ্যবিত্ত দালালশ্রেণি।[১৭৩] বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের মধ্যে ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম।

দাদনি প্রথা

দাদন ফার্সি শব্দ দাদান শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ আগাম বা অগ্রিম প্রদান করা। সুলতানী শাসনে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে দাদনি প্রথার প্রচলন ঘটে। বণিকগণ পণ্যদ্রব্যের কাঁচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁতিতে অগ্রিম টাকা সরবরাহ করত দালালের মাধ্যমে। দালাল সেই টাকা পাইকারকে দিলে তারা বিভিন্ন স্থানের বা শহরের উৎপাদক কারিগরদের মধ্যে সে অর্থ বণ্টন করতেন। সেই অর্থের জন্য কারিগর পাইকারের জামিনদার এবং পাইকার দালালের জামিনদার হিসেবে গণ্য হতেন। এই ঐতিহাসিক প্রথা 'দাদনি প্রথা' নামে পরিচিত।[১৭৪] এখানে পাইকার বা ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁতি কারিগরদের সম্পর্ক ছিল মধ্যস্বত্বভোগী ও পণ্য সরবরাহকারী।[১৭৫] এ প্রথা ছিল এক ধরনের ব্যাংকিং প্রথা। দাদনি প্রথায় কারিগর পণ্যের মূল্যের অধিকাংশ হাতে পেতো এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল। গৃহীত অর্থ কারিগর কাঁচামাল ক্রয়ের কাজে ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করতে পারতো। বাংলা ও ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে দেশি ও বিদেশি বণিকগণ দাদনি ব্যবস্থার মাধ্যমে কারিগরদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বণিকগণ নগদ অর্থ দিয়েও পণ্য ক্রয় করতেন। দাদনি প্রথা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ব্যাপকভাবে বিকাশে সহায়তা করেছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে মহাজনরা অনেক সময় ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করে প্রয়োজন মেটাতেন। মহাজন বা সাহুদের বড় বড় প্রতিষ্ঠানও ছিল। বেপারিরা তাদের কর্তাদের প্রতিনিধি (শাহু/সাহু) হয়ে বিভিন্ন স্থানের দোকানে বসতেন। মূলত ঋণ হিসেবে অগ্রিম টাকা দিয়ে সাহু বা মহাজনরা বাণিজ্যিক উদ্যোগকে

---

[১৭৩] Sirajul Islam, `Economic History in Perspective', *History of Bangladesh, Economic History*, vol. 2, Reprint. 2017, pp. 8-9

[১৭৪] দাদনি প্রথা-দাদনি শব্দ ফার্সি দাদন বা আগাম শব্দ থেকে এসেছে। কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যবসায়িক চুক্তির স্মারক হিসেবে কোনো আগাম দিলে তাকে দাদনদার বলা হয়।

[১৭৫] M.R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, p. 100

সহায়তা করলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল চড়া দামে সুদ নিয়ে টাকা খাটানো। এরা সর্বস্তরে সাহু/শাহু বা মহাজন নামে পরিচিত ছিল।[১৭৬] সাধারণত সমাজের ওপর মহলে এদের খুব কদর ছিল। কারণ ঋণগ্রস্ত অভিজাতশ্রেণি অনেক সময় দেশি মহাজনদের কাছে জায়গির বন্ধক রাখতেন। মহাজনকে ঋণের বিপরীতে কি পরিমাপে সুদ দিতে হতো সেই তথ্য পাওয়া না গেলেও আমির খসরু একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে,

> মোটা অঙ্কের ঋণ হলে তার সুদের হার ছিল বছরে দশ শতাংশ। আর টাকার পরিমাণ অল্প হলে সুদ দিতে হতো বছরে বিশ শতাংশ। . . . তিনি আরো দেখিয়েছেন যে এক তঙ্কার সুদ ছিল এক জীতল অর্থৎ বছরে প্রায় বিশ শতাংশ।[১৭৭]

আমির খসরুর এই বর্ণনা থেকে তৎকালীন মহাজন ও সাহুরা ঋণ প্রদান করে যে সুদ গ্রহণ করত তার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সব ধরনের ব্যবসায়ীরাই কম বেশি ঋণ নিয়ে সুদও প্রদান করত। তবে সাধারণ মানুষ ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারলে অনেক সময় গৃহহারা হতে বাধ্য হতো।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সুলতানী শাসনামলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় নগরের বিকাশ ঘটে এবং নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অভিবাসিত শ্রেণির সাথে অনেক বহিরাগত জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষক পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়। উৎপাদন বাড়লে বড় বড় শহর ও নগরে পণ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য অনেকেই সংশ্লিষ্ট হয়ে পরে। আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। আমদানি পণ্য চাহিদাপূর্ণ এলাকায় প্রেরণ করতে অর্থ বিনিয়োগ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় দৈহিক শ্রম কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। যেমন- সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রামে অনেক লোক নিযুক্ত ছিল।

সুলতানী বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বহুমুখী প্রভাব দেখা যায়। এ সময় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐসব দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁত শিল্পে বস্ত্র উৎপাদনে চরকার ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধি

---

[১৭৬] K M Ashraf, *op.cit.*, p. 140
[১৭৭] Amir Khusrau, *Ijaz-i-Khusravi*, vol.1, Lucknow,1875-76, p. 174, উদ্বৃতি, K M Ashraf, *op.cit.*, p. 140

পাওয়ায় এই শিল্পের সাথে অনেক লোক যুক্ত হয়। ফলে তাঁতিদের মধ্যে নতুন নতুন বর্ণ (caste) ও শাখা বর্ণের (sub-caste) জন্ম নেয়।[১৭৮] যেমন- রংরেজ, আভিসন্ধিক প্রভৃতি। বাজারে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দুই ধরনের পাইকার ছিল। এসব পাইকারদের বড় পাইকার ও ছোট পাইকার বলে ডাকা হতো। বড় পাইকারদের 'আড়তদার' আর ছোটো পাইকারদের 'ফড়িয়া' বলে আখ্যায়িত করা হতো। শেষোক্তদের ব্যবসাকে 'ফড়িয়ামি' বলা হতো। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কারিগর ছিল। বাকেরগঞ্জে পাটিপাতা গাছ জন্মাত এবং সেই পাতা দিয়ে শীতলপাটি তৈরি হতো, এই পাটির কারিগরদেরকে বলা হতো 'পাইট্টা'।[১৭৯] বস্ত্র তৈরির সাথে কারিগরি শিল্প যুক্ত হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্য নিয়মিত লেনদেনের জন্য গড়ে উঠে নতুন দোকানদার শ্রেণি। এরা নিজস্ব দোকান দিয়ে গ্রামীণ হাট ও মেলায় পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করত। উল্লেখ্য যে, সুলতানী শাসনে অভিজাতশ্রেণির চাহিদার প্রেক্ষিতে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন শিল্পের সাথে জড়িত ছিল যেমন- চামড়া শিল্পের সাথে চামার, লৌহশিল্পের সাথে কামার প্রভৃতি। চট্টগ্রামের জাহাজ শিল্পের সাথে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক জড়িত ছিল। সমুদ্রে যারা জাহাজ চালাতেন তাদেরকে নাবিক বলা হতো। যার নির্দেশে জাহাজ উপকূলে নিয়ে যাওয়া হতো তিনি মালুম নামে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করা হতো এবং পালবাহী দাড়টানা কাঠের জাহাজকে সরের (আরবি শব্দ সর অর্থ পাল, বৈদেশিক জাহাজের পালকে সর বলা হতো) বা পালের জাহাজ বলা হতো। সরের জাহাজ নির্মাণ শিল্পীদেরকে বালাম বলা হতো এবং তারা যেখানে বাস করত সেই পাড়াকে বলা হতো 'বালামী' পাড়া।[১৮০] সুলতানী বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে ভিন্ন ভিন্ন নামের বণিক জড়িত ছিল। যেমন- গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক এবং শঙ্খবণিক। *কালকেতুর উপাখ্যানে* গন্ধবণিকদের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বণিকরা ধুপ-ধুনা, আতর, আগরবাতি, গোলাপজল প্রভৃতি দ্রব্য বাংলার হাট-বাজারে বিক্রি করত। সুবর্ণ বণিকেরা হলো স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তারা স্বর্ণের অলংকার তৈরি করত না তবে স্বর্ণকারের কাছ থেকে যাচাই করে কম দামে গহনা কিনে অধিক দামে বিক্রি করত। শঙ্খবণিক মূলত শঙ্খের তৈরি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী। শঙ্খ বা শামুক দিয়ে তৈরি শাঁখা ও বিভিন্ন গহনা এই বণিকরা বিক্রি করত। হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের কাছে এসব গহনার খুব কদর ছিল। এই বণিকগণ 'শাঁখারি' নামেও পরিচিত ছিল। বর্তমান সমাজেও শাঁখারিদের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

---

[১৭৮] M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Mevieval Bengal*, p. 74

[১৭৯] H. Beveridge B.C.S, *The District of Bakargonj*, Trubner & co. Ludgate Hill, London, 1876, pp. 288-289

[১৮০] Ma Hung, *op.cit.*, p.160; M. R. Tarafder, *op.cit.*, pp, 87-89; আবদুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম* (একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃ. ৪৬-৪৭

উল্লেখ্য যে, সেন শাসন আমলে বল্লাল সেন বণিকদেরকে পতিত পর্যায়ে নামিয়ে দেন। লক্ষ্মণ সেনের সময়েও বণিকদের একই অবস্থা ছিল। কিন্তু সুলতানী আমলে বণিকরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসহ অনেক সুবিধা ভোগ করত। এ কারণে সুলতানী শাসনাধীনে বণিকদের অবস্থার উন্নতি হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন বণিকের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বণিকের মধ্যে ধনপতি, হীরামাণিক, দুলালধন প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন।

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে নদীমাতৃক বাংলা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপযোগী দেশ হিসেবে সুপরিচিত। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুদ্রার প্রচলন, নগরায়ণ, সুলতান ও অভিজাতবর্গের সরাসরি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করায় বাংলার পতনোন্মুখ ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। আলোচ্য সময়ে শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, একটি বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কৃষিজ ও শিল্পপণ্যের বিপুল উৎপাদন, মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ, নগর ও বন্দরসমূহের উন্নতি ইত্যাদির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর বৈদেশিক বাণিজ্যের সাফল্য ও বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। সুলতানী আমলে বাংলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুলতানী আমলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। নানা কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। মূলত বিদেশি বণিকদের আগমন ঘটায় তাদের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অনেক দালালশ্রেণির লোকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে। তৎকালীন বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোক এই বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হওয়ায় অনেক লোক আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাফল্যের কারণে বাংলার সকল স্তরের জনগণের ওপর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে এবং দ্রব্যমূল্য সহনশীল হওয়ায় স্বল্প আয়ের সাধারণ পরিবারও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। অন্যদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে দাদনি প্রথার প্রচলন ঘটে, যা ছিল এক ধরনের ব্যাংকিং প্রথা। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী বাংলায় উন্নতমানের মুদ্রার প্রচলন করেন এবং এই মুদ্রাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে গতিদান করেছিল। তাই একে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি বলে গণ্য করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

সুলতানী বাংলার নগরায়ণ

অষ্টম অধ্যায়

সুলতানী বাংলার নগরায়ণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাক-মোগল বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার নগরায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জয় করার মধ্য দিয়ে গৌড়ে মুসলিম রাজত্বের সূচনা হয়। তাঁর এই বিজয়ের ফলে বাংলায় অভিবাসী মুসলমানদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ এদেশে শাসনকর্তা, সেনাপতি, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষণকারীরূপে আগমন করে। এসব মুসলিমদের মধ্যে আরব, পারসিক, তুর্কি বিভিন্ন ভাষাভাষীর জাতীগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল সুফি, ধর্ম-প্রচারক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। আগত অভিজাত মুসলমানরা অনেকেই নগর জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলায় তাদের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, প্রশাসনিক কেন্দ্র, থানা, টাকশাল, সরাইখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই বাংলায় নগরবিন্যাস ঘটে। শাসকগণের সাথে সুফিগণ তাদের কিছু শিষ্যসহ বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে *খানকাহ* স্থাপন করেন। *খানকাহ*তে শিষ্যদের আসা যাওয়ার মাধ্যমে খানকাহ সংশ্লিষ্ট স্থান ক্রমেই জমজমাট হয়ে ওঠে। এভাবেই ছোট ছোট স্থানে জনবসতি বাড়তে থাকে। ফলে ঐ স্থানকে কেন্দ্র করে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য নতুন নতুন দোকান-পাট, বাজার ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পর্যায়ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে শহর গড়ে উঠে এবং এভাবেই পরবর্তীতে শহরতলী থেকে নগরের পত্তন ঘটে। এ সময়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে শিল্পকারখানায় পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নগরের বিকাশ ঘটায় শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে কারিগর শ্রেণির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ নানা ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অধিক অর্থ আয়ের প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে নগরে কারিগর ও পেশাজীবীদের ভিড় বাড়তে থাকে এবং তারা নগরে বসবাসের জন্য আবাসস্থল গড়ে তোলে। ফলে পর্যায়ক্রমে নগরের পরিসীমা বৃদ্ধি পায়। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নত পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার সকল সুবিধা বিদ্যমান থাকায়, বাংলায় বিভিন্ন দেশের বণিকদের আগমন ঘটে। নগরায়ণের ফলে শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে এবং বাংলা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে এক প্রকার মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। নগরায়ণের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই অধ্যায়ে সুলতানী বাংলার নগরায়ণ প্রক্রিয়ার নিয়ামকসমূহ, নগরের প্রকারভেদ ও আর্থ-সামাজিক জীবনে নগরায়ণের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান অধ্যায়টিকে তিনটি অংশে ভাগ করে উপস্থাপন করা হলো। যথা- (ক) নগরায়ণ প্রক্রিয়ার নিয়ামকসমূহ (খ) বাংলার নগরের প্রকারভেদ এবং (গ) আর্থ-সামাজিক জীবনে নগরায়ণের প্রভাব। নগরায়ণ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের নগর সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই প্রথমেই নগর এবং নগরায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

নগর

কোনো অঞ্চলে যখন বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর বসবাস শুরু হয় এবং সেখানে শহর অপেক্ষা উন্নত যোগাযোগ, শিল্প, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়, সাধারণত তখন ঐ অঞ্চলকে নগর বলে অভিহিত করা হয়। নগর শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ City বা Town। আধুনিককালে Urban শব্দটি নগর অর্থে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জার্মান ভাষায় নগরকে Stadt ফরাসি ভাষায় Citi, সুইডিস ভাষায় Stadr বলা হয়। ফরাসিরা নগরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন। সুইডিসরা নগর বলতে Tatort শব্দও ব্যবহার করেছেন, যেখানে ২০০ জনের চেয়ে বেশি লোক বসবাস করে এবং ২০০ মিটার ব্যবধানে পুঞ্জীভূত। স্থাপত্যবিদ্যার গ্রন্থাদিতে একটি 'নিগম' বা 'শহর' তা-ই, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বসতি এবং প্রচুর কারিগর আছে। নিগমের অর্থ বাজার এলাকা বা একটি সংঘ এবং বণিকদের একটি সংঘবদ্ধ দল।[১] এগারো শতকের বৈয়াকরণ কৈয়টের মতে, নগর হলো উঁচু পাঁচিল এবং পরিখা দিয়ে ঘেরা বাসভূমি। এখানে কারিগর ও ব্যবসায়ীর তৈরি আইন ও নিয়ম-কানুন বলবৎ থাকত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গকে নগর বলা হয়েছে।[২] অর্থাৎ নগর বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়, যেখানে ভৌগোলিকভাবে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী স্থানের চেয়ে মানুষের বসবাসের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থাদি রয়েছে এবং যেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ অকৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। সেখানে যোগাযোগব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকে এবং সে স্থানের জনসংখ্যার ঘনত্ব পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোর থেকে অনেক বেশি হয়। নগরের সংজ্ঞায় *The New Encyclopedia of Britanica* তে বলা হয়েছে- a relatively permanent and highly organized center of population of greater size or importance than a town or village.[৩]

---

[১] রামশরণ শর্মা, *ভারতে নগর অবক্ষয়*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪

[২] ড. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (অনূদিত), *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম, কলকাতা*, ২০০২, পৃ. ১৭০; রামশরণ শর্মা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

[৩] *The New Encyclopedia of Britanica*, 1975, vol. 11, p. 951

নগরায়ণ

নগরায়ণ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Urbanization। এটি ল্যাটিন শব্দ Urbs (আরব্‌স) থেকে এসেছে। আরব্‌স (urbs) বলতে রোমানরা রোমের নগরকে বুঝিয়েছেন। নগর হচ্ছে গতিময়, নিত্য পরিবর্তনশীল, বিকাশমুখী জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। নগর আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নগরের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, যেখানে পর্বতশ্রেণির ন্যায় সৌধসমূহ বিদ্যমান থাকে তাকে নগর বলে। সাধারণ অর্থে নগরায়ণ বলতে নগরের উদ্ভব, বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বুঝায়। নগরায়ণ দুটি ভিন্ন ও সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। যেমন- প্রথমত: গ্রামীণ এলাকা থেকে শহর এলাকায় মানুষের আগমন এবং এর ফলে গ্রামীণ এলাকা অপেক্ষা শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া। দ্বিতীয়ত: নগরের বিকাশের ফলে গ্রামীণ এলাকায় নগর সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রসার ঘটে। ফলে অতি মাত্রায় নগরায়িত সমাজে গ্রামীণ ও নগরের জনসংখ্যার মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য হ্রাস পায়।[৪] নগরে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা থাকে। যেমন- রাজধানী, সামরিক ঘাঁটি, শিল্পকারখানার প্রাধান্য, নানা রকম কর্মসংস্থানের সুযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা, প্রশাসনিক কেন্দ্র, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং ভিন্ন ভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এসব সুযোগ-সুবিধার কারণেই মানুষ মূলত নগরে ভিড় জমায়।[৫] নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটে। B.D.Chattopadhyaya এর মতে, যেকোনো কালের বিচারে নগরায়ণের সংজ্ঞা শাস্ত্রভেদে বিভিন্ন। উন্নত ও বিভিন্ন রীতিবদ্ধ সমৃদ্ধ ক্ষেত্রের স্থানগত ও কৌশলগত বিশ্লেষণে নগরের ক্রমোন্নতিকে নগরায়ণ বলে।[৬] নগর থেকেই নগরায়ণ কথাটি ব্যবহৃত ও প্রচলিত। নগরায়ণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে- Urbanization refers to the population shift from rural areas to urban areas, the decrease in the proportion of people living in urban areas, and the ways in which each societies adapts to this changed. or the state of being or becoming urbanized.[৭] সর্বোপরি নগরায়ণ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকা থেকে নগর এলাকায় মানুষের আগমন এবং এর ফলে গ্রামীণ এলাকা অপেক্ষা নগর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া। এটি একটি প্রক্রিয়া যার ফলে মূলত কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনব্যবস্থা থেকে মানুষের শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক শহুরে জীবনব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটে। আর অতি প্রাচীনকাল থেকেই

---

৪ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *আর্থনীতিক ভূগোল বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ১৫৬

৫ অণিমা ভট্টাচার্য ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, *সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২৭৪

৬ B. D Chattopahyaya, *Urban Centres in Early Bengal, Archaeological Perspectives,* Pratna Samiksha 2&3, 1993-94, pp. 170-192

৭ *Websters New Collegiate Dictionary,* A Merriam Webster, G.& C. Merriam Company, U.S.A, 1973, p. 1278

এ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এজন্য বলা হয় যে, নগরায়ণ হলো শহুরে হওয়ার প্রক্রিয়া। এখানে মানুষ কৃষি পেশা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে অন্যান্য পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পায়।

নগরে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেমন- অকৃষিভিত্তিক পেশা, প্রশাসনিক সদর দপ্তর, কর্মব্যস্ততা, নাগরিক সুযোগ সুবিধা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বিভিন্ন পেশাজীবীর সমাবেশ, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। মধ্যযুগে বাংলার নগরায়ণের এসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও আধুনিক গবেষকগণ নগরের আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। বিভিন্ন সৌধ, ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা, খাদ্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত নয় এমন শ্রেণির লোকজনের (শাসক, অভিজাতগণ, বণিক, কারিগর) বসবাস এবং শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ইত্যাদি নগর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য। অমলানন্দ ঘোষের মতে, একটি শহর গড়ে উঠার পূর্বশর্ত শাসন বিভাগীয় সংগঠন এবং বণিক গোষ্ঠীর বিকাশ।[৮] রামশরণ শর্মার মতে, শুধু আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাপ নয়, বস্তুগত জীবনমান এবং পেশার বৈচিত্র্য শহরের অত্যাবশ্যক উপাদান। যদিও শহরের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যাদি বা উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী অত্যাবশ্যক, তবু কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন যেকোনো বাসস্থানই নগর নয়। কারিগর বিদ্যার কেন্দ্র এবং অর্থভিত্তিক বিনিময় প্রথাও নগর জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[৯] এ সকল গবেষকগণ মনে করেন, কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্যই নগর বিকাশের একক নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সুলতানী বাংলার নগর বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ এ সময়ে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের (স্থল ও সমুদ্রপথে) বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। যা তৎকালীন বাংলায় নগরায়ণের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সমৃদ্ধ নগর একটি দেশের উন্নত অর্থনীতির চিহ্নস্বরূপ। যে দেশ অর্থনৈতিকভাবে যত উন্নত সে দেশের রাজধানী ও নগরগুলো তত বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। এছাড়া উন্নত দেশসমূহের রাজধানী ও নগরগুলোতে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের জন্য সুন্দর ও সুবিন্যস্ত ভৌতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থাৎ- একটি দেশের রাজধানী, শহর বা নগর, পর্যটন কেন্দ্র ও বিভিন্ন স্থাপত্য নিদর্শনের মাধ্যমে সে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

---

৮ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, 'নগরায়ণ, আদি-ঐতিহাসিক ও প্রাক-মধ্যযুগ' *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৪৯৪

৯ Jadunath Sarkar, *History of Bengal*, vol. 2, Dacca, 1976, p. 4; Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol.1, (1203-1576), Karachi, 1963, p. 125; Md. Akhtaruzzaman, "Process of Urbanization in Early Muslim Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum. 46 (1), June 2000, pp. 35-44; Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 35-44

নগরকেন্দ্রের বিকাশের জন্য বাংলার সুলতানগণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতানগণ শিক্ষিত, ভদ্র, বণিকদেরকে শহরে বাস করার জন্য সুবিধা প্রদান করেন। মূলত বাংলায় আগত মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে নগরে বাস করার প্রবণতা বেশি ছিল। কারণ, প্রথমত: তাদের উদ্দেশ্য ছিল নগরগুলো অধিকার করে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত: শাসকগোষ্ঠীর সাথে আগত সামরিক বাহিনী, বণিক, রাজকর্মচারী, সুফি-মাশায়েখগণের পক্ষে উৎপাদনে অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল না। এ কারণে নগরের শাসক ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি পেশার উদ্ভব হয়। তৃতীয়ত: সামরিক কারণ ও নিরাপত্তাবোধ। এছাড়া সুলতানী আমলে নগরায়ণের অগ্রগতির তিনটি কারণ রয়েছে বলে ইরফান হাবীব উল্লেখ করেছেন। কারণগুলো নিম্নরূপ: (১) এ সময়ে নগরগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। (২) নগর জীবনের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কারিগরি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং (৩) মধ্যযুগে বাংলায় নগরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক অর্থনীতির পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইরফান হাবীব অর্থনীতিকে নগরায়ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নগরায়ণের বিকাশের জন্য রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক কারণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে হাবীবের মতের সাথে আমরা আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কারণ একটি দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোনো দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে সে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতি সাধিত হয় না, রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। অন্যান্য দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা কষ্টকর হয়। এর ফলে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নীতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সে দেশের অর্থনীতির পরিবেশও ঠিক হতে পারে না। অতএব, আমরা এ কথা বলতে পারি যে, নগরায়ণের বিকাশে অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। কোনো দেশ রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হলেই কেবল সেখানে শিল্প কারখানায় উৎপাদন বাড়বে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। তাই আমরা এটা বলতে পারি যে মধ্যযুগে নগরায়ণের অগ্রগতির নিয়ামক চারটি। যথা- (ক) নগরের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি (খ) কারিগরি শিল্পের বিকাশ (গ) নগরকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক অর্থনীতি ও (ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অর্থাৎ স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা নগরায়ণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

---

[১০] Irfan Habib, Economic History of The Delhi Sultanate-An Essay in Interpretation, *The Indian Historical Review*, vol. 1v, No-1, Kanpur, Kalkata, p. 289

উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক কারণ সর্বদা সর্বযুগেই যেকোনো দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সুলতানী শাসনাধীনে বাংলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়। ফলে অধিক সংখ্যক নগরকেন্দ্র স্থাপন শুরু হয় এবং পূর্বতন নগরকেন্দ্রগুলোর পুনরুজ্জীবন, উন্নয়ন ও প্রসারণ ঘটে। মূলত, তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল বলেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং দ্রুতগতিতে নগরের উত্থান ও বিকাশ ঘটতে থাকে।

(ক) নগরায়ণ প্রক্রিয়ার নিয়ামকসমূহ

তেরো শতকে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পর শাসকগণ রাজধানী শহর, প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ ক্যাম্প, মিলিটারি গ্যারিসন বা থানা প্রভৃতি গড়ে তোলেন। এসব প্রতিষ্ঠান নগরায়ণ প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছিল। সুলতানী বাংলায় যে সমস্ত নিয়ামককে কেন্দ্র করে নগরায়ণ বিকশিত হয় তাহলো- রাজধানী শহর, প্রশাসনিক কেন্দ্র, সুফি-সাধকদের খানকাহ, মসজিদ-মাদ্‌রাসা, শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র, টাকশাল নগরী প্রভৃতি। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক.১. রাজধানী শহর

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগণ নিজেদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সুবিধাজনক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলিম শাসনাধীনে বাংলার নগরায়ণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলার চারটি শহর লখনৌতি, দেবকোট, সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়া রাজধানীতে পরিণত হয়। এগুলো পরবর্তীতে প্রধান শহর ও নগর হিসেবে পরিচিত হয়।[১১] রাজকীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্থানীয় লোকের প্রয়োজন ছিল, এছাড়া শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারিগর, শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। রাজধানী শহরে এসব নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় ফলে গ্রাম থেকে জীবিকার প্রয়োজনে শ্রমিক, কারিগরসহ নানান পেশার লোক কর্মের সন্ধানে রাজধানীতে আগমন করে। এ সকল শ্রমিকশ্রেণি রাজধানীর কাছাকাছি আবাসস্থল গড়ে তোলে। শহুরে স্থায়ী ব্যবসায়ীরা সপরিবারে রাজধানী শহরেই বসবাস করত। এভাবে শহরের পরিধি বাড়ে এবং নগরের লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে রাজপরিবারের সাথে সম্পৃক্ত অভিজাতশ্রেণি ছাড়াও নানা পেশার লোক রাজধানীতেই বাস করত। কিছু শহর একাধারে রাজধানী এবং প্রশাসনিক শহর অন্যদিকে বাণিজ্য নগরী ছিল।

---

[১১] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, pp. 35-44

তৎকালীন রাজধানী নগরে সুলতানগণের উপস্থিতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি, শিল্পনির্ভরতা, কোনো বিশেষ ধরনের শিল্প পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের খ্যাতি, জলপথে যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করেই এসব রাজধানী নগরের বিকাশ ঘটে। সুলতানী বাংলার রাজধানীতে ছিল- স্থায়ী বাজার, অকৃষিজীবী বাসিন্দা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র, কৃত্রিম উপায়ে পানির সহজলভ্যতা, প্রাসাদ, পরিখাসহ প্রতিরক্ষা, কাদা বা ইটের তৈরি পাঁচিল, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি।[১২]

ক.২. প্রশাসনিক কেন্দ্র

ইবনে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করে বিভিন্ন স্থানে শহর, প্রশাসনিক সদর দপ্তর, থানা বা পুলিশ ক্যাম্প এবং সেনানিবাস বা দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রত্যেকটি প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ঘিরে নগরের বিকাশ ঘটে। অভিজাতবর্গ এবং স্থানীয় প্রশাসকগণ এ ধরনের নগরে বসবাস করতেন। ফলে তাদের প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী শহরের আকার নির্ধারিত হতো। এভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকশ্রেণির জন্য অভিবাসী বসতি গড়ে উঠে, যা সময়ের বিবর্তনে ছোট্ট শহরে উপনীত হয়।[১৩] আবার আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ভিত্তি করে অনেক নগরকেন্দ্রের উন্মেষ ঘটেছিল। উল্লেখ্য যে, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসন গড়ে ওঠে। ইবনে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এ রাজ্যকে কতকগুলো প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এ অঞ্চলগুলোকে 'ইক্তা' বলা হতো এবং এক একজন আমির এক একটি 'ইক্তার' 'মুকতা' বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। উল্লেখ্য যে, ইবনে বখতিয়ার খলজি একজন 'মুকতা' (ভিউলি ও ভাগত পরগনার) ছিলেন।[১৪] মূলত, মুসলমানদের আগমনের পর বাংলায় 'ইক্তা' প্রথা শুরু হয় যা ছিল শহরভিত্তিক। ইক্তার মুখ্য কেন্দ্রগুলোই প্রধান শহর হিসেবে ঐসব অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করে এবং এ শহরগুলো আশপাশের গ্রামগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। ইকতার আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

সুলতানী বাংলার রাজস্ব সংগ্রহকে আরও কার্যকরী করে তুলতে স্থানীয় প্রশাসনিক স্থাপনাদি গড়ে তোলা হয়েছিল। এ সময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা *ইকলিম*, *আরসাহ*, *শহর* এবং *কসবা* নিয়ে গঠিত ছিল। এসব

---

[১২] মো: মোশারফ হোসেন, *বাংলাদেশের নগর উদ্ভব ও বিকাশ*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯-১০

[১৩] মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ণ মধ্যযুগ ও ওপনিবেশিক পর্ব, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -১, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫১২

[১৪] Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin (A History of Bengal*) eng. tra. Abdus Salam, Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 2009, p. 60; মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬০

ছোট ছোট অফিসকে ঘিরে কলোনি গড়ে উঠে যা বড় শহর তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৫] উপরিউক্ত প্রশাসনিক কেন্দ্রকে ঘিরে মানুষের যাতায়াত বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষুদ্র পরিসরে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত। এরূপ প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োগে নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১৬] স্বাধীন সুলতানদের শাসনামলে স্থিতিশীল রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ যুগে বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের পাশাপাশি প্রতিটি বাণিজ্যকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, ফলে নতুন নতুন শহরের পত্তন ঘটে।[১৭]

ক.৩. সুফি-সাধকদের খানকাহ

বাংলার কয়েকটি নগরের উত্থানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল সুফি- সাধকদের খানকাহ। সুফিগণ ধর্মীয় সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসতি স্থাপন করতেন এবং তাদের খানকাহ নির্মাণ করেন। এসব খানকাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত মসজিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের আনাগোনা বেড়ে যায়। যেমন-তাব্রিজাবাদ। শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি এবং তাঁর শিষ্যরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দে এখানে মসজিদ নির্মিত হয়। স্থানটি বেশ বড় এবং জনবহুল ছিল।[১৮] সুলতান মুহাম্মদ শিরান খলজির কবরস্থান মহীসুন বহু সুফির সমাধিস্থল ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। শরফউদ্দিন মানেরির (১২৯০-১৩৮১ খ্রিস্টাব্দ) পিতা শেখ ইয়াহিয়া মানেরি বিখ্যাত পণ্ডিত শিখ তকিউদ্দিনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৪৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানেরই নামকরণ করা হয় বারবকাবাদ এবং একজন ওয়াজিরের হাতে শহরটির দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার সংস্পর্শে মানের (মুনের) একটি বিখ্যাত ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র পরিণত হয়।[১৯]

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সুফি-সাধক ও মাশায়েখগণ বাংলায় আগমন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের *খানকাহ* প্রতিষ্ঠা করেন। সুফি মাশায়েখগণ বাংলার বিভিন্ন উপশহর কিংবা হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাসের স্থানগুলোর কাছাকাছি তাদের খানকাহ স্থাপন করেছিলেন।

---

১৫ জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৯২

১৬ সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮- ১৫৩৮), ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৪৬৯

১৭ মো: আখতারুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২-৫১৩

১৮ Syed Hasan Askari, The correspondence of two 14th Century Sufi-Saints, 1948, p.35, Md. Akhtaruzzaman, `Urbanization Process and Planning' *History of Bengal, Sultanate and Mughal Period*, (editor) Abdul Momin Chowdhury, vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, 2020, pp. 481-482

১৯ Minhaj-I-Saraj, *Tabaqat-I-Nasari*, p. 433

সুফি-সাধকদের এসব *খানকাহ*গুলো ছিল ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিকতা, মানবকল্যাণ ও শিক্ষামূলক কার্যাবলির এক একটি প্রধান কেন্দ্র। এসব *খানকাহতে* যেকোনো ধর্মের লোক আসতে পারত। বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলির মুক্ত ও অকপট আলোচনার মূল কেন্দ্র ছিল খানকাহ। এসব শিক্ষাকেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হতো।[২০] সুফি-সাধকদের অনুসারীরা বিভিন্ন প্রদেশের নিভৃততম কোণেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের এসব বসতি স্থাপন নগরকেন্দ্রের সৃষ্টি করেছিল, যেমন- সিলেট ও সোনারগাঁও। সোনারগাঁও শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, সুফি-সাধকদের খানকাহর জন্যও বিখ্যাত ছিল। শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁওয়ে *খানকাহ* ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২১]

বাংলায় এসব *খানকাহ* স্থাপনের সাথে অর্থনীতির বিষয়টিও জড়িত ছিল। *খানকাহ* এর জন্য বরাদ্দ করা নিষ্কর ভূমি থেকে প্রাপ্ত কৃষিজ উদ্বৃত্ত থেকে *খানকাহ* সংলগ্ন ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সুফি-সাধকদের অনাড়ম্বর জীবন ও *খানকাহ*গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার প্রভাবে অনেক নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। *খানকাহর* রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত ভূখণ্ডে তাদেরকে সুবিধাজনক শর্তে বসবাস করতে দেওয়া হতো। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর আশপাশে নতুন নতুন ভূখণ্ড গঠিত হচ্ছিল। কোনো কোনো সুফি-সাধক নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জেগে উঠা জমিতে স্থানীয় লোকদেরকে দিয়ে আবাদ করাতেন। এভাবে নতুন সমাজকাঠামো নির্মিত হয়েছিল।[২২] আর নতুন সমাজকাঠামোর এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুরু হয়েছিল নগরকেন্দ্রের উদ্ভব।

ক.৪. মসজিদ ও মাদ্‌রাসা

সুলতানী শাসনাধীনে নগরায়ণের ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা সংযোজিত হয়। অভিজাতশ্রেণির আগমনের পর শহরগুলিতে নতুন কিছু সংযোজন হয়েছিল। যেমন- প্রাসাদ, মসজিদ, পুকুর ইত্যাদি।[২৩] মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। পরবর্তীতে এসব মসজিদকে কেন্দ্র করে মাদ্‌রাসা গড়ে উঠেছিল। সুলতান ও আমির ওমরাহ্‌গণ মসজিদ, মাদ্‌রাসা স্থাপন ও এগুলো

---

২০ Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, vol.1, (1203-1576), Karachi, 1963, p. 125

২১ Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p. 125

২২ মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৬২

২৩ K.M.Ashraf, *op.cit.*, pp.198-199

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। এছাড়াও আমির ওমরাহ, অভিজাতগণ এক্ষেত্রে প্রচুর অনুদানের ব্যবস্থা করেন। সুফিসাধক ও উলেমাগণের ধর্ম প্রচার সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের যাতায়াত বেড়ে যায়। বেশি সংখ্যক লোকজনের জমায়েত হওয়া এবং তাদের বহুমুখী প্রয়োজনে ধীরে ধীরে এসব মসজিদ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে নগরের পত্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ পাণ্ডুয়া, রংপুর, মান্দারন (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর) ও সাতগাঁও প্রভৃতি নগরের কথা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে জানা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ পাণ্ডুয়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর জমি দান করেন।[২৪] গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) লক্ষ্মণাবতীতে একটি সুন্দর মসজিদ, একটি মহাবিদ্যালয় এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।[২৫] সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (রাজা গণেশের পুত্র যদু, ১৪১৫-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আবার সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৬৪- ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলিম আমলে রংপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে সুলতান বারবাক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ) রংপুরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ) বাঘায় একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়া সুলতান হুসেন শাহের সময়ে মান্দারনে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬] এ সমস্ত মসজিদ ও মাদ্রাসাকে ঘিরে পরবর্তীকালে উপশহরের গোড়াপত্তন ঘটে। এক কথায় বলা যায় যে, বাংলার নগরায়ণে এসব মসজিদ ও মাদ্রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক.৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ

সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় পূর্বের তুলনায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। ফলে দেখা যায় অভিজাতগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকায় শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে বেশকিছু শহর গড়ে উঠেছিল এবং পূর্বের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো আরও বেশি সম্প্রসারিত হয়েছিল। যেমন- তাব্রিজাবাদ (দিনাজপুর), নবদ্বীপ, বিহার শরিফ, সোনারগাঁও, বাঘা, আজিমাবাদ (পাটনা) প্রভৃতি স্থানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে নগরের বিকাশ ঘটেছিল। যদিও এর মধ্যে

---

[২৪] Khan Sahib M. Abid Ali Khan, *Memoirs of Gour and Pandua,* edited by H.E Stapleton, Calcutta, 1931, pp. 33-34

[২৫] Minhaj-i-Siraj, *op.cit.,* p. 583

[২৬] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.,* p.186

দু' একটি কেন্দ্রের বিশেষ বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল। ইবনে বখতিয়ার খলজির বিহার আক্রমণের সময় বিহারে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। তাঁর সময়ে রংপুরে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া সুলতানী আমলে সোনারগাঁও শিক্ষাকেন্দ্র এত বেশি সম্প্রসারিত হয়েছিল যে দেশের বাইরে থেকে অনেক শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগমন করেছিল। এছাড়াও মাহিসন্তোষ নামে পরিচিত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মহিসুন ছিল মুসলমানদের প্রথম যুগের অন্যতম জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের সুনাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছিল। মাওলানা তকিউদ্দিন আরাবি নামে বিখ্যাত পণ্ডিত এখানে একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। তেরো শতকের মধ্যভাগে মহিসুন উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল।[২৭] বাংলার অনেক শিক্ষাকেন্দ্র আবাসিক হওয়ায় ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভিড় জমাত। গৌড় অঞ্চলে ওমরপুর গ্রামের নিকটে দরাসবাড়ি নামক স্থানে একটি মাদরাসা নির্মিত হয় যা দরাসবাড়ি মাদরাসা নামে পরিচিত।[২৮] দরস্‌বাড়ি শব্দের অর্থ পড়ালেখার ঘর। এটি ছিল সম্পন্ন আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সাতগাঁওয়ে সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের সময়ে ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দে একটি মাদ্‌রাসা নির্মিত হয়। তাছাড়া সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সময়ে ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে সাতগাঁওয়ে আরও একটি মাদ্‌রাসা নির্মিত হয়। এ মাদ্‌রাসা 'দারুল খায়রাত' (পরোপকারের বাড়ি) নামে অভিহিত ছিল।[২৯] মূলত এ মাদ্‌রাসা দুটো সাতগাঁও অঞ্চলে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক.৬. থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি

আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হলে কিছু শহরতলী গড়ে উঠেছিল। বাংলায় আগমনের পর ইবনে বখতিয়ার খলজি সামরিক ফাঁড়ি স্থাপন করেছিলেন।[৩০] মুহাম্মদ শিরান খলজির জায়গীর বা আঞ্চলিক কেন্দ্র লখনৌর (বীরভূম জেলার নাগোরো) থানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বুড়িগঙ্গক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত শামসুদ্দিনপুর (সমস্তিপুর) শহর প্রতিষ্ঠা করেন। মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইকতাদার নিয়োগ ও সেনা মোতায়েন করার পাশাপাশি এসব ঘাঁটিতে কোতোয়ালের দপ্তর ছিল।[৩১] এসব থানায় মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি প্রশাসনিক দপ্তর, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদি স্থাপনায় সমৃদ্ধ এসব বসতি ক্রমে

---

[২৭] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p.186
[২৮] Khan Sahib M. Abid Ali Khan, *op.cit.*, pp.76-77
[২৯] *Ibid.*, pp.77-78
[৩০] Ghulam Hussain Salim, *op.cit.*, p. 62
[৩১] Minhaj-I-Siraj, *Tabaqat-I-Nasiri*, p. 433

পরগনা সদর দপ্তরের ছোট শহরতলিতে রূপান্তরিত হয়। মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে যেসব সেনানিবাস ও থানা বা পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেন, সেসব স্থানের অধিবাসী ও আগন্তুকদের তারা নিরাপত্তা দিতো এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখত। এসব থানাকে ঘিরে পরবর্তীকালে শহর সৃষ্টি হয়। আব্বাস শেরওয়ানী উল্লেখ করেন যে, অডিটপোস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শাহানা উপাধিধারী এক কর্মকর্তার ওপর, যাকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি দেওয়া হয়েছিল। যা নগরায়ণের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ক.৭. ব্যবসায়-বাণিজ্য

যেকোনো রাষ্ট্রের সফলতার সার্থক প্রয়াস হলো সে রাষ্ট্রের ব্যবসায় বাণিজ্যের সমৃদ্ধি। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল না এবং বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি। বাংলার সুলতানদের প্রচেষ্টায় এখানে মানসম্মত মুদ্রার প্রচলন ঘটে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। মূলত বাংলার বহিরাগত মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। বিদেশিদের রুচি, খাওয়া-দাওয়া, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা ছিল ভিন্ন যা বাংলায় প্রচলিত ছিল না। তাই তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। অভিজাতশ্রেণির চাহিদানুযায়ী খাদ্য, যেমন- বিভিন্ন রকম ফল, তরকারি, সুগন্ধি পোলাও ইত্যাদি, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় তেজি ঘোড়াসহ সব ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া জাফরান, কুমকুম, উন্নতমানের জুতা, মোজা ও সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদন করা হতো এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের কাছে এসব জিনিস অধিক লাভে বিক্রি করত। A.B. M Habibullah বলেন যে, The luxury living of the nobility undoubtedly quickened the demand for consumers goods and the middlemen as well as the craftmen did good business.[৩২] বহিরাগতদের এসব চাহিদাপূরণের বা প্রয়োজনীয় চাহিদার যোগানের জন্য আমদানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তা সরবরাহের জন্য অনেক লোকের সম্পৃক্ততা বাড়ে। অন্যদিকে মুসলিম শাসক এবং তাদের সহযোগীদের জন্য বৈদেশিক পণ্যসামগ্রীর পাশাপাশি স্থানীয় কুটির শিল্পজাত দ্রব্যেরও প্রয়োজন ছিল। এ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে ছোট ছোট শহরগুলোর পরিধি বেড়ে যায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ঘটে যা ক্রমান্বয়ে নগরায়ণের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এরই

[৩২] A.B.M.Habibullah, *The foundation of Muslim rule in India,* Allahabad, 1961, p. 314

ধারাবাহিকতায় সুলতানী বাংলায় নগরায়ণের এক নতুন বিপ্লব শুরু হয়। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনর্জাগরণ বাংলার নগরায়ণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক.৮. টাকশাল নগর

নগরায়ণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো টাকশাল নগর প্রতিষ্ঠা। মুসলিম শাসকগণ বাংলায় মুদ্রার প্রচলন করেন ফলে মুদ্রা প্রচলনের জন্য নতুন নতুন টাকশাল শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবনে বখতিয়ার খলজি রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর লখনৌতিতে টাকশাল শহর প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৩] মুসলিম শাসকগোষ্ঠী বাংলায় একটি জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় প্রতিটি বড় বড় নগরে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব টাকশাল হতে কেবল ধাতবমুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয়নি বরং এর পাশাপাশি এসব টাকশালগুলো দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজেও ব্যবহৃত হতো। ঐ সময়ে গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগরে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে শহরগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।[৩৪] শাসনকর্তা বা সুলতানগণ নদীপথে ভ্রমণ করার সময় অনেক নতুন শহর পরিদর্শন করতেন এবং সে সমস্ত শহর থেকে প্রায়শই মুদ্রা জারি করতেন।[৩৫] এসব মুদ্রার মাধ্যমেই আমরা নতুন নতুন শহরের নাম জানতে পারি।[৩৬] এসব মুদ্রার প্রচলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। টাকশাল শহর প্রতিষ্ঠিত হলে টাকশালকেন্দ্রিক নতুন নতুন পেশাজীবী শ্রেণির লোক এর সাথে যুক্ত হয়। এই উপশহরে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হতো। এসব টাকশাল শহরে পর্যায়ক্রমে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সবধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দোকানপাট গড়ে উঠে এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

খ. নগরকেন্দ্রের প্রকারভেদ ও প্রকৃতি

নগর হলো কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবয়ব নির্ধারণকারী একটি প্রতীক। এটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রগতির মাপকাঠি। সুলতানী বাংলার নগরের বিকাশ এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র প্রস্ফুটিত করেছে। তৎকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ, মুদ্রা, উৎকীর্ণ লিপি এবং বিদ্যমান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সুলতানী আমলে বাংলায় যে সমস্ত নগরীর সন্ধান পাওয়া যায় তাতে দেখা

---

[৩৩] Minhaj-I-Siraj, *op.cit.*, pp. 427-436

[৩৪] Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal* (A Socio-Political Study) Dhaka, 1965, p. 29

[৩৫] M. Mir Jahan; "Mint Towns of Medival Bengal" Proceeding, of the Pakistan Historical Conference, Pakistan Historical Society. 1953, p. 225; Sir Jadu-nath Sarkar, *op.cit.*, p. 29

[৩৬] Sir Jadu-nath Sarkar, *op.cit.*, p. 29

যায়, সে নগরীসমূহ কখনও রাজধানী শহর, কখনও টাকশাল নগরী আবার কখনও বা বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উদ্দেশ্য এবং কর্মভেদে তাই বাংলার এ নগরসমূহকে বিশেষ ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। একই শহর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন- একটি শহর একাধারে রাজধানী, বন্দর নগরী, টাকশাল নগরী বা সেনাছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এরূপ অনেকগুলো কাজ অনেক সময় একটি শহরে বা নগরে সম্পাদিত হয়েছে। সুলতানী বাংলায় ছয় ধরনের নগরের বিকাশ ঘটেছিল। যথা- ১. রাজধানী শহর, ২. প্রশাসনিক শহর, ৩. বন্দর নগর, ৪. ধর্মীয় নগর বা শহর, ৫. টাকশাল নগর, ৬. দুর্গ নগরী প্রভৃতি।

খ.১. রাজধানী শহর

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির অধীনে মুসলিম বাংলার প্রথম রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে লখনৌতি। এটি সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহের (১৩৩৮-১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকাল পর্যন্ত রাজধানী হিসেবে বহাল ছিল। নগরটি প্লাবিত হওয়ার পর ইবনে বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের আগে দেবকোটে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার দ্বিতীয় খলজি শাসক আলী মর্দান খলজির মৃত্যু পর্যন্ত দেবকোট শাসনকেন্দ্র হিসেবে বহাল ছিল।[৩৭] ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ) আমলে সোনারগাঁও প্রথমে লখনৌতি এবং পরে পাণ্ডুয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক পাণ্ডুয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া পর্যন্ত এই শহর রাজধানী হিসেবে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।[৩৮] সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৪-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) পুনরায় রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেছেন।[৩৯]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে নিজেদের জড়িত করার উদ্দেশ্যে মানুষ বিভিন্ন শহরে জড়ো হতো যেমন- গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও। এগুলো টাকশাল শহর হিসেবেও সুপরিচিত ছিল। প্রশাসনিক শহর ছাড়াও পাণ্ডুয়া গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। ১. চৌদ্দ ও পনেরো শতকের রাজধানী ছিল। ২. এটি মহানন্দা ও গঙ্গার এক পূর্ববর্তী তলদেশের সঙ্গমস্থলের কাছে অবস্থিত। ৩. উত্তর বঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন এলাকার দিকে যাওয়া বিভিন্ন নদীপথে ও স্থলপথের পাশে এটা অবস্থিত ছিল। ৪. এছাড়াও

---

[৩৭] Minhaj-I-Siraj, *op.cit.*, pp. 427-436
[৩৮] Nalini Kanta Bhattashali, *op.cit.*, pp. 14-17, 21-22
[৩৯] Ghulam Husain Salim, *Riyaz-us-Salatin*, p. 118

শহরটি তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করেছিল। কারণ এখানে নুর-কুতুব-ই-আলমের সমাধি ছিল। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় হোসেন শাহ প্রতি বছর একডালা থেকে পায়ে হেঁটে নুর-কুতুব-ই-আলমের মাজারে আসতেন।[৪০]

বাণিজ্যিক শহরগুলোর উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চৈনিক বিবরণে রয়েছে যে, পাণ্ডুয়ার জনজীবন প্রাচুর্য ও বিলাসিতার উল্লেখ আছে। নগরের আকারগুলো খুবই জমকালো বাজারগুলো সুবিন্যস্ত, দোকানগুলো সারিবদ্ধ, এগুলো সবধরনের পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ। চুন বালির গাথুনিযুক্ত সুলতানের প্রাসাদ সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরি। এতে যাবার রাস্তাগুলো উঁচু ও প্রশস্ত। হলঘরগুলোর ছাদ সমতল এবং এগুলোর ভেতরের দিক চুনকাম করা। ভেতরের দরজাগুলো তিনগুণ পুরু এবং নয় প্যানেল বিশিষ্ট। দরবার কক্ষের থামগুলো পিতলের পাত দিয়ে ঢাকা। এগুলো খোদাই ও পালিশ করা ফীল ও জীবজন্তুর নকশা দ্বারা অলংকৃত। এর ডান ও বাম দিকে লম্বা বারান্দা রয়েছে। শহর ও শহরতলী ছিল বড় ও সুরুচিসম্পন্ন।[৪১] একডালার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেশি কিছু জানা যায় না। চৌদ্দ শতকের শেষে ফিরুজ তুঘলকের আক্রমণের সময় এখানে উচ্চবিত্তশ্রেণি, ছাত্র, সুফি সাধক, সন্ন্যাসী, শাসনাধীন অভিজাতশ্রেণি এবং বিদেশি বিভিন্ন পেশার মানুষ বসবাস করত।[৪২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় পাণ্ডুয়া রাজধানী হলেও পাশেই কৃষি এলাকা ছিল এবং এখানে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

মধ্যযুগের এসব রাজধানী শহরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এগুলো শহরের কেন্দ্রে মজবুত প্রাকারবেষ্টিত থাকত। সাধারণভাবে সেখানে থাকত সৈনিকদের ব্যারাক বা বাসস্থান। রাজধানী শহরে শাসকগণ তাদের পরিবার পরিজন এবং নিকটতম আত্মীয়দের নিয়ে থাকতেন। রাজধানীর বাইরে দ্বিতীয় প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে থাকতেন অভিজাতশ্রেণির অন্যান্য ব্যক্তিগণ। যেমন- আমির ওমরাহ ও অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দ। গৌড়-লখনৌতিতে বিভিন্ন পেশার লোকজনের বসবাসের আলাদা আলাদা বাসস্থান স্থির করে দেওয়া হয়। যেমন- তাঁতিপাড়া, ধুনিচকপাড়া, চামকাটিপাড়া ইত্যাদি। রাজধানী শহরের বাইরের বেষ্টনী থাকত সাধারণত উঁচু মাটির প্রাচীরের, কখনও আবার কোনো দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত থাকত। নদী না থাকলে সেখানে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করা হতো। গৌড় নগরীর অভ্যন্তরীণ বেষ্টনী দেয়াল ছিল বেশ চওড়া, উঁচু এবং ইট দ্বারা নির্মিত। এছাড়া মহিলাদের জন্য কোয়াটার

---

৪০ Ghulam Husain Salim, *Riyaz-us-Salatin*, p. 135
৪১ Ma Huan, *op.cit.*, p. 121
৪২ Barani, *op.cit.*, p. 590

বা হারেম এবং তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য খোজা নিয়োজিত থাকত।[৪৩] এসব খোজাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল দাস।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজধানী শহরে বাগান, জলাধার, মৃতদেহ সৎকার, কসাইখানা প্রভৃতি ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপনের জন্য শহরের ভেতরের দূরতম জায়গাগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো।[৪৪] আবার প্রাসাদ স্থাপনের জন্য পাহাড়ের উঁচু স্থান অথবা কেন্দ্রস্থল নির্ধারিত রাখা হতো। শহরের যে দিকে নদী থাকত সেদিকে পরিখা খনন করা হতো না। অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে ঐ দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো। শহরের সামনে পেছনে দুটি তোরণ স্থাপন করা হতো। এগুলো খুব ভোরে খুলে দেওয়া হতো এবং সন্ধ্যা বেলায় বন্ধ করে দেওয়া হতো। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকতেন একজন কোতোয়াল। আর অধীন একজন দারোগা নিয়ন্ত্রণ করত শহর-তোরণের নিরাপত্তা। শত্রুর গতিবিধির ওপর লক্ষ রেখে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনে বিপদ সংকেত বাজানোসহ তীর বা গোলা ছোড়ার উদ্দেশ্যে পাঁচিলের সঙ্গে থাকত তোপমঞ্চ। শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পথিক, ব্যবসায়ী, আগন্তুক এবং পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য চৌকো আকারে সরাইখানা, কাটরা স্থাপন করার রেওয়াজও প্রচলিত ছিল। এর মাঝখান দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি প্রশস্ত রাস্তা ও দুদিকে দুটো তোরণ থাকত। এতে এক বা একাধিক পাচক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত থাকত। তারা নির্দিষ্ট হারে ভাড়া আদায়ের বিনিময়ে আগন্তুকদের জন্য কোঠা খুলে দিতো। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানার ফটক বন্ধ করে দেওয়া হতো ও ভোরে পুনরায় খুলে দেওয়া হতো।[৪৫]

খ.২. প্রশাসনিক শহর

মুসলিম সাম্রাজ্য ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণের সাথে সাথে কিছু আঞ্চলিক প্রশাসনিক বসতি গড়ে উঠেছিল। ঐসব বসতি সময়ের পরিক্রমায় জনবহুল নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেমন- সাতগাঁও, চট্টগ্রাম, বিহার শরিফ। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে সাতগাঁও দক্ষিণ পূর্ব বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক সদর দপ্তরে পরিণত হয়।[৪৬] সুলতান ফকরউদ্দিন মোবারক শাহের সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম বাংলা সালতানাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক শহর হিসেবে সুপরিচিত ছিল। পরবর্তীতে প্রশাসনিক কেন্দ্র ছাড়াও বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর

---

[৪৩] এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০

[৪৪] Abul Fazl, *The Ain- i-Akbari.*, vol.1, eng. tra. Colonel H.S Jarret, The Asiatic Society, Kolkata , p. 284

[৪৫] মো: মোশারফ হোসেন, *বাংলাদেশের নগর উদ্ভব ও বিকাশ*, পৃ. ১০

[৪৬] Abdul Karim, *Corpus*, pp. 31-32, 36

হিসেবে চট্টগ্রামের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বতুতা উল্লেখ করেন যে, মহাসমুদ্রের তীরে বাংলার শহর এটি (চট্টগ্রাম)।[৪৭] ইবনে বখতিয়ার খলজির সময়ে বিহার/ উদন্তপুর বিহার প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪৮] এই প্রসিদ্ধ নগরকেন্দ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্ নির্মিত হয়েছিল। সুলতানী বাংলার অন্যতম প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম ছিল খলিফাতাবাদ। মধ্যযুগের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বাগেরহাট যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক একইভাবে প্রত্নস্থলের দিক থেকে প্রসিদ্ধ হওয়ার কথা ছিল বৃহত্তর যশোরের বারোবাজার। কারণ বাগেরহাটে আসার আগে খান জাহান আলী প্রথম এখানেই তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসন সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বারোবাজার বা মাহমুদাবাদ এবং খলিফাতাবাদ বা বাগেরহাট নামক দুটি প্রশাসনিক শহর গড়ে তোলা হয়। এই মাহমুদাবাদ সুলতানী আমল এবং মোগল আমলে বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখান থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ হতো। বারোবাজার অঞ্চলে দুটি জাহাজ ঘাটের সন্ধান পাওয়া যায় যা থেকে ধারণা করা হয় যে, এই অঞ্চলটি বড় ধরনের একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করে এ পর্যন্ত এ এলাকায় ১১টি স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কার করেছে।[৪৯] যার মধ্যে অধিকাংশই মসজিদ বলে প্রমাণিত। স্থাপত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- জাহাজঘাটা, সেনানিবাস, সমাধিক্ষেত্র, পুকুর প্রভৃতি। এই নিদর্শনের সাথে লখনৌতি, পাণ্ডুয়া, দেবকোট, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে সুলতানী আমলে নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনাদির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্নসূত্র অনুযায়ী গৌড়ের সুলতানের দরবারের *উলুঘ খান-ই-জাহান* (পৃথিবীর মহান খান) উপাধিধারী[৫০] একজন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর অভিজাত ব্যক্তি খলিফাতাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ.৩. বাণিজ্যিক নগর ও বন্দরসমূহ

সুলতানী বাংলার কিছু নগরী সমুদ্রবন্দর বা নদীবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সমুদ্রবন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম এবং নদীবন্দর হিসেবে সোনারগাঁও খুবই বিখ্যাত ছিল। নদীবন্দরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও। এ নগরগুলো আবার রাজধানী হিসেবেও সুপরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক শহর গড়ে উঠেছিল তা অতি সম্প্রতি

[৪৭] Ibn Battuta, *The Rehla of Battuta*, pp. 235-237

[৪৮] Minhaj-I-Siraj, *op.cit.*, pp. 426, 438

[৪৯] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, সমবায় প্রকাশ, গতিধারা, ২০১১, পৃ. ২১৭-২২০

[৫০] *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৯ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০, পৃ. ৫০৩-৫০৪

সম্পন্ন একটি গবেষণা থেকে জানা যায়।[৫১] এসব বন্দর ও শহরের নাম সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, সাহিত্যিক উৎস, মুদ্রা ও উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। তাছাড়া বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকেও বেশকিছু নগরের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু সেসব নগর শনাক্ত করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ ব্যাপার। ইবনে বতুতার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলার সবচেয়ে সুন্দর ও গৌরবময় শহরগুলোর মধ্যে 'হবঙ্ক' ছিল অন্যতম।[৫২] ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন শহরটি পূর্ববঙ্গের কোথাও অবস্থিত ছিল। কিন্তু এটি কোথায় অবস্থিত ছিল তা সঠিক করে বলার উপায় নেই। অবশ্য নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন যে, সিলেট শহরের ৬ মাইল উত্তরে বরাক নদী যেখানে সুরমা ও কুশিয়ারা এ দুটি শাখা নদীতে বিভক্ত হয়েছে, তার সংযোগস্থলে 'হবঙ্ক' নামক একটি টিলা পাওয়া যায়।[৫৩] সাধারণভাবেই এখানে অতীতে সমৃদ্ধশালী নগরীর অস্তিত্ব ছিল বলেই অনুমান করা যায়।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সুলতানগণ মানসম্মত মুদ্রা প্রচলন করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং পূর্বের পরিত্যক্ত বাণিজ্যিক নগরীগুলো আরো বেশি সম্প্রসারিত হয়। বাংলার বিখ্যাত চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে নগরের পরিসর বৃদ্ধি পায়। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও দূরবর্তী নগর ও শহরে প্রেরণের জন্য বহু লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়। বন্দরে কর্মরত ব্যক্তিগণ পরিবার পরিজনসহ বন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করত। এসব লোকের খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রব্যাদির দোকান গড়ে উঠে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে তা চাহিদাসম্পন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বণ্টন করা হতো। সুলতানী বাংলার এসব বন্দরে পোতাশ্রয়ের সুবিধা থাকায় চট্টগ্রাম, সাতগাঁও প্রথম সারির বন্দরের মর্যাদা লাভ করেছিল। পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে বাংলা ও আসাম পরিভ্রমণ করেন। তাঁর জীবন বৃত্তান্তে চট্টগ্রামকে 'সুদকাওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] চট্টগ্রামের অবস্থান বর্ণনা করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী উল্লেখ করেছেন যে, চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) সমুদ্র তীরে অবস্থিত।[৫৫] প্রকৃতপক্ষে বাংলায় আগমনের অর্থই ছিল চট্টগ্রামে আসা। এজন্যই পর্তুগিজরা প্রথম চট্টগ্রামে এসেছিল। সাগর তীরের পাহাড় টিলাময় জঙ্গলাকীর্ণ পারিপার্শ্বিক এলাকা ও বন্দর নগরী

---

[৫১] Anil Kumar Das, Urbanization in Mughal Bengal in the Seventecnth Century. (*Ph.D thesis)* Jadavpur University. Map No-1

[৫২] Nalini Kanta Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal,* W. Heffer & Sons, England, 1922, pp. 142-143; রীনা ভাদুড়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

[৫৩] Nalini Kanta Bhattasali, *op.cit.*, p. 154

[৫৪] Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta,* eng.tra., Agha Mahdi Hussain, Baroda,1976, p. 237

[৫৫] Nalini Kanta Bhattasali, *op.cit.*, p.146

ছিল চট্টগ্রাম। প্রতিবেশী দুটি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে সামরিক, কৌশলগত, ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব বেশি ছিল। তেরো শতকের শেষ প্রান্তে মার্কো পোলো (১২৭১-১২৯৪ খ্রি.) চট্টগ্রাম হয়ে বাংলায় আসেন এবং বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে[৫৬] আলোচনা করেছেন। ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার জন হার্বার্ট চাটগাঁকে অন্যতম সমৃদ্ধশালী ও জনাকীর্ণ নগরী বলে উল্লেখ করেন।[৫৭] পনেরো শতকের প্রারম্ভে যে চীনা মিশনটি বাংলায় পরিভ্রমণ করেন তার নেতা মাহুয়ান (Mahuan) লিখেছেন যে, "সুমাত্রা দ্বীপের বৃহৎ জাহাজটি প্রথমে চান-টি-গান (চাটগাঁও)-এ প্রবেশ করে, এখানেই এটি নোঙর করে এবং এখান থেকেই আরো ছোট ছোট নৌকা সাগরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে একটি সুনার কং (সোনারগাঁও)-এ গিয়ে থামে।[৫৮] চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নৌবাণিজ্যও পরিচালিত হতো।[৫৯] সিলভেরা বাংলার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে অবতরণ করে ব্যবসায়িক সুবিধা ও একটি কারখানা স্থাপনের অনুমতি চেয়ে আবেদনপত্র পাঠায়।[৬০] ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের পর পর্তুগিজরা বাংলায় আসে।[৬১] উল্লেখ্য বাণিজ্যিক সুবিধা বেশি থাকায় বাংলায় পর্তুগিজদের আগমন ঘটে। বাংলার বৃহৎ দুটি বন্দরকে তারা দুই নামে অভিহিত করেছিল। সাতগাঁওকে তারা 'পোর্টো পিকুইনো' (ছোট বন্দর) আর চট্টগ্রামকে 'পোর্টো গ্রান্ড' (বড় বন্দর) বলত।[৬২] চট্টগ্রাম বন্দর অনর্বপ্রোত (জাহাজ) নির্মাণের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। তুরস্কের সুলতান একসঙ্গে তেরোখানি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।[৬৩] ফ্রেডারিকের দু'বছর পূর্বে ভেনিসীয় পর্যটক মিশিরা বলেছিলেন, চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাঠ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।[৬৪] বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফ্রেডারিক লিখেছেন যে, চট্টগ্রামের বিরাট বন্দর থেকে জাহাজযোগে পর্যাপ্ত চাল, সব ধরনের বস্ত্র, চিনি ও নানা প্রকার ফসল পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি হতো।[৬৫]

পূর্ব বাংলার অন্যতম একটি বিখ্যাত বাণিজ্যিক নগরী ছিল সাতগাঁও। শহরটির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল চাল ও কাপড় উৎপাদনের ওপর। এখানে অনেক ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের বাস ছিল। এর নিকটবর্তী

---

[৫৬] Marco Polo, *The Travels of Marco Polo*, The Orion Press, New York, p.204
[৫৭] মাহবুবুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল)*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ.৪৫
[৫৮] P.C Bagchi, *Visva Bharati Annals*, vol.1, 1945, pp.101-103
[৫৯] M.R.Tarafdar, *op.cit.*, p. 55
[৬০] Abdul Mannan, Commercial Persuits of the Portuguese in Chittagong: an Overview, *Chittagong University Studies*, Commerce vol.1, 1985, p. 135
[৬১] J.J.A Campos, *op.cit.*, p.14
[৬২] Nalini Kanta Bhattasali, *op.cit.*, p.146; J.J.A Campos, *op.cit.*, pp. 23-24
[৬৩] আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[৬৪] আবদুলাহ ফারুক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[৬৫] Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, 1st Reprint, 2019, p. 353

দালালপুরে প্রায় দেড় হাজার তাঁতি পরিবার বাস করত। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে কারখানা স্থাপন করেছিল। শহরের রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- চাল, সুতিবস্ত্র, চিনি, লম্বা মরিচ, গালা ইত্যাদি। সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও কংসবণিক বসবাস করত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৫৪৪-১৫৩৩) তাঁর *চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে* উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তগ্রামের বণিকরা অন্য কোথাও না গিয়ে সপ্তগ্রামে বসেই ব্যবসা করতে পারত।[৬৬] তোমে পিরেস, ফ্রেডারিক, র‍্যালফ ফিচ প্রমুখের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ষোলো শতকের শেষের দিকে সাতগাঁও ছিল সমৃদ্ধ জনবহুল শহর। এ বন্দরে প্রচুর মালবোঝাই জাহাজ নোঙর করে থাকত। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে পর্তুগিজরা নতুন বন্দর স্থাপন করলেও ১৫৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে শহরটি (সাতগাঁও) ৫৩টি মহলসহ একটি সরকারের সদর দপ্তরে পরিণত হয়।[৬৭] সপ্তগ্রামে পর্তুগিজদের আগমন ঘটেছিল ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দের অঙ্কিত মানচিত্রে সাতগাঁও-এর নাম পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকে সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে) সাতগাঁওকে খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর বলে বর্ণনা করেন। র‍্যালফ ফিচ আগ্রা থেকে নৌকা করে যমুনা ও গঙ্গা নদী হয়ে বাংলায় আসেন। তাঁর সাথে আরও ১৮০টি নৌকা ছিল। হিন্দু ও মুসলিম বণিকরা ঐসব নৌকায় লবণ, নীল, সীসা, গালিচা ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বোঝাই করে বিক্রয়ের জন্য বাংলায় আসছিল। তিনি প্রথমে বাংলার তাণ্ডায় পৌঁছান।[৬৮] সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বড় জাহাজ সাতগাঁও বন্দরে প্রবেশ করতে পারেনি। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ ইত্যাদি ছোট শহরগুলোর আরো বিস্তৃতি ঘটে। আর এর ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন ঘণ্টা বেজে ওঠে।[৬৯]

বাংলার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বন্দর সোনারগাঁও। ইবনে বতুতার বিবরণে সোনারগাঁও বন্দরের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। পর্যটক র‍্যালফ ফিচ (Ralph Fitch) ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করে বলেন যে, শ্রীপুর থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত সোনারগাঁও ছিল তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট কাপড়ের প্রধান বাজার। সোনারগাঁও বস্ত্র ছাড়াও সব ধরনের পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর সাথে এর সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খাসা (Khasa) নামে পরিচিত এক ধরনের

---

[৬৬] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

[৬৭] J.J.A Campos, *op.cit.*, pp. 23-24

[৬৮] Rakhal Das Babdyopadhaya, "Saptagram or Satga" *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, July 1909, pp. 249-250; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

[৬৯] Muhammad Mohar Ali, *op.cit.*, p. 955

মসলিন কাপড়, দাস ও নপুংসকের বিশাল বাজারের জন্য শহরটি বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। শহরটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল।[৭০]

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে ষোলো শতকের দিকে পর্তুগিজরা সপ্তগ্রাম বন্দর নগরটির গোড়াপত্তন করে। বন্দরটি মূলত পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাবার ফলে বড় জাহাজ আর আসতে পারছিল না, যার ফলে পর্তুগিজরা আকবরের কাছ থেকে ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে ফরমান নিয়ে হুগলি বন্দরের প্রতিষ্ঠা করে।[৭১] পর্তুগিজদের প্রধান শ্যাম্পরি ও ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এ পর্তুগিজ বসতিটি এখানে গঞ্জ বা মাঠ বলে পরিচিতি পায়। সালতানাতের পতনের পর পেদ্রো তাভারিজের (Peodro Tavares) নেতৃত্বে পর্তুগিজদের একটি প্রতিনিধি দল সম্রাট আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘোলাঘাটে উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ঘোলাঘাটে এ পর্তুগিজ স্থাপনা শীঘ্রই ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। হুগলি নদীর নামানুসারে এ স্থানটি হুগলি বান্দেল নামে পরিচিতি পায়। বান্দেল শব্দটি পর্তুগিজ বন্দর শব্দটির বিবর্তিত রূপ যার অর্থ বন্দর বা শহর।

খ.৪. ধর্মীয় নগর

অনেক সময় ধর্মীয় স্থান, *খানকাহ* ও দরগাহকে কেন্দ্র করেও বাংলার নগর গড়ে উঠেছিল। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর অধঃপতিত ও উৎপীড়িত বৌদ্ধ ও হিন্দুরা মুক্তির জন্য সুফি সাধকদের নিকট ভিড় জমাত। এভাবে শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজি উত্তরবঙ্গে একটি শক্তিশালী মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলায় নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন সুসংহত করার ক্ষেত্রে তাঁর (শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজির) যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ধর্মান্তরিত শিষ্য সংগ্রহ করে তিনি অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম শাসনকর্তার জন্য একটি শক্তির উৎস তৈরি করেছিলেন। তাঁর *খানকাহ* বা আস্তানায় এবং লঙ্গরখানাগুলো আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবসেবামূলক কাজের কেন্দ্র হিসেবে দরিদ্র, দুস্থ ও গরিব লোকদেরকে নানাভাবে সাহায্য করত।[৭২] সোনারগাঁও শুধু প্রশাসনিক শহর, রাজধানী ও বাণিজ্যিক নগরী ছিল না ধর্মীয় দিক থেকেও শহরটি সুপরিচিত ছিল। শেখ শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা মুসলিম সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সোনারগাঁও এ তাঁর খানকাহ ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। ফলে উত্তর ভারত থেকে অনেক শিক্ষার্থী এই কেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণের জন্য

---

[৭০] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬
[৭১] মো: আখতারুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১২-৫২২
[৭২] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 86-87

আগমন করেছিল। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন সুফি ও পণ্ডিত মখদুম মাওলানা শরফুদ্দিন এহিয়া মানেরী।[৭৩] এরূপ আরো দুজন প্রসিদ্ধ সুফির দরগাহ হলো সিলেটের শাহজালালের দরগাহ, খুলনার বাগেরহাটের খান জাহান আলীর দরগাহ। সুফিগণ শিষ্যবৃন্দসহ ধর্মকর্ম করতেন। সুফিগণ সাধারণত ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ধর্মান্তরিত করতেন এবং প্রয়োজনবোধে সীমান্ত রক্ষার জন্য শাসকের আদেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতেন। এ যোদ্ধাদের সাধারণভাবে গাজী বলা হতো। তারা দেশের অনিয়মিত সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হতো এবং সীমান্ত থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। বিখ্যাত ওসমানীয় রাষ্ট্র এ ধরনের গাজী রাষ্ট্র। মরক্কোর রাজধানী রাবাত 'রাবাত' জাতীয় দুর্গ থেকেই বর্ধিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

খ.৫. টাকশাল শহর

প্রাক-মোগল বাংলার অন্যতম নগর ছিল টাকশাল শহর। যা বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বড় প্রতীক। এই প্রদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসকগণ উন্নত অর্থনীতির স্মারক হিসেবে মুদ্রা প্রচলন করেন। মুদ্রা তৈরির জন্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে টাকশাল স্থাপন করায় বেশ কিছু শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই শাসকগণ শুধু রাজধানী হতেই নয় অপরাপর প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো হতেও মুদ্রা জারি করেন। মুসলমানরা যখন কোনো অংশ জয় করতেন তখন তারা ঐ অঞ্চলের নামে স্মারক মুদ্রা প্রণয়ন করতেন এবং টাকশাল নির্মাণ করতেন। মুসলিম শাসকদের অনুসৃত এ নীতির ফলে টাকশাল স্থানটি কালক্রমে একটি শহরে রূপান্তর হয়েছিল। এসব টাকশাল নগরী প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এভাবে মুসলিম শাসকগণ বাংলাকে গ্রাম থেকে শহরমুখী করে তোলে যার ভিত্তি রচিত হয়েছিল মূলত বাণিজ্যিক অর্থনীতিকে ঘিরে।[৭৪] মুদ্রা বিশেষজ্ঞগণ বাংলার তৎকালীন মুদ্রা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুলতানী যুগের বেশ কিছু টাকশাল নগরীর সন্ধান পেয়েছেন। তবে এর সবগুলোর যে পৃথক সত্তা ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। কারণ বাংলার সুলতানগণ সময় বিশেষে তাঁদের রাজধানী অথবা টাকশাল শহরের নাম পরিবর্তন করতেন। নাম পরিবর্তনের পেছনে কিছু কারণ থাকত, যেমন নিজের বা পিতার নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। এছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উদযাপন করতে গিয়ে অথবা সুলতানদের রাজসিক খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য।[৭৫]

---

৭৩ Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp.103-107

৭৪ Momtazur Rahman Tarafdar, *op.cit.*, p. 29

৭৫ এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, "প্রাথমিক সূত্রে সুলতানী বাংলায় নগরের ক্রমবিকাশ", *The Jahangir Nagar Review*, part c,vol. xr&xπ, 1990-2000& 2000- 200 1, p.164

সুলতানী শাসনাধীনে বেশকিছু টাকশাল নগরী থেকে মুদ্রা প্রণীত হয়। সেগুলো হলো- লখনৌতি (গৌড়), সোনারগাঁও, সাতগাঁও, গিয়াসপুর, ফিরোজাবাদ, শহর-ই-নও, মুয়াজ্জেমাবাদ, সুবর্ণগ্রাম, জান্নাতাবাদ, ফতেহাবাদ, মুহাম্মদাবাদ, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি।[৭৬] এ সকল টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ শুধুমাত্র স্বাধীন সুলতানী আমলেরই ৩৪৬টি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।[৭৭] প্রতিটি টাকশালে মুদ্রা তৈরির সাথে জড়িত ছিল একুশ শ্রেণির কর্মচারী। এদের কেউ কেউ মুদ্রা তৈরির জন্য ধাতুকে রাসায়নিক দ্রবণে রেখে বিক্রিয়া করত, কেউ ধাতুর বিশুদ্ধতা নিরূপণ করত, কেউ ধাতুর খণ্ডকে ছাঁচে ফেলে মুদ্রার আকার দিতো। অন্য কেউ মুদ্রার গায়ে লিপি অঙ্কন করত।[৭৮] এসব কর্মচারী সপরিবারে টাকশাল শহরে বসবাস করত বলেই আমরা ধারণা করতে পারি। ফলে প্রতিটি টাকশাল শহরেই লোকবসতি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং নগরের বিকাশ ঘটে। মুদ্রাগুলো শুধু সরকারের প্রধান কেন্দ্রগুলোর বিভাজনই দেখায় না বরং নগর বা শহরগুলোর উত্থান ও পতনকেও নির্দেশ করে। মূলত প্রতিটি টাকশাল ছিল এক একটি নগর কেন্দ্র। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে টাকশাল শহরের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। বাংলার মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে এডওয়ার্ড টমাস (Edward Thomas) বলেছেন যে, ভারতের মুদ্রার ইতিহাসে বাংলার বিশেষ মর্যাদা এজন্য যে, সুলতানী আমলে বাংলায় একটি জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[৭৯] ফলে বাংলার গ্রাম্য অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছিল এবং বহির্বাণিজ্য পুরোদমে শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ভৌগোলিক কারণে উত্তর ভারতে সড়কব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড কিছু নির্দিষ্ট শহরেই সীমিত রাখতে হতো। অপরপক্ষে, পর্যাপ্ত নদীর দেশ এ বাংলায় শাসনকর্তাগণ নৌপথে যাতায়াতের সুবিধার কারণে প্রয়োজনমতো রাজধানী স্থানান্তরিত করতে পারতেন। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হতো। এসব নগরকেন্দ্রগুলোতে টাকশাল কেন্দ্রিক পেশাজীবী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকের বসতি গড়ে ওঠে। ফলে পর্যায়ক্রমে এসব কেন্দ্র নগরায়ণের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফলে বাংলা গ্রাম্য কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশের দিকে একধাপ অগ্রসর হয়।

---

[৭৬] Abdul Karim, *Corpus of the Muslims Coins in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1960, pp, 160-165

[৭৭] Nalini Kanta Bhattasali, *op.cit.*, p.7

[৭৮] Abul Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari,* eng.tra. Colonel H.S Jarret, The Asiatic Society, Kolkata, vol. 2, 2010, p. 134

[৭৯] Edaward Thomas, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi,* p. 147

খ.৬. দুর্গনগরী

সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ নির্মাণের ফলে কিছু নগরকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সীমান্ত এলাকা পাহারা দেওয়া এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুসলিম শাসকগণ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন। মুসলিমদের এসব দুর্গবসতি সময়ের বিবর্তনে বিশাল জনবহুল শহরের জন্ম দিয়েছিলেন। যেমন- বিহার শরিফ। উদন্তপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষের ওপর ইবনে বখতিয়ার খলজি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তা সুরক্ষার জন্য তিনশ-এর বেশি সৈন্য নিয়োগ করেন।[৮০] ইবনে বখতিয়ার খলজির এই দুর্গবসতি কালের বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত একটি জমজমাট শহর এবং রাজনৈতিক সদর দপ্তরে পরিণত হয়। শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরির (১২৯০-১৩৮১ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ অনুযায়ী বিহারে মুকতা, কোতোয়াল, পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর দপ্তর ছিল। একইভাবে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ) সামরিক ঘাঁটি হাজিপুর আলোচ্য সময়ে এটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৮১] এটি পরবর্তীতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

দুর্গযুক্ত নগরীকে বলা হতো *খিত্তাহ (খিত্তা)*। দুর্গহীন নগরীকে *কসবাহ* এবং সীমান্ত রক্ষার ঘাঁটিকে বলা হতো থানা। মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র ছিল সামরিক শক্তিনির্ভর। তাই কসবাহ এবং *খিত্তাহ (খিত্তা)*কে সামরিক ছাউনির সঙ্গে তুলনা করা যায়। *খিত্তাহ (খিত্তা)* স্থায়ী সামরিক ছাউনিকে বলা হতো এবং অস্থায়ী সামরিক ছাউনিকে বলা হতো *কসবাহ*। বিদেশ থেকে আগত বিজেতাদের জন্য দুর্গ ছিল অপরিহার্য।[৮২] বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে সুলতানী বাংলার বেশ কিছু দুর্গ-নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, গড় মন্দারন, গড় জড়িপা, গড় একঢালা, দেবকোট, ঘোড়াঘাট, মাহিসন্তোষ, মহাস্থানগড়, নারকিলা বা তুঘরিল গড় প্রভৃতি। দুর্গ নগরীতে সাধারণত দুর্গ, পরিখা, পরিদর্শক স্তম্ভ ও পণ্য বিক্রয়ের কাটরা বাজার প্রভৃতি থাকত। এ সুরক্ষিত স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে হতো নগর বিন্যাস। শাসকরা ভিন্ন

---

[৮০] মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ণ প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা, *বাংলাদেশের ইতিহাস, সুলতানি ও মোগল* (সম্পাদক, আব্দুল মমিন চৌধুরী), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০, পৃ. ৪২৩

[৮১] মো: আখতারুজ্জামান, নগরায়ণ প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা, পৃ. ৪২৩-৪২৪

[৮২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫-৭৬; সুলতানি বাংলায় বহির্শক্রর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য দুর্গ নির্মাণ করা হয়। যে পরিমাণ দুর্গ নির্মাণ করা হয় তার সামান্য ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে টিকে আছে। দুর্গকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- প্রাসাদ দুর্গ, জল দুর্গ এবং প্রাসাদ সীমান্ত পাহারা চৌকি। প্রাসাদ দুর্গ সুলতান ও তাঁর পরিবারের বসবাসের জন্য এবং রাজধানী শাসনকেন্দ্র ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে নির্মিত হয়। কারণ প্রাসাদের প্রতিরক্ষা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল। এজন্যই দুর্গ সাধারণত নদীর ধারে এবং দুটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর সন্নিবেশিত থাকত। নদীপ্রধান দুর্গ তিন ধরনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। যথা- (১) নগরের প্রতিরক্ষায় পানি সরবরাহ করত, (২) নদীপথে অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন রসদ সরবরাহ করত এবং (৩) সহজ যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করত। দুর্গ রাজকীয় শক্তির প্রতীক এবং উঁচু প্রবেশ দরজার ঝরকা আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতো। এ বি এম হোসেন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২, স্থাপত্য, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯-২৪০

ভিন্ন স্থানে অবস্থান করলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় বা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত অবস্থায় দুর্গনগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।[৮৩] মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেকটি দুর্গ উপশহরের ন্যায় উন্নত ছিল।

সুলতানী যুগের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের মধ্যে গৌড় দুর্গনগরী ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফিরোজপুর থেকে মালদাহের ফুলওয়ারি পর্যন্ত বিস্তৃত ১২ কি.মি. জুড়ে কালিন্দি নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল গৌড় দুর্গনগরী। বাংলাদেশে টিকে থাকা সুলতানী যুগের দুর্গনগরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এটি। এই দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ। দুর্গটির আয়তন ছিল উত্তর দক্ষিণে ১৬১ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ৫০০ মিটার। এই দুর্গটি পরবর্তী চারশো বছর ধাপে ধাপে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়। দুর্গে প্রবেশের মূল দরজাটি দাখিল দরজা নামে পরিচিত। এর ভেতরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সুলতানের রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাসাদ চত্বরের উত্তর প্রাচীর থেকে দাখিল দরজার মাঝে নিম দরজা ছিল। নিম দরজা ও দাখিল দরজার মাঝে চাঁদ দরজা নামে আরো একটি দরজা ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দুর্গের প্রাচীরগুলো মাটির তৈরি হলেও অত্যন্ত মজবুত করে গড়ে তোলা হয়। এখানে ছিল রাষ্ট্রীয় খাজাঞ্চিখানা, বহির্মহল, অন্তঃপুর, সালামি দরজা, হোসেন শাহের সমাধি, কদম রসুল, বাইশ গাজীর দেয়াল প্রভৃতি স্থাপত্য।[৮৪] এই দুর্গের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বাংলার নগরের ধারণা পাওয়া যায়।

এছাড়াও আলোচ্য সময়ের দুর্গের মধ্যে রয়েছে- (১) ঠাকুরগাঁ জেলার রানী শংকৈলে অবস্থিত গড় ভবানীপুর দুর্গ, (২) পঞ্চগড় শহর থেকে ১০ মাইল উত্তরে ভিতরগড় দুর্গ, (৩) দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে ঘোড়াঘাট দুর্গ এবং (৪) রংপুরের শাহীগঞ্জে খাসবাগ দুর্গ। দিল্লি বা জৌনপুর রাজ্যের শাসকগণ যেকোনো সময় বাংলা আক্রমণ করতে পারে, এটা চিন্তা করে বাংলার সুলতানগণ সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। সেই কারণে সুলতানগণ উপরোক্ত দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। সুলতানী বাংলার দুর্গ ছিল শক্তিশালী, সুরক্ষিত ও সামরিক শক্তিনির্ভর। এ দুর্গগুলো বেশ কয়েকটি নিরাপত্তাস্তরবিশিষ্ট ছিল। এসব দুর্গ মূলত আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা ও দুর্গে অন্তপুরবাসীদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সংবলিত

[৮৩] দুর্গ নির্মাণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সব সময় একই ছিল যেমন- অভ্যন্তরীণ বৃত্তকার বেষ্টনী প্রাচীর বহির্প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত হতো এবং সেই সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিখা দ্বারাও পুনঃবেষ্টিত হতো। আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই দুর্গের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতো সাধরণত দুর্গের প্রবেশফটক ও পার্শ্ব-বুরুজ। প্রবেশ দরজা এবং প্রতিরক্ষা বুরুজ হয়ে থাকে প্রহরা কক্ষ সংবলিত। বেষ্টনী প্রাচীরে উপরিভাগে চওড়া চলাচলের পথের ব্যবস্থা থাকে যাতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে আক্রমণকারী বহির্শত্রুর আগমন লক্ষ করা যায়। এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

[৮৪] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও অন্যান্য, স্থাপত্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ.৩৪৬

ছিল। কিন্তু মোগল আমলের দুর্গগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম নিরাপত্তা বেষ্টনী পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিলাসবহুল ছিল।

মধ্যযুগের ইতিহাসে কোনো কোনো সময় দমদমা[৮৫] নামে শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দমদমা খুব সম্ভব সেনা শহর বা ছাউনি। এ সমস্ত শহর সাধারণভাবে ক্যাম্প শহর নামে খ্যাত। এ শহরসমূহ যুদ্ধরত সৈনিকদের ক্যাম্প থেকে সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলো সৈনিকদের ক্যাম্প ছিল, পরে আস্তে আস্তে এলাকাগুলোতে লোকবসতি বাড়তে থাকে। ফলে এ ক্যাম্পগুলোকে ঘিরে ক্যাম্প শহর গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ খলিফাতাবাদ, সোনারগাঁও ও দেবকোটের কথা উল্লেখ করা যায়।

(গ) প্রাক-মোগল বাংলার নগরায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে নগরায়ণের প্রভাব

প্রাক-মোগল বাংলার নগরায়ণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নগরগুলোর বিকাশ ঘটেছিল রাজধানী শহর, টাকশাল, প্রশাসনিক কেন্দ্র, সামরিক ঘাঁটি, থানা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র, নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী বাণিজ্য স্থান প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। নগরায়ণের ফলে লোকবসতি স্বাভাবিকভাবেই (natural

[৮৫] *Encyclopedia of Islam*, London, 1960, p. 860; আহমদ হাসান দানীর মতে দমদমা হলো উঁচু স্থান যেখান থেকে যুদ্ধ করা হতো। ইবনে বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে দেবকোট রাজধানী করেন এবং এর একটি অংশে সুরক্ষিত দমদমা নির্মাণ করেন। একইভাবে লক্ষ্মণাবতী প্রথমে ছিল সেনা ছাউনি এবং পরে রাজধানী শহর। এবি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

increase) বৃদ্ধি পায়। ইতোপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলায় নগরগুলোতে ক্রমান্বয়ে লোকবসতি বাড়তে থাকে। নগরে পরিপূর্ণভাবে আবাসিক এলাকা, শিল্প এলাকা কিংবা বাণিজ্যিক এলাকা নির্দিষ্ট ছিল। বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মধ্যযুগের নগরে অভিগমন থাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক এলাকা নতুন করে গড়ে উঠেছিল। যেমন গৌড় নগরীর বর্ণনায় লক্ষ করি। আধুনিক বন্দর নগরী গড়ে উঠেছে নদী বা সমুদ্রের আশ্রয়ে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে অবলম্বন করে। সমুদ্র বা নদীবন্দরগুলো ক্রমে বৃহৎ নগরে পরিণত হয়। মধ্যযুগের চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, সপ্তগ্রাম, হুগলি প্রভৃতি বন্দরগুলো বড় বড় নগরে পরিণত হয়েছিল। সুলতানী বাংলার নগরগুলোতে গ্রামীণ পণ্যদ্রব্য নির্ভর বাজার, আড়ৎ, বাণিজ্যকেন্দ্র, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা, ক্রয় বিক্রয়ের বড় কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও তৎকালীন নগরগুলো অনেক লোকের মিলনস্থল, নগরবাসীর প্রয়োজন মেটানোর নানারকম সরবরাহ কেন্দ্র, উন্নত শিল্পকারখানা, কারখানার জন্য কাঁচামাল ও বিশেষ কোনো উপাদান শিল্পের অবস্থানকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। মধ্যযুগের সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, গৌড় নগরীতে নগরবাসীর জীবনধারণ থেকে একথা বলা যায় যে, তৎকালীন কালের বিচারে নাগরিকদের জীবন ছিল আধুনিক নগরবাসীর ন্যায়। সুলতানী বাংলার নগরগুলোতে আধুনিক নগরের সব ধরনের সুবিধা না থাকলেও তৎকালীন সময় উপযোগী নগরবাসীর নাগরিক সকল সুবিধা বিদ্যমান ছিল।

আলোচ্য সময়ে বাংলার প্রতিটি শহর নির্মিত হয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান বিবেচনা করে। বাংলার শাসকগণ নদীর তীর বা বাণিজ্য পথের সংগমস্থলে শহর বা নগর নির্মাণে গুরুত্ব দেন। বাংলার লখনৌতি, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, চট্টগ্রাম ইত্যাদি নগর নদীর তীর বা কোনো বাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে গড়ে উঠেছিল। আশপাশের স্থান থেকে উঁচুভূমিতে এসব শহরের অবস্থান ছিল। এরূপ অবস্থানের কারণেই বাংলার নগরগুলোতে সহজে যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, পানি সরবরাহ, ব্যবসায় বাণিজ্যের সংযোগস্থল প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতো। যেমন- সোনারগাঁও; মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। লখনৌতির অবস্থান ছিল গঙ্গা ও মহানন্দার একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডে। বাংলা মূলত অন্যান্য জনবহুল অঞ্চলের তুলনায় মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ছিল।

আধুনিক কালের নগরগুলোর ন্যায় আলোচ্য সময়ের নগর ও শহরগুলোর মধ্যে এক শহরের সাথে অন্য শহরের খুব সহজেই যোগাযোগ করা যেতো। কোনো কোনো শহর স্থলপথের মাধ্যমে আবার কোনো কোনো শহর নৌপথের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হতো। সুলতানী বাংলার নগর বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, পাণ্ডুয়ার মধ্যে স্থলপথে ও জলপথে/নৌপথে যোগাযোগ স্থাপিত হতো। বাংলার সাতগাঁও

শহর থেকে হুগলি নদী দিয়ে গৌড়ে/লক্ষ্মণাবতীতে পৌঁছানো যেতো।[৮৬] নগরায়ণের বিকাশে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কে এম আশরাফ বলেন যে, শহরগুলো নিরাপত্তা চৌকি ও কার্যকর অন্যান্য সামরিক ব্যবস্থাপনা দিয়ে ঘেরা ছিল। শহরগুলোতে সুন্দর প্রশস্ত মসজিদ, প্রবেশদ্বার, কখনো ঝরনার ব্যবহার, গম্বুজ, নতুন ধরনের খিলান ও উন্নত রীতির দেয়াল ছিল। তিনি আরো বলেন, তাদের ভবন সমাধিসৌধ, ছাদসম্বলিত পুকুর, হাম্মামখানা ও সুন্দর বাগান - এ সবকিছুই শহরগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে।[৮৭] মুসলিম শাসকগোষ্ঠী নগরে মসজিদ, খানকাহ, মাদরাসা, চিকিৎসালয়, বাগান, পুকুর, কুয়া প্রভৃতি দ্বারা শহরগুলোকে সুসজ্জিত করেন। এছাড়া রাস্তার পথচারীদের বিশ্রামের জন্য সব শহরেই সরাইখানা বা খানকাহ ছিল। বিহার, তাব্রিজাবাদ, সোনারগাঁও ও পাণ্ডুয়ায় খানকাহ এবং লঙ্গরখানা ছিল। এসব লঙ্গরখানায় বিনামূল্যে খাদ্যগ্রহণের সুবিধা ছিল। প্রত্যেক নগরেই মসজিদ ছিল তবে বড় বড় শহরগুলোতে ‘জাম-ই-মসজিদ’ ছিল। পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে ইবনে বখতিয়ার খলজি এবং ইওজ খলজি মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়াও শাসকগোষ্ঠী প্রায় গুরুত্বপূর্ণ শহরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। *রিয়াজ উস সালাতিন* এ উল্লেখ রয়েছে যে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডুয়ায় দিল্লির শামসি হাম্মামখানার মতো একটি গোসলখানা নির্মাণ করেন। সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ) লখনৌতিতে জালালি পুকুর নামে একটি পুকুর ও দীঘি নির্মাণ করেন।[৮৮] মুসলিম শাসকগণ শহরগুলোর বিভিন্ন অংশে বহু পুকুর খনন করেন। পাণ্ডুয়ায় গোসলের ব্যবস্থাসহ সব ধরনের সুবিধা ছিল।[৮৯] শহরে রাজপ্রাসাদের পাশে অভিজাতশ্রেণির বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। *কালকেতু উপাখ্যান* এ বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায় নানা শ্রেণি-পেশার লোক শহরে তাদের আবাসিক এলাকা গড়ে তোলে। ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির স্বতন্ত্র আবাসিক এলাকা ছিল। প্রত্যেক এলাকা পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পন্ন ছিল এবং ঐ সমস্ত এলাকায় আলাদা মসজিদ, বাজার, পুকুর, স্বর্ণকার, চর্মকার, রঞ্জনশিল্পী, কারুশিল্পী থাকত।

আলোচ্য সময়ে শহরের সম্প্রসারণের জন্য শহরতলীর বাইরে বিস্তৃত এলাকা রাখা হতো। যেমন, পুরনো লখনৌতি শহর ফুলওয়ারি গেট থেকে পাতালচণ্ডী পর্যন্ত চার মাইল দীর্ঘ এবং গড়ে দেড় মাইল প্রশস্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম শাসনামলে শহরটি সম্প্রসারিত হয় ফুলওয়ারি গেট থেকে কোতোয়ালী গেট পর্যন্ত।

[৮৬] J J A Campos, *op.cit.*, p. 37

[৮৭] K M Ashraf, *op.cit.*, pp.198-199

[৮৮] Ghulam Hussain Salim, *op.cit.*, pp. 100, 118; উদ্বৃতি, মোঃ আতারুজ্জামান, নগরায়ণ প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা, *বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মোগল*, (সম্পাদক) আব্দুল মমিন চৌধুরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৪২৭

[৮৯] Ma Hung, *op.cit.*, p.161

মূল শহরের দৈর্ঘ্য ছিল আট মাইল দীর্ঘ এবং যেকোনো হিন্দু শাসনামলের শহরের তুলনায় দ্বিগুণ।[৯০] এছাড়া সুলতানী বাংলার নগরায়ণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'নগরের কসমোপলিটন' চরিত্র বজায় রাখা। লখনৌতি শহরটি মুসলমানদের অধিকারে থাকলেও শাসকগোষ্ঠী পূরবর্তী সময়ের হিন্দু শহরবাসীদের যথাযোগ্য মর্যাদায় রাখেন। ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ করেছে। মুসলিম শাসকেরা নতুন শহরের প্রবেশদ্বার শ্রমিক, কারুশিল্পী ও চণ্ডালদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। উঁচু-নীচু সকল শ্রেণির মানুষ শহরের সীমানার মধ্যে বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন পেতো। শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বাজারে চামড়া ব্যবসায়ীদের দোকান ছিল।[৯১] বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি গণক, নর্তকী, গায়ক, বাদক দল, চিকিৎসক, জ্যোতিষী শত রকমের হতশিল্পে দক্ষ কারুশিল্পী শহরের বাজারগুলোতে জড়ো হতো এবং তাদের বিভিন্ন রকমের দোকান ছিল।[৯২] শহরগুলোতে সব ধর্মের লোক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করত। ধর্মীয় কোনো বিভেদ ছিল না। প্রত্যেক ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্ম পালন করত।

নগর গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতি গতিশীল করে। প্রতিটি নগর বহুমুখী কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। মধ্যযুগের নগরগুলো উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলার নগরগুলো বর্তমান সময়ের তুলনায় অপরিকল্পিত মনে হলেও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সুলতানী বাংলার নগরগুলোতে ছিল ঐ সময়ের বিচারে অত্যাধুনিক নগর। নগরগুলোতে সাধারণভাবে আবাসিক এলাকার ন্যায় বিভক্ত ছিল। বাজারগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকতো। বারানী লখনৌতিতে দুই মাইল দীর্ঘ বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৩] প্রতিটি বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা ছিল। চৈনিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে যে, পাণ্ডুয়া বাজারের রাস্তাগুলোতে সব ধরনের দোকান ছিল। যেমন- গোসলখানা, মদের দোকান, খাবারের দোকান, মিষ্টির দোকান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দোকান।[৯৪] এ সকল বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, সুলতানী বাংলার নগরগুলোতে নাগরিকদের সুবিধার জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান ছিল।

নগরায়ণের ফলে অতিরিক্ত লোকের চাহিদা পূরণের জন্য পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাড়লে কাঁচামালের যোগান বাড়ে, ফলে শিল্পকারখানাগুলোর আকার এবং শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদনের

---

৯০ Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 76

৯১ Isami, *Futuh us Salatin*, pp. 105-106, উদ্বৃতি, মোঃ আতারুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩০

৯২ P.C. Bagchi, Political Relations between Bengal and China, 1945, pp. 118, 124; উদ্বৃতি, মোঃ আতারুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩১

৯৩ Barani, *op.cit.*, p. 55

৯৪ Ma Huan, *op.cit.*, p.161

পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় ততই এর গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং এসব পণ্যের বিক্রয়মূল্য কম হয়। ফলে বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠে এবং উন্নয়নের ভিত মজবুত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখা যায় নগরায়ণের ফলে কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কারণ নগরের নাগরিকগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। নগরায়ণের ফলেই শহুরে নাগরিকের চাহিদা পূরণে কৃষক তার উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য শহরে মুদ্রার মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ পায় এবং এর পাশাপাশি নগরের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

গ্রামে শহরের তুলনায় কাজের সুযোগ কম থাকায় গ্রামীণ এলাকা থেকে মানুষ শহরে আসে। আলোচ্য সময়ে নগরের বিকাশ ঘটায় বড় বড় শহরগুলোতে লোকের ভিড় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সুলতানী বাংলার নগরায়ণের বিকাশ ঘটায় বিভিন্ন পেশার লোকজন শহরে ভিড় করেছিল। যেমন- সোনারগাঁও নগরীতে শিল্পকারখানায় সংখ্যা বেশি থাকায় কারিগর ও বিভিন্ন শ্রেণির লোকের আনাগোনা বেশি ছিল। এছাড়া চট্টগ্রাম জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এতে বাড়তি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। প্রতিটি নগর কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখে। উল্লেখিত সময়ে নগরের বিকাশে গ্রামীণ কৃষকগণ এভাবেই মুদ্রা অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে।

নগরায়ণের ফলে শহরের উন্নত জীবনযাপন ও সুযোগ-সুবিধা মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। বারানী বলেন যে, মুলতান থেকে গৃহহীন, সহায়হীন বহু লোক লক্ষ্মণাবতীতে আশ্রয় নিয়েছিল।[৯৫] বারানীর এই বিবরণ থেকে এটা বোঝা যায় যে, লখনৌতি তৎকালীন সময়ের আশ্রয় নেওয়ার মতো নিরাপদ শহর ছিল। কারণ মুসলমানগণ উঁচু-নীচু, ধনী-গরিব সকলের জন্য শহরের দ্বার উন্মুক্ত রাখেন। ফলে শ্রমিক, মজুর কারিগর সকল শ্রেণির লোক বিনা বাধায় শহরে বাড়ি বানাতে পারত। ঐতিহাসিক আফিফ উল্লেখ করেন যে, পাণ্ডুয়া নগরীতে হাজার হাজার মানুষ বসবাস করত। তাঁর মতে, যদি ফিরুজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ) হঠাৎ আক্রমণ করে দুর্গ দখল করে নিতো তাহলে হাজার হাজার সম্মানীত নারী বর্বর লোকদের হাতে সহিংসতা ও অসম্মানের শিকার হতো।[৯৬] জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া জনবহুল নগরীতে পরিণত হয়েছিল।[৯৭] লখনৌতি ও সাতগাঁও- এর জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

---

[৯৫] Ziauddin Barani, *Tarikh-i-Firoz Shahi*, p. 100

[৯৬] Shams-I-Siraj Afif, *Tarikh-I-Firoz Shahi, The Hisrory of India As Told by its Own Historian,* Sir H M Elliot, edited by John Dowson, vol. 3, 2nd reprint, Sunil Gupta Ltd. Calcutta, 1953, pp. 31-33

[৯৭] Ghulam Hussain Salim, *op,cit.*, p. 118

শুধুমাত্র সাতগাঁও-এ দশ হাজার বাসিন্দা বসবাস করত।[৯৮] এ সকল তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে নগরের বিকাশের ফলে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম সুলতানগণ নগরের দ্বার উন্মুক্ত রাখায় বিভিন্ন পেশা ও সংস্কৃতির মানুষের আগমন ঘটেছিল। এ সময় অভিবাসন ছিল খুব বেশি। যেমন, কাজী রুকনউদ্দিন সমরকন্দি, বুখারা থেকে মাওলানা তকিউদ্দিন ও শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা, বাবা কোতোয়াল ইস্ফাহানী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পাণ্ডুয়া শহরে শত রকমের কারুশিল্পে দক্ষ কারিগরদের পাওয়া যেতো।[৯৯] বাংলার নগরগুলোতে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জাতির মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে নগরায়ণ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। মুদ্রার প্রচলনে ব্যবসায় বাণিজ্য উন্নত হয় এবং নগরের বিকাশে বাংলা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। শহর ও নগরগুলোতে সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। গ্রামের উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যাদি সহজেই শহরে বিক্রির জন্য প্রেরণ করতে পারত। ফলে কৃষক শ্রেণিও মুদ্রার মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ পায়। নগরায়ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করেছিল। বন্দরগুলোতে বাণিজ্য আরো বেশি জমজমাট হয়। ইবনে বতুতার বর্ণনায় সোনারগাঁও বন্দরে চীনা জাংক[১০০] এর বিবরণ তার প্রমাণ দেয়। চট্টগ্রাম বন্দরে ভিনদেশি জাহাজ নোঙর করত এবং সেখানে তারা একত্রিত হয়ে বাণিজ্যের মুনাফা বণ্টন করত। সাতগাঁও বন্দরের বণিকদের সম্পর্কেও একই বর্ণনা পাওয়া যায়। নগর ও বন্দরে মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হতো। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকে রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতার বর্ণনায় জানা যায়, বাজারে ধান, গম, চিনি, তৈল, গাভী, মুরগি প্রভৃতি পণ্য রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে বেচা কেনা হতো।[১০১] চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় বাণিজ্যে তারা টঙ্কা নামক রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করত।[১০২] এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শাসনামলে দ্রব্য বিনিময় প্রথার পরিবর্তে বাংলায় মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি চালু হয়।

মুসলিম শাসকগণ বাংলায় নতুন প্রযুক্তির আমদানি করেন। যেমন মুদ্রা তৈরিতে ডাইচের ব্যবহার (dices), বস্ত্র বুননে চরকার ব্যবহার (spinning wheel), পাদানি (treadles) রেশমশিল্প

---

[৯৮] Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, vol. 1, pp. 91-92, 95

[৯৯] P C Bagchi, The Political Relations between Bengal and China, *Visva Bharati Annals*, Cheena Bhavana, edited P.C.Bagchi, 1945, pp. 128, 130

[১০০] Ibn Battuta, *op.cit.*, p. 241

[১০১] *Ibid*, p. 234

[১০২] Ma Huan, *op.cit.*, pp. 163-164

(sericulture), চিনিশিল্প, লবণশিল্প, কাগজশিল্পে (art of paper making), সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য তৈরিতে চোলাই/পাতন প্রক্রিয়া (technique of distillation), কৃষিক্ষেত্রে গিয়ার (saqiya) ও চাপযন্ত্র বা লিভার (lever) প্রভৃতি। এসব প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্পকারখানার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং অনেক লোক শিল্পের সাথে যুক্ত হয়। এই সময়ে বস্ত্রশিল্পের বিকাশে সমাজে নতুন নতুন পেশাজীবী শ্রেণির জন্ম হয়। উদাহরণ হিসেবে রেশম ও মসলিন বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। রেশমবস্ত্রের জন্য তুঁতগাছ (mulberry) চাষ করতেন কৃষক। গুটিপোকা চাষ ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্টদের বলা হতো ‘চসর’। তা থেকে গুটি সংগ্রহ করে সুতা কাটার কাজটি করতেন ‘নকদ’ নামের আরেক শ্রেণির লোক। বেশিরভাগ রেশম উৎপাদন ছিল একটি ঘরোয়া ধরনের শিল্পকর্ম। গুটির লালন, সুতা কাটা, সুতা পাকানো ও সুতার কুণ্ডলীকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজগুলোতে পরিবারের লোকজন সাহায্য-সহায়তা করত। রেশমবস্ত্র বয়নের সাথে ‘বসুনিয়া’ নামে পরিচিত একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষও যুক্ত ছিলেন। মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের সাথে তাঁতি ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণির পেশা ও শ্রমজীবী মানুষ জড়িত ছিলেন। যেমন- ছেঁড়া মসলিন রিপু করার কাজ করতেন ‘চুনাই’ নামের একশ্রেণির লোক। এলোমেলো সুতা ঠিক করার কাজে নিয়োজিত ছিল ‘নাদিয়া’ নামক আরেক শ্রেণির কারিগর। এরা মসলিন ভাঁজ করা ও রপ্তানির জন্য গাঁট বাঁধার কাজটিও করতেন। এছাড়া একশ্রেণির অভিজ্ঞ কারিগর বড় শঙ্খ দিয়ে মসলিন ঘষে মসৃণ করার সূক্ষ্ম কাজটি করতেন। মসলিন শিল্পের সাথে জড়িত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারিগর ছিলেন ‘রঞ্জনশিল্পী’।

আলোচ্য সময়ে নগরায়ণের বিকাশে সমাজে ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং সমাজে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। নগরায়ণের ফলে নগরগুলোতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে সময়ের পরিক্রমায় গ্রামীণ কৃষক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও কারিগর শ্রেণি পারিবারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায়। বাংলার বড় বড় নগরগুলোতে গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্য সংগ্রহ করে চাহিদাসম্পন্ন শহরে প্রেরণ করা হতো। যেমন- উন্নত ও ভালোমানের কাপড় সরবরাহ করত সোনারগাঁও। এভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি হয়েছিল। সুলতানী বাংলার নগরায়ণের বিকাশে নতুন নতুন নগরকেন্দ্র ও শহরে গ্রামীণ পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাংলায় নতুন প্রযুক্তি আমদানি করায় বিভিন্ন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। এতে অনেক কারিগর ও শিল্পীদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রাম থেকে বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ ও শিল্পীরা সক্রিয় হওয়া নগর ও বন্দরে আসে। প্রচলিত নিয়মে শিল্পী কারিগরদের সমাজে নতুন নতুন বর্ণ (caste) ও শাখাবর্ণের (sub-caste) জন্ম নেয়। ফলে বাংলার অনগ্রসর মুসলিম ও অমুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতি হয়। এছাড়া বাংলায় মুসলিম শাসন

প্রতিষ্ঠিত হলে অভিবাসিত শ্রেণিদের মধ্যে অনেকেই সামরিক বেসামরিক পদে নিযুক্ত হন। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক বৈষম্য পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায় এবং কায়স্থরা এ সময়ে নিজ যোগ্যতায় সরকারি চাকুরি পায়। কায়স্থরা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ওপরের স্থান লাভ করে যা ছিল সামাজিক গতিশীলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বাংলার ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রায় কাজই কায়স্থদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

শিক্ষাক্ষেত্রে নগরায়ণের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। প্রাক-মুসলিম যুগে বর্ণবৈষম্যের কারণে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ছিল এবং অন্য সবাই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সেনামলে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গন ছিল অসংবদ্ধ।[১০৩] মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষ শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ফিরে পায়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম শাসকগণ বাংলায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মুসলিম পরিবারের অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের বয়স চার বছর, চার মাস, চার দিন পূর্ণ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশোনায় হাতে খড়ি দিতেন। এই অনুষ্ঠানকে 'বিসমিল্লাহ খানি' অনুষ্ঠান বলা হতো।[১০৪] জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু প্রথম পাঠ গ্রহণ করত। শিক্ষক কুরআন হতে নির্বাচিত একটি আয়াত পাঠ করতেন শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত।[১০৫] মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা মসজিদে এবং হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েরা টোলে শিক্ষাগ্রহণ করত। এ সময়ে বাংলায় উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন দরাসবাড়ি মাদ্রাসা। এছাড়া সোনারগাঁও, সাতগাঁও, বিহার শরিফ, সিলেট ও পাণ্ডুয়ায় মাদরাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরবি, ফার্সি ও বাংলা ভাষা শেখানো হতো। যদিও মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি। সরকারি চাকুরির সুযোগ থাকায় অনেক হিন্দু ফার্সি ভাষা শিখতেন এবং সন্তানদেরও ফার্সি শেখাতেন।

আলোচ্য সময়ে নতুন প্রযুক্তি কাগজের ব্যবহার শুরু হলে বই-পুস্তক, দলিল পত্রাদি ও অন্যান্য কাজে কাগজের ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়। সুলতানী আমলে প্রথম গ্রন্থ অনুবাদ করার রীতি প্রচলিত হয়। সুলতান আলী মর্দান খলজির (১২১০-১২১৩ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে লখনৌতির কাজী রুকনউদ্দিন সমরখন্দী প্রথম অমৃতকুণ্ড (Amritkand) নামক অতিন্দ্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেন।[১০৬] বাংলা ভাষার উন্নতির ফলে

---

[১০৩] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.৪৪
[১০৪] S.H.M Rijvi, Shibani Ray, *Muslim Bio-cultural Prospective*, Delhi, 1984, pp.42-44
[১০৫] K.M.Ashraf, *op.cit.*, p.145
[১০৬] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, p.164

১২০৪-১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এ সময়ে কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর '*ইউসুফ জুলেখা*' রচনা করেন। কৃত্তিবাস '*রামায়ণ*' কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। এছাড়া কবি ফয়জুল্লাহর- '*গোরক্ষ বিজয়*', *গাজী বিজয়*, *সত্যপীরের পাঁচালী*, জয়নালের '*চৌতিষা ও রাজমালা*'। কবি জৈনুদ্দিনের '*রসুল বিজয়*' মুহাম্মদ কবীরের '*মনোহর মধুমালতি*'প্রভৃতি।[১০৭] এছাড়া হিন্দু কবি কানা হরিদত্তের '*মনসামঙ্গল*', রামাইপণ্ডিতের '*শূন্যপুরাণ*', মালাধর বসুর '*শ্রীকৃষ্ণবিজয়*', বিজয়গুপ্তের '*মনসামঙ্গল*', বৃন্দাবন দাসের '*চৈতন্য ভাগবত*', কৃষ্ণদাস কবিরাজের '*শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত*'। এছাড়া ২৯ জন কবির মূল্যবান রচনাবলি বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১০৮] মূলত মুসলিম শাসনামলেই নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা তাদের ধর্মগুলো পঠন, লিখন ও পর্যালোচনায় সুযোগ পায়।

মধ্যযুগের নগরায়ণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। তৎকালীন বাংলার অভিবাসিত শ্রেণি ও স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জনসাধারণ বন্ধুত্বসুলভ পরিবেশে একক সমন্বিত সমাজব্যবস্থায় বসবাস করত। যেখানে সকল ধরনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া হতো। অভিবাসিত শাসকগোষ্ঠী ও স্থানীয় অমুসলিমদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার কতিপয় উদাহরণ হলো- মাজার ও দরগায় গভীর শ্রদ্ধা জানানো। খাদ্যাভাসে একই রকম খাবার গ্রহণ-ভাত, মাছ, মাংস খাওয়া। পোশাকের ক্ষেত্রে শাড়ি, লুঙ্গি ও ধুতি পরিধান করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মুসলিম বাংলার সুফি-সাধক ও পণ্ডিতবর্গের সরাসরি অংশগ্রহণে তৎকালীন বাংলায় সামাজিক মিথস্ক্রিয়া আরো উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়। এপর্যায়ে সুফি-সাধকদের খানকাহ ও মাদরাসাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, মুসলমানদের আগমনের পর বাংলার নগরায়ণের বিকাশ শুরু হয়। প্রাক-মোগল বাংলার বিভিন্ন নগর ও বন্দর গড়ে উঠেছিল নদী ও সমুদ্রের প্রবাহকে কেন্দ্র করে। এসব নগর ও বন্দর কোনোটা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে, কোনোটা প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণেও গড়ে উঠেছিল। এই সময়ের প্রধান নগরগুলো হলো- নদীয়া, লখনৌতি, দেবকোট, গৌড়, সোনারগাঁও প্রভৃতি। আন্তর্জাতিকমানের বন্দর ও নগরের মধ্যে ছিল- চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও হুগলি। এসব বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো ফলে বাংলার আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আলোচ্য সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে

---

[১০৭] Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Riyadh, 1985, pp. 854-874
[১০৮] Muhammad Abdur Rahim, *op.cit.*, pp. 230-234

এবং বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এসব নগরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল নগর, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দুর্গের প্রাধান্য, নগরের ভেতরে প্রশাসনিক ভবন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নগর কেন্দ্রের প্রশস্ত রাজপথের কাছাকাছি ছিল অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির আবাসিক এলাকা, নগরের বাইরে কারিগর, অন্যান্য পেশাজীবী ও নিম্ন আয়ের লোকজন বসবাস করত। এ সময়ে নগরের আকার ও আয়তন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও মধ্যযুগের নগরগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অস্থবিরতা। নগরগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল তাই নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সাথে নগরগুলোর ভাগ্য নির্ধারিত হতো। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে যদিও ইট বা পাথরের তৈরি ইমারত ছিল কম। বেশির ভাগ ঘর-বাড়ি বাঁশ, খড় বা কাদা নির্মিত ছিল। তবে অভিজাত ও ধনীদের বেলায় অবশ্য ইটের ব্যবহার ছিল। সুলতানী আমলের বিভিন্ন নগরে গুরুত্বপূর্ণ যেসব ভৌতিক অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল; সেগুলোর মধ্যে সুলতান, তাঁর দরবার, অভিজাতশ্রেণির আবাসস্থল, সামরিক প্রধানের আবাসস্থল প্রভৃতি প্রধান। প্রাক-মোগল বাংলার কিছু প্রাচীন শহর পুনরুজ্জীবিত হলেও বেশকিছু নগর বা শহর নানা কারণে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ায় বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়। নগরায়ণের ফলে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে এবং হিন্দু-মুসলিম উভয়ের সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। উল্লেখ্য যে অভিবাসী বহিরাগত শ্রেণির সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির প্রচলিত হয়।

উপসংহার

উপসংহার

পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে সুপরিচিত ছিল। বিপুল প্রাচুর্যের জন্য দেশটিকে কখনো 'ভারতের স্বর্গ' বা স্বর্গরাজ্য আবার কখনো 'দোযখ-ই-পুর নিয়ামত' বা সম্পদে প্রাচুর্যপূর্ণ দোযখ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলার সম্পদের আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের বণিকরা এখানে ভিড় করত। বিদেশি পণ্যবাহী জাহাজের আগমন, বিদেশি বণিকদের বিশেষ করে ইস্পাহান, মালাক্কা, চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বণিকদের উপস্থিতি থেকে এসব দেশগুলোর সাথে বাংলার জমজমাট বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশের সম্পদ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে ভৌগোলিক পরিবেশ, নদনদী ও উর্বর ভূমি। যেখানে ফলে ধান, গম, আখ, তুলা, আফিম, সবজি ও অন্যান্য কৃষিজপণ্য। অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও মূল্যবান অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ছিল লাক্ষা, শোরা, লবণ, চিনি, লাল মরিচ প্রভৃতি। এছাড়াও বাংলা ছিল বিভিন্ন জাতের তুলা ও বস্ত্রশিল্পের এক অসাধারণ ভাণ্ডার। বহির্বিশ্বে এদেশের তৈরি উন্নতমানের বস্ত্রের চাহিদা ছিল এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি হতো।

প্রাচীনকালে বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল- যেমন বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, রাঢ় প্রভৃতি। প্রাক-মুসলিম যুগে বা সেনামলেও ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন বিদ্যমান ছিল। কারণ রাজা লক্ষ্মণ সেন শেষ বয়সে কার্যকর প্রশাসন চালাতে পারেননি। ফলে সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। সুন্দরবনের খাড়ি মণ্ডলের শাসকের স্বাধীনতা, মেঘনার পূর্বতীরে দেব শাসকদের স্বাধীনতা, ১২০২ সালে কুমিল্লায় স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব প্রভৃতি অঞ্চলের স্বাধীনতা লক্ষ্মণ সেনের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। অর্থাৎ সেনামলে রাজ্যের নানাস্থানে বেশ কয়েকজন স্বাধীন শাসকের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। বাংলার শাসকগণ যেকোনো সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করত, তাই দেশটিকে 'বলগাকপুর' বা বিদ্রোহী অঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বার বার বিদ্রোহ করায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। বাংলার শাসকগণের বিদ্রোহ ঘোষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বাংলার নদনদী। অনেক নদী থাকায় দিল্লির শাসনকর্তাগণের পক্ষে এই প্রদেশে যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করেও সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এদেশের আবহাওয়া, বর্ষাঋতুর সময়ে মানিয়ে নিতে না পারা ও অন্যান্য কারণে তাদের পক্ষে বাংলার শাসকগণের মোকাবেলা করাও কঠিন ছিল। বাংলার

বিভিন্ন জনপদও গড়ে উঠেছিল নদনদীকে কেন্দ্র করে। সময়ের পরিক্রমায় এদেশের নদনদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। ফলে ধ্বংস হয়েছে অনেক নগর, বন্দর ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপত্য। আবার গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর, নগর ও বন্দর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও সেন শাসনাধীনে বাংলায় একান্ত গ্রামনির্ভর ও কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলায় মুদ্রাব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। এমনকি এ সময়ের কোনো তাম্রমুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়নি, কড়িই ছিল বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম। মুদ্রাব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বণিক ও অন্যান্য শ্রেণির লোকজন বেকার হয়ে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করতে থাকে। এতে বাংলা কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দিকে আরো একধাপ অগ্রসর হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধঃপতনে বন্দরগুলো ঝিমিয়ে পড়ে এবং নগরায়ণের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া বণিকদের প্রতি শাসকদের বিরূপ মনোভাব থাকায় অনেক বণিক দেশ ত্যাগ করে। সমাজে কঠোর জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং এই জাতিভেদ প্রথাই সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিমাপক হিসেবে চিহ্নিত হতো। এ কারণে শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ীদের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে। রাজা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ভূমিদান করায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সেনামলে কোনো অবস্থাতেই নিম্নশ্রেণির মানুষ তাদের পেশা পরিবর্তন করতে পারত না, এজন্য তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ আয় করা সম্ভব হতো না। ফলে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেনি এবং এ সময়ে সামাজিক অবস্থা একেবারেই বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রাক্-মুসলিম যুগে বাংলায় যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও সামাজিক বৈষম্য বিরাজমান ছিল সুলতানী শাসনামলে সেই স্থবিরতা ও সামাজিক বৈষম্য ক্রমান্বয়েহ্রাস পায়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় সুলতানী শাসনের সূত্রপাত করেন এবং সময়ের পরিক্রমায় দেশটি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হয়। এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি হতে থাকে। বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলে শহর ও নগরগুলোকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসনের পূর্ববর্তী হিন্দু শাসনব্যবস্থায় এক চরিত্রগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের শাসন কাঠামোয় উঁচুস্তরের প্রশাসনিক পদগুলোতে অভিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠীর আধিক্য ছিল। কিন্তু আঞ্চলিক প্রশাসনের শীর্ষস্থানে পূর্ববর্তী খুদে জমিদার ও প্রধানদের নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে স্ব স্ব পদে বহাল রাখা হয়। মুসলিম শাসকগণ প্রশাসনকে মসৃনভাবে পরিচালনার স্বার্থেই এই নীতি গ্রহণ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে

পক্ষপাতশূন্য নীতি অবলম্বন করা। মুসলমান শাসকগণের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অমুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবেই বাংলার হিন্দু সমাজের উঁচুশ্রেণির বেশকিছু লোক নতুন মুসলমান শাসকদের সামরিক ও রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হয়ে অভিজাতশ্রেণির মর্যাদা লাভ করে। মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর এই রাজকীয় নীতির মূল সার্থকতা ছিল- সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা। সুলতানগণ সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন টাকশাল হতে মুদ্রার প্রচলন করেন। মানসম্মত মুদ্রা প্রচলনে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। এছাড়া মুদ্রাকেন্দ্রিক বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ায় বন্দর নগরীগুলো জমজমাট হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নগরায়ণ। বাংলায় মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর আগমনে নগরায়ণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। আগত অভিজাতশ্রেণির মুসলমানরা নগর জীবনে অভ্যস্ত ছিল। ফলে তাদের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, প্রশাসনিক কেন্দ্র, থানা, টাকশাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে নগরের পত্তন হয়। এ সময়ে পূর্বের ক্ষীয়মান নগরগুলো বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন নগরের গোড়াপত্তন হয়। টাকশালকে ঘিরেও অনেক নগর কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। নদী ও সমুদ্রের প্রবাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নগর ও বন্দর গড়ে উঠেছিল। এসব নগর ও বন্দর প্রধানত বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ক্ষেত্রবিশেষে সুফি সাধকদের খানকাহ, মসজিদ ও মাদরাসা প্রভৃতি স্থাপনাকে ঘিরে ধর্মীয় প্রয়োজনেও গড়ে উঠেছিল অনেক নগর কেন্দ্র। প্রতিরক্ষার জন্য শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস, গ্যারিসন, দুর্গ, পুলিশ চৌকি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে নগরের বিকাশ ঘটেছিল। সুলতানী বাংলার প্রধান নগরগুলোর মধ্যে ছিল- নদীয়া, লখনৌতি, দেবকোট, গৌড়, খলিফাতাবাদ, তাণ্ডা প্রভৃতি। নগরগুলোকে ঘিরে নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শহুরে অর্থনীতি বিকশিত হয়। অনেকেই জীবন জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত হওয়া নগরে ও শহরে গমন করে। ফলে অনিবার্যভাবেই এক সামাজিক রূপান্তর ঘটেছিল। এতে বাংলায় সামাজিক গতিশীলতা ত্বরান্বিত হয়। শহর ও নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এক প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। যেখানে দেশীয় ও বিদেশি বণিক উভয়েই অংশগ্রহণ করে। নগরকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসার পরিধিও বিস্তৃত হয়। তারা উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যদ্রব্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে ঐসব শহর ও নগরে প্রেরণ করত। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতির পরিবেশ তৈরি করেছিল প্রাক-মোগল বাংলার নগরায়ণ। এটা বলা

যায় যে বাজার অর্থনীতি কৃষকশ্রেণিকে স্থানীয় ও বহুজাতিক শহরগুলোতে তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেতে সহায়ক হয়েছিল।

বাংলার নগরকেন্দ্রগুলোতে বসবাসরত সুফি মাশায়েখগণের খানকাহ, লঙ্গরখানা, আবাসিক মাদরাসা ও সরাইখানাকে ঘিরে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কল্যাণমূলক কাজের প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেওয়া হতো। তাছাড়া সুফি মাশায়েখগণের রহস্যময় চিন্তাভাবনা, জ্ঞানের গভীরতা, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, উদার ও উন্মুক্ত মনোভাব তাদের ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। তারা ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান জনসাধারণের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করত। এছাড়া তাদের প্রতিষ্ঠানে সমাজসেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ অনুষ্ঠিত হতো। যেমন- লঙ্গরখানা, খানকাহ, সরাইখানা ও মাদরাসা নির্মাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত ও হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করত। ফলে জনসাধারণ শাসকগণের ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তরের ফলে এদেশের বেশিরভাগ মুসলমান জনগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। মূলত ধর্মান্তরিত নব্য মুসলিমদের ধর্মীয় অনুশাসন, জাতিভেদের তীব্রতা প্রভৃতি নানা কারণে অমুসলিমরা তাদের পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে কুটির শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি। নানা শ্রেণি পেশার লোকের পূর্বের তুলনায় বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে তারা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নানা উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান, পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করত। এ সময়ে শাসক, অভিজাতশ্রেণি ও স্থানীয় জনসাধারণের পারস্পরিক মেলামেশার ফলে বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির আদান প্রদানে এক নতুন মিশ্রধরনের লোকাচার ও প্রথার জন্ম নেয়। এভাবেই সুফি–সাধকদের সমাধি ও দরগায় শ্রদ্ধা জানানো ও বিভিন্ন ধরনের অন্ধবিশ্বাস জন্ম নেয়। বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে ভাত, মাছ, মাংস খাওয়ার বহুল প্রচলন হয় এবং হিন্দু-মুসলিম সবার মধ্যে লুঙ্গি, ধুতি ও শাড়ি পরার প্রচলন ঘটে। মূলত ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে বাংলার গোঁড়া হিন্দু সমাজের সংস্কৃতি, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের শিক্ষা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রবেশ করে। শিক্ষিতশ্রেণির হিন্দুগণ মুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করাকে বড় সম্মানের বিষয় মনে করত। কালকেতুর দরবারের ভাড়ুদত্ত পাগড়ি পরিধান করত। এছাড়া অভিষেক অনুষ্ঠানে মনোহর পাগড়ি ও ঢিলা জামা পরিধান করেছিল। হিন্দু রমণীরা

মুসলিম মহিলাদের ন্যায় ঘাঘড়া, ওড়না এবং কাঁচুলি বা চোলি ব্যবহার করত। হিন্দু, মুসলিমরা এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। মোটকথা বিভিন্ন উৎসবে আনন্দ অনুষ্ঠানে হিন্দু অভিজাত ব্যক্তি মুসলিমদের ন্যায় পোশাক পরিধান করত এবং হিন্দুরা কেবল কপালে চন্দনফোঁটা ও উৎসর্গীকৃত চিতাভস্মের চিহ্ন দ্বারা হিন্দুরূপে চিহ্নিত হতেন।

মুসলিম শাসনামলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ বাংলার অর্থনীতিকে গতিশীল করেছিল। ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্যিক ঐতিহ্যে ভাটা পড়েছিল। বাংলায় অভিজাতশ্রেণির মুসলমানদের আগমন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নগরায়ণ, সুলতান ও অভিজাতবর্গ সরাসরি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করায় বাংলার পতনোন্মুখ ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। অভিজাত শাসকশ্রেণি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিলাসজাত দ্রব্য-সামগ্রী আমদানি করেন। এছাড়াও আলোচ্য সময়ে বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কৃষিজ ও শিল্পপণ্যের বিপুল উৎপাদন, বন্দরসমূহের উন্নতি ইত্যাদির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর বৈদেশিক বাণিজ্যের সাফল্য ও বিকাশ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের তালিকা ও পরিমাণ দীর্ঘ হয়। বাংলায় বাণিজ্যিক পরিবেশ সুনিশ্চিত থাকায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পতুর্গিজরা এদেশে আগমন করে। পরবর্তীতে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরাও একই উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করে। আগত বণিকদের ভাষার সমস্যা, পণ্যদ্রব্যের ওজন পরিমাপ, স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ প্রভৃতি কারণে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নানা শ্রেণিপেশার লোক সম্পৃক্ত হয়। বিদেশি বণিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা শতকরা হারে সম্মানী পেতো ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। কড়ির পরিবর্তে রূপার মুদ্রা তঙ্কার ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন, বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর আগমন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটায় পূর্বের তুলনায় বাংলার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বন্দর নগরগুলো জমজমাট হয়ে উঠে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বন্দরকেন্দ্রিক নগরের বিকাশ ঘটে। বন্দর নগর কেন্দ্রের প্রশস্ত পথের কাছাকাছি বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণি বসবাস করত। তৎকালীন বাংলার আন্তর্জাতিক মানের বন্দর নগরীর মধ্যে ছিল- চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও হুগলি। এসব বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হলে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং বন্দরগুলোকে ঘিরে মানুষের কর্মপরিধি বাড়তে থাকে। বন্দরের সকল পণ্যদ্রব্য চাহিদাসম্পন্ন স্থানে

প্রেরণের জন্য অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই সমৃদ্ধির ফলে পণ্যদ্রব্যের সচলতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকশ্রেণি ছাড়াও নানা শ্রেণিপেশার লোক এই বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাফল্যের কারণে বাংলার সকল স্তরের মানুষের জীবনযাত্রায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে। অন্যদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে অধিক গতিশীল করতে দাদনি ও হুণ্ডি প্রথার প্রচলন ঘটে। যা ছিল এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এ সময়ে মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন বেড়ে যাওয়ায় বাংলা কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে এক প্রকার মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। ফলে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যে এক নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলে। আলোচনাধীন সময়ে বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় নতুন পদ্ধতি ইকতা প্রথার প্রচলন শুরু হয়। ইকতা প্রথা ছিল এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান ছিলেন মুকতি। মুকতির তত্ত্বাবধানে অনেক জমি চাষের আওতায় আসে, ফলে আবাদি জমির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইতোপূর্বে ভূমিতে সাধারণ প্রজার কোনো অধিকার ছিল না। রাজা এক-ষষ্ঠাংশ পুণ্যলাভের আশায় মন্দির ও ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। কিন্তু সুলতানী শাসনামলে ভূমিতে প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রজারা ইচ্ছা করলে ভূমি বিক্রি ও দান করতে পারত। এ সময়ে আবাদি জমির উর্বরা শক্তির ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রচলন শুরু হওয়ায় কৃষক জমি চাষের প্রতি আগ্রহী হয়। প্রজারা নির্দিষ্ট দিনে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ ভূমি রাজস্ব প্রদান করত। অনেক ক্ষেত্রে রাজস্বের এই হার কম হতো। মুদ্রা ও ফসল উভয় মাধ্যমেই রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। এ সময়ে রাজস্বের উৎসগুলো ছিল- গানিমাহ, বাণিজ্য শুল্ক, আফগারি শুল্ক ও ভূমি রাজস্ব। অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। শহর এবং বন্দর নগরীগুলো থেকে নিম্নহারে আমদানি শুল্ক আদায় করা হতো। প্রাক-মুসলিম যুগের চেয়ে সুলতানী আমলে তুলনামূলক কম হারে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। প্রজারা মুদ্রা ও ফসলের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব প্রদান করত। শাসকের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্বনীতি পরিবর্তিত হতো। সুলতানী শাসনাধীনে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের সাথে জমিদার, ইজারাদার, মুকতি, হিসাব নিরীক্ষক, মুকাদ্দাম প্রভৃতি শ্রেণির লোক জড়িত ছিলেন। বাংলার জমিদারশ্রেণির পুনরুত্থান এবং এক শ্রেণির সমৃদ্ধিশালী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উত্থান ঘটে। যারা সরকারকে টাকা ধার দেওয়ার মতো সামর্থ্য অর্জন করেছিল। তারা অভিজাতশ্রেণির মতো জীবনধারণ করত। নগরায়ণের ফলে অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদাপূরণের পাশাপাশি কৃষিজপণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির বিকাশ। এ সময়ে বিভিন্ন শিল্পে ও মুদ্রা তৈরিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। এই মুদ্রা তৈরির সাথে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত ছিল। যোগাযোগ ও পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানির জন্য জাহাজ নির্মাণ হতে থাকে। বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্প ছিল বেশ ব্যয়বহুল, অত্যাধুনিক ও বৃহদাকার শিল্প। প্রাক-মোগল বাংলায় স্থাপত্য নির্মাণ শিল্পে প্রথম টালী, চুন, ইট সুরকির ব্যবহার, ছাদ তৈরির পদ্ধতিতে গম্বুজের ব্যবহার, খিলানের ব্যবহার করা হয়। এই সময়ে প্রথম মসজিদ স্থাপত্যে (আদিনা মসজিদে) নারীদের জন্য বসবার মঞ্চ (badshah-ki-takt) তৈরি হয়। শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা রকম চিত্র অঙ্কিত হয় এবং চিত্রশিল্পে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বস্ত্রশিল্পে এ সময়ে নতুন প্রযুক্তি চরকার ব্যবহারের ফলে বস্ত্র উৎপাদনও পূর্বের তুলনায় ছয় থেকে সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। বাংলায় বিভিন্ন নামে ও নানান রঙের কাপড় তৈরি হতো, যা বিদেশি পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বহির্বিশ্বে এ সকল কাপড়ের প্রচুর চাহিদা থাকায় রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে অনেক লোক যুক্ত হয়, ফলে তাঁতিদের মধ্যে নতুন নতুন জাতি ও জাতিশাখার জন্ম হয়। এই অর্থনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক তাঁতি, কারিগর, রংরেজ, নকশা প্রস্তুতকারী, এমব্রয়ডারি কারিগর প্রভৃতি পেশাজীবীরা অর্থনৈতিকভাবে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বাবলম্বী হয়। অন্যদিকে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পাওয়ায় নিম্নশ্রেণির অনেক লোক তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত হয় এবং নতুন সৃষ্ট কর্মক্ষেত্রসমূহের পেশাজীবীগণের হাতে অর্থের প্রবাহমানতা বৃদ্ধি পায়। বাংলায় নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে শিল্পকারখানার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন রকমের ও প্রকৃতির কাজের জন্য কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটা বলা যায় যে সাধারণ কারিগরদের হাতে অর্থ আসায় তাদের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব পড়ে। ফলে বাংলার সমাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়। নতুনভাবে গড়ে উঠা শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পূর্বের স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাজার অর্থনীতি ও মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটিয়েছিল। যা বাংলার শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছিল। পূর্বে আলোচিত কারণগুলোর প্রভাবে গ্রামীণ এবং কারখানাজাত পণ্যের চাহিদা এবং যোগান উভয় বৃদ্ধি পায়।

আলোচিত সময়ে কৃষিজ পণ্যনির্ভর শিল্পকারখানার সংখ্যা, শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি ও বর্ধনশীল ব্যবসায়-বাণিজ্য কেবলমাত্র ভূমি রাজস্বের ওপর নির্ভরতা কমায়নি বরং

এগুলো সমাজের একশ্রেণির মানুষকে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জনের পথ সুগম করেছিল। একইভাবে তা মূলধন তৈরিতেও সহায়ক হয়েছিল।

বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত পদক্ষেপের ফলে নানা শ্রেণিপেশার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া শিক্ষার নানান বিভাগ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। নিম্নশ্রেণির লোকেরা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় এবং শিক্ষার ওপর ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য হ্রাস পায়। শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পঠন, পাঠন, লিখন ও পর্যালোচনার সুযোগ পায়। কায়স্থদের সরকারের উচ্চপদে নিয়োগের প্রমাণ রয়েছে। বর্ধমানের কুলীন কায়স্থ পরিবারের মালাধর বসু এবং তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু উচ্চপদে আসীন হন এবং তাদের নামে ভূমি বরাদ্দ ছিল। চব্বিশ পরগনা জেলার মহীনগরের গোপীনাথ বসু তাঁর প্রতিভাবলেই উজির/রাজস্বমন্ত্রী নিযুক্ত হন। গোপীনাথ বসুর বড় ভাই গোবিন্দ বসু খাজাঞ্চিখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। হোসেন শাহের সময়ে তিনজন কায়স্থ ভ্রাতা রামভদ্র, রায়নাথ (হিসাবরক্ষক) এবং বানীকান্ত রায় কানুনগো বিভাগে চাকরি করত। যশোরের প্রতাপাদিত্যের পূর্ব পুরুষগণও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির বহুসংখ্যক লোকের সামাজিক উত্তরণ ঘটে এবং তাদের অনেকে অভিজাতশ্রেণির মর্যাদা লাভ করে।

অন্যদিকে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস পাওয়ায় নিম্নশ্রেণির অনেক শ্রমিক, কারিগর, শিল্পী, মুসলিম কারিগর ও শিল্পীদের সাথে একত্রিত হয়ে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিজেদেরকে যুক্ত করে। তাছাড়া গ্রামীণ কারিগর ও পেশাজীবীদের অনেকে এই সময়ে নতুন পেশায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে। এটাও মনে করা হয় যে, বিভিন্ন শিল্পের সাথে জড়িত কারিগর ও শিল্পীগণ রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভের প্রত্যাশায় এবং সমাজের নিপীড়িত ও অস্পৃশ্য শ্রেণির অসংখ্য মানুষ শাসকগণের ধর্ম গ্রহণ করে। শাসকগোষ্ঠী ও অপরাপর ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্থাপিত কারখানায় ও কুটির শিল্পে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কারিগর শ্রেণির কায়িক শ্রম লাঘব হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। নব প্রযুক্তির প্রয়োগে শিল্প কারখানার সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির পেশাজীবীদের কাজের জন্য উপযুক্ত ও নতুন পরিবেশের সূত্রপাত ঘটে।

বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। অর্থনৈতিক বিচারে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। গ্রামের ভূমি চাষনির্ভর শ্রেণিপেশার মধ্যে রায়, রায়ান, মুকাদ্দাম শ্রেণির লোকের জীবনমান পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে কৃষিজ

পণ্য বড় বড় শহরগুলোতে প্রেরিত হতো। অর্থাৎ কৃষকগণ এই সময় অনেক বেশি শহরমুখী হয়েছিল। নারীরা নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তারা সংসারের যাবতীয় কাজ, খামার সংশ্লিষ্ট কাজ এবং তাঁতশিল্পের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকত। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, কারিগর, কামার, কুমারসহ অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির প্রত্যেকের এক একটা জাত ব্যবসা নির্দিষ্ট ছিল এবং তারা কোনো না কোনোভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতো। গ্রামের এসব লোকের চাহিদা কম থাকায় অল্পতেই সন্তুষ্ট ছিল। তাদের জীবনযাপন ছিল অতি সাধারণ এবং কঠোর পরিশ্রমের পর দিনে তিনবেলা পেট পুড়ে খেতে পারলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কম থাকায় জীবনধারণের জন্যও খুব বেশি ব্যয় করতে হতো না। ফলে সাধারণ শ্রেণির শ্রমিকরাও ভালো খেতে ও সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারত।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতানী শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়ে ইকতা প্রথাভিত্তিক কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপিত করেছিল। বাংলায় কড়ির পরিবর্তে মানসম্মত মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে কুটির শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থানের পরিধিও বিস্তৃত হয়। এছাড়া কৃষিজপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, পূর্বের চেয়ে কম হারে রাজস্ব ধার্য করা হয়। মূলত সুলতানী আমল ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শহুরে অর্থনীতিতে উত্তরণের প্রক্রিয়া। বাংলার পরিচিতি গড়ে উঠেছিল আমলাতন্ত্রনির্ভর, রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল, উন্নত বস্ত্রের ভাণ্ডার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ, অর্থনৈতিক অগ্রগতির অঞ্চল হিসেবে। অন্যভাবে বলা যায় স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতি ও মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতিতে বাংলার রূপান্তর ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের আগমন এবং শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত উন্নয়নমূলক কার্যাবলির দ্বারা। মোগলামলে ইউরোপীয় বিভিন্ন কোম্পানি ও বণিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করে, সেই সঙ্গে তারা নিয়ে আসে নিজস্ব মুদ্রা। বাংলায় নানারকম মুদ্রার বিনিময় শুরু হয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে। যা বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ– সুলতানী বাংলার অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই মোগল শাসানাধীনে বাংলার সুবিন্যস্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

সুলতানী বাংলার স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা

১.১ সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্যে সুলতানী বাংলার প্রশাসনিক বিভাগ

ইকলিম
- ইকলিম মুয়াজ্জামাবাদ
- ইকলিম মোবারকাবাদ

আরসহ
- আরসহ সাজলা মানখাবাদ
- আরসহ মহরবাদ
- আরসহ হাদিগর
- আরসহ শ্রীহট্ট

শহর
- শহর লাউবেলা
- শহর শিমলাবাদ

থানা
- থানা লাইড়
- থানা লাউবেলা

মহল
- মহল মুয়াজ্জমপুর
- মহল হাদিড়গ
- মহল জোর বারোর

১.২ মুদ্রা থেকে প্রাপ্ত প্রশাসনিক বিভাগ

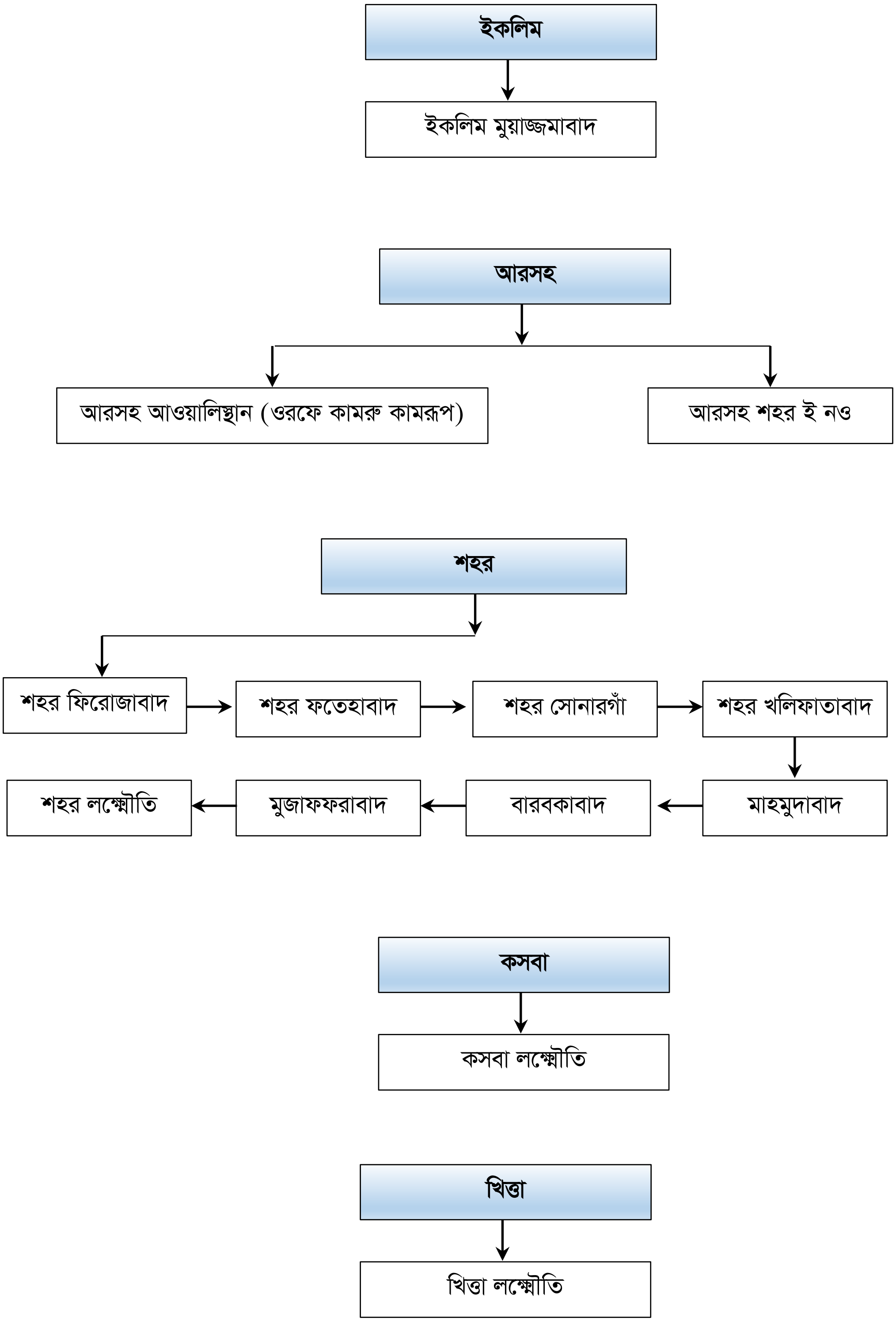

পরিশিষ্ট ২

জাও দ্যা বারোস-কৃত বাংলার ভূমি ও নদ-নদী, ১৫৫০

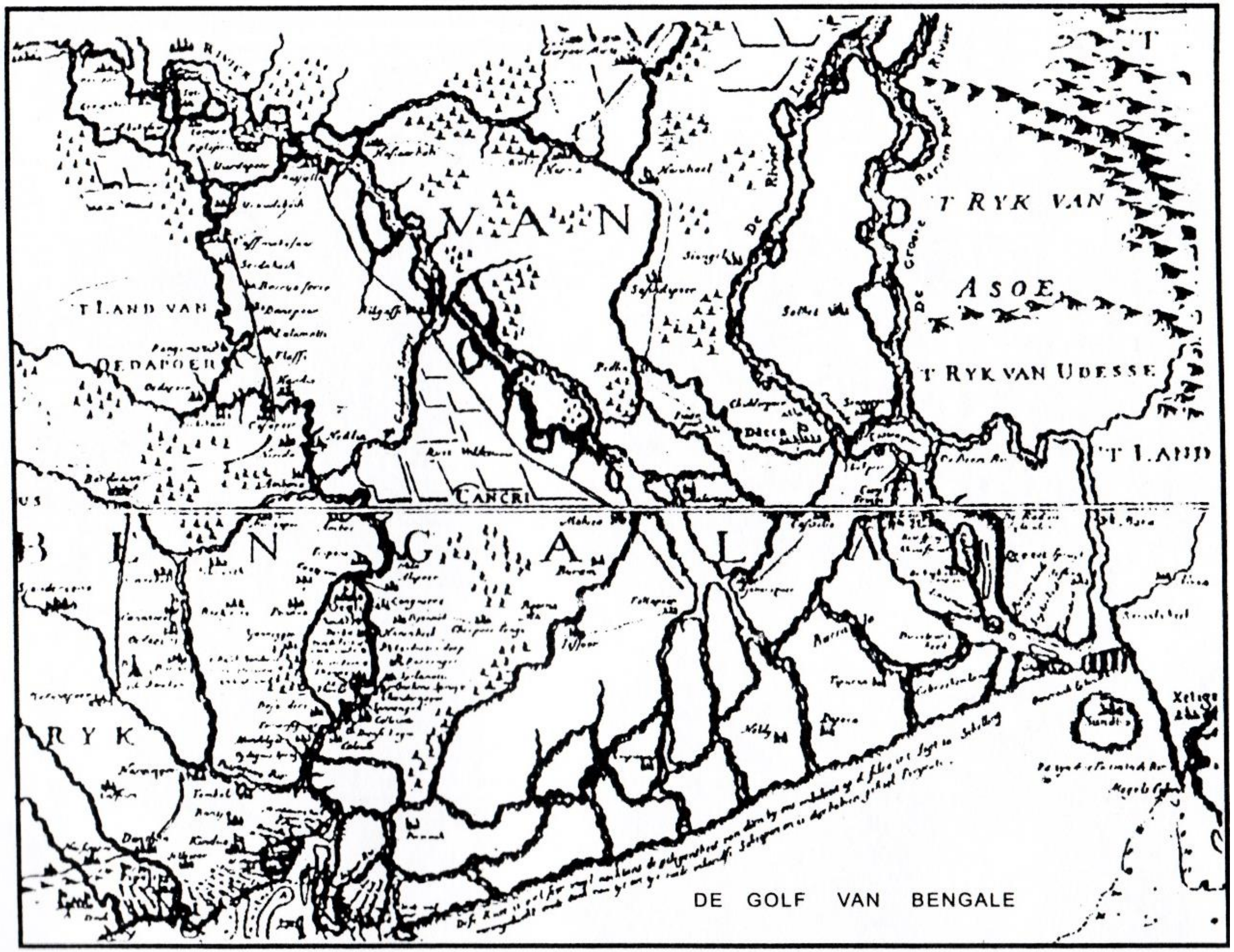

ফন্ ডেন ব্রোক-কৃত বাংলার ভূমি ও নদ-নদী, ১৬৬০

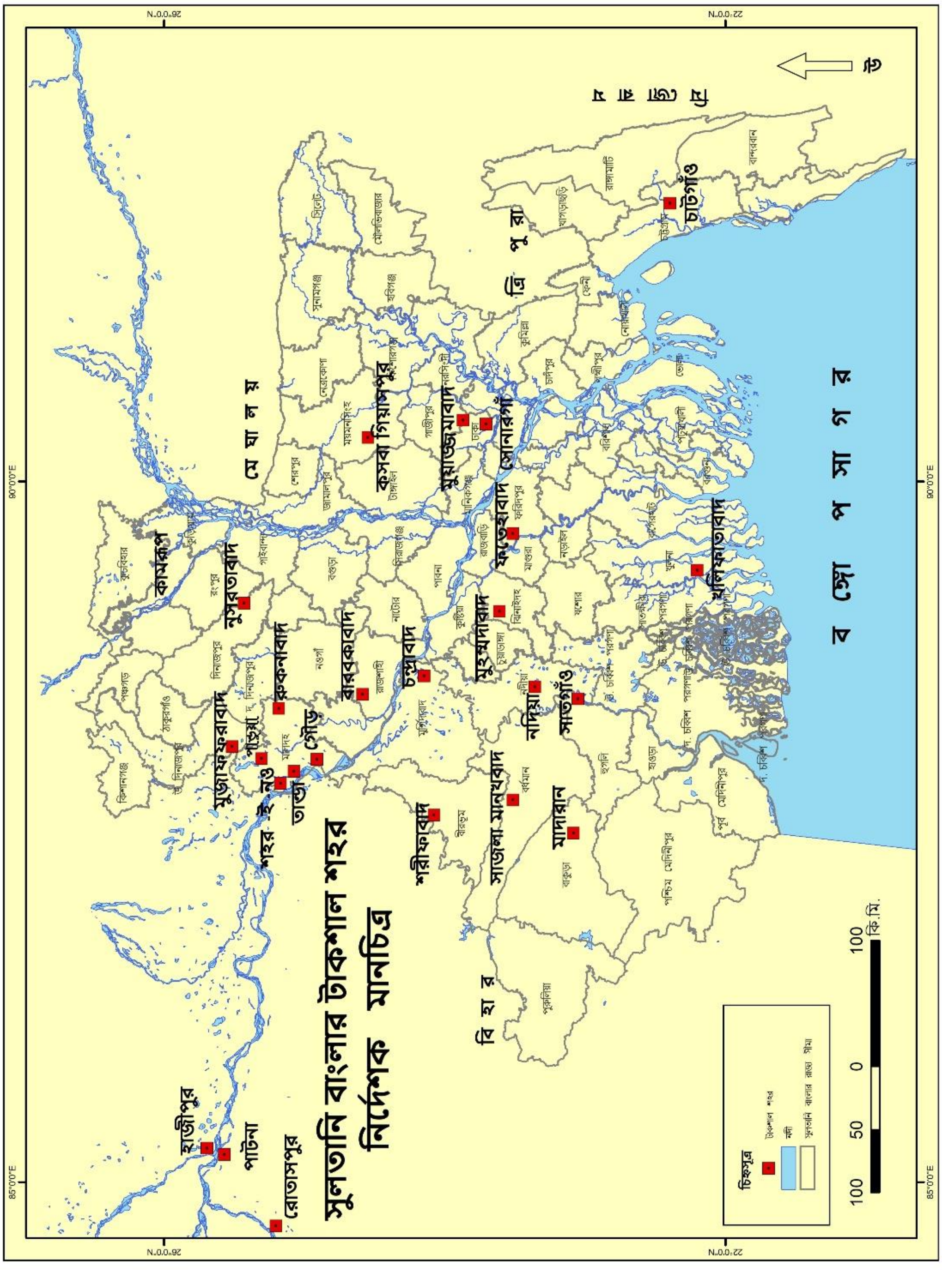

সুলতানি বাংলার টাকশাল শহর
নির্দেশক মানচিত্র
হাজীপুর
পাটনা
রোতাসপুর
শহর-ই-নও
তান্ডা
পান্ডুয়া
গৌড়
মুজাফফরাবাদ
রুকনাবাদ
বারবকাবাদ
নুসরতাবাদ
কামরূপ
চন্দ্রাবাদ
শরীফাবাদ
সাজলা মানখবাদ
মাদারান
নদিয়া
সাতগাঁও
মুহম্মদাবাদ
ফতেহাবাদ
সোনারগাঁও
মুআজ্জমাবাদ
কসবা গিয়াসপুর
চাটগাঁও
খলিফাতাবাদ
মেঘালয়
ত্রিপুরা
বিহার
বঙ্গোপসাগর
উ
চিহ্নসূত্র
টাকশাল শহর
নদী
সুলতানি বাংলার রাজ্য সীমা
100 50 0 100 কি.মি.
85°0'0"E
90°0'0"E
26°0'0"N
22°0'0"N

পরিশিষ্ট ৩

সিজার দা ফেডারিকের বিবরণের (১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ) অনুবাদ

পতুর্গিজদের হাতে নিহত চট্টগ্রামের এক গভর্ণর।

পর্তুগিজরা বাংলায় শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্যই করত না। তারা এদেশে বিভিন্নভাবে লুটতরাজ করত। মানুষকে হত্যাও করত। ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের পর্তুগিজদের ব্যাপারে সিজার দা ফেডারিকের বিবরণ অনেকটা কৌতুহল উদ্দীপক। Cf. *Hakluytus Posthumus Purchas, His Pilgrimes* by Samuel Purchas vol. 10, pp. 137-138 Glasgow, M C M V.

"বাংলার অধীন এই স্থানের নাম সন্দ্বীপ। চট্টগ্রাম থেকে এর দূরত্ব ১২০ মাইল। এখানকার মানুষ মুসলমান এবং এর মুসলিম রাজা অত্যন্ত ভালো মানুষ। তিনি স্বৈরাচারী হলে আমাদের সবাইকে নিশ্চয়ই লুটে নিতেন। কারণ চট্টগ্রামের পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন তখন রাজার স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে লড়াই করছে। প্রতিদিন খুনাখুনি হয়। স্থানীয় গভর্ণর আমাদের ভীত না হওয়ার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের পর্তুগিজরা শহরের গভর্ণরকে হত্যা করে এবং দাবী করে যে তারা হত্যার জন্য দায়ী নয়।"
J.J.A Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, Butterworth & Co. Bell Yard, London, 1919, p. 269

পরিশিষ্ট ৪

৪.১: সুলতানী শাসনাধীনে বাংলায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন টাকশালে তৈরি প্রতীক মুদ্রার চিত্র।

স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

স্বর্ণ মুদ্রা (১২৫৪-৫৮ খ্রি.) মুগিসুদ্দীন ইউজবক

মুদ্রা (১২৯১-১৩০১ খ্রি.) রুকনুদ্দিন কায়কাউস

মুদ্রা (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) শামসুদ্দিন ফিরুয শাহ

মুদ্রা (১২৩৮-১৩৪৯ খ্রি.) ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

মুদ্রা (৭৯২-৮১৩ হি.) গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (৭৪৪-৭৫৮ হি.) সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (১৪৯৪-১৫১৯ খ্রি.) সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (১৫৩৮-১৫৪৫ খ্রি.) শেরশাহ

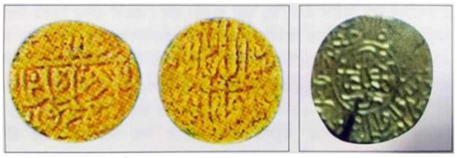
স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (১৬ শতক) সম্রাট হুমায়ুন

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) সম্রাট আকবর

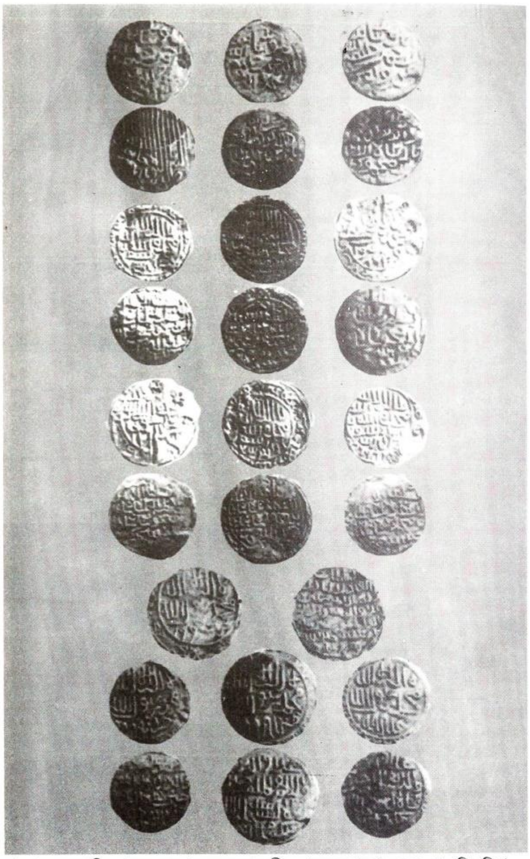

বাংলার সুলতানি আমলের মুদ্রা রুকন আল-দীন বারবক শাহ (৮৬৪-৮৭৯ হিজরি / ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ) আলা আল-দীন হুসাইন শাহ ৮৯৯-৯২৫ হিজরি / ১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)

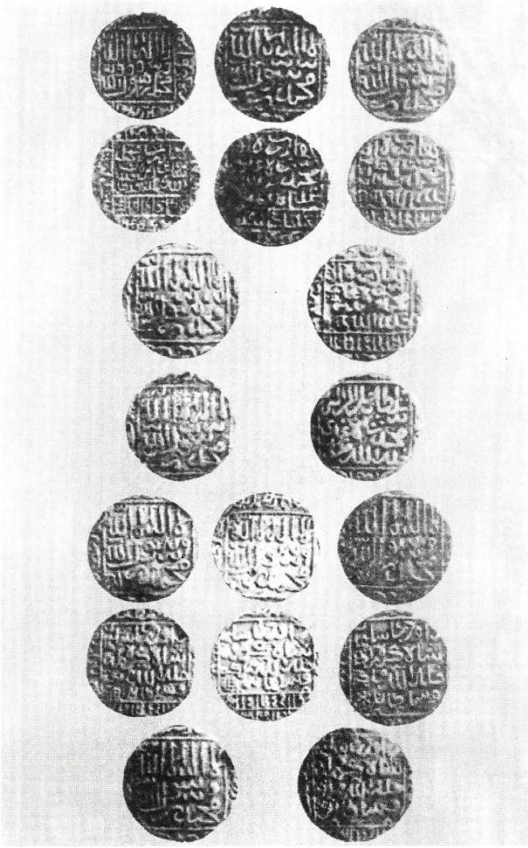

বাংলার সুলতানি আমলের মুদ্রা বাহাদুর শাহ শুর (৯৬২-৯৬৮ হিজরি / ১৫৫৫-১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ) দাউদ শাহ কররানী ৯৮০-৯৮৪ হিজরি / ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

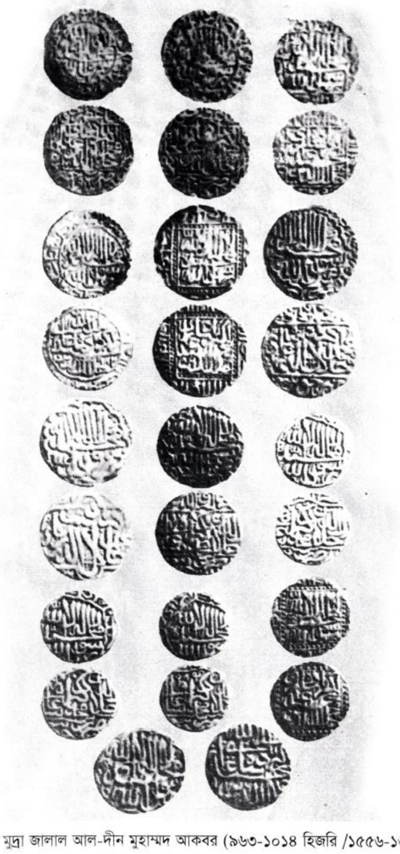

মোগল মুদ্রা জালাল আল-দীন মুহাম্মদ আকবর (৯৬৩-১০১৪ হিজরি /১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ)

মোগল মুদ্রা জালাল আল-দীন মুহাম্মদ আকবর (৯৬৩-১০১৪ হিজরি /১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ)

৪.২: বাংলার সুলতানগণ কর্তৃক জারীকৃত কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার তালিকা-

ক্রমিক নং	সুলতানের নাম	মুদ্রার নাম/ ধাতু	টাকশালের নাম	মুদ্রা প্রবর্তনের হিজরি সন/খ্রি.	ওজন গ্রেন
১	ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি	স্বর্ণ মুদ্রা	গৌড়	৬০১ হি/ ১২০৪ খ্রি.	১৭২ গ্রেন
২	গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি	রৌপ্য মুদ্রা	-	৬০৭ হি/ ১২১০ খ্রি.	১৫৬.৫
৩	মুগিসউদ্দিন ইউজবক	”	লখনৌতি	৬৫৩ হি./ ১২৫৬ খ্রি.	১৬৮
৪	রুকনউদ্দিন কায়কাউস	”	লখনৌতি	৬৯১ হি./ ১২৯১ খ্রি.	১৭১
৫	শামসউদ্দিন ফিরোজশাহ	স্বর্ণ মুদ্রা	-	অস্পষ্ট	১৭০
৬	শামসউদ্দিন ফিরোজশাহ	রৌপ্য মুদ্রা	লখনৌতি	৭২০হি./ ১৩২০ খ্রি.	১৬৮.৫
৭	নাসিরউদ্দিন বুগরা খান	”	লখনৌতি	৭১৮ হি./ ১৩৫৮খ্রি.	১৬৮.৫
৮	গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ	”	লখনৌতি	অস্পষ্ট	১৬৫
৯	ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৪৫হি./ ১৩৪৪খ্রি.	১৬৭
১০	ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৪৭হি./ ১৩৪৬ খ্রি.	১৬৮
১১	ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৪৮ হি./ ১৩৪৭ খ্রি.	১৬২.৫
১২	ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৪৯ হি./ ১৩৪৮ খ্রি.	১৬৩.৫
১৩	ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫১ হি./ ১৩৫০ খ্রি.	১৬৬
১৪	আলাউদ্দিন আলী শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৪৩ হি./ ১৩৪২ খ্রি.	১৬৮
১৫	আলাউদ্দিন আলী শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৪৪ হি./ ১৩৪৩ খ্রি.	১৬৮
১৬	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	স্বর্ণ মুদ্রা	-	অস্পষ্ট	১৬৬
১৭	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	ফিরোজাবাদ	৭৫৪ হি./ ১৩৫৩ খ্রি.	১৬৪
১৮	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	ফিরোজাবাদ	৭৫৪ হি./ ১৩৫৩ খ্রি.	১৬৮
১৯	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৫৭ হি./ ১৩৫৬ খ্রি.	১৬৭
২০	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৫৩ হি./ ১৩৫২ খ্রি.	১৬৫.৫
২১	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৫৮ হি./ ১৩৫৬ খ্রি.	১৬৪.১
২২	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫৫ হি./ ১৩৫৪ খ্রি.	১৬৭
২৩	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫৮ হি./ ১৩৫৬ খ্রি.	১৬৬
২৪	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫৪ হি./ ১৩৫৩ খ্রি.	১৬৭.৫

২৫	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	শহর-ই নও	অস্পষ্ট	১৬৬
২৬	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৫৪ হি./ ১৩৫৩ খ্রি.	১৬৪
২৭	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ	”	শহর-ই নও	অস্পষ্ট	১৬৬
২৮	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৫৯ হি./ ১৩৫৭ খ্রি.	১৬৬.৫
২৯	সিকান্দার শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫৯ হি./ ১৩৫৭ খ্রি.	১৬৭
৩০	সিকান্দার শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৬০ হি./ ১৩৫৮ খ্রি.	১৬৫
৩১	সিকান্দার শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৮৪ হি./ ১৩৮২ খ্রি.	১৬৫
৩২	সিকান্দার শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৬০ হি./ ১৩৫৮ খ্রি.	১৬২
৩৩	সিকান্দার শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৬১ হি./ ১৩৫৯ খ্রি.	১৬৬.৫
৩৪	সিকান্দার শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৬৪ হি./ ১৩৬২ খ্রি.	১৬৩
৩৫	সিকান্দার শাহ	”	-	অস্পষ্ট	১৬৮.৫
৩৬	সিকান্দার শাহ	”	-	অস্পষ্ট	১৫৩
৩৭	সিকান্দার শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	ফিরোজাবাদ	৭৬৪ হি./ ১৩৬২ খ্রি.	১৬৩
৩৮	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৭১ হি./ ১৩৫৯ খ্রি.	১৫৮
৩৯	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৭৭ হি./ ১৩৭৫ খ্রি.	১৬৫
৪০	সিকান্দার শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৭৭ হি./ ১৩৭৫ খ্রি.	১৫৮
৪১	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৮১ হি./ ১৩৭৯ খ্রি.	১৬৬.৫
৪২	সিকান্দার শাহ	”	-	৭৮৭ হি./ ১৩৮৫ খ্রি.	১৬৫
৪৩	সিকান্দার শাহ	”	শহর-ই নও	৭৮১ হি./ ১৩৭৯ খ্রি.	১৬২
৪৪	সিকান্দার শাহ	”	সাতগাঁও	৭৮১ হি./ ১৩৭৯ খ্রি.	১৬৭
৪৫	সিকান্দার শাহ	”	সাতগাঁও	৭৮২ হি./ ১৩৮০ খ্রি.	১৬৬
৪৬	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৬৭ হি./ ১৩৬৫ খ্রি.	১৬৬.৫
৪৭	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৮২ হি./ ১৩৮০ খ্রি.	১৬৫.৫
৪৮	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৮৩ হি./ ১৩৮১ খ্রি.	১৫৪
৪৯	সিকান্দার শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৮৬ হি./ ১৩৮৪ খ্রি.	১৬৭
৫০	সিকান্দার শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫৮ হি./ ১৩৫৬ খ্রি.	১৬৪.৫
৫১	সিকান্দার শাহ	”	সোনারগাঁও	৭৫৯ হি./ ১৩৫৭ খ্রি.	১৬৮

৫২	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৯১ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.	১৬৫
৫৩	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৯১ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.	১৬৭
৫৪	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৯৩ হি./ ১৩৯০ খ্রি.	১৬৫
৫৫	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৮৮ হি./ ১৩৮৬ খ্রি.	১৫৮
৫৬	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৭৯৩ হি./ ১৩৯০ খ্রি.	১৬৬.৫
৫৭	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৯৩ হি./ ১৩৯০ খ্রি.	১৬৫
৫৮	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৭৬ হি./ ১৩৭৪ খ্রি.	১৬৫
৫৯	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	জান্নাতাবাদ	৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.	১৬৪
৬০	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	সাতগাঁও	৭৯৮ হি./ ১৩৯৫ খ্রি.	১৬৬
৬১	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	সাতগাঁও	৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.	১৬৩
৬২	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	৭৯৯ হি./ ১৩৯৬ খ্রি.	১৬৬.৫
৬৩	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	”	সাতগাঁও	৭৯৬ হি./ ১৩৯৩ খ্রি.	১৬৬
৬৪	সাইফউদ্দিন হামজা শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৮১৩ হি./ ১৪১০ খ্রি.	১৬৪
৬৫	শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৮১৭ হি./ ১৪১৪ খ্রি.	১৬৭
৬৬	শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৮১৬ হি./ ১৪১৩ খ্রি.	১৬৩
৬৭	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৮১৮ হি./ ১৪১৫ খ্রি.	১৬৩.৮
৬৮	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৮২২ হি./ ১৪১৯ খ্রি.	১৬৬
৬৯	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	সাতগাঁও	৮২১ হি./ ১৪১৮ খ্রি.	১৫৫.৫
৭০	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	সাতগাঁও	৮২১ হি./ ১৪১৮ খ্রি.	১৫৪
৭১	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	মুয়াজ্জমাবাদ	অস্পষ্ট	১৬৬
৭২	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	-	৮১৮ হি./ ১৪১৫ খ্রি.	১৬৬
৭৩	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	-	অস্পষ্ট	১৫৮
৭৪	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	ফতেহাবাদ	৮৪০ হি./ ১৪৩৬ খ্রি.	১৬১
৭৫	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	-	অস্পষ্ট	১৬৮
৭৬	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	-	৮২১ হি./ ১৪১৮ খ্রি.	১৬৬
৭৭	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	ফিরোজাবাদ	৮৩৪ হি./ ১৪৩০ খ্রি.	১৬৪.৫
৭৮	জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ	”	চাটগাঁ	৮৩৪ হি./ ১৪৩০ খ্রি.	১৬৫

৭৯	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ	”	-	৮৪৮ হি./ ১৪৪৪ খ্রি.	১৬২.৫
৮০	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ	”	মাহমুদাবাদ	৮৫৮ হি./ ১৪৫৪ খ্রি.	১৬৫
৮১	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ	”	নুসারাতাবাদ	৮৬২ হি./ ১৪৫৭ খ্রি.	১৬৬
৮২	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	”	খাজানাহ	৮৬৪ হি./ ১৪৫৯ খ্রি.	১৬৪
৮৩	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	”	খাজানাহ	৮৬৭ হি./ ১৪৬২ খ্রি.	১৬৩
৮৪	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	”	খাজানাহ	৮৬৮ হি./ ১৪৬৩ খ্রি.	১৬৫
৮৫	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	”	খাজানাহ	৮৬৪ হি./ ১৪৫৯ খ্রি.	১৬৬
৮৬	সাইফউদ্দিন ইউসুফ শাহ	”	খাজানাহ	৮৮১ হি./ ১৪৫৬ খ্রি.	১৫৮
৮৭	জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ	স্বর্ণ মুদ্রা	খাজানাহ	৮৮৭ হি./ ১৪৮২ খ্রি.	১৬০
৮৮	জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	ফতেহাবাদ	৮৮৬ হি./ ১৪৮১ খ্রি.	১৫৯
৮৯	জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	ফতেহাবাদ	৮৮৬ হি./ ১৪৮১ খ্রি.	১৭৩
৯০	জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ	”	মুহাম্মদাবাদ	৮৯০ হি./ ১৪৮৫ খ্রি.	১৬২
৯১	সাইফউদ্দিন ফিরোজশাহ	”	ফতেহাবাদ	৮৯৩ হি./ ১৪৮৭ খ্রি	১৬৪
৯২	সাইফউদ্দিন ফিরোজশাহ	”	খাজানাহ	৮৯৩ হি./ ১৪৮৭ খ্রি.	১১৩
৯৩	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ২য়	”	-	অস্পষ্ট	১৬৬
৯৪	শামসউদ্দিন মোজাফফর শাহ	”	বারবকাবাদ	৮৯৬ হি./ ১৪৯০ খ্রি	১৬৫
৯৫	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	স্বর্ণ মুদ্রা	খাজানাহ	৮৯৯ হি./ ১৪৯৩ খ্রি.	১৬৩.৫
৯৬	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	স্বর্ণ মুদ্রা	মুয়াজ্জমাবাদ	৯০৭ হি./ ১৫০১ খ্রি.	১৬৪.৫
৯৭	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	ফতেহাবাদ	৮৯৯ হি./ ১৪৯৩ খ্রি.	১৫৫
৯৮	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	খাজানাহ	৯০৫ হি./ ১৪৯৯ খ্রি.	১৬৩
৯৯	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	হুসাইনাবাদ	৯১৯ হি./ ১৫১৩ খ্রি.	১৬৩
১০০	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	রৌপ্য মুদ্রা	মুয়াজ্জমাবাদ	৯০৭ হি,/ ১৫০১ খ্রি.	১৬৩
১০১	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	”	খাজানাহ	৯০৭ হি./ ১৫০১ খ্রি.	১৬৪.৫
১০২	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	”	মুহাম্মদাবাদ	৯০০ হি./ ১৪৯৪ খ্রি.	১৬৪
১০৩	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	”	খলিফাতাবাদ	৯২৫ হি./ ১৫১৯ খ্রি.	১৬৪
১০৪	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	”	হুসাইনাবাদ	৯২৫ হি./ ১৫১৯ খ্রি.	১৬১
১০৫	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	”	নুসরাতাবাদ	৯২৭ হি./ ১৫২০ খ্রি.	১৬৪

১০৬	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	”	খলিফাতাবাদ	৯২২ হি./ ১৫১৬ খ্রি.	১৬৩.৫
১০৭	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	”	হুসাইনাবাদ	৯২৫ হি./ ১৫১৯ খ্রি.	১৪৮
১০৮	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ	”	মুহাম্মদাবাদ	৯৩৪ হি./ ১৫২৭ খ্রি.	১৬৩
১০৯	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	”	হুসাইনাবাদ	৯৩৯ হি./ ১৫৩২ খ্রি.	১৬৪
১১০	গিয়াসউদ্দিন শাহমুদ শাহ ৩য়	”	হুসাইনাবাদ	৯৩৯ হি./ ১৫৩২ খ্রি.	১৬৩
১১১	গিয়াসউদ্দিন শাহমুদ শাহ ৩য়	”	খলিফাতাবাদ	৯৪২ হি./ ১৫৩৫ খ্রি.	১৬৮
১১২	শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ গাজী	”	আরাকান	৯৬২ হি./ ১৫৫৪ খ্রি.	১৭৮.৫
১১৩	গিয়াউদ্দিন বাহাদুর শাহ ২য়	”	”	৯৬৪ হি./ ১৫৫৬ খ্রি.	১৭৪
১১৪	গিয়াউদ্দিন বাহাদুর শাহ ২য়	”	”	৯৬৬হি./১৫৫৮ খ্রি.	১৭৪.২

Ref. H. Nelson Wright, *Catalogue of the Coins in the Indian Museum Calcutta including the Cabinet of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. II, Clarendon Press, Oxford, 1907, pp.145-181; Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal (down to A.D. 1538),* Dacca, 1960, pp.18-130

পরিশিষ্ট ৫

৫.১ টাকশালে মুদ্রা তৈরিরত কারিগর

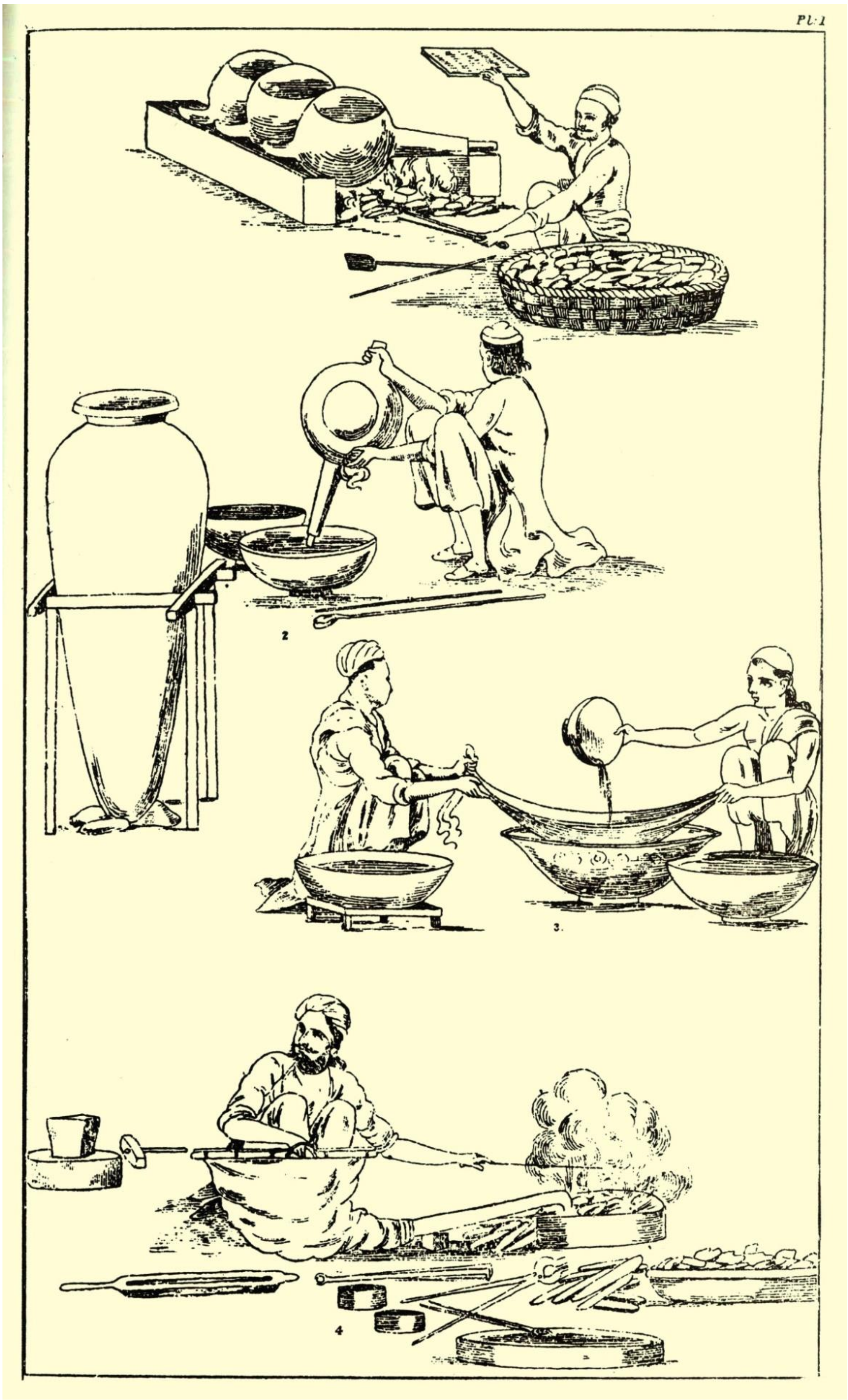

Pl. II

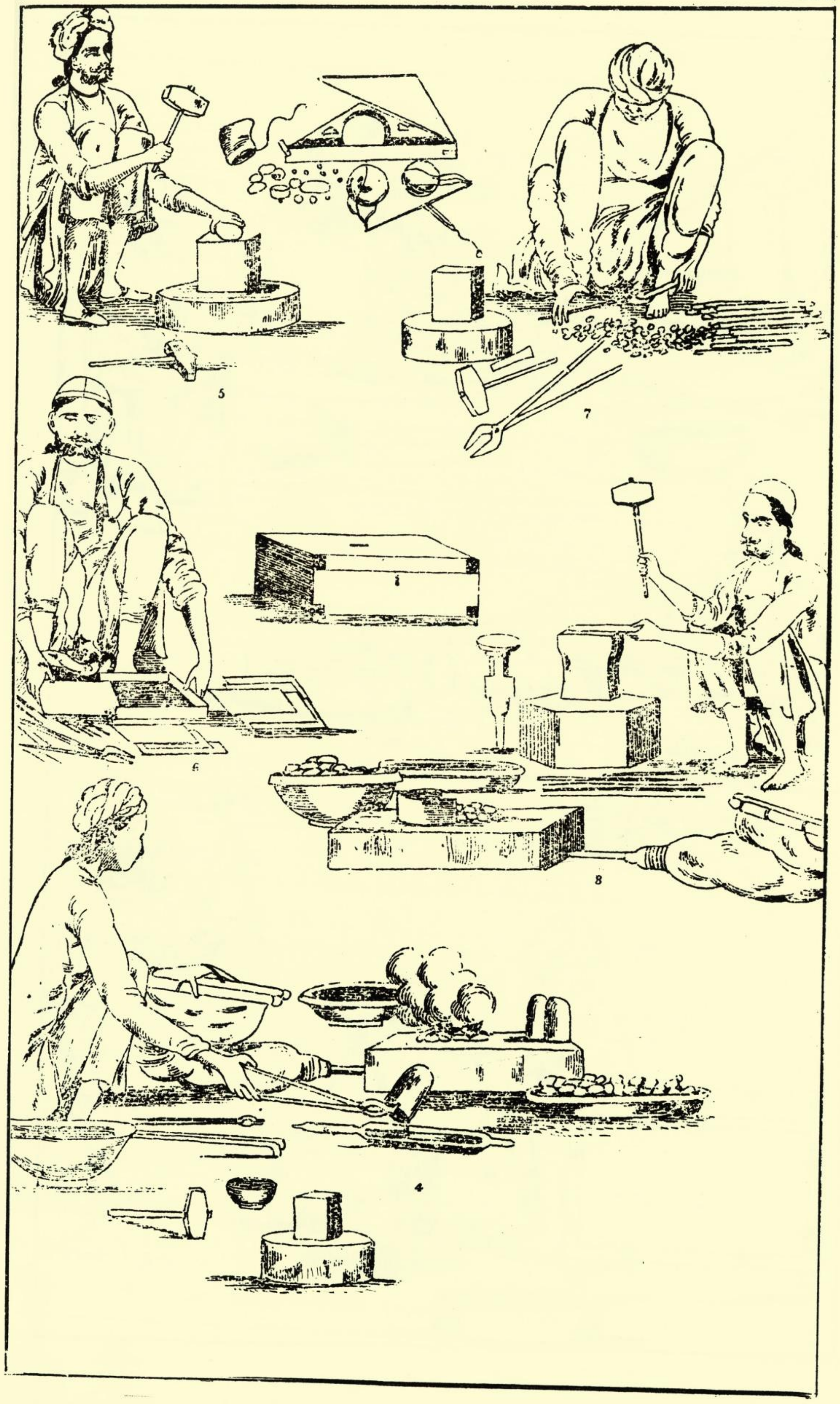

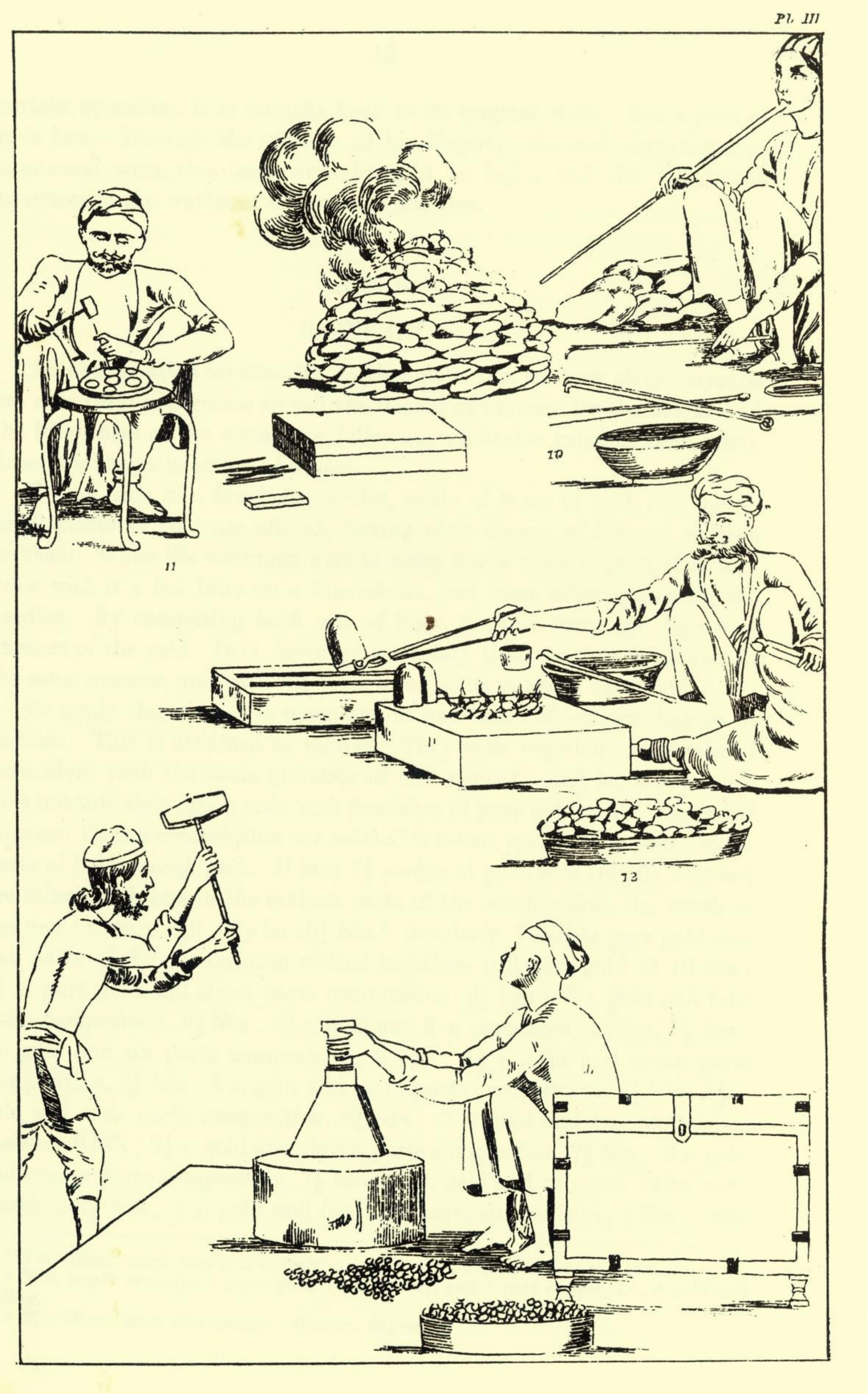

Abul-Fazl Allami, The Ain-I-Akbari, vol, 1, pp.18-19

পরিশিষ্ট ৬

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ভূমি রাজস্ব। সমগ্র বাংলায় ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ছিল এবং সরকারের নির্দেশে নিয়মিত ভূমি রাজস্ব আদায় হতো এর প্রমাণ পাওয়া যায় আবুল ফজলের *আইন ই আকবরী* বিবরণ থেকে।

MAHALS OF LAKHNAUTI

Sarkār of Jannatābād or Lakhnauti.
66 *Mahals*. Rev. 18,846,967 *Dāms*.

Castes *Kāyaths* and *Brahmans*. Cavalry 500.
Infantry, 17,000.

	Dāms.
Jannatābād, commonly known as Gaur. It has been a brick fort	7,869,202
Adjacent villages of Ākrā forming 14 *Parganahs* as follows : ...	1,573,296
Ajor ...	138,925
Bāzkhokrā ...	192,508
Baler ...	127,060
Ākra suburban district ...	211,260
Dhanpur ...	140,340
Deviya ...	112,208
Serhwar[1] ...	71,000
Shāhbālā ...	98,400
Shāhlalsari ...	8,000
Khektar ...	50,200
Madnāwāti ...	151,890
Modihāt ...	6,980
Nāhat ...	242,710
Hashtganjpur ...	28,515
Adjacent villages of Darsarak 16 *mahals* as follows : ...	2,009,344
Achārikhānah where they sell undried ginger	7,800
Bhatiya ...	826,432
Belbāri ...	91,560
Bāzāri Kadim (Old Bāzār) ...	3,720

	Dāms.
Darsarak ...	62,835
Rāngāmāti ...	3,200
Sāir duties from Gangapat and neighbourhood of Hindui† ...	170,800
Sherpur and Gangalpur 2 *mahals*	2,000
Shāhbāzpur within the city ...	400
Ghiyāspur ...	41,920
Kamalā ...	16,377
Kāṭhachhāpā ...	12,000
Modi Mahal ...	13,000
Mewa Mahal ...	360
Duties from the New Market ...	11,760
Adjacent villages of Dihikot 7 *mahals* ...	869,000
Barāripinjar ...	698,900
Pākor ...	37,720
Dihikot ...	31,624
Dahlgāon ...	130,320
Shāhzādahpur ...	84,360
Māligāon ...	141,460
Modipur ...	61,880
Adjacent villages of Ramrauti 7 *mahals* ...	749.795
Badhtahli ...	207.500
Rāmauti ...	194,767
Selghariya ...	103,000
Sangkalkarā ...	93,320

	Dāms.
Sultānpur ...	29,210
Sangdwār ...	14,447
Māhinagar ...	107,550
Adjacent villages of Sarsābād rev. of 10 *mahals*	13,192,377
Akbarpur ...	9,736
Pārdiyār ...	85,280
Khizrpur ...	396,100
Sarsābād ...	553,080
Kotwāli ...	788,427
Garhand ...	334,880
Garhi ...	200,000
Makrāin ...	106,480
Manikpur and Hatanda, 2 *mahals*	630,770

Adjacent villages of Māldah, 11 *mahls*.
Bārbakpur, Bāzār i Yusuf, Suburban district of Māldah, Dherpur, Sujāpur, Sarbādahlpur, Sankodiya, Shālesari, Shāhmandawi, Fathpur, Mui'zzu'ddinpur.

Sarkār of Chorāghāt.

84 *mahals*. Rev. 8,083,072½ *dāms*.

Castes, various. Cavalry, 900. Elephants, 50.
Infantry, 32,800.

	Dāms.
Adhwā ...	91,292
Andhar ...	75,010
Andalgāon ...	154,337
Anwarbān ...	31,022
Ālgāon ...	171,695
Ambathurā, Abthurā	25,326
Āhmadābād ...	18,517
Anbalāgāchhi ...	9,200
Anwar Malik ...	8,020
Āl Hāt ...	7,508
Ilāhdādpur ...	2,190
Bāzu Zafar Shāhi, 2 mahals ...	735,835
Bāzu Faulād Shāhi	711,412
Bāgdwār ...	102,440
Phulbāri ...	6,580
Bārbakpur ...	84,952
Bāmanpur ...	349,070
Town of Nasratābād ...	336,445
Barsalā ...	233,680
Bari Sābakbālā	146,767
,, Ghorāghāt	165,827
Bāyazidpur ...	144,227
Pātāldeh ...	41,365
Bālkā ...	30,335
Bholi ...	12,040
Bājpatāri ...	7,900
Banwārkājar ...	4,452
Belghāti ...	3,245
Bāzār Chhatāghāt	387
Palāsbāri[1] ...	
Panch Mālka ...	5,340
Tulsighāt ...	164,340
Taalluq Husain	35,410
,, Bālnāth	27,962
,, Siwān	15,490
,, Kasāi	15,267
Tāchahal ...	8,290
Taalluq Ahmad Khān ...	238,475
Hāmilā ...	6,580
Khairābādi ...	5,602
Khāsbāri ...	2,735
Rungpur [Ruknpur]	10,950
Sultānpur ...	108,377
Sikhshahar[2] ...	93,071
Sāthipur ...	49,570
Sirhata ...	344,097
Sabdi ...	206,224
Sitpur ...	128,775
Siriyā Kāndi ...	24,622
Sāghāt ...	16,412
Sherpur Koibāri (S. Kafurā) ...	15,675
Fathpur ...	353,355

Sarkār of Ghorāghāt—Contd.

	Dāms.		*Dāms.*
Khetāri ...	1,344,280	Korā, receipts from Zakāt ...	18,000
Gayapur ...	107,205	Kokaran ...	13,120
Kābulpur ...	98,465	Kābul ...	11,690
Ganj Sākhmālā	98,465	Garhiya ...	10,980
Khadkhadi ...	81,565	Gokanpārā ...	9,850
Gokul ...	56,865	Magatpur ...	124,005
Kothi Bāri 2 *mahals*	48,807	Muhabbatpur ...	46,512
Khalsi ...	264,322	Musjid Husain Shāhi	28,945
Kandibāri ...	125,797	,, Andarkhāni	3,447
Kuli Bāzār, commonly Jorpuri	115,680	Malāir ...	24,800
Gobindpur Akhand	40,675	Nandahra ...	61,050
Kanhtāl[3] ...	40,367	Naupāra ...	19,202
Kanak Sakhar ...	28,065	Nahajaun Bātor	49,010
Ghātnagar ...	27,922	Wakar Hazir ...	30,646
Kawā Gāchhi ...	24,600	Wachhi ...	16,832
Kālibāri ...	24,847	Wahrib ...	4,230

Sarkār of Sonārgāon.

52 *mahals*. Rev. 10,331,333 *dāms*.

Castes, various. Cavalry, 1,500. Elephants, 200. Infantry, 46,000.

	Dāms.		*Dāms.*
Uttar Shāhpur	388,442	Chhokhandi, from shop dues ...	17,827
Āl Jihāt ...	53,090	Chand Bāzār ...	30,322
Uttar Usmānpur	24,880	Chāndpur ...	120,000
Bikrampur ...	3,335,052	Suburban district of Sonārgāon with city ...	459,532
Bhulwā-jowār ...	1,331,480	Khizrpur ...	40,308
Baldākhāl ...	694,090	Dohār ...	458,524
Bawāliyā ...	237,320	Dānderā ...	421,380
Barchandi ...	120,100	Dakhin Shāhpur	239,910
Bāth Karā ...	4,080	Dilāwarpur : receipts from *zakāt*	127,207
Palās-ghāti, &c.	43,265	Dakhin Usmānpur	8,840
Baradiyā ...	19,000	Rāepur ...	4,535
Phulari ...	19,000	Sekhargāon ...	340,365
Pānhatta ...	7,367	Sakri ...	184,780
Torā ...	104,910	Salimpur ...	91,090
Tājpur ...	60,000		
Tarki ...	18,270		
Jogidiyā ...	512,080		
Environs of Port	82,632		

Sarkār of Sonārgāon—Contd.

	Dāms.
Sālisari with produce and piscary of rivers, tanks, &c., *raiyati** and the like ...	40,724
Sakhwā from *raiyati*	280,000
,, ,, *sāir* dues	28,000
Sakhādia ...	28,000
Sejoāl† ...	13,000
Shamspur ...	22,000
Kerāpur ...	293,402
Gardi ...	89,590
Kārtikpur ...	80,000
Khāndi ...	40,140

	Dāms.
Kothri (Kothari)	35,160
Gāthi Nadhi (G. Danai) ...	20,000
Mehrkol ...	1,039,470
Muazzampur ...	236,830
Mehār ...	60,800
Manoharpur ...	53,301
Mahijāl ...	25,000
Narāenpur, from *sāir* dues, *zakāt* and *raiyati* ...	940,760
Nāwākot ...	16,080
Hamtā Bāzu ...	281,280
Hāt Ghāti ...	10,285

Sarkār of Sātgāon.

53 *mahals*. Rev. 16,724,724 *dāms*.

Castes, various. Cavalry, 50. Infantry, 6,000.

	Dāms.
Banwa, Kotwāli, Farāsatghar,(?) 3 *mahals* ...	1,540,770
Ukrā ...	726,360
Anwarpur ...	236,950
Arsa Tāwāli† Sātgāon 2 *mahals*	234,890
Akbārpur ...	115,590
Bodhan ...	956,457
Panwān and Salimpur ...	952,505
Purah ...	652,470
Barmhattar and Mānikhatti ...	383,803
Belgāon ...	233,602
Bālindā ...	125,250
Bāgwān and Bangābāri ...	100,000
Baliyā ...	94,725
Phalkā ...	38,245
Baridhati ...	25,027
Tortariyā ...	36,604
Haveli Shahr ...	502,330
Husainpur ...	324,322
Hājipur, Bārbakpur, 2 *mahals*	142,592
Dhuliyāpur ...	78,815
Ranihāt ...	1,358,510

	Dāms.
Sādghāti ...	468,058
Sakotā ...	204,072
Srirājpur ...	125,792
Sāir dues from Bandarbān and Mandawi, 2 *mahals* ...	1,200,000
Sākhāt, Kātsāl, 2 *mahals* ...	45,757
Fāthpur ...	80,702
Calcutta, Bakoya†† Bārbakpur, 3 *mahals* ...	936,215
Khārar ...	365,275
Kandāliyā ...	242,160
Kalaruā ...	197,522
Magrā ...	801,302
Matiyāri ...	307,845
Medni Mal ...	186,242
Muzaffarpur ...	108,332
Mundāgāchhā ...	98,565
Nāhihatti ...	49,935
Nadiya and Sāntipur, 2 *mahals*	1,508,820
Helki ...	90,042
Hāthi Kandhā ...	55,702
Hatiyāgarh ...	781,360

Abul Fazl, *op.cit.*, vol. 2, pp. 134-141

পরিশিষ্ট ৭

স্থাপত্য প্রতিটি দেশের অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে। সুলতানী আমলের প্রযুক্তির ব্যবহার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কতিপয় নিদর্শন।

৭.১ বাঘা মসজিদ ও মাদরাসা (১৫২৩-২৪ খ্রি.) রাজশাহী

৭.২ দরাসবাড়ী মাদরাসা (১৫০৩-১৫০৪ খ্রি.) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৭.৩ ষাটগম্বুজ মসজিদ (আনু. ১৪৫৯) বাগেরহাট

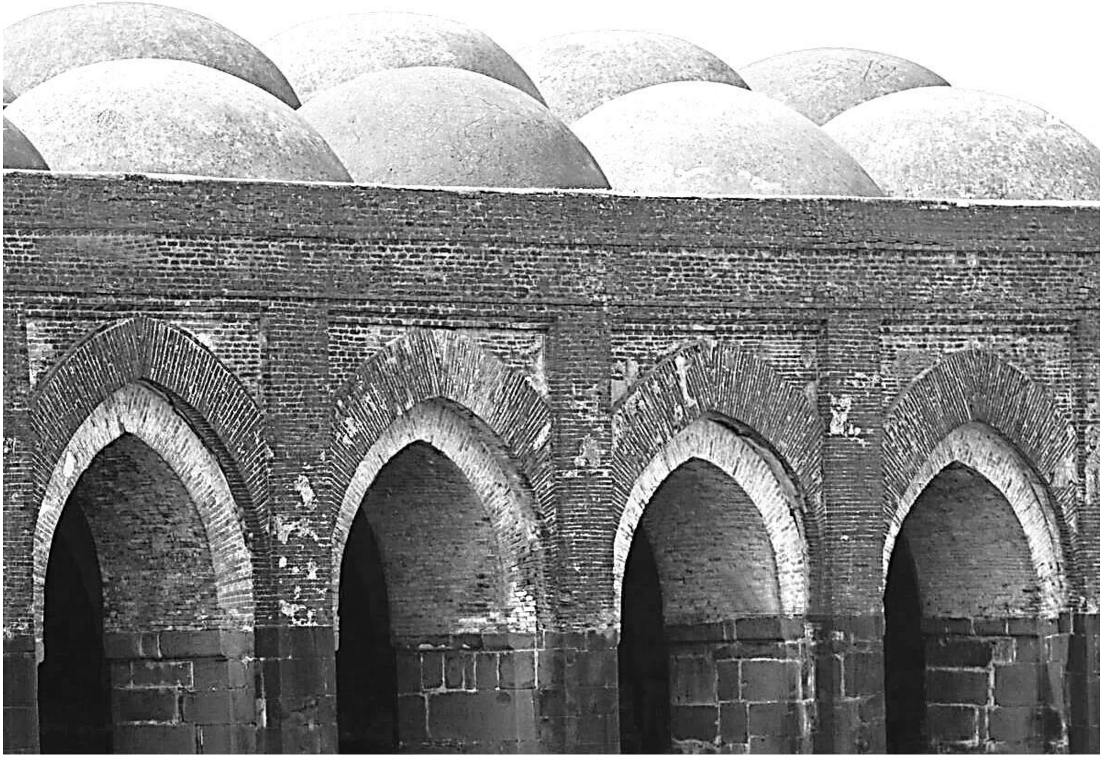

৭.৩ আদিনা মসজিদ পান্ডুয়া

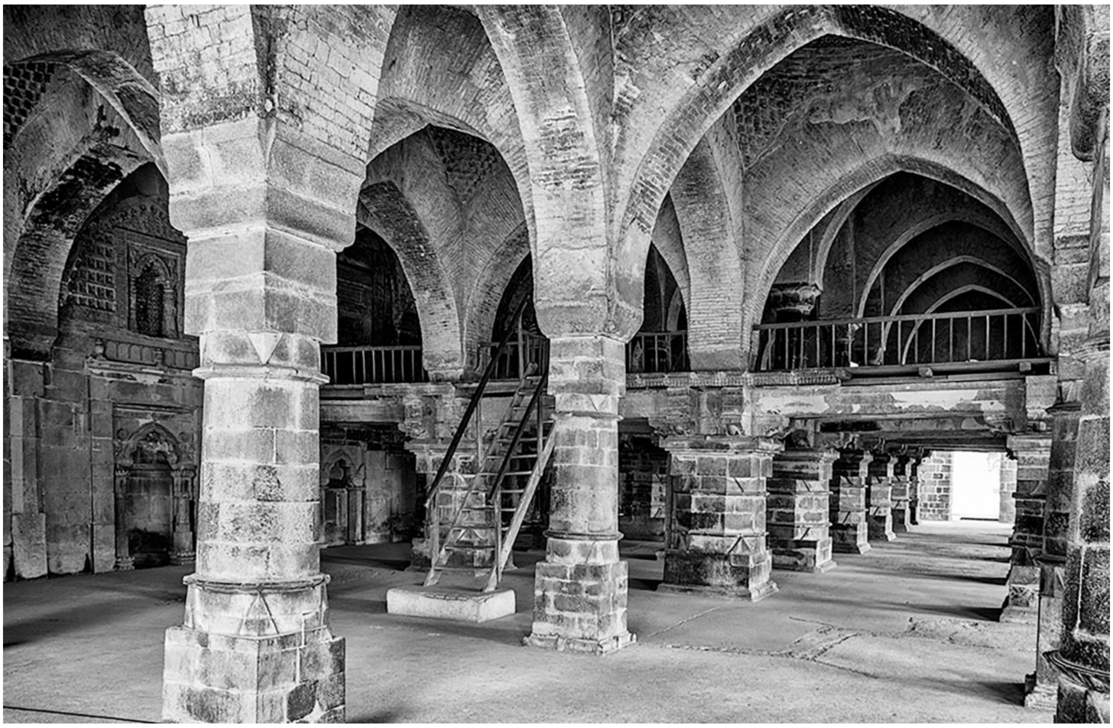

৭.৫ আদিনা মসজিদ এর বাদশাহ-কি-তকত (ladies gallary)

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

ক.১ প্রাথমিক উৎস

আরবি ও ফারসি গ্রন্থাবলি (অনুবাদ গ্রন্থ)

Abul-Fazl Allami, *The Ain-I-Akbari*, eng. tra. Colonel H. S. Jarrett, 3 vols, Asiatic Society Kolkata, re.print, 2010

Afif, Shams-i-Siraj, *Tariq-I-Firoz Shahi, The History of India, As Told By Its Own Historians, The Muhammadan Period*, Edited by H. M. Elliot and John Dowson, Sunil Gupta pub. Ltd., Calcutta, 1953

Ahmed Nizam-ud-din, *Tabqat-i-Akbari*, eng.tra. B.De, published in Bib.Indica, revised by Baini Prasad, 3 vols, Delhi, 1939

Al Juzzana, Minhaj-I-Siraj, *Tabakat-I-Nasiri*, eng. tra, Major H. G. Raverty. 2 vols, Orient Books, Reprint, 1970, 1st Published 1818 in the Bibliotheca Indica series by Asiatic Society of Bengal. Calcutta, 1970

Ali bin Hamid al Kafi, *The Chachnamah, An Ancient History of Sind*, tra. from the Persian By Mirza Kalichbeg Fredunbge, Printed at the Commissioner's Press, Karachi, 1900

Barani, Ziauddin, *Tarikh-i-Firuz Shahi*, eng.tra, Ishtiyaq Ahmed Zilli, Primus Book, Delhi, 2015

Babur Padshah Ghazi, Zahirud-din Muhammad, Turki *The Babur Nama, Memoirs in Babur*, eng. tra. from text., Annette Susannah Beveridge, 2 vols, Low Prince Publication, Delhi, 1921

Begam, Gul-Badan, *The History of Humayun, Humayun Nama*, eng.tra, Annette S. Beveridge, M.R.A S, The Royal Asiatic Society, London, 1902

Salim, Ghulam Hussain *Riyazu-s-Salatin*, eng. tra. Abdus Salam, Delhi, 1975

Khusrau, Amir, *Qiran-us-Sadain*, eng. tra. Ishrat Husain Ansari and others, Delhi, 2012

____ *Khazainul Futuh*, tra. into English with notes and Parallel Passages from other Persian writers by. Muhammad Habib, D.B. Taraporewala, Sons & Co. Bombay. 1931

Nathan, Mirza — *Baharistan-i-Ghaybi,* eng.tra., M I. Borah, Guahati, Assam, 1936

Qanungo, Kalikaranjan — *Sher Shah and His times,* Orient Longmans Ltd., Calcutta, 1965

____ — *Sher Shah,* Kar, Mujumder & Co, Calcutta, 1921

Sarwani, Abbas Khan — *Tarikh-i-Ser Shai,* eng. tra. by Brahmadeva Prasad, Ambashthya, Patna, 1974

তুগলক, ফিরোজশাহ, — *ফুতুহাত-ই-ফিরুজশাহী*, অনু.আব্দুল করিম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯

ফিরিশতা, মুহাম্মদ কাশিম, — *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস*, অনু. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

বারানী, জিয়াউদ্দিন, — *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, অনু. গোলাম সামদানী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

বাবর, জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ — *বাবরনামা*, বাংলা অনুবাদ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, ১ম ও ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫

বেগম, গুলবদন — *হুমায়ুন নামা (অনুবাদ)*, মোস্তফা হারুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

সলীম, গোলাম হোসাইন, — *রিয়াজুস-সালাতীন, বা্ংলার ইতিহাস*, অনু. আকবরউদ্দিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

সিরাজ, মিনহাজ-ই, — *তবকাত-ই-নাসেরী*, অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩

ক. ২. Coins, Inscriptions and Architecture

Ahmad, Shamsuddin, — *Inscription of Bengal,* vol. IV, Varendra Research Society, Rajshahi, 1960

Bhattasali, Nalini Kanta, — *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal,* London, 1922

Dani, Ahmed Hasan, — *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal* (Down to A.D. 1538), Appendix to the Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol.1, 1957

____ — *Muslim Architecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Publication No-7, 1957

Karim, Abdul, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal* (Down to A.D.1538), Asiatic Society of Pakistan Publication No. 6, Dhaka, 1960

Karim, Abdul, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1990

Majumder, Nani Gopal, *Inscriptions of Bengal*, vol, 111, Varendra Research Society, Rajshahi, 1929

Sen, B.C, *Historical Aspects of Bengal Inscription,* Calcutta University, 1940

Thomas, Edward, *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi*, Indian edition, Delhi, 1967

ক.৩. ভ্রমণবৃত্তান্ত

Battuta, Ibn, *Travels in Asia and Africa 1325-1354,* eng. tra. H. A. R Gibb, London: Routledge & Kegan Pall Ltd., 1953

____ *The Rehla of Ibn Battuta,* eng.tra, Agha Mahdi Hussain, Oriental Institution, Borada, 1953

Bernier, Francois, *Travels in the Mongol Empire,* A.D, 1656-1668, 3rd ed. New Delhi: S. Chand & Co. Pvt. Ltd, 1972

Barbosa, Duarte *The Book of Duarte Barbosa,* 2 vols. An Account of the countries bordering on the Indian Ocean and their Inhabitants written by Duarte Barbosa and completed about the year 1518 A.D, The Hakluyt Society, London, 1812

Fitch, Ralph *Travels in India,* by Harton, Ryley. T. Fisher Unwin, Patrmaster Squre, London, 1899

Polo, Marco, *The Travels of Marco Polo,* intro., John Masefield, First pub.1908, Last rpt. London: J M Dent & sons Ltd., 1954

Ma Huan, *Ying-Yia-Sheng Lan, The over all Servey of Oceans Shores* (1433), eng. tra. and edited by J V G. Mills, London, 1970

Mundy, Peter, *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia (travels in Asia 1628-1634),* ed. by Lt. Col. Sir Richard Carnac Temple, vol. 2, The Hakluyt Society, London, 1914

Hsin Fei — *Hsing cha sheng Lan, The Over all Servey of star Rafi,* eng. tra. J V G Mills, Wiesbaden, 1996

Pires, Tome, — *The Suma Oriental of Tome Pires , An account of the East, from the Red sea to Japan written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues*. Translated from the Portuguese Afs in the Bibliotheque de la chamber des Deputes, Paris and edited by Armando Cortesao, 2 vols, Hakluyt Society, London, 1944

Travenier, Jean Baptist, — *Travels in India,* vol. 1, tra. V Ball. Oriented Books Reprint Corporation, New Delhi, 1977

Varthema, Ludo Vico di, — *The Travels of Ludovico Varthema (1503-1508 A.D),* trans. John W. Jones, Hakluyt Society Publication, 1st ser., no 32, reprint, New York, 1863

সং প্রেমময় দাশগুপ্ত — *তাভারনিয়ারের দেখা ভারত*, ফার্মা কে.এল. এম. প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৮৪

সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ — *ফীচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সমসাময়িক ভারত, ৪র্থ কল্প, ভারতে ইউরোপীয় পর্যটক*, ১ম খণ্ড, পাটনা, সমসাময়িক ভারত কার্যালয়, ১৩২২

চৌধুরী, ননীগোপাল, — *র‍্যালফ ফীচ, বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত*, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪

ক.৪ সাহিত্যিক ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী

কবির, মুহাম্মদ — *মনোহর মধুমালতি*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৭

গুপ্ত, বিজয়, — *মনসা মঙ্গল*, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, বাণীনিকেতন (প্রকাশনার তারিখ নেই)

চণ্ডীদাস, — *শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন*, বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

জয়ানন্দ, — *চৈতন্যমঙ্গল*, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, — *চণ্ডীমঙ্গল*, ডি সি সেন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯২৪, ও ১৯২৬

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), — *কালকেতুর উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭

ফয়জুল্লাহ, শেখ, — *গোরক্ষ বিজয়*, পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

দাস, বৃন্দাবন — *শ্রী চৈতন্য ভাগবত*, মৃণাল কান্তি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, কোলকাতা, ৪৪০ গৌরাঙ্গাব্দ

বাহরাম খান, দৌলত উজির, — *লাইলী মজনু*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৫৭

বিপদাস, — *মনসা মঙ্গল*, সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা, ১৯৫৩

শ্রী রায় বিনোদ প্রণীত এবং মুহা. শাহজাহান মিয়া (সম্পাদিত), — *পদ্মাপুরান*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১

সগীর, শাহ মুহাম্মদ, — *ইউসুফ জুলেখা*, মোহাম্মদ এনামুল হক কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪

সেন, কবি কর্ণপুর পরমানন্দ, — *চৈতন্যচরিতামৃত*, রামনারায়ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, রাধারমন প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৪৯১ বঙ্গাব্দ

সেন, দীনেশচন্দ্র রায় বাহাদুর (সম্পাদিত ও সংকলিত), — *মৈমনসিংহ- গীতিকা*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১২

সেন, বল্লাল — *দানসাগর*, ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৩

নন্দী, সন্ধ্যাকর, — *রামচরিতম*, শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

Bhatta, Ananda, — *Vallala Charita*, ed. and trans.from Sanskait and English by Haraprasad Sastri, Hase Press, Calcutta, 1901

Misra, Halayudha — *Sekasubhodaya*, ed. by Sukumar Sen, Calcutta, 1963

ক.৫. জেলা গেজেটিয়ার

O. Malley, L.S.S. — *Eastern Bengal District Gazetteers*; *Chittagong*, Calcutta, 1908

Webster, J. E — *Eastern Bengal District Gazetteers*; *Tippera*, Allahabad 1910

O. Malley, L.S.S. — *Bengal District Gazetteers Khulna*, Calcutta, 1908

______ — *Bengal District Gazetteers Jessore*, Calcutta, 1912

O. Malley, L.S.S. — *Bengal District Gazetteers*; *Murshidabad*, Calcutta, 1914

Allen, B.C.C.S, — *Bengal District Gazetteers*; *Sylhet*, vol-2, Calcutta, 1905

Garrett, J.H.E — *Bengal District Gazetteers*; *Nadia*, Calcutta, 1910

Jack, J. C — *Bengal District Gazetteers*; *Bakarganj,* Calcutta, 1918

২. সহায়ক গ্রন্থাবলী

Abid, Ali Khan, — *Memoires of Gour and Pandua,* ed. by H. E. Stapleton, Calcutta, 1931, reprint, The Department of Information and Cultural Affairs, West Bengal, 1986

Ali, Muhammad Mohar, — *History of the Muslim of Bengal,* vol.1.A, 1st ed. Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, 1985

Ashraf, K, M, — *Life and Conditions of the people of Hindustan, (1200-1550 A.D),* Munshiram Monoharlal, Oriental Publishers, Delhi, 1970.

Akhtaruzzaman, Md, — *Society and Urbanization in Medieval Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009, 1st Reprint, 2019

Blockman H, — *Contributions to the Geography & History of Bengal,* The Asiatic Society of Calcutta, 1968

Boxer, C.R, — *The Portuguese Sea-borne Empire, 1415-1825,* 2nd ed. Carcanet Press, London, 1991

Bharadwaj, R.K, — *Urban Development in India*, Delhi, 1974

Banerjee, Anil Chandra, — *The State and Society in Northen India, 1206-1526,* K.P.Bagchi & Co., Calcutta, 1982

Beveridge, Henry, — *A Comprehensive History of India*, vol. 1, Associated pub. House, New Delhi, 1980

Buchanan, Doctor Francis — *Geographical Statistical, and Historical Description of the District or Zila of Dinajpur, in the Province or Soubah of Bengal,* The Journal of the Asiatic Society, Calcutta, 1833

Campos, J.J.A, — *History of the Portuguese in Bengal,* 1st ed, Janaki Prakashan, Patna, 1979

Chaudhuri, K, N, — *Trade and Civilization in the Indian Ocean,* Cambridge University Press, Cambridge, 1985

Charlesworth, M.P, — *Trade-Routes and Commerce of the Roman Empire,* Cambridge University Press, London, 1924

Cunningham, Alexander, *Archaeological Survey of India Report*, vol. XV, Calcutta, 1882

____ *Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-1880 From Patna to Sunargaon,* xv, Delhi, 1969

Chakrobarti, Dilip K, *The Archaeology of Indian Cities,* New Delhi, 1998

____ *Ancient Bangladesh, A study of the Archaeological Sources*, Oxford University Press, 1992

Choudhury, Tapon Ray &

Habib, Irfan (ed.), *The Cambridge Economic History of India*, 1200- 1750, vol. 1, Cambridge, 1982

Chopra, P.N.B.N.Puri Das, *A Social, Cultural and Economic History of India,* Vol. 11: M.N. Medieval India, rpt. Macmillan India Ltd. Delhi, 2003

Chattopahyaya B. D, *Urban Centres in Early Bengal, Archaeological Perspectives,* Pratna Samiksha 2&3, 1993-94

Choudhury, Abdul Momin, *Dynastic History of Bengal, (c. 750-1200 A.D),* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1967

Choudhury, Abdul Momin (ed.), *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods (c. 1200 to 1800 CE) Political History,* Vol. 1, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2020

____ *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods (c. 1200 to 1800 CE) Society Economy and Culture,* Vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2020

Chaudhuri, Sunil, *Trade and Commercial Organization in Bengal 1650-1720,* Firma K.L Mukhopadhyay, Calcutta, 1975

Dadwell, H.H, *The Cambridge History of India* 1497-1858, vol. V, Delhi, 1929

Eaton, Richard M, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760),* University of California press, London, 1994

Gupto, S.N.Das, *Bengal in the Sixteenth Century A.D,* The University of Calcutta, 1914

Habibullah, A.B.M, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1961

Habib, Irfan, *The Agrarian System of Mughal India (1556-1707),* Asia Publishing House, New York, 1963

Habib, Irfan, *Technology in Medieval India (c.650- 1750),* Aligarh Historians Society, New Delhi, 2017

____ *Medieval India-1, Researches in the History of India 1200-1750,* Oxford University Press, New Delhi, 1992

Husain, A.B.M, *Gawr-Lakhnawti,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997

Hussain, Syed Ejaz, *The Bengal Sultanate: Political, Economy and Coins (AD 1205-1576),* Delhi, 2003

Husaini, S A Q, *Administration under the Mughals*, Paradise Library, Dacca, 1952

Hunter, W.W, *Report of the Education Commission,* Calcutta, 1883

____ *Annals of Rural Bengal,* vol. V, Smith Elder & Co. London, 1868

Islam, Kamrunnesa, *Aspects of Economic History of Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984

Islam, Sirajul (editor), *Banglapedia, National Encyclopedia of Bangladesh*, 10 vols, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2003

____ *History of Bangladesh, Political History,* vol. 1, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, reprint, 2017

____ *History of Bangladesh, Economic History,* vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, reprint, 2017

____ *History of Bangladesh, Social and Cultural History,* vol. 3, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, reprint, 2017

Jaffar, S. M, *Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India*, Jayyed Press, Delhi, 1972

Jaggi, O.P, *History of Science & Technology in India, Science and Technology in Medieval India*, vol. 7, Atma Ram & Sons, Delhi,1981

Islam, M. Mufakharul (editor), *Socio-Economic History of Bangladesh, Essays in Memory of Professor Shafiqur Rahman*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2004

Karim, Abdul,	*Social History of the Muslims in Bengal,* Down to A.D, 1538, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959
Karim Khondkar Mahbubul,	*The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan,* Asiatic Society of Bengal, Dhaka, 1974
K. K Dewett,	*Modern Economic Theory,* Multicoloure Illustrative Edition, New Delhi, 2005
Majumder, R, C	*The Delhi Sultanate,* 9th ed. S. Chand & Co. Ltd., New Delhi, 1992
Majumder, R.C,	*History of Bengal, Hindu Period,* vol.1, The University of Dhaka, 1943
Murtaza, Ali Sayed,	*History of Chittagong,* Dhaka, 1964
Moreland, W.H,	*The Agrarain system of Moslem India,* Atlantic Publisher and Distributors, New Delhi, 1994
____	*India at the Death of Akbar,* Macmillan and Co. London, 1920
Mukherjee, R.K,	*A History of Indian Shipping.* Orient Longmans, Bombay, 1957
Naqvi, Hameeda Khatoon,	*Urbanization and Urban Centers under the Great Mughals* (1556-1707), vol, 1, Simla, 1972
____	*Urban Centres & Industries in upper India,* Asia Publishing House, Bombay, 1982
Nizami Kaliq Ahmed,	*Some Aspects of Religion and Politics in India during the Thirteenth Century,* Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, 1961, 2nd edition, 1974
Nigam, S,B.P,	*Nobility Under the Sultans of Delhi A.D.1206-1398,* Munshiram Monoharlal, Oriental Publishers, Delhi, 1968
O'Mally L.S.S,	*Modern India and the west,* Oxford University Press, London, 1968
Prakash, Om	*The Dutch East India Company and the Economy of Bengal,* Princeton, 1985
Majumder, R. C, H. C. Raychaudhuri and K.Datta,	*An Advance History of India,* re.pt. London: Macmillan & Co. Ltd., 1961

Qureshi, Istiaq Hussain, *The Administration of the Sultanate of Delhi,* 4th ed. Pakistan Historical Society, Karachi, 1959

____ *The Administration of the Mughal Empire*, Low Price Publications, Delhi, 1973

Ray, Haraprasad, *Trade and Trade Routes between India and China, c.*140 B.C-A.D.1500, Progressive Publishers, Kolkata, 2003

____ *Trade and Diplomacy in India, China Relation,* A study of Bengal During the Fifteenth Century, New Delhi,1993

Ray, Tirthankar, *The East India Company The World's Most Powerful Corporation,* Calcutta, 2012

Roy, A.C, *History of Bengal,* Calcutta University, Calcutta, 1967

Rijvi, S.H.M. & Ray Shibani, *Muslim Bio-Cultural Prospective,* Delhi, 1984

Rubbee, Khondkar Fuzli, *The Origin of the Musalmans of Bengal,* Calcutta, 1979

Rahim, Muhammad Abdur, *Social and Cultural History of Bengal,* 2 vols, Pakistan Historical Society, Karachi, 1963

Rennel, James, *Memoires of a Map of Hindustan, or the Mogul's Empire,* 3rd. ed. London, 1793

Sarker, Jagadish Narayan, *Islam in Bengal*, Patna Pakistan, Calcutta, 1972

____ *Hindu Muslim Relations in Bengal, Medieval Period,* Idrah-i-Adabiyat-i-Delhi, 1985

Stewart, Charles, *History of Bengal,* Calcutta, 1910

Sarkar, Jadu-nath, *The History of Bengal,* vol, 2, Muslim Period (1200-1757), Dhaka.University, Dacca, 1972

____ *Studies in Mughal India*, M. C. Sarkar & Sons, Calcutta, 1919

Sinha, Narendra Krishna, *The Economic History of Bengal,* vol, 1, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1961

Sharma, Sunil *Amir Khusraw (The Poet of Sufis and Sultans),* New world Publications Oxford, England, First South Asian Edition, 2006.

Sharma, R.S *Urban Decay in India* (300-1000), Munshiram Monoharlal Pub. Pvt. Ltd., New Delhi, 1987

Tarafdar, Momtazur Rahman, *Husain Shahi Bengal, 1494-1538 A.D, A Socio-Political Study*, The University of Dhaka, 1999

____ *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal*, International Center for Bengal Studies, Dhaka, 1st Pub., 1995

Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture,* The Indian Press Pvt, Allahabad, 1963

Taylor, James *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* Calcutta, 1840

Tripathi, R. P, *Some Aspects of Muslim Administration,* Central Book Depot, reprint, Allahbad, 1979

Westland. J. *A Report on the District of Jessore; its Antiquities, its History and its Commerce,* Calcutta, 1871

Wise, James *Notes on the Races, Cases and Trades of Eastern Bengal,* London, Harrison and Son's, 1883

খ. বাংলা গ্রন্থাবলি

আনিসুজ্জামান (সম্পাদক) *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খ্রিষ্টীয় চর্তুদশ শতাব্দী পর্যন্ত*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯

আল্লামী, আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ, আহমেদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩

আলী, এ কে এম ইয়াকুব , *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, বুক চয়েজ, ঢাকা, ১৯৮৯

----- *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

আলী, খান সাহেব আবেদ, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

----- *সুলতানী আমলের বাংলা সাহিত্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

আহমদ, সালাউদ্দিন, মমতাজুর রহমান তরফদার ও অজয় রায় (সম্পাদক), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১

আইয়ুব, সালাউদ্দিন (অনুবাদ) *দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন*, সম্পাদক, ভেলাম ভান সেন্দেল, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

আহমেদ, তোফায়েল, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬

আহমদ, ইমতিয়াজ , *দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য* (১৪৯৮-১৬৪১), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১

আশরাফ, কে, এম, *হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা*, পার্ল পাবলিশার্স কলকাতা, ১৯৯৪

সিরাজুল, ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস*, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

----- *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), রাজনৈতিক ইতিহাস*, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

----- *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

ইকরাম, শেখ মোহাম্মদ, *পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, ঢাকা, ১৯৯৬

কানুনগো, সুনীতিভূষণ *বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

করিম, মোঃ রেজাউল ও

আসগর সৈকত, *সোনারগাঁয়ের উৎস ও উপাদান*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

করিম, মোঃ রেজাউল *আবহমান বাংলার মুদ্রা*, জার্নিম্যান প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫

করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি আমল*, ঢাকা, ১৯৯৯

----- *মোগল রাজধানী ঢাকা*, অনুবাদ ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্ল্যাহ ছিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

----- *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

----- *মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ*, অনুবাদঃ মোকাদ্দেসুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

----- *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

----- *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

----- *সুলতানি আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র*, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১

----- *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র*, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২

ঘোষ, বিনয় *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, চব্বিশ পরগনা*, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০২০,

চৌধুরী, আবদুল মমিন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত আদি বাংলা*, (আনু: ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) *প্রত্নতত্ত্ব, রাজনৈতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রগঠন*, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৯

----- *বাংলাদেশের ইতিহাস আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত আদি বাংলা, (আনু: ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত), সমাজ, অর্থনীতি সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৯

চৌধুরী, আব্দুল মমিন ও আলম ফকরুল, *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, *গৌড়ের ইতিহাস*, মালদহ, ১৯০৯

চৌধুরী, আব্দুল হক, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

----- *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ১৯৮২

চৌধুরী, ননীগোপাল, *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত: খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯৪

চৌধুরী, সুশীল, *পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ১৬০০-১৮০০*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, সম্পাদনা, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, কে চি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১২

চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর *গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ২য় ভাগ, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০০৫

ভদ্র, গৌতম , *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪২০

ভট্টাচার্য, শ্রী নৃপেন্দ্র *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ওরিয়েন্ট বুক, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬১

ভট্টাচায, শ্রী আশুতোষ *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫,

জাকারিয়া, এ, কে এম, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

তরফদার, মমতাজুর রহমান, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১

----- *হোসেনশাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪–১৫৩৮, একটি সামাজিক রাজনৈতিক পবেষর্ণা*, অনুবাদ মোকাদ্দেসুর রহমান, ঢাকা, ২০০১

----- *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

থাপার, রোমিলা *ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ)*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০

দাস, গোকুল চন্দ্র *বাংলার নৌকা প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১১

পান্না মুস্তফা *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

ফারুক, আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র শাস্ত্রী (অনূদিত) — *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম (কোটিল প্রণীত অর্থশাস্ত্র)*, কলকাতা, ২০০২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রাখালদাস — *বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড*, অখণ্ড সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন, — *মধ্যযুগের বাঙ্গালা*, গুরুদাস এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৩০ বাংলা

বিভারিজ, বি.সি.এস, এইচ, — *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস (বৃহত্তর বরিশাল জেলা)*, অনুবাদক, গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪

বসু, নির্মল কুমার — *হিন্দু সমাজের গড়ন*, কলকাতা, ১৩৫৬ সাল

মোস্তাফিজুর, রহমান সুফি, — *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, (বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

হোসেন, এ.বি.এম, — *স্থাপত্য, (বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত, — *বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*; অনুবাদ মোঃ রেজাউল করিম, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, — *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)*, কলিকাতা, ১৯৮১

----- — *বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ*, সরকার পাবলিশিং এণ্ড কোঃ কলিকাতা, ২০০৬

মণ্ডল, সুশীলা, — *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, — *বাংলার ইতিহাস, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব ১২০৪-১৫৭৬*, ঢাকা, ২০০৫

----- — *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল)*, ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৯৮

মিত্র, সুধীর কুমার, — *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ*, কলিকাতা, ১৯৬৫

মিত্র, সতীশচন্দ্র, — *যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড*, সমবায় প্রকাশ, গতিধারা, ২০১১

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, — *বাঙালির ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, — *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন* (১২০০-১৭৫০), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

শ্রীমানী, সৌমিত্র, — *সুলতানী রাজত্বকালে ভারত*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪,

শর্মা, রামশরণ, — *ভারতে নগর অবক্ষয়*, কলকাতা, ১৯৯৯

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, — *মধ্যযুগের বিশ্ব ঃ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা*, বুক চয়েজ, ঢাকা, ২০০৭

----- — *মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্যে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

শরিফ, আহমদ — *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

---- — *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য: গ্রন্থ- ভূমিকা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, সম্পাদক, আবুল আহসান চৌধুরী, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

স্যানাল, দুর্গাচন্দ্র, — *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪১০

সেন, দীনেশচন্দ্র, — *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

সেন, সুকুমার, — *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৪০

----- — *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

হাবীব, ইরফান, — *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, (অনু.সৌভিক বন্দোপাধ্যায়) পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৪

----- — *মুগল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫

হক, মুহাম্মদ এনামুল, — *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, র‌্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১

হোসেন মো: মোশারফ — *বাংলাদেশের নগর উদ্ভব ও বিকাশ*, প্রতীক পাবলিকেশন, ২০০১

রায়, নীহাররঞ্জন, — *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, ৭ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

রায়, অনিরুদ্ধ, — *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস (সুলতানি আমল)*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০০৫

----- — *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

----- — *সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা*, কলকাতা, ১৯৯৭

----- — *মধ্যযুগের বাংলা (১২০০-১৭৬৫ খ্রি.)*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২

রায়, আনন্দনাথ, — *ফরিদপুরের ইতিহাস*, কলিকাতা, বাংলা ১৩৬১

রায়, শ্রী মিহির কুমার, — *ভারতের ইতিহাস; তুর্কো-আফগান যুগ, ১২০৬-১৫২৬*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৬

রায়, তীর্থংকর, — *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা, ২০১৯

রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর, — *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

----- — *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম*, সম্পাদনা পরিষদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নভেম্বর, ২০১৪

ইসলাম, এস এম রফিকুল, — *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস সেনযুগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, — *বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রাচীন থেকে মুসলিম বিজয় পর্যন্ত*, ১ম খণ্ড, শৈব্যা প্রকাশন বিতান, কলকাতা, ১৩১৬ বাংলা

পিএইচ ডি থিসিস

Anjum, Nazer Aziz	*Economy of Transport in Mughal India,* Aligarh Muslim University, 2010
Ahmed, A.B.M Samsuddin,	*Bengal Under the Rule of the Early Ilyas Shahi Dynasty*, Dhaka University, 1987
Das, Anil Kumar,	*Urbanization in Mughal Bengal in the Seventecnth Century,* Jadavpur University, 1993
Karim, Md. Rezaul,	*A Critical Study of the Coins of the Independent Sultan of Bengal,* Dhaka University, 2001
Moosvi, Shireen	*The Economy of Mughal India-A Statistical Study*, Aligarh Muslim University, 1981

Dictionary

Shorter Oxford English Dictionary, 2nd edition, 2002

A New English Dictionary on Historical Principles, vol. 2, 5th edition, 2005

প্রবন্ধ

Akhtaruzzaman, Md,	"Md. Process of Urbanization in Early Muslim Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* Hum, 46(1), June 2000
____	"The Sultanat of Bengal and Its Political Culture" Fakrul Alam & Firdous Azim ed. *Politic and Culture*, Essays in Honour of Serajul Islam Choudhury, *University of Dhaka,* Feb.2002
____	"Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal frontier (1204-1760) ", (a review article), *The Dhaka University Studies*, vol. 53, no. 2, Dec.1997
____	"Urbanization Process and Planning", *History of Bangladesh*, vol. 2, editor Abdul Momin Chowdhury, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2020
Banerji, R D,	"Saptagram or Satgawn", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*,1909
Hamilton, Buchanon,	"Dinajpur", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, 1833
Habib, Irfan,	"Economic History of the Delhi Sultanate", *The Indian Historical Review*, vol. 5, no-1, July, 1977

Dhaka University Institutional Repository

Hussain, Syed Ejaz, "Crafts and Economy: Bengal Sultanate", *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods (c. 1200-1800 C.E),* vol. 2, Society, Economy, Culture, edited by Abdul Momin Chowdhury, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2020

Islam, Sirajul, "Economic History in Perspective", *History of Bengal (1704-1971), Economic History,* vol. 2, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2017

M. Mir Jahan; "Mint Towns of Medival Bengal " *Proceeding, of the Pakistan Historical Conference, Pakistan Historical Society*, 1953

Mannan, Abdul, "Commercial Persuits of the Portuguese in Chittagong": an Overview, *Chittagong University Studies*, Commerce vol.1, 1985

K.M Mohsin, "Mughal Banking System" *History of Bangladesh, Economic History (1704-1971),* vol. 2, ed. Sirajul Islam, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2017

Rahman, Mizanur, "Medieval Agriculture: An Archaeobotanical Study", *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods (c. 1200-1800 C.E),* vol. 2, Society, Economy, Culture, edited by Abdul Momin Chowdhury, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2020

Shamsuzzoha, A.T.M "Crafts and Technology", *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods (c. 1200-1800 C.E),* vol. 2, Society, Economy, Culture, edited by Abdul Momin Chowdhury, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2020

আখতারুজ্জামান, মোঃ "নগরায়ন, মধ্যযুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগ", *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, সম্পাদক, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

----- "রাষ্ট্রগঠন পর্ব, মধ্যযুগ", *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, সম্পাদক, এমাজউদ্দিন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

আলী আহমেদ, "ইবনে বতুতা বাংলাদেশকে যেমন দেখেছেন" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৭, ১নং, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০০

আহমদ, ওয়াকিল "মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র", *ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা*, উনত্রিশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০২

আলী, সৈয়দ মর্তুজা, "হযরত শাহ জালাল ও শ্রীহট্টের ইতিহাস", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক- পৌষ, ১৩৬৯

আহমদ, গুলশান, "সোনারগাঁও পরিচিতি", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ-৩য় সংখ্যা, ১৩৭৬

আহমেদ, ফকির ফারুক, "পানাম নগর, অতীত ও বর্তমান", *ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা*, অষ্টবিংশতিবর্ষ, ১৯৯৬

ইসলাম, এম মোফাখ্খারুল, "অর্থনৈতিক জীবন", *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

করিম, মোঃ রেজাউল, "মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা, মধ্যযুগ ও পরবর্তী মধ্যযুগ", *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

খাতুন, আশিয়ারা, "সুলতানি আমলে বাংলার নগর প্রকৃতি ও প্রকারভেদ", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ত্রিশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৩

খাতুন, হাবিবা, "সোনারগাঁও রাজধানী শহর ও বন্দর", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৯৪

চক্রবর্তী, রনবীর, "মুদ্রা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া ৮ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩

চিশতি, শেখ মোঃ আছরারুল হক, "শেরশাহ কর্তৃক ভারতে আফগান শাসন পুন:প্রতিষ্ঠায় বাংলার গুরুত্ব", *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, তেত্রিশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০৬ বাংলা

তরফদার, মমতাজুর রহমান, "চৈনিক পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬

ভাদুড়ী, রীনা, "মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ও সুলতানি আমলে বাংলার নগর বিন্যাস", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৩, কে পি.বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৬

ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর, "ফতেয়াবাদ", *সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা*, সংখ্যা-৪০, ১৩৪০ বাংলা

রহমান, মোস্তাফিজুর, "মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা আদি-ঐতিহাসিক থেকে প্রাক-মধ্যযুগ", সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

সুতপা সিন্‌হা, "মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থা" *বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মোগল যুগ*, সম্পাদক আবদুল মমিন চৌধুরী, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০২০

শাহনাওয়াজ, এ কে এম, "প্রাথমিকসূত্রে সুলতানি বাংলায় নগরের ক্রমবিকাশ", *The Jahangir Nagar Review,* part-c, vol-x1&x11, 1990-2000& 2000-2001

শরীফ, আহমদ, "বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান", *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, সম্পাদক, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধায়, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১২